২/৭৭৬

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ

৪/৩/২৭

পঞ্চম খণ্ড

(১৩০০ সালের ডায়েরী)

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

৫/৭/২৯

শ্রীউমানন্দ সরকার

শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

পঞ্চম খণ্ড

(১৩০০ সালের ডায়েরী)

শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহাশ্রিত অবস্থার
কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত

তদীয় কৃপাভাজন
শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক যথাযথভাবে
লিখিত

মহেশ লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণ
১৩৫৯

পুরীধাম, ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের সেবাইত
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

All rights reserved by Thakurbari Committee of Puri

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বৈশাখ

(১৩০০)

বস্তিত্যাগ, নীরব অযোধ্যায় রামনাম ... ১
হনুমান গৌড়ি দর্শনে ঠাকুরের স্মৃতি : মহাপুরুষ দর্শন ২
বৈদান্তিকের উপর শোক সঞ্চার : ভগবানের নাম করা সহজ নয় : অযোধ্যার আশ্রম ও দেব-মন্দির : হিরণ্যগর্ভ-চক্র লাভ ... ৩
গুপ্তার ঘাটে শ্রীরামচন্দ্রের অন্তঃলীলা স্মরণে শোকোচ্ছ্বাস ৪
ভীষণ স্বপ্ন—মাতার প্রতি অত্যাচার : হরিদ্বারে হরগৌরীর অনুপম জ্যোতিদর্শন ... ৬
জলদান ব্রত : রামপ্রকাশ মোহন্তের আশ্রয় গ্রহণ : মক্ষিকার উৎপাতে রক্ষা ... ৭
চণ্ডী পাহাড়ে যাত্রা : গঙ্গার বন্ধন : তপস্যার স্থান নির্দ্দেশ ৯
ভজন কুটীর প্রস্তুত ... ১১
ভিক্ষায় বিপদাশঙ্কা—মহামায়ার খেলা ... ১২
স্থূল ভিক্ষার প্রয়োজন ও আদেশ ... ১৩
তন্দ্রায় প্রসাদলাভ—জ্বর আরোগ্য : হরিদ্বারে নিত্য কর্ম্ম ১৪
আমার প্রার্থনায় ঠাকুরের বিষম ভোগ ... ১৫
উচ্ছিষ্ট মুখে খাবার দিলে উচ্ছিষ্ট দেওয়া হয় ... ১৭
সাধনে যোগমায়ার কৃপা ... ১৮

জ্যৈষ্ঠ

নামে ও ধ্যানে পরমানন্দ সম্ভোগ : তীব্র তপস্যায় ভজন লোপ ... ১৯
স্বাভাবিক আহারে ঠাকুরের কৃপা ... ২১
বিষয় পৃষ্ঠা
আমার দৈনিক কর্ম্ম : অহৈতুকী জ্বালা : নিত্যক্রিয়ায় নিবৃত্তি ... ২২
দণ্ডী স্বামীর নিকট ত্রিসন্ধ্যার উপদেশ : বৃষ্টিতে ভিজা—ঠাকুরের উপর অভিমান ... ২৩
একি প্রলোভন, না ঠাকুরের দয়া ? ... ২৪
মত্তপায়ীর হাতে পড়া : জ্যোতির্ম্ময় শালগ্রাম ... ২৫
শালগ্রাম চুরি ... ২৬
হরিদ্বারে শালগ্রাম অনুসন্ধান ... ২৭
শালগ্রাম সংগ্রহ : চণ্ডী পাহাড়ে চণ্ডী দর্শন : রাস্তা ভুল, বিপদের আতঙ্ক ... ২৮
কেশবানন্দ স্বামী ... ৩০
সাধন চেষ্টার নিষ্ফলতা : বস্তু তাঁর হাতে—দাতা তিনি ৩১
বিচার বুদ্ধিতে নিরম্বু একাদশী ভঙ্গ ও অনুতাপ ... ৩২
উত্তপ্ত ডাল পড়ার জ্বালা—প্রার্থনায় নিবৃত্তি ... ৩৩
লোভের প্রতিফল : অসৎ পরিগ্রহে অশান্তি ... ৩৩

আষাঢ়

মন্ত্র শক্তি ... ৩৪
ভয়ানক শুষ্কতায় ঠাকুরের কৃপাবর্ষণ : শালগ্রামে নীল জ্যোতিঃ ... ৩৫
ছায়ারূপ দর্শনে খেদ আতঙ্ক : প্রার্থনা—'দর্শন দিও না' ৩৫
লোক সেবায় সাধন স্ফূর্ত্তি ... ৩৬
বর্ষার প্রারম্ভে বিষময় গঙ্গা—স্নানে বিপত্তি ... ৩৭
বিক্ষিপ্ত ও উদ্বেগপূর্ণ মন : অন্যের কল্যাণকামনায় চিত্ত সুস্থির : গায়ত্রী জপে অষ্টদল পদ্মস্থিত কেন্দ্রে নীল জ্যোতিঃ দর্শন ... ৩৮

বিষয় পৃষ্ঠা
জ্যোতিঃ দর্শন চেষ্টায় বিফলতা ঃ বর্ষা আরম্ভে তিন মাসের আহার সংগ্রহ ... ৩৯
মণিপুর চক্রে ধ্যানের ফল ঃ ক্রোধে নাম, ধ্যান লোপ ৪০
কর্ত্তা তিনি—তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত জুটিতেছে ... ৪১
স্ত্রীলোকের সঙ্গ নিঃসঙ্গ সমান বোধই নিরাপদ ঃ নামের উৎপত্তি স্থান—নাভি-চক্র ... ৪২
ত্রিসন্ধ্যা কি ভাবে করি ... ৪৩
চিত্তের একাগ্রতায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অনুভব ... ৪৪
নাম ও নামী এক ... ৪৫
শালগ্রামের শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত স্বেদবিন্দু ... ৪৫
শিবানন্দ স্বামী ও তাহার সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম ... ৪৭
অদ্ভুত স্বপ্ন—ঠাকুরের চরণামৃত পান ... ৪৭
রুদ্রাক্ষে শালগ্রাম দর্শন ... ৪৮
সুলক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম প্রাপ্তি ... ৪৯
অন্যের প্রশংসা শ্রবণে অভিমানে আঘাত ... ৫০

শ্রাবণ

বাস্তুসাপ দর্শনে আতঙ্ক ... ৫২
আমাকে উর্দ্ধরেতা করিতে সিদ্ধপুরুষের আগ্রহ ... ৫৪
ঠাকুরের জটা ঃ চণ্ডীর রূপ ঃ 'সর্ব্বদেবময়োগুরু' ... ৫৪
তৃতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য শেষ ঃ কণ্ঠ শালগ্রাম ... ৫৬
কণ্ঠ শালগ্রাম অভিষেক ও পূজা ... ৫৬
ঠাকুরের নিকট যাইতে চিঠি—আমার বিচার ... ৫৮
ঠাকুরের নামে ও ধ্যানে নিত্য নূতন অবস্থা সম্ভোগ ৫৮
মহামায়ার শাসন ঃ পুনরায় ঠাকুরের আদেশ চিঠি ঃ বিষম সমস্যা ঃ আসন তোলায় মন উচাটন ৫৯
হৃষীকেশ যাত্রা ঃ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ঃ ভীমগড় ও সপ্তস্রোত দর্শন ঃ তপস্বী সাধু ... ৬২
বিল্বকেশ্বর পাহাড়ে বিল্বকেশ্বর মহাদেব ... ৬৪
হরিদ্বার ত্যাগ ঃ গঙ্গার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ঃ জ্বালাপুর যাত্রা ... ৬৫

বিষয় পৃষ্ঠা

ভাদ্র

ভজন প্রতিকূল সাহারাণপুর ঃ জ্বালা-যন্ত্রণার কারণ নির্ণয় ... ৬৬
স্বপ্নে ঠাকুরের অপ্রাকৃত প্রসাদ ... ৬৭
বস্তি যাত্রা ... ৬৭
কলিকাতা অভয় বাবুর বাড়ীতে ঠাকুরের সংবাদ ... ৬৮
ঠাকুর দর্শন ঃ সঙ্গে থাকার অনুমতি ... ৬৯
পরলোক সম্বন্ধে কথা ঃ গীতা ও ভাগবতের ধর্ম্ম ৭১
ভক্তি ভালবাসা নয় ঃ ভক্তি গোপনীয়া ... ৭১
শাসনে নয়, ভালবাসায় সংশোধন ঃ অতিথির অবৈধ আবদার পূরণ করা উচিত কি না ? ... ৭৩
কলিকাতায় ভিক্ষার অসুবিধা ঃ ঠাকুরের ভাণ্ডার হইতে ভিক্ষা নিতে আদেশ ... ৭৪
যোগজীবন কর্ত্তৃক ঠাকুর মা'র শ্রাদ্ধ ঃ ঠাকুরের তিন গণ্ডূষ জল দান ... ৭৫
শ্রাদ্ধবাসরে মুকুন্দের কীর্ত্তন ঃ কীর্ত্তনে শক্তি সঞ্চার ৭৬
ঠাকুর মা'র মৃত্যুতে তত্ত্বপ্রকাশ ঃ জীবাত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ ঃ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা কেন ? ৭৭
পরমহংসদেবের উৎসবে নিমন্ত্রণ ... ৭৮
সত্য দাসীর অলৌকিক অবস্থা ও দীক্ষা ... ৭৯
মোহিনী বাবুর দীক্ষায় অনুভূতি ... ৮০
জ্ঞান বাবুর দীক্ষা ... ৮০
সদাশিব রূপে ঠাকুরকে দর্শন ঃ ভাণ্ডার অফুরন্ত ৮১
শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা ... ৮২
এঁড়েদহে ও সপ্তগ্রামে অস্বাভাবিক রূপে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন ... ৮৩
ঠাকুরকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া রটনা করায় জনৈক শিষ্যকে ঠাকুরের শাসন ... ৮৫
আমার শালগ্রাম সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা ঃ শালগ্রাম পূজা ৮৫
নিরম্বু একাদশীর নিয়ম ও ফল ... ৮৭
মুক্তি, পরলোক, শ্রাদ্ধ-তর্পণ ও রুগ্নাবস্থায় অলৌকিক দর্শনাদি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ... ৮৮
ঠাকুরের মমতা ... ৯০

বিষয় পৃষ্ঠা
তত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ : স্বপ্নে তত্ত্বপ্রকাশের উপদেশ ... ৯১
দেবদেবী কল্পনা নয় : সাধনের সপ্ত সোপান : ত্রিবিধ কর্ম্ম : উদ্ধারের উপায় ... ৯২
শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে আদেশ—না পারায় ঠাকুরের ভরসা দান ... ৯৩
ঠাকুরের দয়ায় শালগ্রামে ধ্যান ও তাহাতে আনন্দ ... ৯৫
চারি দ্বার রক্ষার উপায় ... ৯৭
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আহারে ভিন্ন ভিন্ন রিপুর উত্তেজনা আহারে ধর্ম্মের যোগ ... ৯৭
কাম-ক্রোধ অধর্ম্ম নহে : ধর্ম্ম-অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে ... ৯৮
শালগ্রামে আরতির আদেশ : কাম ও প্রেম ... ৯৯
দৈনিক কার্য্য ... ১০০
গুরু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ... ১০১
ঠাকুরের মৌন থাকা সম্বন্ধে অভিমত ... ১০৩
শালগ্রামের ধর্ম্ম : শালগ্রাম পূজায় সাধারণের বিদ্বেষ ১০৪
সদ্‌গুরু সম্বন্ধে নানা কথা ... ১০৫
ভীষণ স্বপ্ন—মাতৃহত্যা ... ১০৭
ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবে উপাসনা কি ? ... ১০৮
সেবা বন্দনা আউর অধীনতা ... ১০৮
স্বপ্নে আশীর্ব্বাদ ... ১১০
জীবের স্বাধীনতার সীমা ... ১১১
ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ কি দোষ ? ধর্ম্মের লক্ষণ ১১২
ঋষি বাক্যই সার ... ১১৩
একাগ্রতা লাভের উপায় ... ১১৪
মণিবাবুর মা ও ভগ্নীর কথা ... ১১৫
দেবদেবীর আবির্ভাব ... ১১৬
অলৌকিক দর্শনে লাভ কি ? ... ১১৮
মা কালী ও ঠাকুর ... ১১৮
ঠাকুরের চাহনি ... ১১৯
নিত্য ভজনে সম্বন্ধ ... ১২০
সাধন সঙ্কেত ... ১২১

বিষয় পৃষ্ঠা
ন্যাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ... ১২২
গুরুব্রহ্মা অর্থ কি ? আমাদের গুরু কে ? ... ১২৩
নাম সাধনে কি অবস্থা হয় ? অদ্বৈতবাদ কি ? ... ১২৪
পঞ্চকোষ ভেদের লক্ষণ ... ১২৫

আশ্বিন

অতি নিদ্রায় ঠাকুরের অনুশাসন ... ১২৫
দিবা নিদ্রার অপকারিতা : যোগতন্দ্রার লক্ষণ ... ১২৮
তপস্যা ও পুরুষকার ... ১২৯
চন্দনঘসাও উপাসনা ... ১৩০
যথার্থ দান ও দানের পাত্র ... ১৩১
অবিশ্বাস ও ধ্যানেতে জ্বালা ... ১৩৩
যোগ কি ? যোগের অবশ্য পালনীয় উপদেশ ... ১৩৪
নাম করিয়া ফল পাই না কেন ? শুষ্কতায় কর্ত্তব্য ... ১৩৬
গুণাতীত হইলেও তাপ থাকে ... ১৩৭
এখন কুলগুরু প্রদত্ত সাধন করিব কিনা ? ... ১৩৭
প্রার্থনায় ঠাকুরের সহানুভূতি ... ১৩৮
ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের হেতু : মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আধুনিক কি পুরাতন ? ... ১৩৯
গৈরিক গ্রহণ করাতে কোন গুরুভগ্নীকে নিষেধ উপদেশ ১৪০
বীর্য্য ধারণ ব্যতীত যোগ সাধন হয় না : ঊর্দ্ধরেতাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ... ১৪১
ঠাকুরের গেণ্ডারিয়া ত্যাগের পূর্ব্বাভাষ : রহস্যপূর্ণ আসনত্যাগ : মহাশঙ্খমালা ... ১৪২
তান্ত্রিক সাধনের উপকারিতা ... ১৪৩
শাস্ত্র বুঝা সুকঠিন ... ১৪৩
ভজনানন্দ সম্ভোগে অভিমানের বিষম আক্রমণ : অবিশ্বাসের আগুনে সমস্ত ছারখার : ঠাকুরের অযাচিত প্রসাদ লাভে শান্তি ... ৬৪৪
প্রেতের আক্রোশে শুভকার্য্যে বিঘ্ন : পিণ্ডদানে ব্যবস্থা ১৪৭
নরক আছে কিনা ? পরলোকে পিতৃপুরুষের কার্য্য : বাসনানুরূপ জন্ম ... ১৪৮
স্ত্রী-পুরুষের মেশামেশিতে শাসন ... ১৪৯

বিষয় পৃষ্ঠা

পাপ—পরিত্রাণের উপায় ... ১৫২
ভোগে ভোগ ক্ষয় : দৈহিক ও আত্মিক সম্বন্ধ :
    স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ... ১৫২
কল্পনাতীত সহানুভূতি—একি মানুষে পারে ? ... ১৫৪
ঠাকুরের প্রার্থনা—তুমিই সব ... ১৫৮
সাধনের ক্রম ও তাহার উপকারিতা ... ১৫৯
রাখাল বাবুর হোম করিতে আগ্রহ :
    দেবতার ছাঁচ দর্শন ... ১৫৯
রাখাল বাবুর মহত্ত্ব : উদ্বেগে আবার দেবকুমার ... ১৬০
হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম ... ১৬১
অদ্বৈতবাদী ফকির : জাতিভেদ কাহাকে বলে ? ... ১৬২
বিভিন্ন শাস্ত্রে আহার বিহার : গঙ্গাস্নানে জীবের গতি ১৬৩
শিষ্যের অপরাধে ক্ষমা ভিক্ষা : দোষ দৃষ্টি দূষণীয় ... ১৬৩
জাতিস্মর বালক ... ১৬৪
গুরুবাক্য লঙ্ঘনে সত্যপালন : সমস্যা ... ১৬৫
মহরমে ভিস্তি দ্বারা ঠাকুরের জলদান : অহিংসা
    ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ... ১৬৬
বলির অভিমানে বামন অবতার ... ১৬৭
মনোহর দাস বাবাজীর আখড়ায় সংকীর্ত্তন : সাত্ত্বিক,
    রাজসিক ও তামসিক নৃত্য ১৬৭
পরমেশ্বর সাকার না নিরাকার ... ১৬৯
দীক্ষাপ্রার্থী ব্রাহ্মের প্রতি উপদেশ ... ১৬৯
এ সাধনে ব্রাহ্ম-সমাজের লোক অধিক কেন ?
    শক্তি সঞ্চার ... ১৭০
মহাপ্রভু কি আবার অবতীর্ণ হইবেন ? মহাপ্রভুর
    শিক্ষাদি সম্বন্ধে কথা ... ১৭২

কার্ত্তিক

শালগ্রাম পূজায় উপাধির সৃষ্টি—লোকের বিব দৃষ্টি ১৭৪
যোগ-সঙ্কট ... ১৭৫
পূজার ভেদ প্রকাশে গুরুতর শাসন : শালগ্রাম ত্যাগ ১৭৯
সন্ধ্যা, গায়ত্রী, হোমাদির আবশ্যকতার উপদেশ ... ১৮২

বিষয় পৃষ্ঠা

শালগ্রাম পূজায় ইষ্টানিষ্ট বিচার ... ১৮৩
কলিতে ধার্ম্মিকের দুঃখ, অধার্ম্মিকের সুখ, দুর্ভিক্ষাদি
    অনর্থের হেতু, কলিতে ব্রহ্মনাম ... ১৮৫
'ভূমৈব সুখম্' ; সত্যই আদর্শ ... ১৮৭
চিত্রে চন্দন প্রদান—অদ্ভুত রহস্য ... ১৮৭
ঠাকুরের উপদেশ—জীবনের কথা : সংসারে কেহ
    সুখী নয় ... ১৮৮
গুরু পরিবারের দীক্ষার কথা ... ১৮৯
সত্য, মিথ্যা, পাপ-পুণ্য সকলের পক্ষে এক নয় ... ১৯০
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—শীতল-ষষ্ঠীর কথা : স্বামীর
    অমর্য্যাদায় উৎকট রোগ ... ১৯১
শ্রীধরের কীর্ত্তি ... ১৯২
স্ত্রীবিয়োগে শোকার্ত্তকে জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে উপদেশ :
    নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না—ঠাকুরের
    আত্মজীবনের কথা ... ১৯৩
সকল বাসনাই কি অনিষ্টকর ... ১৯৫
অসামান্য শক্তিলাভের উপায় : মহাপুরুষের বত্রিশ লক্ষণ ১৯৬
পালনীয় উপদেশ ... ১৯৮
অপবিত্র হাতে ঠাকুরকে খাবার দিতে উদ্যোগ : বিনিময়ে
    ঠাকুরের বর দান ... ১৯৮
প্রকৃত স্বভাব দুর্ব্বোধ্য ... ২০০
'নেদং যদিদমুপাসতে' : ভগবৎলাভের প্রকৃষ্ট উপায় ২০১
মগ্নাবস্থার কথা ... ২০২
অজ্ঞাত অপরাধে লীলা দর্শন বন্ধ,—রূপগোস্বামী ও খোঁড়া
    বৈষ্ণবের কথা ... ২০৩
শাস্ত্র সদাচারের অনুসরণই একমাত্র নিরাপদ ... ২০৪
বন্ধুবিহীন জীবনের দুর্গতি ... ২০৫
কীর্ত্তনে ভাবাবিষ্ট মুসলমানের সমাদর ... ২০৬
সমাজের উন্নতিপথে ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ২০৭
বস্তুতঃ বেদ বিভিন্ন নয় : পরা ও অপরা বিদ্যা ... ২০৯
১৬ই আশ্বিনের ঝড় : ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা ... ২১০
বিবেক সংস্কার গত : ভগবৎ আদেশ—অতি দুর্লভ ... ২১১

বিষয় পৃষ্ঠা

ঠাকুরের বন্য মহিষ ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা: মনঃসংযমে অহিংসা ... ২১৩
অর্থ বুঝিয়া নাম করার ফল: কর্ম্ম ও নির্ভরতা ২১৪
দাবানল হইতে মহাপুরুষের কৃপায় রক্ষা ... ২১৫
নানক ও কবীরের ধর্ম্ম ... ২১৬
শঙ্করাচার্য্যের পরিবর্ত্তন ... ২১৭
সাধন ভজনের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ ... ২১৭
নরোত্তম দাস ঠাকুরের কথা ... ২১৮
বিধিহীন ভক্তি উৎপাতের কারণ ... ২২০
বৌদ্ধ সাধন প্রণালী শাস্ত্রানুমোদিত কিনা? ... ২২০
অন্য জীব অপেক্ষা মানুষ বড় কিসে? ... ২২১
রেবতী বাবুর কীর্ত্তন: অসাধারণ কণ্ঠধ্বনি ... ২২২
আমার ডায়েরী—ঠাকুরের স্পর্শ ... ২২৪
ঠাকুরের কুম্ভে গমনের হেতু: গোঁসাই-শূন্য গেণ্ডারিয়া ২২৫
বাড়ীতে অবস্থান: মায়ের নিত্যকর্ম্ম: পাড়াগাঁয়ের ধর্ম্ম ... ২২৮
বরিশালে অবস্থান, আত্মার উন্নতির লক্ষণ সম্বন্ধে অশ্বিনী বাবুর প্রশ্নের উত্তর ... ২৩১
বিনা আগুনে অন্নপূর্ণার রান্না অন্ন ... ২৩৩
মহাপুরুষ সাজালের দর্শন: ঠাকুরের কৃপায় সুস্বাদু খিচুড়ি ২৩৪
ঠাকুরের কৃপায় কুসুমের আহার ত্যাগ: কুসুমের হাতে ভোজনে অদ্ভুত অবস্থা ... ২৩৫
গুরুভ্রাতা ব্রজমোহন ... ২৩৭
ঠাকুরের যোগৈশ্বর্য্য ... ২৩৮
বানরিপাড়ায় অবস্থান ... ২৩৯
প্রয়াগে উপস্থিতি: আপদে গোঁসায়ের ডাক ... ২৪১
চড়ায় কুম্ভমেলার স্থান দর্শন ... ২৪৩
বেণীমাধব ও আর আর বিগ্রহ দর্শন: ঠাকুরের দান ২৪৫
ঠাকুরের নানা দেবালয় দর্শন ... ২৪৬
ল্যাংগা বাবা: গুরুভ্রাতাদের কাণ্ড ... ২৪৭
আশ্রমে কাজের বিভাগ: ঠাকুরের ভিক্ষা ও দান: ঠাকুরের আকাশবৃত্তি ... ২৪৮

বিষয় পৃষ্ঠা

পৌষ

চড়ায় যাত্রা: পথে মাধোদাস বাবাজীর আশ্রম দর্শন: পরমহংসজীর আবির্ভাব ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা: সংকীর্ত্তনে মহাভাবের তুফান ... ২৫৩
কুম্ভমেলায় অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা ... ২৫৬
ব্রজবিদেহী কাঠিয়াবাবার দর্শন: মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ... ২৫৮
ত্রিবেণী সঙ্গমে মকরস্নান: সাধুদের মিছিল অপূর্ব্ব দৃশ্য ... ২৬০
প্রয়াগে কুম্ভমেলার উৎপত্তি ... ২৬২

মাঘ

ছোট কাঠিয়াবাবার দর্শন ... ২৬৩
কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী: বিদ্যাভিমানী সন্ন্যাসীকে শাসন ... ২৬৪
নানকসাহীদের চত্তরে সাধু দর্শন ... ২৬৬
সন্ন্যাসীদের চত্তরে সাধু দর্শন: বাইনাচের তাৎপর্য্য ... ২৬৭
সাধুদের সদাব্রতে চমৎকার শৃঙ্খলা ... ২৬৮
ঠাকুরকে মেলা হইতে সরাইতে ষড়যন্ত্র: সমবেত সভায় মহাত্মা মহাপুরুষদের ঠাকুর সম্বন্ধে অভিমত ... ২৭০
দয়ালদাস স্বামীর ছাউনীতে নিমন্ত্রণ: কীর্ত্তনে মাতামাতি ... ২৭২
দয়ালদাস স্বামীর অসাধারণ দয়ার কথা ... ২৭৩
"এই তোমার বিলাসী সাধু!" গুরু—শিষ্যের অবস্থা: অসাধারণ শক্তিশালী সা-সাহেব ... ২৭৫
সাধু ভিখন দাস: ভগবানের দান প্রবাহ—স্পর্শে কৃতার্থ: মহাপুরুষ গম্ভীরানাথজী দর্শন ... ২৭৯
ভৈরবী দর্শন: সত্যদাসীর পূর্ব্বজন্মের গুরু ... ২৮১
মহাপুরুষের কবচ দান ... ২৮২

বিষয় পৃষ্ঠা
রঙ্গিলা বাবা ... ২৮৪
ছদ্মবেশী মহাপুরুষ ... ২৮৫
রাসায়নিক সাধু ... ২৮৬
অসাধারণ ক্ষ্যাপাচাঁদ ... ২৮৭
কালী কম্বলীবাবা : ছোটদাদার জন্ম কাঠিয়াবাবার নিকট ঠাকুরের প্রার্থনা : ঠাকুরের অসাধারণ সহানুভূতি ... ২৯০
বাসনাহীন সাধুর ঠাকুরের হস্তে দান প্রাপ্তির জেদ ২৯২
মহাপুরুষদের বিচরণকাল : প্রকৃতি পূজা ... ২৯৩
ঠাকুরের কমলেকামিনী দর্শন : মৌনীবাবার চিঠি : ঠাকুরের উত্তর : মৌনীবাবার দীক্ষা প্রার্থনা ও লাভ ২৯৫
মৌনীবাবার পত্র ... ২৯৮
মহাবিষ্ণু বাবুর সংকীর্ত্তনে ভাবের তরঙ্গ : নিত্যানন্দ প্রভুর অকস্মাৎ আবির্ভাব ... ৩০০
কুম্ভের শেষ স্নান ... ৩০২
বিষয় পৃষ্ঠা
ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রস্থান : পাহাড়ীবাবা ... ৩০৩
ঠাকুরের অভয়বাণী ... ৩০৪

ফাল্গুন

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা সংবাদ : নবদ্বীপে যাত্রা ৩০৬
গ্রহণ সময়ে ঠাকুরের অপূর্ব্ব নৃত্য : বালক গৌরাঙ্গের নূপুরের জন্ম ক্রন্দন ... ৩০৭

চৈত্র

সিদ্ধা-গোয়ালিনী ... ৩০৮
সা-সাহেবের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য শক্তি আকর্ষণ : রেল সংঘর্ষণে ঠাকুরের চরণে আঘাত ... ৩০৯
রসিকদাসের পদাবলী গানে ঠাকুর ... ৩১১
নবদ্বীপে রাইমাতা : অপূর্ব্ব তমালবৃক্ষ : ভাবাবিষ্ট বালক ৩১২
নবীন বাবুর প্রকৃতি ... ৩১৩
ওঁকার সাধন ... ৩১৪

চিত্র-সূচী

১। প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী : বৃন্দাবন চন্দ্র মৈত্র ও দেবকুমার ... ১
২। গুপ্তার ঘাট ... ৪
৩। ব্রহ্মকুণ্ড ... ৭
৪। দামপাড় আশ্রম ... ১১
৫। চণ্ডীদেবীর মন্দির ... ২৮
৬। হৃষীকেশ ... ৬১
৭। লছমন ঝোলা ... ৬২
৮। বিল্বকেশ্বর ... ৬৪
৯। রাখাল বাবুর বাড়ী ... ৭০
১০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ... ৮২
১১। শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন ... ২২২
১২। শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ ... ২৫৯
১৩। মহারাজ গম্ভীরানাথজী ... ২৭৯
১৪। স্বামী ভোলানন্দ গিরি ... ২৮০
১৫। মৌনীবাবার পত্র ... ২৯৮
১৬। শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ... ৩১৫

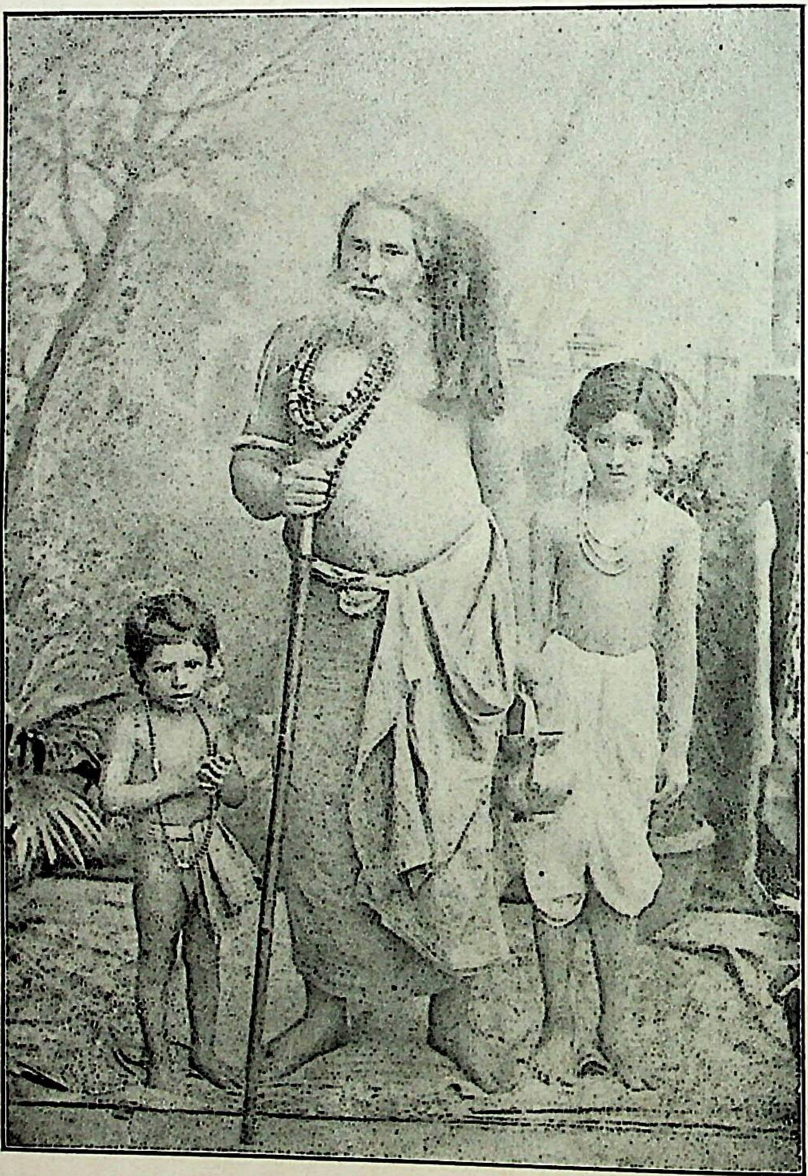

গোস্বামীপ্রভুর দৌহিত্র
বৃন্দাবনচন্দ্র মৈত্র
ওরফে দাউজী

প্রভুপাদ
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র
দেবকুমার

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ

পঞ্চম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩০০ সাল

বস্তি ত্যাগঃ নীরব অযোধ্যায় রাম নাম।

১২ই-১৪ই বৈশাখ,
১৩০০ সাল।

ভগবান গুরুদেবের কৃপায় দাদার সঙ্গে পরমানন্দে ২।৩ সপ্তাহকাল বস্তিতে কাটাইলাম। শরীর অনেকটা সুস্থবোধ হওয়ায় পাহাড়ে যাইতে অস্থিরতা জন্মিল। হরিদ্বার যাইতে দাদার নিকটে অনুমতি চাহিলাম। তিনি করযোড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসন্নমনে আমাকে অনুমতি দিলেন। মহাতীর্থ অযোধ্যায় শত শত মন্দিরে সুলক্ষণযুক্ত মনোরম শিলাচক্র রহিয়াছেন—দাদার বন্ধুদের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ হইতে পারে এই প্রত্যাশায় অযোধ্যা যাত্রা করিলাম। বৈশাখের প্রারম্ভে একদিন রাত্রি বারটায় দাদার শ্রীচরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া বস্তি ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। প্রত্যুষে সরযূতীরে লকরমণ্ডি ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

পুণ্যতোয়া সরযূর নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া শরীরটি ঠাণ্ডা হইল, মনও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি পরমানন্দে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে "জয় রাম" "জয় রাম" বলিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলাম। এই সেই দয়ার সাগর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকৃত লীলাভূমি শান্তিময় অযোধ্যা—যাহার ছায়ামাত্র স্পর্শ করিয়া কত যোগী ঋষি তপোধনগণ কৃতার্থ হইয়াছেন, আজও কত মহাপুরুষ ছদ্মবেশে এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন! সুর-মুনিবন্দিত নিত্য অযোধ্যাধামে কত দেবর্ষি মহর্ষিগণ আজও অলক্ষিতভাবে রহিয়াছেন এবং সূক্ষ্মশরীরে বিচরণ করিয়া রাম নাম গান করিতেছেন—এই সকল কথা মনে হওয়াতে প্রাণ আমার উথলিয়া উঠিল। আমি ইহলোক-পরলোকবাসী মহাপুরুষগণের চরণোদ্দেশে

নমস্কার করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলাম। দেখিলাম—বহুজনতাপূর্ণ অযোধ্যা নীরব নিস্তব্ধ। এত বড় সহর কিন্তু লোক-কোলাহল কিছুই নাই, সর্ব্বত্র সকলেরই মুখে সময়ে সময়ে 'রাম রাম, জয় রাম, সীতারাম' বাহির হইতেছে। কাহারও মুখে বৃথা কথা নাই—কথার পূর্ব্বে সকলেই রাম নাম বলিতেছে। খরিদ্দার—দোকানীকে বলিতেছে—'রামজি, ভাইয়া রাম রাম হ্যায় ? রাম দানা দেও, রাম রস চাহি !' গাড়োয়ান গোয়ালা প্রভৃতি ঘোড়া গরুকে 'রাম রাম' বলিয়া তাড়া দিতেছে—কথা আরম্ভে সকলেরই মুখে রাম নাম ! এ রূপটি আর কোথাও দেখি নাই।

হনুমান গৌড়ি দর্শনে ঠাকুরের স্মৃতি ঃ মহাপুরুষ দর্শন।

ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম—'প্রাচীন অযোধ্যায় একমাত্র হনুমান গৌড়িই ঠিক আছে। পর্ব্বে পর্ব্বে ঐ স্থানে হনুমান, বিভীষণ, অশ্বত্থামা ও ব্যাসাদি ঋষিগণ আসিয়া থাকেন।' ভক্তরাজ মহাবীরের আবাসভূমি হনুমান গৌড়ি দেখিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। আমি গুরুদেবের শ্রীচরণ অন্তরে রাখিয়া হনুমান গৌড়িতে পঁহুছিলাম। অযোধ্যার সাধারণ স্থান হইতে এ স্থান অনেকটা উঁচু। কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া মহাবীরের মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়। প্রশস্ত সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে অসংখ্য বানর রহিয়াছে দেখিলাম। তাহারা মানুষের গা ঘেঁসিয়া চলিতেছে—কোন প্রকার ভয় নাই। আমি সিঁড়ির উপরে উঠিয়া মহাবীরের মন্দিরের সম্মুখে গেলাম। ঠাকুরের কথা আমার মনে হইল। ঠাকুর আমার ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু অবস্থায় স্খলিতপদে কোন প্রকারে সিঁড়ির উপরে উঠিয়া গড়াইতে গড়াইতে মন্দিরের নিকটে আসিয়াছিলেন। পরে মহাবীরকে দর্শন করিয়া তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল—তিনি ভাব-বিভোর অবস্থায় কতক্ষণ এই স্থানে পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরের সেই সময়ের কথা ভাবিয়া আমার কান্না আসিয়া পড়িল। আমি পুনঃ পুনঃ মহাবীরকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম—ভক্তরাজ ? তোমার দর্শন বৃথা হয় না, দয়া করিয়া এই জঘন্য দুরাচার, অবিশ্বাসী নাস্তিককে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার কণিকামাত্র চরণরজলাভে কৃতার্থ হইয়া আমার পরম দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবার অধিকারী হইতে পারি—তাঁহার অবিচ্ছেদ সঙ্গ ও একান্ত আনুগত্যই যেন এই জীবনের সম্পদ হয়। দেখিলাম মহাবীরের মন্দিরের বিস্তৃত অঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই নিবিষ্টমনে রামায়ণ পাঠ শুনিতেছেন। বহুসংখ্যক বানরও শ্রোতাদের গা ঘেঁসিয়া হেঁটমস্তকে বসিয়া আছে—যেন একান্ত মনে তাহারাও পাঠ শুনিতেছে। সুন্দরাকাণ্ড পাঠ হইতেছে। বহু জনতার ভিতরে একটি শুভ্রকেশ তেজঃপুঞ্জ-কলেবর বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কিছুক্ষণ চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। রামায়ণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তিনি যেন ভাবের অতলজলে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণের যে কি অবস্থা হইল বলিতে পারি না—মনে হইল ঐ বেশে আমার ঠাকুরই বসিয়া আছেন। তাঁহার চরণধূলি লইতে আকাঙ্ক্ষা হইল কিন্তু পাঠান্তে তিনি লোকের ভিড়ে কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন ঠিক পাইলাম না।

বৈদান্তিকের উপর শোক সঞ্চার।

মহাবীরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অযোধ্যা ষ্টেশনে পঁহুছিলাম এবং একখানা টিকেট করিয়া ফয়জাবাদ যাত্রা করিলাম। ফয়জাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া দাদার বন্ধু বাবু জালিম সিংহের বাসায় উপস্থিত হইলাম। জালিম সিং আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বাহিরের একখানা ভাল ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জালিম সিংকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা আপনাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? আপনার কি কোন অসুখ হইয়াছে?—দাড়ি গোঁফ চুল এভাবে পাকিয়া গেল কিরূপে?" জালিম সিং বলিলেন—"ভাই সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। আমার পুত্রটী কিছুকাল হয় মারা গিয়াছে। আমার স্ত্রী তাহার শোকে পাগলের মত হইলেন। আমার কিন্তু কিছু লাগিল না। সর্ব্বদা বেদান্তের আলোচনা নিয়া থাকি—স্ত্রীকে আমি বেদান্ত উপদেশ দিতে লাগিলাম। তিন দিন আমার উপদেশ শুনিয়া স্ত্রী ঠাণ্ডা হইলেন—তাঁর শোকাগ্নি একেবারে নির্ব্বাণ হইল—কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভিতরে তাঁর জ্বালা প্রবেশ করিল, আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি দাড়ি গোঁফ মাথার চুল সমস্ত পাকিয়া গিয়াছে। শোকে এতটা হয় কখনও পূর্ব্বে জানিতাম না। আমি এ সব কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

ভগবানের নাম করা সহজ নয়।

জালিম সিংহের একটী দয়ার কার্য্য দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। পোষ্টাফিসের একটী পিয়ন কোন অপরাধে কার্য্যচ্যুত হইয়া জালিম সিংহের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল—"বাবু সাব্! চাকরি গেল, আমার উপায় কি? আমি যে অনাহারে মারা যাইব।" জালিম সিং কহিলেন—"আচ্ছা, তুমি ৬টা হইতে ১১টা এবং ১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'সীতারাম, সীতারাম' জপ কর, আমি তোমাকে আট আনা প্রতিদিন দিব—তোমার বেতন অপেক্ষাও তিন চারি টাকা বেশী পাইবে। লোকটি খুব সন্তুষ্টির সহিত রাজী হইল এবং পরদিন হইতে জপে লাগিবে বলিয়া গেল। তিন চার দিন লোকটি কোন প্রকারে জপ করিল। পরে একদিন জালিম সিংকে সেলাম দিয়া বলিল—"বাবু সাব্! এ কাম হামসে নেই হোগা—দোসরা নকৃরি দে-জীয়ে—নেহি তো হাম চলা যাতে ঘর।" লোকটি চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য! একটি স্থানে বসিয়া ভগবানের নাম করা এতই কষ্টকর?

অযোধ্যার আশ্রম ও দেব-মন্দির ঃ

হিরণ্যগর্ভ চক্র লাভ।

ফয়জাবাদের সুপ্রসিদ্ধ উকীল বলদেবপ্রসাদ এবং লালতাপ্রসাদ প্রভৃতি দাদার বন্ধুগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা আমাকে অযোধ্যার বড় বড় মন্দির ও আশ্রমে লইয়া গিয়া

শালগ্রাম দেখাইলেন। এক এক মন্দিরে সহস্র সহস্র শালগ্রাম দর্শন করিলাম। কিন্তু একটীও আমার পছন্দমত হইল না। প্রাচীন অনেক মন্দিরেই নানা আকারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণযুক্ত শিলাচক্র ধামা ভরিয়া রাখিয়াছে—দেখিলাম তুলসী-চন্দন মিশ্রিত জলধারা এক সঙ্গে তাঁহাদের স্নান হয়। পূজা ভোগ আরতিও এক সঙ্গেই হইয়া থাকে। বিগ্রহের সম্মুখে কয়েকটী বিশিষ্ট শালগ্রাম রহিয়াছে তাঁহাদেরই মাত্র সাজসজ্জা পূজাভোগাদি বিশেষ ভাবে হইয়া থাকে। বহুকাল যাবৎ এ সকল বিগ্রহের সেবা পূজা ভোগ আরতি অবাধে প্রতিদিন মহাসমারোহের সহিত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে—ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এক একটী আশ্রমে শত শত কখন বা সহস্রাধিক সাধুরও অবস্থান হয়। সকলেই আপন আপন আসনে উপবিষ্ট—কেহ নিবিষ্টভাবে নাম জপে মগ্ন আছেন কেহ ধুনীর সম্মুখে ধ্যানস্থ কেহ বা রামায়ণ পাঠে বিভোর—দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অসংখ্য লোকের আবাসস্থান এই সকল আশ্রম নীরব ও নিস্তব্ধ—কখন কখন কোন কোন স্থানে "রাম রাম সীতারাম" ধ্বনি মাত্র হইতেছে, সমস্ত আশ্রমই ভগবদ্‌ভাবে পরিপূর্ণ—দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম।

কোনও প্রসিদ্ধ মন্দিরের ভজনানন্দী বৃদ্ধ মহান্ত আমাকে একটী শিলাচক্র দিয়া বলিলেন—"আপনি এটী গ্রহণ করুন—ইহার নাম হিরণ্যগর্ভ। বহুকাল এই মন্দিরে ইনি শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত পূজিত হইয়া আসিতেছেন।" আমি ইহা ঠাকুরেরই ইচ্ছা মনে করিয়া শালগ্রামটি গ্রহণ করিলাম; কিন্তু পছন্দমত হইল না। স্থির করিলাম আর আমি শালগ্রাম সংগ্রহের চেষ্টা করিব না—ঠাকুরের বাক্য অন্যথা হইতে পারে না, সুন্দর শালগ্রাম আমার নিশ্চয়ই জুটিবে—যত দিন না জোটে এটীই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিব।

গুপ্তারঘাটে শ্রীরামচন্দ্রের অন্তঃলীলা স্মরণে শোকোচ্ছ্বাস।

কয়েকটী সৎসঙ্গীর সঙ্গে ফয়জাবাদের পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তারঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই ঘাটের শাস্ত্রীয় নাম গোপ্রান্তর। অযোধ্যা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরে সরযূর তীরে এই ঘাট অবস্থিত। ঘাটটী সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত বড়ই সুন্দর। ঘাটের উপরে সুচারু কারুকার্য্য সমন্বিত কয়েকটী মন্দির তাহাতে রামসীতা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভাল ভাল ভজনানন্দী সাধু মহাত্মারা আসিয়া এই স্থানে নির্জ্জন বাস করেন। সাধন-ভজনের জন্য এইস্থান বড়ই উপযোগী। ঘাটের উপরে বসিয়া সরযূ দর্শন করিতে লাগিলাম। কত কথা মনে আসিতে লাগিল। এক সময়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মর্ত্ত্যলীলা এইস্থানেই অবসান হয়—সেই সময়ের দারুণ মর্ম্মভেদী ঘটনা সকল প্রাণে উদয় হওয়ায় আমার শরীর মন শিথিল হইয়া আসিল। আহা! সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবানও নিয়তিকে অতিক্রম করেন না। স্বেচ্ছাকৃতবিধানে স্বয়ং আবদ্ধ হইয়া সংসারের অশেষ যন্ত্রণা সাধারণ লোকের মতই

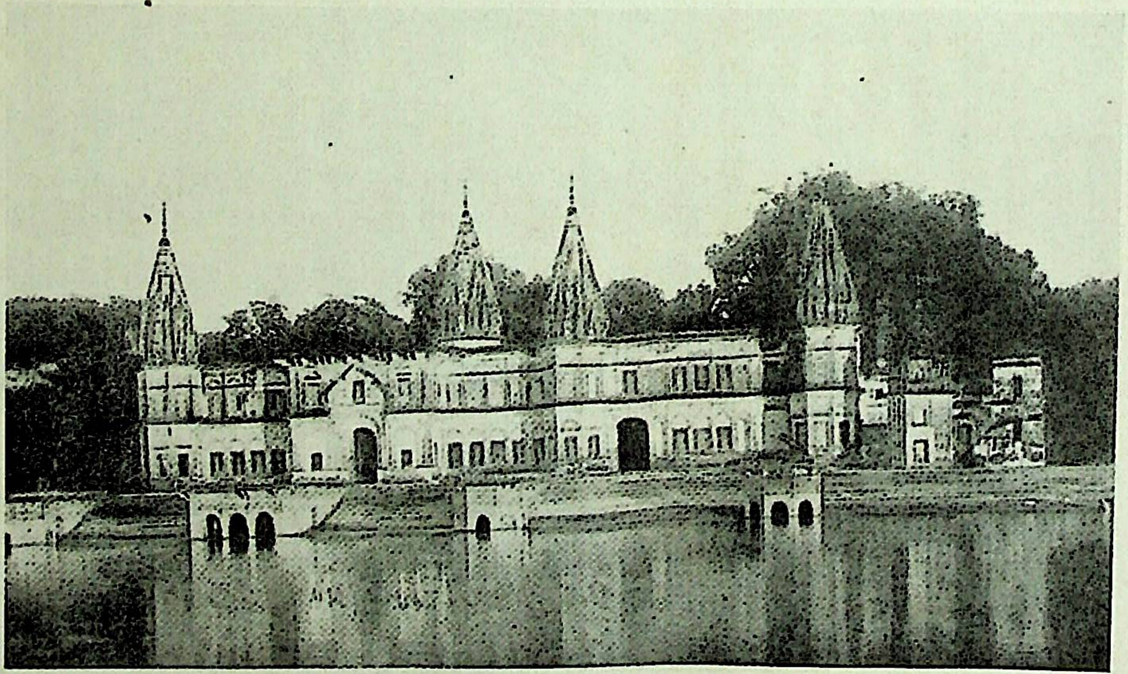

গুপ্তার ঘাট

পৃষ্ঠা ৪

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ভোগ করেন। শুনিয়াছি বিধির বিধানানুসারে ক্রূরকর্ম্মা কালপুরুষ ভগবান ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরামকে বলিলেন—“বিশেষ প্রয়োজনীয় একটী বিষয় বলিবার জন্য আমি আপনার নিকটে অসিয়াছি। আমাদের কথোপকথনকালে যদি কোন ব্যক্তি আমাদের নিকটে উপস্থিত হয়েন তাহা হইলে তিনি আপনার বধ্য হইবেন; ইহা আপনি অঙ্গীকার করিলে আমার বক্তব্য বিষয় আপনাকে বলিতে পারি।” কালপুরুষকে ঋষি-প্রেরিত দূত জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন এবং চিরানুগত দৃঢ়কর্ম্মা লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া নির্জ্জন স্থলে কালপুরুষের কথা শুনিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ অমোঘতেজা ঋষি দুর্ব্বাসা লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“আমার কোন বিশেষ প্রয়োজনে এখনই আমি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।” লক্ষ্মণ বলিলেন—“ভগবান্! আপনার যাহা প্রয়োজন দয়া করিয়া আমাকে আদেশ করুন আমি এখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতেছি।” দুর্ব্বাসা বলিলেন—“ওহে! না কিছুতেই তাহা তোমা দ্বারা হবে না—আমি রামকেই চাই। যদি তুমি রামের নিকট যাইতে আমাকে বাধা দেও আজ এখনই শ্রীরাম সহিত সমস্ত অযোধ্যা দগ্ধ করিয়া চলিয়া যাইব নিশ্চয় জানিও।” লক্ষ্মণ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন ভাবিলেন—ঋষিকে যদি শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে যাইতে বাধা দেই—এখনই তিনি সমস্ত অযোধ্যা ধ্বংস করিবেন, আর আমি যদি ঋষির আগমন সংবাদ শ্রীরামকে দেই, আমিই মাত্র বধ্য হইব। সুতরাং তাহাই করা সঙ্গত। ঋষির কথা বলিবার জন্য লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিকটে উপস্থিত হইলেন—কালপুরুষ “সিদ্ধকাম হইলাম” বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র ঋষির নিকটে করজোড়ে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“ভগবান্! আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয় কি বিষয় আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে আদেশ করুন। ঋষি বলিলেন—আমি পেট ভরে খাব বহুকাল অনশনে আছি—আমাকে খাওয়াও। শ্রীরামচন্দ্র ঋষিকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইলেন। এই সামান্য বিষয় লক্ষ্মণ দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে না; রামকেই চাই—ঋষির এইপ্রকার জেদ শুধু নিয়তিবশেই হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণকে অতিশয় শোকসন্তপ্তহৃদয়ে বলিলেন—“আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে সমান। সত্যরক্ষার্থে অদ্য আমি তোমাকে বর্জ্জন করিলাম।” শ্রীরামের একান্ত ভক্ত লক্ষ্মণ রামশূন্য জীবন বৃথা মনে করিয়া সরযুতে ঝাঁপ দিলেন। সরযু উজান বহিয়া লক্ষ্মণকে এইস্থানে লইয়া আসিলেন—লক্ষ্মণ “জয় রাম” “জয় রাম” বলিতে বলিতে এইস্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ “রাম রাম” বলিয়া সরযুতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং লক্ষ্মণেরই অনুগমন করিবেন স্থির করিলেন। ইহার পর অচিরেই রামচন্দ্র সরযূতে উপস্থিত হইলেন। তখন অযোধ্যাবাসী জনমানব পশু পক্ষী সকলেই “হা রাম” “হা রাম” বলিতে বলিতে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। “প্রাণারাম রামকে ছাড়িয়া কি প্রকারে আমরা দেহ ধারণ করিব” ভাবিয়া তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরামের সঙ্গেই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। তখন ভক্তবৎসল রামচন্দ্র সমস্ত আযোধ্যা-

বাসীদের লইয়া এইস্থানেই সরযূর অতল জলে চিরতরে অদৃশ্য হইলেন। সেই সময়ের দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। শোকাভিভূত অবস্থায় কতক্ষণ ঘাটে পড়িয়া রহিলাম পরে সন্ধ্যার পরে জালিম সিংহের সহিত বাসায় আসিলাম।

ভীষণ স্বপ্ন—মাতার প্রতি অত্যাচার।

১৫ই বৈশাখ।

শেষ রাত্রিতে অতি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক একটী স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া পড়িলাম। কত প্রকার উদ্বেগই মনে আসিতেছে—হায়! মা আমার পরম সৌভাগ্যবতী হইয়াও আমা দ্বারা অভাগিনী হইয়াছেন। মার এক পলকের স্নেহদৃষ্টির ধার—শত শত জন্মেও কণিকামাত্র শোধ করা যায় না। হায়, আমি সেই স্নেহময়ী মাকে চিনিলাম না! গত রাত্রে মার প্রতি যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি—মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্মরণ-ক্লেশকর ভীষণ স্বপ্নের স্মৃতি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়—ঠাকুরের শ্রীচরণে ইহাই প্রার্থনা। এই অভিপ্রায়েই ডায়েরীর এই স্থলে স্বপ্ন বিবরণ আর লিখিলাম না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঠাকুরকে এই 'স্বপ্ন' বৃত্তান্ত বিস্তারিত বলিয়া এইপ্রকার স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা রহিল। ফয়জাবাদ আমার নিকট শ্মশান হইল—এখন যত শীঘ্র হয় এই স্থান ত্যাগ করিতে পারিলে বাঁচি।

হরিদ্বারে হরগৌরীর অনুপম জ্যোতিঃদর্শন।

১৬ই বৈশাখ।

ফয়জাবাদে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। পাহাড়ে যাইতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। যথাসময়ে ষ্টেশনে যাইয়া হরিদ্বার যাত্রা করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে লাকসার ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। দু' এক ষ্টেশন অগ্রসর হইয়াই হরিদ্বারে পাহাড় দেখিতে পাইলাম। দেবাদিদেব মহাদেব ভাবে বিভোর হইয়া অহর্নিশি ঢুলুঢুলু অবস্থায় এই পাহাড়েই নাকি উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেন। পরমারাধ্যা ভগবতী পার্ব্বতী স্বামীরূপে মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য এই পাহাড়েই কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। আমি একান্তপ্রাণে সদ্‌গুরুরূপী সদাশিবকে স্মরণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলাম। প্রাণ আমার কাঁদিয়া উঠিল। আমি হরপার্ব্বতীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আকুলপ্রাণে পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। জালাপুর পঁহুছিয়া নীল পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ সকল সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। উহাতে অসংখ্য শ্বেত ও নীল জ্যোতিঃ ক্ষণপ্রভার ন্যায় ঝিকি-মিকি করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই লয় পাইতেছে দেখিলাম। এই জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু সকল কখনও খণ্ডাকারে কখনও বা একাধারে মিলিত হইয়া অপূর্ব্বজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হরিদ্বার ষ্টেশনে পঁহুছিলাম।

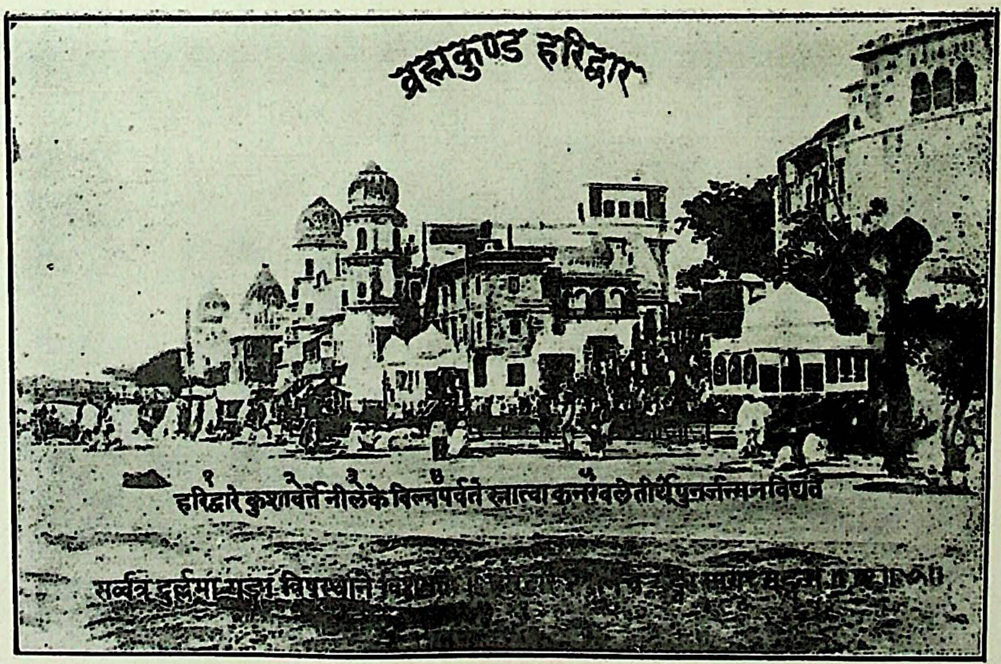
ब्रह्मकुण्ड हरिद्वार
१ २ ३ ४ ५
हरिद्वारे कुशावर्ते नीलेके विल्वपर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते
सर्वत्र दुर्लभा गङ्गा त्रिषुस्थानि [illegible]

ব্রহ্মকুণ্ড

আমি নতশিরে নিম্নদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্বচ্ছভূমির অভ্যন্তর হইতে স্বর্ণবর্ণ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ব্বিম্ব সকল বিবিধ আবর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

মহামায়া ভগবতীর অনুপম রূপের ছটা মনে করিয়া বারংবার উহাকে নমস্কার করিতে লাগিলাম। চিত্ত আমার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। মা যোগমায়ার অস্থি গঙ্গাজলে এই কুণ্ডেই সমাহিত হইয়াছিল মনে পড়িল। এখানে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে ঘাটের উপরে একখানা কুটীরে বসিয়া স্থিরভাবে নাম করিতে লাগিলাম।

জলদান ব্রত।

বেলা প্রায় দুইটার সময়ে 'কোথায় থাকিব' মনে হওয়ায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। অমনি ঝোলাঝুলি একটী মুটিয়ার মাথায় তুলিয়া কনখলে রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে চলিলাম। দারুণ রৌদ্রে উত্তপ্ত ধূলাবালির উপর দিয়া কিছুক্ষণ নগ্নপদে চলিয়া অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল, পা আমার পুড়িয়া যাইতে লাগিল। এ সময়ে কোথায় যাই কোন্ স্থানে গিয়ে দাঁড়াই ভাবিতে লাগিলাম। কিছুদূর চলিয়া দেখি—রাস্তার বামদিকে একটী আশ্রমের দ্বারে গৈরিকধারী বৃদ্ধ একজন সন্ন্যাসী জলদান করিবার জন্য বসিয়া আছেন। বরফতুল্য সুশীতল জল কয়েকটী জালা ভরিয়া রাখিয়াছেন। শ্রান্ত পথিকদের দেখিলেই তাহাদের ডাকিয়া জল প্রদান করেন এবং শীতল বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন। বেলা এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সাধুর ইহাই কার্য্য। সন্ন্যাসীর কার্য্য দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। পিপাসার্ত্ত পথিকেরা প্রচণ্ড রৌদ্রে কাতর হইয়া যখন এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং বড় বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া জলপানে ঠাণ্ডা হয়েন তখন তাঁহারা কেমন তৃপ্তিলাভ করেন ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল সাধুর এই কার্য্য পরমধর্ম্ম। যিনি শত শত পিপাসার্ত্তকে সুশীতল জলদানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার কার্য্যে যে আনন্দ লাভ করেন, কঠোর তপস্যা ব্রত নিয়ম যাগ যজ্ঞাদিতে কখনও তেমন সন্তোষলাভ করেন না। সদাচারভ্রষ্ট নিতান্ত দুরাচার কোন ব্যক্তি যদি শুধু এই জলদান ব্রতই অবলম্বন করেন, ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়েন।

সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া হরিদ্বারে আমার আসার উদ্দেশ্য জানাইলাম। তিনি খুব সন্তুষ্টির সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—নিশ্চয় তোমার সুবিধা হইবে। ভগবান সদিচ্ছা পূর্ণ করেন।

রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রয় গ্রহণ ঃ

মক্ষিকার উৎপাতে রক্ষা।

সাধুর নিকট হইতে বাহির হইয়া আমি রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বারে একটী লোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—স্বামিজি? আমি রামপ্রকাশ মহান্তের সহিত

দেখা করিতে চাই, তিনি কোথায়? তিনি বলিলেন—"আপনার কি প্রয়োজন বলুন—আমিই রামপ্রকাশ মহান্ত।" আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া হরিদ্বারে আমার আসিবার কারণ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম এবং যতদিন পাহাড়ে থাকার সুবিধা না হয় এই আশ্রমেই থাকিতে পারিব কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া থাকিবার অনুমতি দিলেন এবং শিষ্যদের ডাকিয়া আমাকে দোতালায় লইয়া যাইতে বলিলেন। আমি আরও আদর পাওয়ার মানসে মহান্তের পরিচিত আমার একটী বন্ধুর কথা বলিয়া তাহার একখানা অনুরোধ-পত্র মহান্তের হাতে দিলাম। তিনি একটু দেখিয়া পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—"একে আমি চিনি না। এখানে কত বাঙ্গালী আসেন যায়েন। বাপ মা ছাড়িয়া তাদের স্মরণ করিতে তো আমি সাধু হই নাই; আপনি আমায় নিকটে আসিয়াছেন এখন আপনাকেই আমি চিনি। আপনি অতিথি আমার দেবতা—এখানে চিঠিপত্রের প্রয়োজন হয় না—আপনি এদের সঙ্গে চলুন।" আমি মহান্তের শিষ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মহান্তও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। উপরে উঠিয়া সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য মৌমাছি আসিয়া পড়িল। আমার অগ্রগামী কয়জন সাধু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে আমাকে চীৎকার করিয়া "শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন" বলিতে লাগিল। সিঁড়িতে পা না দিতেই মক্ষিকারা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং ভন্ ভন্ করিয়া আমার অনাবৃত অঙ্গের সর্ব্বত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। আমি নিরুপায় দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মহান্ত আমাকে ধাক্কা দিয়া একপাশে সরাইয়া উপরে উঠিয়া পড়িলেন। আমিও ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি—মহান্ত এবং তাঁহার দুই তিনটী শিষ্য মেজেতে পড়িয়া আহা, উহু, গেলাম, মলাম করিতেছেন; প্রত্যেককে অন্ততঃ ১৫,২০টী স্থানে মক্ষিকা দংশন করিয়াছে। আমার হাতের চাপে পড়িয়া একটী মক্ষিকা আমাকে সামান্য দংশন করিয়াছে বটে কিন্তু অসংখ্য মৌমাছি সেই সময় গায়ে পড়িয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। দংশন স্থানেও ৪।৫ মিনিটের অধিক সময় বেদনা রহিল না। ইহা পরিষ্কার গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত আর কি বলিব? এই ঘটনায় মহান্ত ও তাঁহার শিষ্যগণ আমাকে শক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ ঠাওরাইয়া লইলেন। মন্দ নয়! "ঝড়ে কাক মরে, ফরিরের কেরামত বাড়ে"—এ যে তাহাই হইল!

রামপ্রকাশ মহান্ত আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। তাঁর থাকার পাশের ঘরে আমাকে আসন করিতে বলিলেন। চণ্ডী পাহাড় অথবা তন্নিকটবর্ত্তী যে কোন স্থানে আমার থাকার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন স্বীকার করিলেন। আগামী কল্য চণ্ডী পাহাড়ে যাইয়া স্থান দেখিয়া আসিব স্থির করিলাম। মহান্ত তাঁহার একটী শিষ্যকে আমার সহিত যাইতে আদেশ করিলেন। রাত্রিটি কোন প্রকারে কাটাইলাম। মোটা মোটা রুটি লুণ ও লঙ্কা দিয়া আহার হইল। উহাদের রশুন দেওয়া ডাল আমি খাইতে পারিলাম না।

চণ্ডী পাহাড়ে যাত্রা ঃ গঙ্গার বন্ধন।

শ্রীযুক্ত রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে থাকিয়া আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। নিত্যকর্ম্ম করিবার কোন প্রকার সুবিধাই এই স্থানে নাই। মহান্তজীর একটী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডী পাহাড়ে রওয়ানা হইলাম। কনখল ও হরিদ্বারের মধ্যবর্ত্তী একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—গঙ্গার অপর পার পর্য্যন্ত একটী পোল রহিয়াছে। লোকে এই পোলকে ‘দাম’ বলে। সরকার বাহাদুর গঙ্গাবক্ষে কতকগুলি সুন্দর প্রস্তরময় থাম (পিলার) প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে লৌহ কপাট বসাইয়াছেন। এই কপাট বন্ধ করিয়া গঙ্গার জল দাম সংলগ্ন একটী বিস্তৃত কাটা খাল দিয়া চালাইয়া দেন। খাল পরিপূর্ণ করিয়া যেটুকু জল থাকে, তাহাই মাত্র গঙ্গার স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত হয়। তাহা অতি সামান্য ৮।১০ হাত প্রস্থ ও ২।৩ হাত গভীর হইতে পারে। গঙ্গার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম। অন্তর যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এক সময়ে যাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, ঋষিদের সেই ভবিষ্যৎ বাণী মনে পড়িল—“ক্বচিৎ চিন্না ক্বচিৎ ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিনী। ভবিষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞে, তদৈব প্রবলা কলিঃ।” আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না, কাঁদিতে কাঁদিতে মা গঙ্গাকে বলিলাম—পতিতোদ্ধারিণি আনন্দদায়িনী মা! যদি ভগবান গুরুদেব আমাকে কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী করেন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে সেই শক্তি তোমার বন্ধন ছিন্ন করিতে প্রয়োগ করিব। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন যেন তোমার বন্ধন-শেল আমার বুকে বিদ্ধ থাকিয়া আমাকে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করে।

১৮ই—৩০শে বৈশাখ,
১৩০০ সাল।

তপস্যার স্থান নির্দ্দেশ।

দাম পার হইয়া চড়ায় পৌঁছিয়া দেখি চণ্ডীর রাস্তার বামপার্শ্বে গঙ্গার উপরে একটী সুন্দর আশ্রম। তথায় প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে একখানা পর্ণকুটীর তাহাতে একটী সাধু বাস করেন। সাধুর নাম আত্মানন্দ, তিনি আমাদিগকে খুব আগ্রহের সহিত আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমরা আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বটবৃক্ষমূলে বসিলাম। স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। আশ্রমের নীচে পশ্চিমদিকে স্বচ্ছসলিলা পতিতপাবনী গঙ্গা কল কল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছেন। গঙ্গার পাড়ে মায়াপুরী হরিদ্বার, তৎপশ্চাৎ বিল্বকতীর্থ শোভিত মনোরম বিল্বকেশ্বর পাহাড়। উত্তরে গঙ্গার বিস্তৃত চড়া তৎপরে হিমালয়ের ক্রমোন্নত পর্ব্বতশ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে আশ্রমের অনতিদূরে গঙ্গার নির্ম্মল নীল ধারা—তদুপরি নীল সরস্বতীর আবির্ভাব স্থল নয়নরঞ্জন নীল পর্ব্বত উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গসমূহে শোভামান। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে শ্রীচণ্ডী প্রতিষ্ঠিতা। তাই লোকে ইহাকে ‘চণ্ডী পাহাড়’ বলে।

আমার ভাগবত গ্রন্থে পাহাড়ের যে চিত্র পড়িয়াছিল—এই স্থান হইতে পাহাড়ের দৃশ্য অবিকল

সেই প্রকার। পাহাড়ের মনোমুগ্ধকর রূপ দর্শনে ঠাকুরের রূপ উজ্জ্বলরূপে জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চোখ আর ফিরাইতে পারিলাম না, স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। নামটী জীবন্তশক্তিরূপে আপনা-আপনি বাহির হইতে লাগিল। কতক্ষণ যেন অভিভূত হইয়া রহিলাম। পরে মহান্তের শিষ্য সহিত চণ্ডী পাহাড়ে যাত্রা করিলাম। ফিরিবার সময়ে আবার আশ্রম হইয়া যাইতে আত্মানন্দ জেদ করিয়া বলিলেন। আমি স্বীকার করিলাম। ভজনের অনুকূল এমন একটী স্থান ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই—স্থানটী ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইতে লাগিল।

আশ্রম হইতে পাহাড়টি দেখিয়া মনে হইয়াছিল ৫।৭ মিনিট অন্তর; কিন্তু চলিতে চলিতে বুঝিলাম অর্দ্ধ ক্রোশের কম নয়। চণ্ডী পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। রাস্তা অতি দুর্গম। উভয় পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। শুনিলাম তাহাতে অসংখ্য হিংস্র জন্তুর বাস। স্থানে স্থানে সংকীর্ণ পথের সংলগ্ন ভয়ঙ্কর গভীর অন্ধকার গহ্বর। একটু পদস্খলন হইলেই কোন অতলতলে গিয়া পড়িব জানি না। এক সময়ে জিমনাস্‌টিক ভাল অভ্যস্ত ছিল বলিয়া পাহাড়ে উঠিতে কষ্ট হইল না।

চণ্ডী পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে মা চণ্ডীর মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বহু দর্শনার্থী পাহাড়টীকে পরিপূর্ণ করিয়া আছে। মায়ের পূজা দিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে। আমিও মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আশ্রমে রওয়ানা হইলাম। নীচে নামিয়া পাহাড়ের পাদদেশে নর-মাংসাশী সিদ্ধ অঘোরী কামরাজের আশ্রম দেখিলাম। আশ্রমটী একেবারে নির্জ্জন। সমস্ত পাহাড়ে একটীও লোকালয় নাই। ব্যাঘ্র ভল্লুক সমাকীর্ণ এই মহাবনে একাকী বাস সহজ শক্তির পরিচয় নয়।

নীলধারা পার হইয়া দামপাড় আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী আমার হরিদ্বারে আসার অভিপ্রায় অবগত হইয়া এই আশ্রমে যে কোন স্থানে একখানা কুটীর করিয়া আমাকে থাকিতে বলিলেন। চণ্ডী পাহাড়ে থাকা সহজসাধ্য নয় তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। চণ্ডী পাহাড়ে ভজন কুটীর করিয়া থাকা একেবারে অসম্ভব। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুর বাস, আর ওখান হইতে ভিক্ষা করারও নিতান্ত অসুবিধা। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ আসিয়া হরিদ্বার বা কনখলে ভিক্ষা করিতে হইবে। তারপর বর্ষার সময়ে নীলধারা পার হওয়ার উপায় নাই। বর্ষার পূর্ব্বেই ৩,৪ মাসের আহার সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কোন আপদ্-বিপদ ঘটিলে সব অন্ধকার—একটী জনপ্রাণীও চক্ষে দেখা যাইবে না। আত্মানন্দের কথা শুনিয়া বুঝিলাম চণ্ডী পাহাড়ে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় থাকা অসম্ভব। আত্মানন্দ আমাকে বলিলেন—দাদা! তুমি এখানে থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভজন কর। আমি ভিক্ষা করিয়া তোমাকে খাওয়াইব এবং সর্ব্বদা তোমার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিব। আমিও দেখিতেছি—এই স্থান হইতে আমার কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না। ভজনের অনুকূল এমন একটী স্থান জীবনে কোথাও দেখি নাই। ভাবিলাম—আসিবার সময় ঠাকুর যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহাতে এমন কিছু বুঝায় না যে চণ্ডী পাহাড়েই

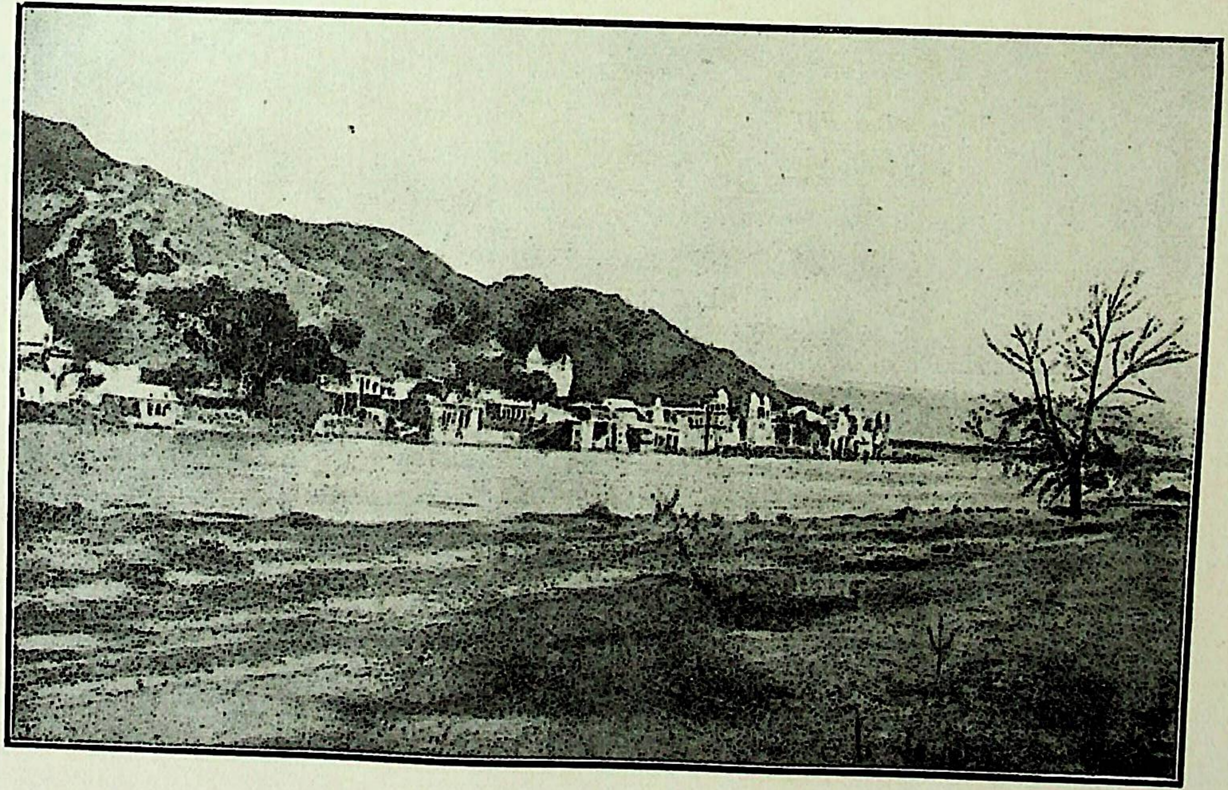

দামপাড় আশ্রম

পৃষ্ঠা ১১

আমাকে থাকিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন—এরূপ পাহাড় যেখানে দেখ্‌বে সেইখানেই আসন কর্‌বে। চণ্ডী পাহাড় এক এক স্থান হইতে এক এক প্রকার দেখায়, কিন্তু এখান হইতে পাহাড়ের দৃশ্য ভাগবতের চিত্রের অনুরূপ ; সুতরাং এই স্থানে থাকাই বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছা।

আত্মানন্দ বিশেষ আগ্রহের সহিত এই আশ্রমে সম্প্রতি তাঁহার কুটীরেই আমাকে থাকিতে বলিলেন। আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে রওয়ানা হইলাম। দামপাড়ে থাকিব মনে করিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সকল রকমেই এই স্থান সুবিধাজনক। আমি সঙ্গীটিকে সঙ্গে লইয়া রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। মহান্ত আমার মুখে দামপাড় ও পাহাড়ের সমস্ত কথা শুনিয়া আমাকে দামপাড়ে থাকিতেই বলিলেন। সহজে সহরের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা পাওয়া যায়, ভজনের এমন একান্ত নির্জ্জন স্থান দামপাড়ের মত আর নাই। মহান্তের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া কল্যই দামপাড়ে যাইব স্থির করিলাম।

ভজন-কুটীর প্রস্তুত।

পাঁচ ছয় দিন যাবৎ দামপাড়ে আসিয়াছি। ঘর একখানা প্রস্তুত করাইতে আত্মানন্দকে বিস্তর খোসামুদি করিতেছি—আত্মানন্দও খুব চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে মজুর জুটিতেছে না। হরিদ্বার বা কনখল হইতে কেহ দামপাড়ে আসিতে চায় না। আত্মানন্দের ঘরে একপাশে আসন করিয়া আছি—ঘরখানা খুব ছোট, নানা বস্তুতে পরিপূর্ণ। অবিশ্রান্ত প্রবল বাতাস ও প্রচণ্ড রৌদ্রের জন্য বাহিরে বসা যায় না। বটগাছের নীচে বসিতে খুব আরাম, কিন্তু চণ্ডী দর্শনার্থী যাত্রীরা যাতায়াতের সময় বেলা প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত দলে দলে আসিয়া এই গাছের তলায় বিশ্রাম করেন। আত্মানন্দ তাহাদের তামাক জল দিয়া সেবা করেন—তাহারাও দু'চার পয়সা দেওয়াতে আত্মানন্দের বেশ সুবিধা হয়। কিন্তু আমার বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। নিত্যকর্ম্ম বন্ধ হওয়ায় আমার মনের ও শরীরের সুখ নাই। বিষম বিরক্তি ও যন্ত্রণা হইতে লাগিল। শরীরও ক্রমশঃ কাতর হইয়া পড়িল।

সপ্তম দিন ভোরবেলা নিত্যকর্ম্মের সুবিধা করিতে না পারায় এতই কষ্ট হইল যে ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। বলিলাম—গুরুদেব! এবার নিরুপায় হইয়া তোমার দিকে তাকাইতেছি—ঘরের ব্যবস্থা করিয়া না দিলে এই ক্লেশ আমি সহ্য করিতে পারিব না—ঠাকুর! ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দেও নাহলে আমি আবার তোমারই নিকটে উপস্থিত হইব। নিজের চেষ্টায় কিছুই হইবে না পরিষ্কার বুঝিলাম।

আশ্চর্য্য গুরুদেবের দয়া! সকালবেলা শৌচান্তে স্নান করিয়া আশ্রমে আসিয়া দেখি ক্যানেলের ম্যানেজার বাবু মজুর লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। আত্মানন্দ কথায় কথায় তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন—একটী ব্রহ্মচারীর ঘরের অভাবে বড়ই কষ্ট হইতেছে—মজুর জুটিতেছে না। এই কথা

স্মরণ হওয়ায় ম্যানেজার বাবু আজ ৫টী মজুর লইয়া আসিয়াছেন। আত্মানন্দ মজুরদিগকে আমার পছন্দ মত ঘর প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিলেন। আত্মানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল তাহার কুটীরের সম্মুখে আমার ঘর করি। কিন্তু তাহাতে ভজনের বহু বিঘ্ন ঘটিবে বুঝিয়া প্রায় ১৫০ হাত তফাতে স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। একটী পুরান ঝাপড়া শিংশপা বৃক্ষের মূলে কুটীর আরম্ভ হইল। আনন্দে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ঘরখানা দুই তিন দিনের মধ্যেই হইয়া গেল। আমার বড়ই পছন্দ মত হইয়াছে। কুটীরখানা ৬ ফুট প্রস্থ ও ৮ ফুট দীর্ঘ করিয়াছি। আসনে বসিলে সম্মুখে হিমালয় পর্ব্বত, বামে অর্দ্ধ-মিনিট অন্তরে গঙ্গা ও মায়াপুরী, দক্ষিণে নীলধারার উপরে বিশাল নীলগিরি—দেখিতে বড়ই মনোরম। যেদিকে তাকান যায় চোখ আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। উত্তরাভিমুখে আসন করিয়া সামনে হোমকুণ্ড করা হইল। আত্মানন্দের অনুমতি লইয়া ভজন-কুটীরে প্রবেশ করিলাম এবং রুটীন্ অনুসারে উৎসাহের সহিত সাধন ভজন করিতে লাগিলাম।

ভিক্ষায় বিপদাশঙ্কা—মহামায়ার খেলা।

দামপাড়ে আসিয়া সাত দিন আত্মানন্দের কুটীরে রহিলাম। আমি ভিক্ষা করিব শুনিয়া আত্মানন্দ খুব দুঃখ করিয়া বলিলেন—দাদা! সেটি হবে না, যতদিন আমার ঘরে থাকিবে আমার যাহা জোটে তাহাই খাইবে। তোমার ঘর হইলে ভিক্ষা করিয়া খাইও। আমি আত্মানন্দের আশ্রয়ে আছি—তাই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেদ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আত্মানন্দ ৪,৫টী গরু পোষেন, প্রচুর দুগ্ধ হয়—প্রত্যহ আমাকে অর্দ্ধ সের দুধ দিতে লাগিলেন।

অতি প্রত্যুষে স্নানান্তে নিজ কুটীরে আসন করিয়া বসিলাম। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত সাধনে পরমানন্দে কাটাইলাম। ভিক্ষায় যাইতে প্রস্তুত হইয়া আত্মানন্দকে জানাইলাম। আত্মানন্দের নিকটে কয়েকটী সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহারা সকলেই আমাকে বলিলেন—হরিদ্বারে বিস্তর সদাব্রত ও ধর্ম্মশালা আছে। মধ্যাহ্নে আহারের সময়ে উপস্থিত হইলে ডাল-রুটি পাওয়া যায়, কিন্তু কাঁচা ভিক্ষা কেহ দেয় না, নিয়ম নাই। গৃহস্থেরা কাঁচা ভিক্ষা—ডাল আটা দিয়া থাকে। অপরাহ্নে অসময়ে আপনি কোথায় গিয়া ভিক্ষা করবেন? আমি গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করিব শুনিয়া তাঁহারা সকলে হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—তা হলেই হয়েছে? আপনি আর যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু গৃহস্থদের বাড়ি কখনও ভিক্ষায় যাবেন না। আমি বলিলাম—কেন, সর্ব্বত্রই ত গৃহস্থদের বাড়ি লোকে ভিক্ষা করে? সন্ন্যাসীরা বলিলেন—তা আমরা জানি। সর্ব্বত্র তো এই মায়াপুরী নাই? এখানে যে মহামায়ার বিষম খেলা! ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে কখনও এই বেশে গৃহস্থ বাড়িতে যাবেন না। মেয়েরা বড়ই উৎপাত করে। সাধু-সজ্জন, সিদ্ধপুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিলে—সেই পুত্র সবল সুস্থ সর্ব্ববিষয়ে গুণবান ও দীর্ঘজীবী হইবে— এদিকে কারো কারো এই বিশ্বাস, তাই তাহারা সাধুদের পাইলে

নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বাড়ির ভিতর লইয়া যায়—পশ্চাতে থাকিয়া কেহ বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। পরে যে প্রকারে হউক সাধুদের সর্ব্বনাশ করে।

আমি। গৃহস্থদের বাড়িতে কি একটী বই মেয়েছেলে থাকে না? তাদের কি কারো নিকট লজ্জা ভয় নাই? সন্ন্যাসীরা বলিলেন—মধ্যাহ্ন আহারের পর পাণ্ডারা বাড়িতে থাকে না, যাত্রী ধরিতে যায়। তারপর অপকর্ম্ম করিলেই লজ্জা ও অপমানের ভয়। কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কিছু ত তাহারা করে না। সাধু সজ্জন দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইলে বংশ উদ্ধার হইবে—ইহাই তাহাদের সংস্কার। সদ্বুদ্ধিতে যাহা করে তাহাতে আর লজ্জা ভয় কি? কৃতকার্য্য হইলে বরং তাহারা গৌরব মনে করে। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। সৃষ্টিছাড়া এদের আচার-ব্যবহার?

জয়পুরের মহারাজার গুরু বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ স্বামী বলিলেন—"নিরুপদ্রবে থাকিতে পারিলে বিপদের স্থানে যাবেন কেন? দেখুন আমি অল্প বয়সে উপনয়নের পর দণ্ড লইয়া বাহির হই, কয়েক বৎসর নবদ্বীপে থাকিয়া টোলে অধ্যয়ন করি। পরে দেশ-ভ্রমণে কয়েক বৎসর কাটাই। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি হরিদ্বারে আসি। ভগবানের কৃপায় তখন আমার গুরু লাভ হয়। একটী নৈষ্ঠিক মহাত্মার নিকট আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া ৪৯ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশমত সদাচার রক্ষা করিয়া সাধন-ভজনে কাটাই। অদম্য উৎসাহ-উদ্যমে গুরুর সঙ্গে নানাস্থানে থাকিয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন করিয়া আমার নিজের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল। আমি স্বাধীনভাবে চলিব স্থির করিয়া গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিলাম এবং পুনরায় হরিদ্বারে আসিলাম। কিছুদিন আমি বেশ ছিলাম। পরে ভিক্ষার ব্যাপারে স্ত্রীলোকের সংস্রব হেতু তাহাদের প্রলোভনে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। বৃদ্ধাবস্থায় ৫০ বৎসর বয়সে আমি চিরকালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য রত্ন হারাইলাম। আমার সর্ব্বনাশ হইল। ৩.৪ মাস পর্য্যন্ত আমার খেয়ালই হইল না—কি করিতেছি, পরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আমার হুঁস হইল। তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া গুরুর নিকটে উপস্থিত হইলাম। গুরুদেব দয়া করিয়া আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সন্ন্যাস ব্রত দিয়া দিলেন। তাই বলি স্ত্রীলোকের প্রলোভনকে সহজ ভাবিবেন না!" দণ্ডী স্বামীর কথা শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। মনে হইল—আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দম্ভপূর্ব্বক গুরুসঙ্গ ত্যাগ করারই এই পরিণাম। আমি দুই ক্রোশ রাস্তা ঘুরিয়া একটি ধর্ম্মশালা হইতে খোসা সহিত কড়ায়ের ডাল ও আটা ভিক্ষা করিয়া আশ্রমে আসিলাম। ভাবিলাম—এক মুঠা আটা ও এক ছটাক ডালের জন্য এত পরিশ্রম ও এত সময় নষ্ট করা সহজ পরীক্ষা নয়।

স্থূল ভিক্ষার প্রয়োজন ও আদেশ।

প্রতিদিন দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ যাতায়াতে হয়রান হইয়া এক মুঠা আটা সংগ্রহ করিতে বড়ই বিরক্তি জন্মিল। সাধুরাও আমাকে—নিত্য ভিক্ষা করা এস্থানে থাকিয়া অসম্ভব, গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলেই দাম খুলিয়া দেয়, তখন এস্থান হইতে কোথাও যাতায়াতের উপায় থাকে না। নিত্য ভিক্ষার

চেষ্টায় প্রত্যহ দুই ঘণ্টা কাটাইলে ভজনের বিষম বিঘ্ন। সাধুদের কথা আমার ভাল বলিয়াই মনে হইল। আমি ঠাকুরকে এ স্থানের সমস্ত অবস্থা লিখিয়া স্থূল ভিক্ষা করিব কিনা জানিতে চাহিলাম। ঠাকুর পত্রোত্তরে আমাকে স্থূল ভিক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। আমি হৃষ্টমনে একদিন ভিক্ষায় যাহা সংগ্রহ করিলাম, দু' তিন সপ্তাহ তাহাতে স্বচ্ছন্দে চলিবে। মহান্তেরা আমার হোম-ঘৃতেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ভিক্ষায় চাউল জোটে না, কড়ায়ের ডাল আটা লুন লঙ্কা ইহাই মাত্র পাওয়া যায়। প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে হরিদ্বার কনখল দিনের বেলায় অগ্নিময়। কয়েকদিন নিত্য ভিক্ষার ফলে আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। বিষম জ্বরে শয্যাগত হইলাম।

তন্দ্রায় প্রসাদ লাভ—জ্বর আরোগ্য।

আমার জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আত্মানন্দ প্রত্যুষে উঠিয়া গো-সেবা করেন। পরে বেলা ৮টার সময় ভিক্ষায় চলিয়া যান। মধ্যাহ্নে কোন কোন দিন আশ্রমে আসেন। অধিকাংশ সময়েই বাহিরে থাকেন। সমস্ত দাম পাড়ের চড়ায় চণ্ডীর যাত্রী ব্যতীত একটী লোকও চক্ষে দেখা যায় না। জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। পিপাসা পাইলে একটু জল দেয় এমন লোক নাই। জনমানবশূন্য নির্জ্জন কুটীরে পড়িয়া জ্বরের যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বেহুঁস হইতে লাগিলাম। ভাবিলাম এবার বুঝি প্রাণ যায়! ঠাকুরকে স্মরণ হইল। কাতরপ্রাণে তাঁর দিকে তাকাইয়া বলিলাম—"দয়াময়! তুমি না আমাকে স্বহস্তে অভয় কবচ পরাইয়া দিয়াছিলে? আজ আমার দশা দেখ।" ঠাকুরকে ক্লেশ জানাইয়াই আমি সংজ্ঞাশূন্য হইলাম। মূর্চ্ছিত বা তন্দ্রাবস্থায় দেখিলাম—ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি—অত্যন্ত পিপাসা পাইল। আমার পাশে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মনাক্কা রহিয়াছে দেখিলাম। ঠাকুরকে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিল। আমি মনাক্কাগুলি ঠাকুরের সম্মুখে নিয়া ধরিলাম। ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্তগুলিই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ৪।৫টী মাত্র নিজে খাইয়া অবশিষ্টগুলি আমাকে দিয়া বলিলেন—"এই নাও, এ সব নিয়া খাও।" আমি যোগজীবনকে কিছু দিয়া বাকীগুলি মুখে ফেলিয়া দিলাম। উৎকৃষ্ট মনাক্কা খাইতে খাইতে জাগিয়া পড়িলাম। জাগ্রতাবস্থায়ও মনাক্কা চিবাইতেছি বুঝিয়া অবাক হইলাম। আমি আসনে উঠিয়া বসিলাম এবং খানিকটা জল খাইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শরীর আমার সম্পূর্ণ সুস্থবোধ হইতে লাগিল। জ্বরে যে বিষম যাতনা পাইতেছিলাম, তাহা কল্পনাও করিতে পারিলাম না। শরীর বেশ সবল, সুস্থ, ঝর্‌ঝরে বোধ হইতে লাগিল। আমি আসনে বসিয়া রুটিন্ অনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। যথাসময়ে ভিক্ষালব্ধ কড়ায়ের ডাল ও রুটী ধুনিতে প্রস্তুত করিয়া আহার করিলাম।

হরিদ্বারে নিত্যকর্ম্ম।

সাধনের কুটীরখানা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। উত্তরমুখে আসন করিয়াছি। দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে বড় বড় জানালা থাকায়, ঝাঁপ তুলিয়া দিলে ঘরখানা পরিষ্কার খোলা মেলা হয়। যে দিকে

তাকান যায়, বিশাল পাহাড়শ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা। আবার জানালা বন্ধ করিলে ঘর একেবারে অন্ধকার হইয়া পড়ে। এই স্থানটী বেশ উঁচু, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেখা যায়। স্থানের প্রভাব এমনই চমৎকার যে আসনে বসিলে আপনা আপনি চিত্তটী জমাট হইয়া আসে। ধ্যানেতে ঠাকুরের স্মৃতি ক্রমশঃই ঘন হইতে থাকে। অবিরল অশ্রুবর্ষণে পরমানন্দে দিনটি কি ভাবে চলিয়া যাইতেছে বলিতে পারি না। আহারান্তে আসনেই বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, শয়নেও অপ্রবৃত্তি আসিয়া পড়িল। ঠাকুরের অপরিসীম দয়ায় এতই অভিভূত হইয়া রহিয়াছি যে দিনরাত যেন একটা নেশায় কাটিয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে বুঝি ঠাকুর চিরকালের মত এখানেই আমাকে রাখিলেন।

বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ শেষ রাত্রি ৩টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন হাত মুখে জল দিয়া আসনে বসি এবং ধুনিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোম করি। পরে প্রাণায়াম ও নামে ভোর পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আসন হইতে উঠিয়া নীলধারার পারে বেলবাগে চলিয়া যাই। সহস্র সহস্র বিল্ববৃক্ষে এই স্থানটী পরিপূর্ণ। কদ্‌বেলের মত ছোট ছোট শ্রীফল এ সব বৃক্ষের তলায় নিয়তই পড়িয়া থাকে। শৌচান্তে স্নান তর্পণ করিয়া দুটী বেল লইয়া কুটীরে আসি। ভোরবেলা আত্মানন্দ আমাকে অর্দ্ধ সের দুধ দিয়া যান; আমি আত্মানন্দকে চা দেই, নিজেও খুব তৃপ্তির সহিত চা পান করি। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ ও ন্যাস সমাপন করিয়া পাঠ করি। ১১টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং ঘর-লেপনাদি বাহিরের কার্য্য করি। ১২টার সময়ে স্নান সন্ধ্যা করিয়া শ্রীফল খাইয়া থাকি। পরে স্থিরভাবে ৩টা পর্য্যন্ত আসনে বসিয়া নাম ও ধ্যানে কাটাইয়া দেই। তৎপরে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময়ে কুটীরে আসি। ধুনির অগ্নিতে ছোট একটী ঘটীতে ডাল চাপাইয়া দেই। শুধু লুণ-লঙ্কা দিয়া জলে উহা সিদ্ধ করিয়া থাকি। হাতে চাপ্‌ড়াইয়া একখানা টিক্কর প্রস্তুত করিয়া ধুনিতে পোড়াইয়া লই। পরম তৃপ্তির সহিত উহা ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাই। নিদ্রাবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত আসনে বসিয়া নাম করি। তৎপরে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আরামে নিদ্রা হয়।

আমার প্রার্থনায় ঠাকুরের বিষম ভোগ।

আমার পছন্দ মত ঘরটি বেশ প্রস্তুত হইয়াছে। মনে করিলাম এখন আর কোন চিন্তা নাই। এবার দেহ মন অঙ্গার করিয়া সাধন ভজন তপস্যা করিব। কিন্তু ঠাকুরের অভিপ্রায় কি বুঝিতেছি না। অকস্মাৎ বিষম-উৎপাত উপস্থিত হইল। তাহাতে ঘরে থাকা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ভোরবেলা স্নানান্তে কুটীরে আসিয়া দেখি নানাজাতীয় অসংখ্য কীট ঘরময় হইয়া রহিয়াছে। মুড়ির মত বড় বড় অতি জঘন্য কুৎসিত পোকা এত পরিমাণে ঘরে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে ২।৫ ইঞ্চি স্থানও ফাঁক নাই। সকল দিক্ হইতেই পোকাগুলি আসনে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। বহুবার ঝাড়ু

দিয়াও এ সব পোকা সরান গেল না। অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তরই ঘর যেমন তেমন। পোকায় উহা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আসনে বসিয়া সারাদিন কেবল শরীর হইতে পোকা বাছিয়া কাটাইলাম। ইহার উপর আর একটি অধিকতর যন্ত্রনাদায়ক উপাধির সৃষ্টি হইল। অসংখ্য মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া চোখে মুখে নাকে কানে এবং সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া পিড়্ পিড়্ করিতে লাগিল। এই মাছি এমনই ভয়ানক যে বস্ত্র দ্বারা সরাইলেও নড়িতে চায় না। উঠিলে তখনই আবার গায়ে আসিয়া পড়ে। নিতান্ত অস্থির হইয়া আমি ধুনিতে কাঠ চাপাইলাম এবং দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘর অন্ধকার করিলাম কিন্তু কোন ফলই হইল না, একটী মাছিও সরিল না—লাভের মধ্যে ধূঁয়ে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এ যে কি বিষম যন্ত্রণা প্রকাশ করা যায় না।

এই সকল উৎপাতের মধ্যে আর একটি বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা উপস্থিত হইল। আসনে বসা মাত্রই জানি না কি এক অজ্ঞাত শক্তিতে চিত্তটীকে আমার ভিতরের দিকে টানিয়া নিতে লাগিল। মধুময় ইষ্টনাম অনায়াসে স্মৃতিপুষ্ট হইয়া আপনা আপনি জাগিয়া উঠিল। ইহার প্রভাবে শরীর আমার অবশ হইয়া আসিল। নিবিষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল, কিন্তু দুরন্ত মাছি ও পোকার দৌরাত্ম্যে অস্থির হইতে লাগিলাম। ১৫।২০ মিনিট অন্তর অন্তর ঘর-বাহির করিয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। দুই দিন দুই রাত্রি এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম। তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলাম—"গুরুদেব! আর আমি পারি না, এই ক্লেশ আর আমি সহ্য করিতে পারিব না। হয় তুমি অচিরে এই উৎপাতের শান্তি কর, না হয় আশীর্ব্বাদ কর তোমার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি অন্তরে রাখিয়া এই সংসার হইতে চিরতরে বিদায় হই। তোমার নামে তোমার ধ্যানে ডুবাইয়া না রাখিলে এ জীবনধারণ আমার পক্ষে নরকভোগ মাত্র। ঠাকুর দয়া কর!" ক্লেশ শান্তির জন্য এই প্রকার কত কি প্রার্থনা করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

শেষ রাত্রিতে একটী স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পুবের ঘরে, ঠাকুর নিজ আসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। যোগজীবন, কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা আপন মনে হাসি গল্প করিতেছেন, কেহই ঠাকুরের দিকে তাকাইতেছেন না। অসংখ্য কুৎসিত পোকা ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গে উঠিয়া কিল্‌বিল্ করিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে ভন্‌ভন্ করিয়া নাকে মুখে চোখে বসিয়া পড়িতেছে। ঠাকুর নিস্পন্দ, স্থির। আমি উহা দেখিয়া পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম। একখানা পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিলাম কিন্তু তাহাতে একটী মাছিও উঠিল না, একটী পোকাও নড়িল না। আমি অন্য উপায় না পাইয়া একটী একটী করিয়া পোকা তুলিয়া ফেলিতে লাগিলাম—এই অবস্থায় জাগিয়া পড়িলাম।

আসন ত্যাগ করিয়া বেলবাগ চলিয়া গেলাম। শৌচান্তে স্নান করিয়া কুটীরে আসিয়া দেখি, একটী পোকা বা মাছি সমস্ত ঘরে নাই। আমি অবাক হইয়া ঘরে ও বাহিরে পোকা ও মাছি খুঁজিতে

লাগিলাম। ৮।১০টী পোকা ঘরে একটী স্থানে মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—একি হইল, এত মাছি পোকা কোথায় গেল। পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল গত কল্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহারই এই ফল। ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন এবং আমার উৎকট ভোগ—আমি ভোগ করিতে চাহি না দেখিয়া—নিজেই উহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং জঘন্য মাছি পোকার দংশন স্থিরভাবে আসনে বসিয়া সহ্য করিতেছেন। ইহাতে প্রাণ আমার জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম—হায় আমি কি করিলাম, সুশীতল গঙ্গাজলে সচন্দন তুলসীপত্র ও গন্ধ পুষ্প নিমজ্জিত করিয়া যাঁহার চরণযুগলে একবার অর্পণ করিলে অনন্তকালের প্রারব্ধ নিমেষে অন্তর্হিত হয়, আমার আরামের জন্য সেই দয়াল ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আমার ভোগ্য কুৎসিত কৃমি-কীট ছড়াইয়া দিতে একটুকু দ্বিধা করিলাম না! হায়, হায়, কি করিলাম! ঠাকুর ধমক দিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন "ব্রহ্মচারী! সাবধান, প্রার্থনা করিলেই কিন্তু তাহা মঞ্জুর হবে। সাবধান থেকো।" আমি ঠাকুরের সেই কথার অর্থ তখন বুঝি নাই। এখন কি করিব, প্রাণ আমার জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। আমি আকুলপ্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে বলিলাম—"গুরুদেব, তোমার বাক্য অন্যথা হইতে পারে না—আমার সমস্ত প্রার্থনাই তো তুমি মঞ্জুর করিবে। এখন কাতরপ্রাণে শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার ভোগ আমাকেই দেও। প্রসন্নমনে আমি তাহা ভোগ করিব। আর যেন প্রার্থনা আমার প্রাণে কখনও উদয় না হয়, আশীর্ব্বাদ কর।" ঠাকুরের সুন্দর মুখমণ্ডল কৃমিকীট ও মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—মনে আসায় সমস্তটী দিন আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম। এই যাতনা যে কি বিষম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। প্রার্থনায় আমার অত্যন্ত ধিক্কার আসিয়া পড়িল। প্রতিজ্ঞা করিলাম জীবনে আর কখনও প্রার্থনা করিব না। সন্ধ্যার সময়ে অকস্মাৎ ঠাকুরের সহাস্য স্নেহদৃষ্টি অন্তরে আসিয়া পড়িল। তাঁহার পরম পবিত্র সুন্দর মুখশ্রী চিত্তে যেন ছাপ পড়িয়া গেল। ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব দয়ার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। জয় গুরুদেব!

উচ্ছিষ্ট মুখে খাবার দিলে উচ্ছিষ্ট দেওয়া হয়।

একটী স্বপ্ন দেখিলাম—ঠাকুর আমাদের বাড়ী গিয়াছেন। মহাসমারোহে তাঁহার সেবা ভোগের আয়োজন হইতে লাগিল। মা রান্না করিতে গেলেন। ঠাকুরের জলযোগের জন্য নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল একখানা থালায় রাখিয়া গেলেন। আমার জন্য আর একখানা থালায় খাবার রহিয়াছে দেখিলাম। ঠাকুরের সেবার জন্য রক্ষিত ফল ফলারি ঠাকুরকে দিবার জন্য চলিলাম। আমার খাবারগুলিও বাম হস্তে নিলাম। উৎকৃষ্ট বস্তু ঠাকুরের ভোজনপাত্রে দেখিয়া আমার লোভ হইল। অমনি ঐ পাত্র হইতে কিছু ফল মাটিতে পড়িয়া গেল। ঐ সকল বস্তু ভূমি হইতে তুলিয়া মুখে ফেলিতে

লাগিলাম, এবং চিবাইতে চিবাইতে ঠাকুরের ও আমার খাবার লইয়া চলিলাম। মনে করিলাম ঠাকুরের খাবার ফল তো কতকটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং বাম হাতে ধরা আমার খাবার-সামগ্রী সকল ঠাকুরকে দিব ; আর তাঁহার খাবার বস্তু আমি খাইব। ঐ সময় মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন—ওকি ! খেতে খেতে ঠাকুরের বস্তু নিয়ে যাচ্ছিস্। ও সব যে এঁটো হয়ে গেল। আমি মাকে বলিলাম—মুখ ও ডান হাত আমার উচ্ছিষ্ট, বাম হাত পরিষ্কার আছে। ঠাকুরের খাবার পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আমার খাবার জিনিষ তাঁকে দিব ভাবিয়াছি। মা বলিলেন—তা হবে না। বাম হাতে ধরিয়া খাবার কোন বস্তু ঠাকুরকে দিতে নাই। আর এঁটো মুখে খাবার বস্তু ধরিলে তাহা ভোগে লাগে না। এ কথা শুনিয়াই আমি জাগিয়া পড়িলাম।

স্বপ্নে আজ মাতাঠাকুরাণীর উপদেশ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। মার কথা যে যথার্থ ঠাকুরের একদিনের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহা পরিষ্কার বুঝিলাম। যোগজীবন একদিন আহারান্তে না আঁচাইয়া আর একটী গুরুভ্রাতাকে বাম হাতে খাবার বস্তু দিতেছিলেন। ঠাকুর যোগজীবনকে বলিলেন—
"খেয়ে উচ্ছিষ্ট মুখে অন্যকে খাবাব দিলে, উচ্ছিষ্ট দেওয়া হয়—এই সাধারণ আচার জানিস্ না। এঁটো মুখে সকৃড়ি বস্তু দিতে নাই।"

সাধনে যোগমায়ার কৃপা।

শরীরের অবস্থা কয়েকদিন যাবৎ ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। দিন দিন দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি। আত্মানন্দের সঙ্গে যে কয়দিন আহার করিয়াছিলাম, পরিমাণের কোন নিয়ম ছিল না। আহার খুব পেটভরা হইত। দুগ্ধও দুবেলা প্রায় অর্দ্ধসের খাইয়াছি। আহার কমাইতে যাইয়া দেখিলাম— তাহাতে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ভাত খাওয়া এখানে সহ্য হয় না—শরীরে রসের সঞ্চার হয়, পায়খানা হয় না, শরীর বিষম অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভিক্ষায় সাধারণতঃ বুটের ছাতু পাওয়া যায়। তাহা একদিন খাইলে ৪।৫ দিন আর কিছু খাইতে হয় না, পেট খারাপ হইয়া পড়ে। শরীর বেশ সুস্থ সবল থাকিলে এবং সকল প্রকার আহারে দেহ অভ্যস্ত হইলে নিত্য ভিক্ষা করিয়া দেহরক্ষা এ স্থানে সম্ভব। যে পর্য্যন্ত শরীর বেশ সুস্থ না হয়, ততদিন আহারের দস্তর মত সুবন্দোবস্ত প্রয়োজন। না হইলে সাধন-ভজন দূরের কথা, প্রাণরক্ষাই কঠিন। শরীর কাতর হইলে দেহে যন্ত্রণা থাকিলে, মন আর ভাল থাকিবে কি প্রকারে ? সাধন-ভজন করিবার প্রবল ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু শরীরে অবসন্নতা হেতু তাহা কিছুই হইয়া উঠিতেছে না। ঠাকুরের কৃপায় শরীরে যেদিন আমার কোন গ্লানি হয় নাই, সেদিন ভজন-সাধনে উদয়াস্ত কি ভাবে গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। আনন্দে যেন মুগ্ধ রহিয়াছি। ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে এমন অবস্থা হইয়াছে যে নির্জ্জনে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। অবিরল অশ্রুধারায়

সমস্তটী দিন অতিবাহিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভজনের অনুকূল নানাস্থানে বহুচেষ্টায় মনের যে একাগ্রতা জন্মাইতে পারি নাই, এখানে আসনে বসামাত্র স্থানের অসাধারণ প্রভাবে আপনা আপনি তাহা হইয়াছে। গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিলেই, বিনা আয়াসে সমস্তগুলি ইন্দ্রিয়শক্তি নিজ হইতে অন্তর্মুখ হইয়া পড়ে। গুণময়ী যোগমায়ার অসামান্য গুণ, এই মহাতীর্থের যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায়, একটু স্থির হইতে চেষ্টা করিলেই পরিষ্কাররূপে প্রাণে অনুভূত হইতে থাকে। জয় মা আনন্দময়ী যোগমায়ে! তোমার যে অপরিসীম দয়া তৈলধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত আমার উপর বর্ষণ হইতেছে, তাহার বিন্দুমাত্র অনুভবের অবস্থা কৃপা করিয়া আমাকে প্রদান কর। তোমার কৃপায় গুরুদেবের মনোহর লীলা দর্শনে দিনরাত্রি মুগ্ধ হইয়া থাকি।

নামে ও ধ্যানে পরমানন্দ সম্ভোগ।

ভগবান গুরুদেবের কৃপায় আমার ভজনবিঘ্নকর বাহিরের উপদ্রবগুলির অচিরেই অবসান হইল।

১লা—৭ই জ্যৈষ্ঠ,
১৩০০ সাল।

একান্তভাবে নিশ্চিন্তমনে সাধন করিবার এমন সুযোগ জীবনে আর নাও ঘটিতে পারে—ইহা মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। হায়! এই শুভ সময় অধিক দিন বুঝি আমার থাকিবে না, নিয়ত ইহা মনে হইতে লাগিল। আমি অবিরাম ভগবদ্‌ধ্যানে অহর্নিশি অতিবাহিত করিব, সঙ্কল্প করিয়া সাধন-ভজনে লাগিয়া গেলাম। শেষরাত্রে যথাসময়ে আসন হইতে উঠিয়া নীলধারার দিকে চলিয়া যাই, শৌচান্তে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করি। তৎপরে দেহকল্প বিধি অনুসারে ২।৩টী ত্রিদল বিল্বপত্র একটুকু চিনি ও ঘৃতের সহিত মিলাইয়া সেবন করি এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করি। পরে ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া আসনে বসি। নিত্য হোম সমাধা করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করি। ১২৯৬ বার জপ করিয়া সঘৃত বিল্বপত্রে তাহার দশমাংশ প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি; পরে ন্যাস আরম্ভ করি। ন্যাসে দেড় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এইভাবে কাটাই। অতঃপর আসন হইতে উঠিয়া গৃহ মার্জ্জন জল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্নান করি। বেলা ১২টার সময়ে আবার আসনে বসি। অপরাহ্ণ ৫॥০টা পর্য্যন্ত নামে ও ধ্যানে অতিবাহিত হয়। এ সময়ে দয়াল ঠাকুর আমাকে কি ভাবে রাখেন প্রকাশ করিবার উপায় নাই। হরিদ্বারের পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষলতা সমস্তই যেন ভগবৎ ভাবে মগ্ন। মহামায়ার অসীম শক্তি প্রভাবে সকলেই যেন অভিভূত। যে দিকে তাকাই ঠাকুরের মনোমুগ্ধকর রূপের স্মৃতি প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশিত হইয়া আমাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া রাখে। দিবসান্তে কান্না পায়, হায়! আজিকার মত এই আনন্দ শেষ হইল!

তীব্র তপস্যায় ভজন লোপ।

শুনিয়াছি—শুভাশুভ সুখদুঃখাদি সমস্ত অবস্থাই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। ঠাকুরের কৃপা অনুভূতির দুর্লভ অবস্থাও কতদিন আমার অদৃষ্টে আছে জানি না। কোন্ দিন কোন্ সময়ে কি

সূত্র ধরিয়া ইহা চলিয়া যাইবে, কিছুই নিশ্চয় নাই। সুতরাং যতক্ষণ ঠাকুর দয়া করিয়া এই অবস্থায় রাখেন মনের সাধে প্রাণপণে সাধন-ভজন করিয়া যাই। পাছে শুভক্ষণ চলিয়া যায়, এই উৎকণ্ঠায় দিনরাত একান্তমনে ভজন-সাধন করিতে লাগিলাম। যোগভূমির অসাধারণ প্রভাবে তীব্র তপস্থার আকাঙ্ক্ষা আমার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি রীতিমত কঠোরতা আরম্ভ করিলাম। উদয়াস্তে গণ্ডূষমাত্র জলও গ্রহণ না করিয়া একাহার ধরিলাম। এতদিন খোসাসহিত কড়ায়ের ডাল সিদ্ধ করিয়া, কখনও বা পাহাড়ের চেনা অচেনা বৃক্ষলতার নূতন নধর ডগা পাতা নুণজলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক আটার সহিত খাইয়াছি। তাহাতে শরীর বেশ সবল সুস্থ হইয়াছিল, মনের উৎসাহ, উদ্যম, তেজস্বিতা এবং চিত্তের প্রফুল্লতা সর্ব্বদা সম্ভোগ করিয়াছি। এখন আমি এক ছটাকেরও কম আটা ছানিয়া হাতের তেলোতে চাপড়াইয়া ধুনির ভিতরে ফেলিয়া দেই, ভস্মের ভিতরে উহা গুঁজিয়া দিয়া উপরে আগুন চাপা দিয়া রাখি। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তুলিয়া দেখি, সুন্দর কচুরির মত ফুলিয়া গিয়াছে। নুণ মরিচের সহিত উহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাই। খুব ক্ষুধা বশতঃই হউক অথবা ঠাকুরের কৃপায়ই হউক, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিয়া থাকি। এই কঠোরতায়ও আমার আশা মিটিতেছে না।

কয়দিন যাবৎ আমার শরীর অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। যথাসময়ে আসন হইতে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া ও স্নানাহ্নিক সমাপন করিতে পারি না। এক মিনিট দূরে স্থিত গঙ্গা হইতে এক কলসী জল আনিয়া হাঁফাইয়া পড়ি। পথে ২।৩ বার বিশ্রাম করিতে হয়। আসনে অধিকক্ষণ বসিতে পারি না। সময় সময় শুইয়া কাটাই, ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যায়। এ'দিকে অবসন্নতা এত অধিক যে হাত পা নাড়িতে কষ্ট হয়। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। এই অবস্থায়ও আমার তপস্থার প্রবৃত্তি, কঠোরতার আকাঙ্ক্ষা কমিতেছে না। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" সকল ধর্ম্মকর্ম্মের পূর্ব্বে শরীর রক্ষা। শরীর অসুস্থ থাকিলে 'আহা উহু' করিয়াই তো দিনরাত কাটাইতে হয়। দৈহিক যন্ত্রণা কিছুতেই তো উপেক্ষা করিতে পারি না। ভজন-সাধন করিব কি প্রকারে? ভাবিয়াছিলাম সকল প্রকার রস ত্যাগ করিয়া দৈহিক বিকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি অতিরিক্ত হটকারিতায় বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। সাধুরা আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিতেছেন—যাহাতে শরীর অসুস্থ হয়, দেহ নষ্ট হয়, জানিয়া শুনিয়া আপনি তাহা করিতেছেন; ইহাতে আপনার আত্মহত্যা করা হইতেছে। এখন আমার আক্ষেপ হইতেছে, শরীরে যদি কোন ক্লেশ না থাকিত, দিনরাত ঠাকুরের নামে মগ্ন হইয়া থাকিতাম। সঙ্কটে পড়িয়া পরিষ্কার বুঝিলাম, যাঁহারা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ধর্ম্মলাভার্থে তাঁহারা মনমুখি হইয়া চলিলে যে দশা ঘটে আমার তাহাই হইয়াছে। ঠাকুর! দয়া কর। তোমার আদেশ না পাইয়া, তোমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও যেন অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। আমি ডাল তরকারীর দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া আহার করিব। দুধও কতকটা আত্মানন্দ হইতে পাইব। শরীরটীকে এখন সবল

সুস্থ নীরোগ রাখাই আমার সার ধর্ম্ম মনে হইতেছে। আগামী কল্য হইতে আমি অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের আদেশ মত চলিব সঙ্কল্প করিলাম।

স্বাভাবিক আহারে ঠাকুরের কৃপা।

৮ই-১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

গতকল্য অপরাহ্ন ৫টার পরে পেট ভরিয়া ডাল-রুটি আহার করিয়াছিলাম। আজ পায়খানা পরিষ্কার হইয়াছে। কয়দিন মলের সহিত রক্ত পড়িয়াছিল, আজ আর তাহা হয় নাই। হাতে পায়ে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে বেদনা ছিল, তাহাও কমিয়াছে। শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছি। দিনটি রুটীন্ মত কাটাইতে কষ্টবোধ হইল না। গত কল্য আহারের সময় ঠাকুরকে ডাল-রুটি নিবেদন করিয়া চোখের জল রাখিতে পারিলাম না, কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরকে বলিলাম—গুরুদেব, আমি নিতান্ত অপাত্র। তপস্যা আমার কার্য্য নহে। শরীরের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আজ আমি কঠোরতায় জলাঞ্জলি দিতেছি। দয়া করিয়া একবার তুমি এই ডাল-রুটিতে দৃষ্টিপাত কর। তোমার প্রসাদ পাইতেছি বুঝিয়া কৃতার্থ হই। ঠাকুরকে কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া চোখ মেলিয়া দেখি, আশ্চর্য্য ব্যাপার! ডাল ও রুটির উপরে ৭।৮টি সরিষাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ খণ্ডাকারে পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ঝল্‌মল্ করিতেছে। এই জ্যোতিঃ নীলাভ গাঢ় লাল বোধ হইতে লাগিল। যতক্ষণ আহার করিলাম, উজ্জ্বল মনোরম জ্যোতির্বিন্দু সকল আমার চক্ষে লাগিয়া রহিল। ৭।৮ মিনিটকাল এই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে আনন্দের সহিত আহার সমাপন করিলাম। আজও সমস্ত দিন চিত্তটী বেশ প্রফুল্ল রহিয়াছে।

অদ্য মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার সময়ে কুম্ভকযোগে যখন ধ্যান করিতেছিলাম, অকস্মাৎ ললাটে একটী জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। অল্পকালের মধ্যে ঐ জ্যোতিঃ চমৎকার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই জ্যোতির বর্ণ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। লাল নীল সবুজাদি কিছুই নয়; অথচ ইহাদের প্রত্যেকটিরই যেন উজ্জ্বল আভা পরস্পরে মিলিত হইয়া একটি সুন্দর স্বতন্ত্র জ্যোতির সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোতির্ম্মণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ হইতে শুভ্রনীল সংযুক্ত ছটা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া নভোমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জ্যোতির্ব্বিন্দুর মধ্যস্থলে নখ-পরিমিত একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ, অতি চঞ্চল ভাবে ক্ষণে প্রকাশিত, ক্ষণে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এই চঞ্চল জ্যোতিঃটী কি, ইহার আকৃতি কি প্রকার, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। রামধনুর ৭টী বর্ণের বহির্ভূত বলিয়া ইহার আর সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। ধ্যান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উহা লীন হইয়া গেল। এই জ্যোতিঃ এতই সুন্দর, এতই মনোমুগ্ধকর যে শরীর মন যতই অসুস্থ ও উদ্বেগপূর্ণ থাকুক না কেন, দর্শনমাত্রে চিত্ত প্রফুল্ল ও বাহ্যস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। দর্শনের স্পৃহা ও উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলাম—গুরুদেব! তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে তোমা অপেক্ষা সুন্দর মনোহারী যদি কিছু থাকে; তাহা যেন চিরকালের জন্য আমার নিকট অপ্রকাশ থাকে, এই আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার দৈনিক কর্ম্ম।

কয়েকদিন বিধিমত আহার করিয়া শরীর আমার বেশ সবল ও সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। আমি সাবেক রুটীন্ মত চলিতে লাগিলাম। প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তর আসনে বসি। গায়ত্রী জপ করিয়া নারায়ণকে গঙ্গাজল তুলসীপত্র প্রদান করি। শালগ্রামকে ১২টী তুলসী পত্র দিতে আমার প্রায় ২ ঘণ্টা কাটিয়া যায়। তৎপরে চণ্ডী, গীতা, চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ করি। ১১টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া ঘর ঝাড়ু দেই। গোময় দ্বারা সমস্ত ঘর পরিষ্কার করিয়া লেপিয়া ফেলি। পরে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ধুনির পাশে আনিয়া রাখিয়া দেই। তৎপরে ডাল বাছিয়া অর্দ্ধ ঘটী জলে ভিজাইয়া রাখি। আটাও দেড় ছটাক আন্দাজ ছানিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দেই। অনন্তর পূজার বাসন ও একটী কলসী লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া যাই। বাসন মাজিয়া স্নানান্তে এক কলসী জল লইয়া চলিয়া আসি। ১২টার সময়ে আসনে বসিয়া নারায়ণকে শ্রীফল নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাই। পরে ৫টা পর্য্যন্ত ঠাকুর আমাকে তাঁর নামে ধ্যানে কিভাবে অভিভূত করিয়া রাখেন, বলিতে পারি না। ৫টার পরে আত্মানন্দের কুটীরের ধারে—বটবৃক্ষমূলে বসিয়া থাকি। চণ্ডী দর্শনার্থী বহু সাধু সন্ন্যাসীর সহিত তৎকালে সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনায় আনন্দ হয়। ৬টার সময় ঐ আটা হাতে চাপড়াইয়া টিক্কর প্রস্তুত করি। জলন্ত কুন্দার নীচে, ধুনির ভিতরে উহা রাখিয়া, কুন্দার গায়ে ডালের ঘটিটী বসাইয়া দেই। একটু নুণ ও লঙ্কা উহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিতে গঙ্গায় চলিয়া যাই। স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া এক ঘণ্টা পরে আসনে আসি। সুপক্ক টিক্কর ও সুসিদ্ধ ডাল ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া পরম তৃপ্তিতে প্রসাদ পাই। শয়ন করিতে রাত্রি ১০টা হয়।

অহৈতুকী জ্বালা ঃ নিত্যক্রিয়ায় নিবৃত্তি।

১৫ই-১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

শেষ রাত্রে হোমান্তে নীলধারায় শৌচক্রিয়া সমাপন করিয়া আসনে আসিলাম, আজ শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইতেছে। ভাবিলাম খুব নিবিষ্টমনে সাধন-ভজন করিয়া দিনটী পরম আনন্দে অতিবাহিত করিব। কিন্তু আসনে বসিয়া ন্যাস আরম্ভ করিতেই দেখি, ভিতরটী একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে। ধ্যেয় বস্তু যে কোথায়, বহু চেষ্টায়ও খোঁজ পাইলাম না। আমি বেগতিক দেখিয়া শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিলাম কিন্তু তাহাতেও চিত্ত বসিল না। তখন সংক্ষেপে পূজা শেষ করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলাম। পাঠ করিতেও বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তখন সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—আজ এমন হইল কেন? অনেক অনুসন্ধানেও কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। জ্বালা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইল যে আসনে বসিতে পারিলাম না, একবার ঘর একবার বাহির করিতে লাগিলাম। মাথা আগুন হইয়া উঠিল, ঠাকুরের উপরে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। ভাবিলাম—বিনা কারণে ঠাকুর আমাকে জ্বালাইতেছেন। এই জ্বালা আমি সহ করিতে পারিব না। এই জ্বালা নিবৃত্তির জন্য যে কোন কার্য্য আমি করিব।

ভিতরে বাহিরে সমস্তই আমার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আমি অসহ্য উদ্বেগে অস্থির হইয়া আসনে শুইয়া পড়িলাম। ২।৩ ঘণ্টা কাল ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম। মনে হইতে লাগিল, সংসারে সদসৎ এমন কোন বস্তু নাই যাহা লইয়া আমি ক্ষণকাল আরাম পাইতে পারি। জল্পনা-কল্পনা অনেক করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সমস্তই নিরস বোধ হইতে লাগিল। পরে স্থির করিলাম, ভালই লাগুক আর মন্দই লাগুক রুটীন্ মত কাজগুলি সুধু করিয়া যাই। আনন্দ নিরানন্দের মালিক একজন। তিনি আনন্দ না দিলে আর কোথা হইতে পাইব? আমি সময় ধরিয়া যথামত নিত্যকর্ম্ম করিতে লাগিলাম। এই নিত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন আমার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট দিন বেশ আরামে কাটিয়া গেল। এত জ্বালা-যন্ত্রণা শুষ্কতার ভিতরেও দেখিলাম, আমার চেষ্টার অপেক্ষামাত্র না করিয়া নামটী আপনা-আপনি চলিতেছে—ইহাই আশ্চর্য্য!

দণ্ডী স্বামীর নিকট ত্রিসন্ধ্যার উপদেশ।

আমাদের আশ্রমের ধার দিয়া চণ্ডীপাহাড়ে যাইবার পথ। বহু যাত্রী, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী এই আশ্রমে বিশ্রাম করিতে আসেন। দু'দিন হয় একটী বৃদ্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এই স্থানে আসিয়া রহিয়াছেন। এদিকে ইনি দণ্ডীস্বামী বলিয়া বিখ্যাত। সন্ধ্যা ও শালগ্রাম পূজা-পদ্ধতি, ঠাকুর আমাকে কাহারও নিকটে জানিয়া নিতে বলিয়াছিলেন। এত কাল আমি উপযুক্ত লোকের অপেক্ষায় ছিলাম। দণ্ডী স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। ত্রিসন্ধ্যা ও শালগ্রাম পূজার বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমাকে উহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অদ্য বেলা প্রায় ১২টার সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত শিখিয়া নিলাম। দণ্ডী স্বামী বলিলেন—ত্রিকালীন সন্ধ্যা করিতে হইলে ব্রহ্ম-যজ্ঞাদি করা নৈষ্ঠিকদের একান্ত কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠ করিয়া সপ্তর্ষি ন্যাস করিতে হয়, পরে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিয়া সন্ধ্যা সমাপনান্তে আবার শান্তিযজ্ঞ পাঠ করিতে হয়, তবেই সন্ধ্যাক্রিয়া যথাবিধি সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার কোন অঙ্গ সংক্ষেপ করিলে সম্যক্ উপকার পাওয়া যায় না। নিত্য ত্রিসন্ধ্যা যথারীতি করিলে সমস্ত উপাসনা তত্ত্ব উহাতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। ব্রহ্মণ্যতেজ লাভ করিতে হইলে সন্ধ্যাই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সন্ধ্যার সমস্ত ক্রম ও প্রকরণ এবং শালগ্রাম পূজার পদ্ধতি দণ্ডী স্বামীর নিকট শিখিয়া লইলাম। আজ মধ্যাহ্নে অন্য কোন কাজই হয় নাই। অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে হোম করিয়া স্তবাদি পাঠ করিলাম। ৫ শ্লোক চণ্ডী ও ৫ শ্লোক গীতা পাঠ করিয়া শ্রীমৎভাগবৎ নমস্কার করিয়া রাখিয়া দিলাম। কাষ্ঠ সংগ্রহ ও আহারের যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার সময়ে স্নান করিলাম। সায়ংসন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে রান্না করিয়া ডাল ও অন্নভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিলাম। আহারে বড়ই তৃপ্তি হইল।

বৃষ্টিতে ভিজা—ঠাকুরের উপর অভিমান।

আজ ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি। আমার কুটীরের চালার খড় এখনও বসে নাই। তাই স্থানে স্থানে জল পড়িতে লাগিল। স্রোতের মত জল পড়িয়া আমার আসন-ঘরের মেঝে ভাসাইয়া দিল।

মাথা রাখিবারও একটু স্থান রহিল না। তখন শালগ্রামের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি নিজ আসনে পরমসুখে বসিয়া আছেন আর আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া যেন হাসিতেছেন। বিন্দুমাত্র জলও শালগ্রামের আসনের ধারে পাশে নাই। দেখিয়া বড়ই অভিমান জন্মিল। ভাবিলাম—যাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটে, যাঁহার ইচ্ছায় এই ভয়ঙ্কর ঝড় তুফানে সমস্ত উলট্-পালট্ করিয়া দিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিলে কি আমার মাথাটী এই বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা করিতে পারেন না? অসীম শক্তিশালী ভগবান পূর্ণরূপে এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন কিন্তু আমার দুঃখে তিনি উদাসীন। আমি শালগ্রামকে বলিলাম—ঠাকুর! নিজে আরামে বসিয়া থাকিয়া আমাকে ভিজাইয়া মজা দেখিতেছ। ভাল, অবিলম্বে তুমি এই ঝড়বৃষ্টি বন্ধ কর, না হলে আর আর কিছুক্ষণ দেখিয়া আমি তোমাকে আকাশের নীচে বৃষ্টিতে রাখিয়া তামাসা দেখিব। আসনে স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। চিত্তটী নিবিষ্ট হইয়া আসিল। গায়ে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হইল। চাহিয়া দেখি ঘরেও আর বৃষ্টি পড়িতেছে না। অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি পড়ায় নূতন চালার খড়গুলি বোধ হয় বসিয়া গিয়াছে, তাই জলপড়া বন্ধ হইয়াছে। বাহিরের ঘটনা পরম্পরা দেখিয়া যুক্তি-বিচারে যাহাই বুঝি না কেন, চৈতন্যযুক্ত মহাশক্তিই প্রতি অণু পরমাণুকে চালিত, রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। আমার ঠাকুর আমার দুঃখ দেখিয়া আমারই আরামের জন্য এই বৃষ্টি বন্ধ করিলেন—আমি ইহাই মনে করি। এই ঝড় পূর্ব্ববঙ্গের ‘কাল বৈশাখীর’ মত।

একি প্রলোভন, না ঠাকুরের দয়া?

১৮ই-১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

আজ সকালে ন্যাস ও পূজা শেষ করিয়া আসনে বসিয়া আছি, কনখলের একটী ধনী পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া কনখল ও মায়াপুরীর মধ্যে একটী বড় বাগানে শিব স্থাপনার্থে সুন্দর একটী মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাকে করজোড়ে খুব কাতরভাবে কহিলেন—প্রভু দয়া করিয়া আপনি আমার শিবালয়ে আসিয়া বাস করুন। আপনার সকল প্রয়োজনীয় বস্তু জুটাইয়া আমি দিনরাত আপনার সেবায় পড়িয়া থাকিব। বাগানবাড়ী, দেবালয় এবং ঠাকুর সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত আপনাকে অর্পণ করিব। আপনার আহারাদি কোন প্রয়োজনেই ভিক্ষা করিতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া দিনরাত আপনি ভজনানন্দে থাকিবেন। আমি নিঃসন্তান, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে আমার যাহা কিছু আছে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন না।

পাণ্ডাজীকে আমি বলিলাম—আমার বাড়ীঘর আছে। অভাবে পড়িয়া আমি সাধু হই নাই। ভিক্ষা আমার ব্রতের নিয়ম, তাই আমি ভিক্ষা করি। ঘরে আমার অন্ন পরে খায়। কোন মন্দিরে গিয়া মহান্তগিরি করিতে আমার বাসনা নাই। হরিদ্বারে ও কনখলে আমার

থাকার বিস্তর স্থান জোটে। আমি নির্জ্জনতা ভালবাসি বলিয়াই এখানে আসিয়াছি। আপনি অন্য লোক দেখুন। আমি আসন তুলিয়া অন্যত্র যাইব না। এখানে থাকা আমার গুরুর আদেশ। গাণ্ডা আমাকে অনেক ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়া এবং সুবিধার দিক দেখাইয়াও যখন মতি জন্মাইতে পারিল না, তখন নিরাশমনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শুনিলাম অনেক লোক এই বাগান-বাড়ীতে মন্দিরের মালিক হইতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা কি মহামায়ার পরীক্ষা না ঠাকুরের দয়া! গুরুদেব, দয়া কর! তোমার হাতের গড়া জিনিস কারো সামান্য অঙ্গুলির টিপে যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। আমার সাধ্য কি কোন প্রলোভনে নিজকে রক্ষা করি।

মদ্যপায়ীর হাতে পড়া ঃ জ্যোতির্ম্ময় শালগ্রাম।

আজ আত্মানন্দের নিকটে কিছুক্ষণ ছিলাম। আত্মানন্দ আমাকে একটী বোতল দেখাইয়া বলিল—গুণি দাদা, তোমার জন্য এই উৎকৃষ্ট রস আনিয়াছি। তুমি একটু খাও। আমি বোতলটী হাতে করিয়া মদের গন্ধ পাইয়া অবাক্। ভাবিলাম—আত্মানন্দ মদ খায়, আমি যদি বলি এসব আমি খাই না, আত্মানন্দ লজ্জা পাইবে; অভিমানে আঘাত লাগিলে অনায়াসে আমাকে তাড়াইয়া দিবে। আমি আত্মানন্দকে বলিলাম—আ রাম! তুমি এই দুর্গন্ধ রস খাও। ভাল মদ আনিতে পার না? এই জিনিস খাইলে আমার প্রাণই যাবে। আত্মানন্দ আর একটী বোতল আমাকে দিয়া বলিল ইহা অতি উৎকৃষ্ট। ইহাই তোমার জন্য আনিয়াছি। ইহা তোমায় খাইতেই হইবে। আমি উহা হাতে লইয়া বলিলাম—এসব দেশী মদ কখনও আমি খাই নাই, সহ্য তো হবে না। তুমি কোন সঙ্কোচ না করিয়া, এসব যেমন খাইয়া থাক অনায়াসে খাও। মদের বোতল ফিরাইয়া দেওয়াতে আত্মানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আমাকে বলিলেন—দাদা, মদ তো খাবে না। আচ্ছা, এই কচুরি দু'খানা নিয়ে খাও। আমি উহা লইয়া আসনে আসিলাম এবং খাইব সম্মত হইয়া নিয়া আসিয়াছি বলিয়া সেবা করিলাম। কচুরি খাওয়ার ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। মনটি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল। শরীরও অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। আমি আজ আর আসনের কোন কাজই করিব না, স্থির করিলাম। সন্ধ্যাটী ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক করিতেই হইবে বলিয়া আবার আসনে চাপিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা করিতে করিতে শালগ্রামের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম—শালগ্রামটি জ্যোতির্ম্ময়। আমি উহার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সন্ধ্যা করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য ঠাকুরের কৃপা! দেখিলাম কাল প্রস্তরের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শ্বেত নীল মিশ্রিত উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইয়া পড়িতেছে। উহা দেখিতে দেখিতে আমার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট দিনটি বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। কচুরি খাইয়া মাথা ধরিয়াছিল, হোম করার পর কমিয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময়ে রান্না করিয়া ঠাকুরকে ডাল-রুটী ভোগ লাগাইলাম। প্রসাদ পাইয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল।

শালগ্রাম চুরি।

এই স্থানে আসিয়া বানরের বড়ই উপদ্রব ভোগ করিতেছি। প্রায় প্রতিদিনই বানর বেড়ার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া কিছু-না-কিছু অনিষ্ট করিয়া যায়। কল্য কতকটা ঘৃত নষ্ট করিয়া গিয়াছে। আজও হোমের ঘৃত সব নষ্ট করিল। ঘৃতের অভাব হওয়াতে কনখলের একটী বর্দ্ধিষ্ট পাণ্ডার নিকট একটি সাধুকে পাঠাইয়াছিলাম। সাধু কিছুক্ষণ পরে আসিয়া আমাকে বলিল, আমি ঐ পাণ্ডার নিকটে আর যাইব না। তাহার সহিত আমার ঝগড়া হইয়াছে। আপনার জন্য সে ঘৃত রাখিয়াছে কিন্তু আমার হাতে সে দিবে না—এ জন্যই ঝগড়া! আপনাকে যাইয়া নিয়া আসিতে বলিয়াছে। আপনি একবার যান্ না। তার বাড়ী ত দূরে নয়। আপনি না আসা পর্য্যন্ত আশ্রমে আমি থাকিব। সাধুর কথা শুনিয়া আমি ঘরে ঝাঁপ বাঁধিয়া কনখলে চলিলাম। আত্মানন্দও দণ্ডী স্বামীর সঙ্গে ষ্টেশনে চলিল। দণ্ডী স্বামী আজ নর্ম্মদায় যাইবেন। কনখলে যাইয়া পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার আসার উদ্দেশ্য জানিয়া বলিলেন—"ঐ সাধু আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আমি ঘৃতের কোন কথা তাহাকে বলি নাই।" আমি শুনিয়া অবাক্। নিজ আশ্রমে রওয়ানা হইলাম। আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই আমার যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। কুটীরের সম্মুখে যাইয়া দেখি দরজাটি দড়ি দিয়া বাঁধা রহিয়াছে কিন্তু ঠেঙ্গা লাগান নাই। দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি ঘর যেমন তেমন। কোন জিনিষই স্থানচ্যুত হয় নাই কিন্তু তবু আমার শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল। অত্যন্ত জল পিপাসা পাইয়াছিল। ঠাকুরকে একটু মিষ্টি নিবেদন করিয়া দিতে ইচ্ছা হইল। আমি আসনে স্থির হইয়া বসিয়া কিছু মিষ্টি ও জল শালগ্রামের আসনের সম্মুখে ধরিলাম। নিবেদন করিতে গিয়া দেখি শালগ্রাম নাই। আমার মাথাটি যেন ঘুরিয়া গেল। ইন্দুরে, বান্দরে নিয়া যাইতে পারে অনুমানে কুটীরে ও বাহিরে তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিলাম। কোথাও চিহ্নমাত্র পাইলাম না। পরে আরও খুঁজিয়া দেখিলাম—শালগ্রামের আসনটীও নাই। কাল মার্ব্বেল পাথরের চারি ইঞ্চি পরিবেষ্টিত চতুষ্কোণ সুন্দর সিংহাসনখানাও অপহৃত হইয়াছে। কয়েকখানা ভাল পূজার বাসনও গিয়াছে। গৈরিকধারী নব-পরিচিত সাধুর আর খোঁজ নাই। শালগ্রাম নিবে বলিয়াই সে আমাকে ফাঁকি দিয়া ঘৃত আনিতে পাঠাইয়াছিল। হায়, হায়! এখন আমি কি করি। আমারই গুরুতর অপরাধে শালগ্রাম ২টী চুরি গিয়াছে। চোরের উপরে আমার একটুকুও বিরক্তি জন্মিতেছে না। তার দোষ অপেক্ষা আমার অপরাধ অনেক বেশী।

দণ্ডী শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকটে শালগ্রাম পূজার পদ্ধতি জ্ঞাত হইয়া, প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল—বিধিমত শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করি, কিন্তু আমার তখন মনে হইয়াছিল, বিধিমত পূজা আরম্ভ করিলে এই শালগ্রাম আর আমি ছাড়িতে পারিব না। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—

সুলক্ষণাক্রান্ত সুশ্রী শালগ্রাম পূজা করিও। কিন্তু এই শালগ্রামের কলেবর আমার তৃপ্তিকর হয় নাই। মহাত্মারা হাতে ধরিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আনিয়াছিলাম। পছন্দমত সুন্দর একটী শালগ্রামের আকাঙ্খা যখন আমার ভিতরে রহিয়াছে এবং ঠাকুরও যখন আমাকে বলিয়াছেন—ঐ প্রকার আমার জুটিবে, তখন আর এই শালগ্রাম বিধিমত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন কি ? শালগ্রামের উপরে আমার এই প্রকার অনাদর হওয়াতেই বোধ হয়, শালগ্রাম আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শালগ্রাম হারাইয়া সমস্ত দিন ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম। এখন শালগ্রামের অভাবে কি পূজা করিব। এই উদ্বেগে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ঠাকুর কি করিবেন তিনিই জানেন। শালগ্রাম যাওয়ায় আমার ভিতর যেন শূন্য হইয়া গেল। যেরূপেই হউক শালগ্রাম একটী সংগ্রহ করিতেই হইবে। আগামী কল্য শালগ্রাম অনুসন্ধান করিতে বাহির হইব স্থির করিলাম। হরিদ্বার ও কনখলে অনেক ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডারা আমাকে "গুণি দাদা" বলিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করেন, তাঁহাদের নিকটে যাইব।

হরিদ্বারে শালগ্রাম অনুসন্ধান।

২০শে-২৩শে জ্যৈষ্ঠ।

অদ্য সকালে নিত্যক্রিয়া কোন প্রকারে সমাপন করিয়া কনখলে একটী সম্ভ্রান্ত পাণ্ডার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং আমার অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া একটী লক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। পাণ্ডা বড় ভাল লোক। আমাকে লইয়া মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক শালগ্রাম দেখাইলেন; কিন্তু একটীও আমার পছন্দমত হইল না। নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে বেলা ১২টার সময়ে শ্রীযুক্ত বিহারীলালজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। ইনি একজন বিখ্যাত বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী। আমাকে দেখিয়া তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন। যেভাবে আদর-যত্ন ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে লাগিলেন তাহাতে বড়ই লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তিনি আমার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া বলিলেন—শালগ্রাম এখানে দুর্লভ নয়, যতটী ইচ্ছা করেন দিতে পারি কিন্তু আপনি যেরূপ লক্ষ্মণাক্রান্ত শালগ্রাম চাহেন তাহা পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মচারী আমাকে কিছু আহার করিতে কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু আমি দিবসান্তে রাত্রে আহার করি জানিয়া কচুরি ও বর্ফি নিয়া আসিতে বলিলেন। আমি কিছু খাবার বাঁধিয়া নিয়া শালগ্রাম তল্লাস করিতে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বাহির হইলাম। অনেক অনুসন্ধানেও একটী শালগ্রাম পাইলাম না। একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন, কল্য সকালে আসিবেন আমি আপনাকে লক্ষণযুক্ত শিলা দিব। তাঁর কথায় নির্ভর করিয়া বেলা শেষে আশ্রমে আসিলাম। শালগ্রামের জন্য কি যে অশান্তি ভোগ করিতেছি, একমাত্র ঠাকুরই জানেন। মনে হইতেছে গঙ্গার তীর হইতে একটী প্রস্তর তুলিয়া লইয়া পূজা করি।

শালগ্রাম সংগ্রহ ঃ চণ্ডীপাহাড়ে চণ্ডী দর্শন ঃ রাস্তা ভুল বিপদের আতঙ্ক।

সকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া বেলা ৯টার সময় কনখলে গেলাম। ব্রাহ্মণটীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত একটী বড় সিধা দিলেন। চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত, লঙ্কা কিছু দিনের মত চলিবে। ব্রাহ্মণ আমাকে একটী শালগ্রাম দিয়া বলিলেন—নিন, এই শালগ্রামটী আমার সাত পুরুষের বড় জাগ্রত ঠাকুর। এই শিলার নাম 'লক্ষ্মী নৃসিংহ'। কয়েক দিন পূজা করিলেই ইহার প্রভাব বুঝিবেন। আমি শালগ্রামটী হাতে লইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলাম—যত কাল আমি পছন্দমত সুগোল সুশ্রী শালগ্রাম না পাই, এইটীই রাখিব পূজা করিব। আমার আকাঙ্ক্ষামত শালগ্রাম জুটিলে এটী আবার আপনাকে দিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন—

আশাং দত্বা ন দদ্যাৎ যঃ দাতারং প্রতিষেধক।
স্বয়ং দত্বা হরেদ্যস্ত স পাপিষ্ঠ ততোধিকঃ॥

আমি আপনাকে যাহা দিলাম তা তো পুনরায় নিতে পারি না। আপনি অন্য কারোকে দিয়া দিবেন। আমি শালগ্রামটি লইয়া আশ্রমে আসিলাম এবং যথামত পূজা করিলাম। ভালই লাগিল। শিলাটি আয়তনে একটু বড়। ঠিক গোলাকৃতি নয় মসৃণও নয়।

শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামী এই আশ্রমে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বহুসংখ্যক মীরাটী ভদ্রলোক ও পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুরুষ আছেন। সকলেই স্বামিজীর শিষ্য। স্বামিজীর বাড়ী হুগলী জেলায় ছিল। স্ত্রী পরিবার পরিত্যাগ করিয়া ৭।৮ বৎসর হইল চলিয়া আসিয়াছেন। কাশীতে রামানন্দ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারীবেশে বহুস্থান পর্য্যটন করিতেছেন। খেচরী মুদ্রায় ইনি সিদ্ধ বলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত পদস্থ লোক ইহার শিষ্য হইয়াছেন। খুব কঠিন কঠিন দুরারোগ্য রোগের ঔষধাদি জানেন বলিয়া এই অঞ্চলে কেশবানন্দের বিশেষ প্রতিপত্তি। অর্থাদি যাহা কিছু অর্জ্জন করেন, সাধু সেবা ও গরীব দুঃখীদের ক্লেশ নিবারণার্থে অকাতরে ব্যয় করেন। কেশবানন্দের সহিত আলাপে বড়ই আরাম বোধ হইল। ঠাকুরের পরিচয়ে কেশবানন্দ আমাকে খুব আদর করিলেন। কেশবানন্দ নিঃশব্দ প্রাণায়াম এবং খেচরী মুদ্রা করিয়া আমাকে দেখাইলেন। খেচরী মুদ্রা এত সহজে করিলেন যে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। এই আশ্রমে কেশবানন্দ আরও ২।৩ বার আসিয়াছেন। এই স্থানের সৌন্দর্য্য ও ভজনের উপযোগিতা দেখিয়া তিনি এই আশ্রমটী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আত্মানন্দের নামে ২টী ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন। আত্মানন্দ ইহার ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব দেখিয়া, ইহারই নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামিজী আত্মানন্দকে কয়েকখানা ঘর এবং কয়েকটী গরু বাছুর জুটাইয়া দিয়াছেন। স্বামীজীর সঙ্গে ২টী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী শিষ্য আছেন। একজনের নাম বরদানন্দ অপরের নাম জ্ঞানানন্দ। শুনিতেছি ব্রহ্মচারীরা এখানেই থাকিবেন।

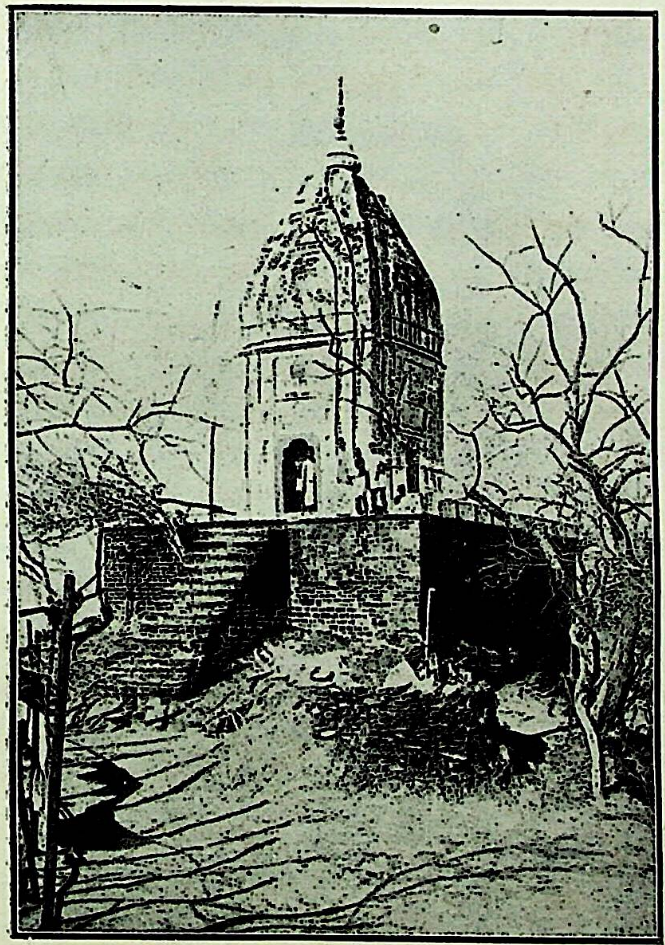

চণ্ডীদেবীর মন্দির পৃষ্ঠা ২৮

অদ্য যথাসময়ে হোম করিয়া অতি প্রত্যুষে স্নান তর্পণান্তে কুটীরে আসিলাম। কেশবানন্দ স্বামী আমাকে তাঁর সঙ্গে চণ্ডীপাহাড়ে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি বেলা ৬টার সময়ে স্বামিজীর সঙ্গে চণ্ডীপাহাড়ে যাত্রা করিলাম। স্বামিজীর ২০।২৫টী শিষ্যও আমাদের সঙ্গে চলিল। আমরা 'জয় মা চণ্ডী' বলিতে বলিতে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। বহু লোকের যাতায়াতে রাস্তাটী বেশ সুগম হইয়া আছে। ইতিপূর্ব্বে যখন আসিয়াছিলাম তখন পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। রামপ্রকাশ মহান্তের শিষ্যটীকেই মাত্র সময়ে সময়ে দেখিয়াছিলাম। এবার ভাবিলাম, এই হিমালয় পর্ব্বতে কত মুনি ঋষি রহিয়াছেন, ঠাকুরের দয়া হইলে অনায়াসে তাঁহাদের দর্শনলাভ হইতে পারে; ঠাকুরকেও এই পাহাড়ে অনায়াসে দর্শন পাইতে পারি। আমি দু'পাশে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য এবং ভীষণ জঙ্গল দেখিয়া বড়ই আমোদ পাইতে লাগিলাম। এই প্রকার পাহাড়ে সকল জন্তুই থাকিতে পারে। পাহাড়ের নিম্নস্তরে কোন কোন স্থানে মহাপুরুষদের তপস্যার গোফা আছে বলিয়া মনে হইল। অধিক নীচে বলিয়া পরিষ্কার লক্ষ্য হইল না। যে সঙ্কীর্ণ পথটীর উপর দিয়া চলিলাম তাহার পাশেই প্রায় আড়াই শত হাত নীচু স্থানে, অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখিলাম। দৃষ্টি করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া মা চণ্ডীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

২৩শে-২৪শে জ্যৈষ্ঠ।

শুনিলাম পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পিতা বা পিতামহ এই মন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি ছোট হইলেও ইহা প্রস্তুত করা যে কত শক্ত ব্যাপার, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন। তখনকার অতি দুর্গম পথে দু' ক্রোশ দূর হইতে জল ও মন্দির প্রস্তুতের উপকরণ কি প্রকারে আনিয়াছিল ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

বহুকষ্টে পাহাড়ে উঠিয়া শ্রীচণ্ডী দর্শন করিয়া প্রাণটী আনন্দে ভরিয়া গেল। সম্মুখে আর একটী উচ্চ শৃঙ্গে 'অন্নপূর্ণা' আছেন শুনিলাম। আমরা পরমোৎসাহে অন্নপূর্ণার মন্দিরে পঁহুছিলাম। মাকে পরিক্রমা করিয়া দর্শন ও স্পর্শ করিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। একটী বৃদ্ধাকে রাস্তায় দেখিয়া অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। বৃদ্ধার বয়স প্রায় ৮০ হইবে। সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। হামা দিয়া ১৪।১৫ হাত অগ্রসর হইতেছে, আবার হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িতেছে। এক হাত দেড় হাত কোন প্রকারে সরিয়া পড়িলে কোন্ অতল গর্ত্তে যাইয়া পড়িবে, খোজও পাওয়া যাইবে না। বৃদ্ধার সঙ্গে একটীমাত্র স্ত্রীলোক। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে সে বুড়িকে হাতে ধরিয়া পার করিতেছে। এই প্রকার হামা দিয়া কত কালে বৃদ্ধা মায়ের মন্দিরে পঁহুছিবে, জানি না। নামিবার সময়ে তো আরও বিপদ। বুড়ির অবস্থা দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—গুরুদেব! তুমি তো কখনও কারো ক্লেশ দেখিয়া সহ করিতে পার না। এই বুড়ির অবস্থা তো তুমি দেখিতেছ। ইহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তোমার শ্রীচরণ দর্শন লাভার্থে জীবিতাশা বিসর্জন দিয়া

মন্দিরের দিকে ধাবিত। ইহার যতই উৎকট প্রারব্ধ থাকুক না কেন, তুমি ইহাকে দয়া করিও। বুড়ির অবস্থা দেখিয়া আমার এতই কষ্ট হইতে লাগিল যে, আমি বুড়ির জন্য ঠাকুরকে কিছু না বলিয়া পারিলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বুড়ির চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে স্বামিজীর শিষ্যেরা বহুদূর চলিয়া গেলেন। আমি নিঃসঙ্গ হইয়া একটী ভয়ঙ্কর পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিলাম। কোন কোন স্থানে মূল রাস্তা হইতে ২।৩টী রাস্তাও গিয়াছে। সে সব স্থানে বড়ই মুস্কিল। অদৃষ্টক্রমে ঠিক পথে না চলিয়া কাঠুরিয়াদের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে জনপ্রাণীশূন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। এই রাস্তারও দুধারে সঙ্কীর্ণ পথ আছে। কোন্ পথে কোথায় যাইয়া পৌঁছিব, নিশ্চয় নাই। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। নিবিড় অরণ্য, স্থানে স্থানে বন্য জন্তুর চীৎকার, একটী লোক কোথাও নাই। নিরুপায় ভাবিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি উপায়ান্তর না পাইয়া যে পথে আসিয়াছি, ফিরিয়া সেই পথেই চণ্ডীর দিকে চলিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া চণ্ডীর যাত্রী পাইলাম। তাহাদের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলাম। সিদ্ধ অঘোরী কামরাজের আশ্রম দর্শন করিয়া নীলধারায় স্নান করিলাম। পরে অপরাহ্ন ৩টার সময়ে সকলে একসঙ্গে আশ্রমে আসিলাম।

কেশবানন্দ স্বামী।

কেশবানন্দ স্বামীর সঙ্গ দিন দিনই ভাল লাগিতেছে। গুরুর আদেশ মত ভারতবর্ষে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া, সাধু ধর্ম্মার্থীদের সেবা ও সুবিধা করাই নাকি ইহার ব্রত। তাই ইহার কোন সম্প্রদায় বুদ্ধ নাই। প্রকৃত ধর্ম্মার্থী দেখিলেই তার সেবায় নিযুক্ত হন। অনেক সমৃদ্ধিশালী লোক ইহার আশ্রয় নিয়াছেন। তাঁহারা সহস্র সহস্র অর্থ ইহাকে দান করেন। ইনি সেই অর্থ মুক্তহস্তে সাধুসেবায় ব্যয় করেন। ব্রহ্মচারীদের উপরে ইহার বিশেষ আকর্ষণ। ব্রহ্মচারীরা নিরাপদে ভজন-সাধন-তপস্যা করিতে পারে লোকালয়ের সন্নিকটে এইরূপ স্থান বড়ই দুর্ঘট। এই দামপাড় ব্রহ্মচারীদের বাসের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান মনে করেন। শুনিলাম এই স্থানটী ক্রয় করিয়া একটী আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য কেশবানন্দ দরখাস্ত করিয়াছেন, দরখাস্ত নাকি মঞ্জুর হইয়াছে। মূল্য নিশ্চয় হইলেই ক্রয় করিয়া আশ্রম প্রস্তুত আরম্ভ করিবেন।

কেশবানন্দ স্বামী আমার কার্য্যকলাপ সাধন-ভজন গোপনে অনুসন্ধান করিয়া আমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিলেই এই আশ্রমে স্থায়ীভাবে আসন করিতে অনুরোধ করেন। এই আশ্রমে বরদানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি কয়েকটি ব্রহ্মচারী থাকিবেন। স্বামিজী এই স্থানটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম করিয়া ইহার সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার ও সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আমার উপর রাখিতে চান। খরচপত্র যাহা আবশ্যক তিনিই চালাইবেন। আমি কেশবানন্দকে বলিলাম—আত্মানন্দ বহুকাল যাবৎ এস্থানে আছেন। তাঁরই উপরে সমস্ত ভার দেন না কেন? স্বামিজী বলিলেন—আপনি এতদিন উহার সঙ্গে থাকিয়া কি উহার প্রকৃতি এখনও বুঝেন নাই? আমি বলিলাম—আমি ৩।৪

দিনেই জানিয়া নিয়াছি। এখানে আমি আরও কিছুদিন থাকিতে পারিব কিনা সন্দেহ হয়। লোকটী বড়ই ভজন-বিরোধী। স্বামিজী বলিলেন—আপনার উপর কি কোন অত্যাচার করিয়াছে? আমি উত্তর করিলাম—আমার আর কি করিবে? তবে মদ খেয়ে, স্ত্রীলোক এনে সারারাত্রি মাতামাতি করা যাহাদের স্বভাব, তাহারা কি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বাসের যোগ্য? কেশবানন্দ শুনিয়া অবাক্! আমি স্বামিজীকে উহার ঘর অনুসন্ধান করিতে বললাম। স্বামিজী আত্মানন্দের ঘরে প্রবেশ করিয়া ২টী মদের বোতল বাহির করিলেন; আত্মানন্দকে যথেষ্ট গালাগালি করিলেন। আমার আদেশাধীন হইয়া আত্মানন্দ না চলিলে, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দিবেন বলিলেন। কেশবানন্দ আমার নামে ১টী বৃহৎ ভাণ্ডারা দিয়া হরিদ্বার ও কনখলের সাধুদের আমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক তাহাদের সেবা করিলেন। সাধুদের ভিতর আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। কেশবানন্দ আমাকে এক জোড়া ধুতি এক সের ঘৃত, তৈল, প্রদীপ, রান্না করিবার একটী পাত্র আনিয়া দিলেন। জ্ঞানানন্দ ও বরদানন্দকে আশ্রমে রাখিয়া অপর শিষ্যগণ সহিত তিনি মায়াটের দিকে যাত্রা করিলেন।

সাধন চেষ্টার নিষ্ফলতা ঃ বস্তু তাঁর হাতে—দাতা তিনি।

২৭শে-৩০শে জ্যৈষ্ঠ,
১৩০০ সাল।

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইতে চলিল। এখানে আসিয়া ভাবিয়াছিলাম, ঋষি মুনিদের তপস্যার পরম পবিত্র যোগ্যভূমি মায়াপুরী হরিদ্বারে আসিয়াছি। এখানে শরীর যদি সুস্থ থাকে, সাধন ভজনের নির্জ্জন মনোরম স্থান পাই, এবং সাধন-বিঘ্নকর কোন বিপত্তি (বাহির হইতে) উপস্থিত না হয়; তাহা হইলে মনের সাধে প্রাণের ক্ষোভ মিটাইয়া একবার ভজন-সাধন করিব। ঠাকুরের কৃপায় আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে। কুটীরটীও ভজনের অনুকূল। অতি সুন্দর স্থানে শিংশপামূলে প্রস্তুত হইয়াছে। বাহির হইতেও কোন প্রকার উপাধিই এখন আর নাই কিন্তু তথাপি ভজনে মন বসিল না। ভজনে কিসে মন বসে আবার কেন বসে না, তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া হয়রান হইলাম। হেতু কিছুই ধরিতে পারিলাম না। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম, সাধক-জীবনে অহৈতুকী জালা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। উহা এতই বিষম যে সাধক উহা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। উহাতে সমস্ত বাসনা কামনা দগ্ধ করিয়া অভিমানকে ভস্মীভূত করে। কিছুদিন যাবৎ দেখিতেছি, চিত্ত অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নামে আনন্দ নাই, নাম করিতে পারি না। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে জালা ও বিরক্তি আসিয়া পড়ে। অস্থির হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠি। উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া-তুলিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। কখনও নাম করিব স্থির করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আসনে বসি, পাঁচ মিনিট নাম করিতে-না-করিতে মনটী কোথায় চলিয়া যায়। নামটী একেবারে ভুলিয়া যাই। বহুক্ষণ পরে চৈতন্য হয়। তখন আবার নাম করিতে আরম্ভ করি। এরূপ কেন হয় কিছুই বুঝিতেছি না। কোন দিন

মন্দিরের দিকে ধাবিত। ইহার যতই উৎকট প্রারব্ধ থাকুক না কেন, তুমি ইহাকে দয়া করিও। বুড়ির অবস্থা দেখিয়া আমার এতই কষ্ট হইতে লাগিল যে, আমি বুড়ির জন্য ঠাকুরকে কিছু না বলিয়া পারিলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বুড়ির চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে স্বামিজীর শিষ্যেরা বহুদূর চলিয়া গেলেন। আমি নিঃসঙ্গ হইয়া একটী ভয়ঙ্কর পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিলাম। কোন কোন স্থানে মূল রাস্তা হইতে ২।৩টী রাস্তাও গিয়াছে। সে সব স্থানে বড়ই মুস্কিল। অদৃষ্টক্রমে ঠিক পথে না চলিয়া কাঠুরিয়াদের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে জনপ্রাণীশূন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। এই রাস্তারও দুধারে সঙ্কীর্ণ পথ আছে। কোন্ পথে কোথায় যাইয়া পৌঁছিব, নিশ্চয় নাই। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। নিবিড় অরণ্য, স্থানে স্থানে বন্য জন্তুর চীৎকার, একটী লোক কোথাও নাই। নিরুপায় ভাবিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি উপায়ান্তর না পাইয়া যে পথে আসিয়াছি, ফিরিয়া সেই পথেই চণ্ডীর দিকে চলিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া চণ্ডীর যাত্রী পাইলাম। তাহাদের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলাম। সিদ্ধ অঘোরী কামরাজের আশ্রম দর্শন করিয়া নীলধারায় স্নান করিলাম। পরে অপরাহ্ন ৩টার সময়ে সকলে একসঙ্গে আশ্রমে আসিলাম।

কেশবানন্দ স্বামী।

কেশবানন্দ স্বামীর সঙ্গ দিন দিনই ভাল লাগিতেছে। গুরুর আদেশ মত ভারতবর্ষে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া, সাধু ধর্ম্মার্থীদের সেবা ও সুবিধা করাই নাকি ইহার ব্রত। তাই ইঁহার কোন সম্প্রদায় বুদ্ধি নাই। প্রকৃত ধর্ম্মার্থী দেখিলেই তার সেবায় নিযুক্ত হন। অনেক সমৃদ্ধিশালী লোক ইঁহার আশ্রয় নিয়াছেন। তাঁহারা সহস্র সহস্র অর্থ ইঁহাকে দান করেন। ইঁনি সেই অর্থ মুক্তহস্তে সাধুসেবায় ব্যয় করেন। ব্রহ্মচারীদের উপরে ইঁহার বিশেষ আকর্ষণ। ব্রহ্মচারীরা নিরাপদে ভজন-সাধন-তপস্যা করিতে পারে লোকালয়ের সন্নিকটে এইরূপ স্থান বড়ই দুর্ঘট। এই দামপাড় ব্রহ্মচারীদের বাসের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান মনে করেন। শুনিলাম এই স্থানটী ক্রয় করিয়া একটী আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য কেশবানন্দ দরখাস্ত করিয়াছেন, দরখাস্ত নাকি মঞ্জুর হইয়াছে। মূল্য নিশ্চয় হইলেই ক্রয় করিয়া আশ্রম প্রস্তুত আরম্ভ করিবেন।

কেশবানন্দ স্বামী আমার কার্য্যকলাপ সাধন-ভজন গোপনে অনুসন্ধান করিয়া আমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিলেই এই আশ্রমে স্থায়ীভাবে আসন করিতে অনুরোধ করেন। এই আশ্রমে বরদানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি কয়েকটি ব্রহ্মচারী থাকিবেন। স্বামিজী এই স্থানটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম করিয়া ইহার সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার ও সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আমার উপর রাখিতে চান। খরচপত্র যাহা আবশ্যক তিনিই চালাইবেন। আমি কেশবানন্দকে বলিলাম—আত্মানন্দ বহুকাল যাবৎ এস্থানে আছেন। তাঁরই উপরে সমস্ত ভার দেন না কেন? স্বামিজী বলিলেন—আপনি এতদিন উহার সঙ্গে থাকিয়া কি উহার প্রকৃতি এখনও বুঝেন নাই? আমি বলিলাম—আমি ৩।৪

দিনেই জানিয়া নিয়াছি। এখানে আমি আরও কিছুদিন থাকিতে পারিব কিনা সন্দেহ হয়। লোকটী বড়ই ভজন-বিরোধী। স্বামিজী বলিলেন—আপনার উপর কি কোন অত্যাচার করিয়াছে? আমি উত্তর করিলাম—আমার আর কি করিবে? তবে মদ খেয়ে, স্ত্রীলোক এনে সারারাত্রি মাতামাতি করা যাহাদের স্বভাব, তাহারা কি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বাসের যোগ্য? কেশবানন্দ শুনিয়া অবাক্! আমি স্বামিজীকে উহার ঘর অনুসন্ধান করিতে বললাম। স্বামিজী আত্মানন্দের ঘরে প্রবেশ করিয়া ২টী মদের বোতল বাহির করিলেন; আত্মানন্দকে যথেষ্ট গালাগালি করিলেন। আমার আদেশাধীন হইয়া আত্মানন্দ না চলিলে, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দিবেন বলিলেন। কেশবানন্দ আমার নামে ১টী বৃহৎ ভাণ্ডারা দিয়া হরিদ্বার ও কনখলের সাধুদের আমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক তাহাদের সেবা করিলেন। সাধুদের ভিতর আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। কেশবানন্দ আমাকে এক জোড়া ধুতি এক সের ঘৃত, তৈল, প্রদীপ, রান্না করিবার একটী পাত্র আনিয়া দিলেন। জ্ঞানানন্দ ও বরদানন্দকে আশ্রমে রাখিয়া অপর শিষ্যগণ সহিত তিনি মায়াটের দিকে যাত্রা করিলেন।

সাধন চেষ্টার নিষ্ফলতা ঃ বস্তু তাঁর হাতে—দাতা তিনি।

২৭শে-৩০শে জ্যৈষ্ঠ,
১৩০০ সাল।

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইতে চলিল। এখানে আসিয়া ভাবিয়াছিলাম, ঋষি মুনিদের তপস্যার পরম পবিত্র যোগ্যভূমি মায়াপুরী হরিদ্বারে আসিয়াছি। এখানে শরীর যদি সুস্থ থাকে, সাধন ভজনের নির্জ্জন মনোরম স্থান পাই, এবং সাধন-বিঘ্নকর কোন বিপত্তি (বাহির হইতে) উপস্থিত না হয়; তাহা হইলে মনের সাধে প্রাণের ক্ষোভ মিটাইয়া একবার ভজন-সাধন করিব। ঠাকুরের কৃপায় আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে। কুটীরটীও ভজনের অনুকূল। অতি সুন্দর স্থানে শিংশপামূলে প্রস্তুত হইয়াছে। বাহির হইতেও কোন প্রকার উপাধিই এখন আর নাই কিন্তু তথাপি ভজনে মন বসিল না। ভজনে কিসে মন বসে আবার কেন বসে না, তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া হয়রান হইলাম। হেতু কিছুই ধরিতে পারিলাম না। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম, সাধক-জীবনে অহৈতুকী জ্বালা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। উহা এতই বিষম যে সাধক উহা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। উহাতে সমস্ত বাসনা কামনা দগ্ধ করিয়া অভিমানকে ভস্মীভূত করে। কিছুদিন যাবৎ দেখিতেছি, চিত্ত অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নামে আনন্দ নাই, নাম করিতে পারি না। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা ও বিরক্তি আসিয়া পড়ে। অস্থির হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠি। উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া-তুলিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। কখনও নাম করিব স্থির করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আসনে বসি, পাঁচ মিনিট নাম করিতে-না-করিতে মনটী কোথায় চলিয়া যায়। নামটী একেবারে ভুলিয়া যাই। বহুক্ষণ পরে চৈতন্য হয়। তখন আবার নাম করিতে আরম্ভ করি। এরূপ কেন হয় কিছুই বুঝিতেছি না। কোন দিন

আবার এমনও দেখিতেছি—মন অতিশয় বিরক্তিপূর্ণ, কিছুই ভাল লাগিতেছে না। ভাবিলাম আজ আর আসনে বসিব না, নিয়মিত সন্ধ্যাটী বা ন্যাসটী মাত্র কোন প্রকারে সারিয়া নেই—এই স্থির করিয়া আসনে বসিলাম, আর উঠা হইল না। আপনা-আপনি চিত্তটী ‘নামে’ ‘ধ্যানে’ এতই নিবিষ্ট হইয়া পড়িল যে ঠাকুর আমাকে চোখের জলে একেবারে ডুবাইয়া রাখিলেন, সারা দিন আর মাথা তুলিতে দিলেন না। এই প্রকার কেন হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বিরক্তিপূর্ণ অস্থির চিত্ত বিনাচেষ্টায় অকস্মাৎ কেন স্থির ও প্রফুল্ল হয়, এবং উৎসাহপূর্ণ সরস হৃদয় বিনা কারণে হঠাৎ কেন নীরস ও শুষ্কতাপূর্ণ হইয়া পড়ে, কিছুই বুঝিতেছি না। তবে সময়ে সময়ে নিরপেক্ষ একটা মহাশক্তির প্রভাবে যেন এই সমস্ত ঘটিতেছে মনে হয়। পুনঃপুনঃ এই মহাশক্তির পরিচয় পাইয়াও ইহার উপরে নির্ভর করিতে পারিতেছি না। সংগ্রাম করিয়া বারংবার পরাস্ত হইতেছি। হাত পা ছাড়িয়া দিয়া নিজে আর কিছু করিব না স্থির করিতেছি—কিন্তু জানি না কেন ভিতর হইতে আবার চেষ্টার জন্য উৎসাহ উদ্যম আসিয়া পড়ে—এই চেষ্টা না করিয়াও উপায় নাই, আবার করিয়াও লাভ নাই। ঠাকুর লোভের বস্তু সম্মুখে ধরিয়া হাত বাড়াইয়া নিতে উৎসাহ দিতেছেন কিন্তু উহা পাইতে হাত বাড়াইলেই অমনি উহা সরাইয়া লইতেছেন। বস্তু তাঁর হাতে—দাতা তিনি। তিনি না দিলে কোথা হইতে পাইব। তবে ঠাকুর যে আমাকে লইয়া এভাবে খেলা করিতেছেন—আমাকে কাঁদাইয়া আমোদ পাইতেছেন—ইহা মনে করিয়া সময় সময় আনন্দ পাই। জয় গুরুদেব!

বিচার-বুদ্ধিতে নিরম্বু একাদশী ভঙ্গ ও অনুতাপ।

৩১শে-৩২শে জ্যৈষ্ঠ।

এখানে আসিয়া একদিনও নিরম্বু একাদশী করিতে পারিলাম না। কোন-না-কোন প্রকারে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আজ নিশ্চয়ই নিরম্বু করিব সংকল্প করিলাম। এই স্থির করিয়া সারাদিন আসনে বসিয়া নাম করিয়া কাটাইলাম। সন্ধ্যার সময়ে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আসনে বসিতেও কষ্ট হইতে লাগিল। নাম বন্ধ হইয়া আসিল। ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আর আর দিন কিন্তু এই সময়ে আমার রান্নাও হয় না। একাদশীর উপবাস আমার এখন পর্য্যন্ত আরম্ভই হয় নাই—আমার তো উপবাস কল্য। একাদশীর নামেই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ কি বিষম সংস্কার! আহারের প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধিও সেইদিকে দাঁড়াইল। ভাবিলাম, এই প্রকার উপবাসে লাভ কি? ভগবানের উপাসনার জন্যই তো উপবাস। এই উপবাসে তো আমার ভজনের বিঘ্ন করিতেছে—নাম চলিতেছে না, ক্ষুধায় অস্থির, মন বিরক্তিপূর্ণ, শরীর দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। কল্যও সারাদিন একরূপ উপবাস। কল্য আর উঠিবার শক্তি থাকিবে না—দিনটাই বৃথা যাইবে। সুতরাং একদিন উপবাস করিয়া দু’তিন দিন পড়িয়া থাকা অপেক্ষা পেট ভরিয়া আহার করিয়া সুস্থ শরীরে ভজন-সাধন

করাই তো সঙ্গত। ভজন-বিরোধী যাহা তাহা যতই কল্যাণকর হউক না কেন, উহা পাপ, বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এ সকল ভাবিয়া আমি কিছু আহার করিব স্থির করিয়া চা প্রস্তুত করিলাম। উহা পান করিয়া সুস্থ হইলাম।

নিরম্বু একাদশীতে যে কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাতে আস্থা থাকিলে অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী আরামের জন্য তাহা কখনও ভঙ্গ করিতাম না। ১৫ দিনের পাপরাশি দগ্ধ করিবার জন্য ভগবৎ-বিধানে দুর্লভ একাদশী তিথি জীবের ভাগ্যে সমাগত হয়। চতুর ও সুবুদ্ধিমান হইলে কখনও আমি এই সুযোগ অগ্রাহ্য করিতাম না। ঠাকুর যাহাতে তোমার আনন্দ, সেই শাস্ত্রানুগত সুবুদ্ধি প্রদান কর।

উত্তপ্ত ডাল পড়ার জ্বালা—প্রার্থনায় নিবৃত্তি।

গত কল্য সুধু চা পান করিয়া একাদশীর উপবাস করিয়াছি। আজ চা ও বেলের সরবৎ খাইলাম। সন্ধ্যার পরে খুব ক্ষুধা পাইল। আকাঙ্ক্ষা হইল ডাল ভাত রান্না করিয়া পেট ভরিয়া আহার করিব। ধুনিতে লোভবশতঃ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ডাল চাপাইলাম। ডাল নামাইবার সময়ে হঠাৎ হাত হইতে বাসনটী পড়িয়া গেল। কতকগুলি ডাল আমার হাতে পায়ে মুখে বুকে আসিয়া পড়িল। ভয়ানক উত্তপ্ত ডাইল যে যে স্থানে লাগিল জ্বলিয়া উঠিল। আমি স্পর্শমাত্রে "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিয়া স্থির হইয়া বসিলাম এবং অগ্নিদেবকে বলিলাম—হে অগ্নি! একি করিলে? কোন্ অপরাধে আমাকে তুমি এই শাস্তি দিলে? অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হওয়ায় ডাল চাউলের পরিমাণ কিছু বেশী নিয়াছিলাম। আমার ঠাকুরের আদেশ লঙ্ঘন করিতেছি দেখিয়াই কি তুমি আমাকে এই শাসন করিলে? প্রত্যহ তিন বেলা সঘৃত বিল্বপত্র আহুতি দিয়া আমি তোমার তেজ বৃদ্ধি করি। সেই তেজকে আমারই উপর প্রয়োগ করিলে? আমার একদিনের একটীমাত্র অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিলে না? আমি এই জ্বালা কি প্রকারে সহ্য করিব। অমনি মনে হইল, অগ্নি কে? আমার ঠাকুরই তো অগ্নিরূপে আমার আহুতি গ্রহণ করেন। তেজের একমাত্র আধার তো তিনিই। ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া বলিলাম—গুরুদেব, তোমার কৃপার দানকে আমি শাস্তি মনে করিতেছি, আমাকে রক্ষা কর! আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক মিনিটও আমার জ্বালাভোগ হইল না। আপনা আপনি জ্বালা একেবারে নির্ব্বাণ হইল।

লোভের প্রতিফল ঃ অসৎ পরিগ্রহে অশান্তি।

আমার আহারের সমস্ত বস্তু ফুরাইয়া গিয়াছে। রামপ্রকাশ মহান্তের নিকট ভিক্ষায় যাইব স্থির করিলাম। শুনিলাম হরিদ্বারের সর্ব্বপ্রধান মহান্ত নানকপন্থী শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামী আজ ভাণ্ডারা দিবেন। কনখল ও হরিদ্বারের সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

১লা আষাঢ়, ১৩০০ সাল।

আত্মানন্দ আমাকে তাহার সহিত তথায় যাইতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি স্থূল ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য রামপ্রকাশ মহান্তের নিকট উপস্থিত হইলাম। আত্মানন্দ সঙ্গে ছিলেন। ভাবিয়াছিলাম আত্মানন্দকে দেখিয়া রামপ্রকাশ অধিক পরিমাণে ভিক্ষা দিবেন। কিন্তু উল্টা হইল। ভিক্ষা চাহিতেই আত্মানন্দকে রামপ্রকাশ বলিলেন—আপনি আশ্রমধারী সন্ন্যাসী বড় বড় ভাণ্ডারা আপনার আশ্রমে হয়। এই ব্রহ্মচারীকে এক মুষ্টি অন্ন আপনি দিতে পারেন না? একে ভিক্ষা করিতে হয়! আত্মানন্দ বলিলেন—ভিক্ষা ইঁহার বৃত্তি তাই করেন। ইনি যদি আমার ভাণ্ডারের বস্তু গ্রহণ করেন, অনায়াসে প্রয়োজন মত সব পাইতে পারেন। কিন্তু ইনি তাহা নেন না। রামপ্রকাশ মহান্ত আর আর বার যে প্রকার ভিক্ষা দিয়া থাকেন, এবার তাহাও দিলেন না। আত্মানন্দকে দেখিয়াই তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। ওখান হইতে আত্মানন্দ আমাকে নানা বস্তুর লোভ দেখাইয়া কেশবানন্দের আশ্রমে লইয়া গেলেন। আমিও প্রচুর সামগ্রী পাইবার আশায় সদাব্রতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ভাগ্যবশতঃ সেখানে কয়েকখানা কচুরি ও কয়েকটীমাত্র লাড্ডু পাইলাম। একখানা বস্ত্রও পাওয়া গেল। উহা লইয়া আশ্রমে প্রস্থান করিলাম। পথে আপনা আপনি মনটী আমার বিরক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিনা-কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে নামটী বন্ধ হইয়া গেল। মনটী অতিশয় উদ্বেগপূর্ণ ও বিষম অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, একি হইল! অকস্মাৎ এই প্রকার হওয়ার কারণ কি? ভাণ্ডারার বস্তু গ্রহণ করিতে আমার একেবারে ইচ্ছা ছিল না, কেবল আত্মানন্দের জেদে গ্রহণ করিয়াছি। বোধ হয় ঐ অপরাধেই আমার এই দুর্দশা ঘটিল। সদাশয় সজ্জন মহাত্মারা ভাণ্ডারার অধিকারী হইলেও, যাহাদের হস্তে উহা বিতরণ করা হয়, তাহাদের অসৎভাবের সংস্পর্শে বস্তু কলুষিত হয়—গ্রহণকারীকেও তাহা স্পর্শ করে। আমি আশ্রমে পঁহুছিয়াই ভাণ্ডারার পক্কান্ন মিষ্টান্নগুলি ও বস্ত্রখানা আত্মানন্দকে দিয়া দিলাম। ঐ সকল বস্তু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পূর্ব্ববৎ নাম চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য গুরুদেবের শিক্ষা ও দয়া! এইভাবে না শিখাইলে কি আর আমার নিস্তার আছে!

মন্ত্রশক্তি।

আজ সন্ধ্যা করিতে আসনে বসিয়াছি, একটি লোকের মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিতে লাগিলাম। বাহিরে যাইয়া দেখি লোকটী বিচ্ছুর দংশনে গেলাম মরলাম বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটীতে লুটাইতেছে। আত্মানন্দকে বলায় সে উহা লইয়া তামাসা করিতে লাগিল। পাহাড়ী বিচ্ছুর কামড়ে মানুষ মরিয়া যায় শুনিয়াছিলাম। দাদা বলিয়াছিলেন দংশনের যন্ত্রণা এ পর্য্যন্ত যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে পাহাড়ী বিচ্ছুর মত তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বিষ আর আবিষ্কার হয় নাই। আমি আত্মানন্দের উপর বিরক্ত হইয়া বরদানন্দের নিকটে যাইয়া বলিলাম। বরদানন্দ তখনই ওঝার জন্য বাহির হইল।

আত্মানন্দ তখন খুব উৎসাহের সহিত কনখলে যাইয়া একটী ওঝা লইয়া আসিল। ওঝাটীর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলাম। সে আশ্রমে পঁহুছিয়াই রোগীকে একবার দেখিয়া ১০।১৫ ফুট দূরে গিয়া দাঁড়াইল এবং দম বন্ধ করিয়া কয়েকটী কাঁচা পাতা হাতে কচলাইয়া মাটিতে রস ফেলিতে লাগিল। বিচ্ছুর বিষ উরু পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ওঝা প্রথম দমে হাঁটু পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় দমে পায়ের নালা, তৃতীয় দমে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত বিষ নামাইল। চতুর্থ দমে রোগী সম্পূর্ণ যন্ত্রণাশূন্য হইয়া উঠিয়া বসিল। পরে অর্দ্ধঘণ্টা পথ হাঁটিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল। ওঝাটী ভদ্রলোক নয়, মুটে মজুর শ্রেণীর—সাধারণ লোক। ভগবানের রাজ্যে কত কি আছে কিছুই জানি না! সাধারণ লোকের ভিতরে যে সকল বিদ্যা ও মন্ত্রশক্তি আছে, বড় বড় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার ত্রিসীমানায়ও পঁহুছিতে পারেন না।

ভয়ানক শুষ্কতায় ঠাকুরের কৃপা বর্ষণ ঃ শালগ্রামে নীল জ্যোতিঃ।

২রা আষাঢ়।

প্রত্যূষে যথামত প্রাতঃশৌচাদি সমাপন করিয়া আসনে বসিলাম। বহু চেষ্টায়ও নিত্যকর্ম্মে মনটিকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। জানি না কেন, আজ মন আপনা আপনি বিরক্তিপূর্ণ। অনেক চেষ্টায়ও প্রাণে সরস ভাব আনিতে পারিলাম না। নাম বোঝার মত ভার বোধ হইতে লাগিল। ধ্যেয় বস্তুর উদ্দেশই পাইলাম না। নীরস নাম অস্বাভাবিক শ্বাসেপ্রশ্বাসে সংযোগ করার চেষ্টায় হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বোধ হইতে লাগিল। আমি সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঠাকুরের উপরে অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। কোন একটা হেতুকে সূত্র করিয়া চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত বা মলিন হইলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। না হ'লে ঠাকুরের ইচ্ছায় এ সমস্ত ঘটিতেছে না বলিয়া উপায় কি? আমি ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়া কত কি বলিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার দৃষ্টি শালগ্রামের উপরে পড়িল। শালগ্রামের রূপ দেখিয়া অবাক হইলাম। দেখিলাম—শিলার কলেবরে নানাস্থানে অত্যুজ্জ্বল গাঢ় নীল জ্যোতিঃ, জোনাকিপোকার মত পুনঃপুনঃ জ্বলিয়া উঠিয়া আবার লয় পাইয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ ধরিয়া এই অনুপম জ্যোতির খেলা দর্শন করিলাম। জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে চিত্তে আমার সরস ভাব আসিল। নামও সরস এবং সতেজভাবে আপনা আপনি ফোয়ারার মত ভিতর হইতে উঠিতে লাগিল। ঠাকুরের স্মৃতি চিত্তে উদিত হওয়ায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম।

ছায়ারূপ দর্শনে খেদ আতঙ্ক ঃ প্রার্থনা—'দর্শন দিও না'।

আজ সকালবেলা হইতে সমস্ত দিন সাধন ভজনে খুব আনন্দে গেল। ঠাকুরের স্মরণে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। প্রশস্ত দিবালোকের সম্মুখের আকাশে ঠাকুরের পরিষ্কার ছায়া আজ আবার প্রকাশ

৩রা আষাঢ়, ১৩০০ সাল।

হইল। ছায়াটীর আকার ঠাকুরেরই অনুরূপ। ক্রমশঃ উহা ঘন হইয়া স্থূল ও খর্ব্ব হইতেছে মনে হইল। আমি তখন চোখ বুজিয়া ছায়ার নিকটে কাঁদিয়া পড়িলাম এবং বলিতে লাগিলাম—ঠাকুর! আর আমাকে দর্শন দিও না। ছায়া দর্শন হলেই ভয়ে আমি অস্থির হই—পাছে তুমি প্রকাশ হইয়া পড়। ছায়ায় দৃষ্টি না করিয়া পুনঃপুনঃ চারিদিকে চঞ্চলভাবে তাকাইতে থাকি। চোখ একবার বুজি একবার মেলি—যেন দর্শন না হয়। তোমার ছায়া জানিয়াও আমি অগ্রাহ্য করি। ঠাকুর দয়া করিয়া যদি আমাকে তুমি দর্শন দাও, তবে এইটুকু কৃপা কর—যেন দর্শনের পূর্ব্বে তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি ভালবাসা জন্মে। ইহা না হইলে তোমাকে আদর করিব কিরূপে? বিশ্বাস ভক্তি ভালবাসা অন্তরে না থাকিলে তোমার দেবদুর্ল্লভ দর্শনও তো ছায়াবাজী দেখার মত হইবে। ঐ প্রকার দর্শন না হওয়া আমি শতগুণে ভাল মনে করি। সময়ে সময়ে তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় সত্য, কিন্তু তাহা হিতাহিতজ্ঞানে নয়, প্রাণের স্বাভাবিক টানে। প্রাণের বস্তুকে যদি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে না পারি, আদরের বস্তু যদি অনাদরে চলিয়া যায়—তাহলে আমার সেই দর্শনে লাভ কি? ঠাকুর তোমাকে আদর করিতে পারি, সেপ্রকার অবস্থা না দিয়া কখনও আমাকে দর্শন দিও না—আমি যতই কান্নাকাটি করি না কেন, সমস্ত অগ্রাহ্য করিও, তোমার চরণে এই আমার প্রার্থনা! প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই ছায়া অন্তর্ধান করিলেন, কিন্তু বিমল আনন্দ প্রাণে সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। আজ সমস্তটী দিন যেন অন্য রাজ্যে কাটাইলাম।

লোকসেবায় সাধন-স্ফূর্ত্তি।

১১ই আষাঢ়।

আজ রাত্রি ৩টার সময়ে জাগিলাম। ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে। কিছুক্ষণ আসনে স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিলাম। তন্দ্রাবেশ হওয়ায় আবার শুইয়া পড়িলাম, একটু পরেই আবার উঠিতে হইল। বৃষ্টির জল গায়ে পড়িতে লাগিল। গুরুগীতা পাঠ করিয়া কিছুকাল ধ্যান করিলাম। মুষল-ধারায় বৃষ্টি হইতেছে। নীলধারায় চলিয়া গেলাম। শৌচাদি সমাপন করিয়া আসনে আসিয়া বসিলাম। বৃষ্টি থামিয়া গেল। আজ পাহাড়ের দৃশ্য বড়ই মনোরম। নীলবর্ণ পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া খণ্ড খণ্ড শাদা মেঘ উঠিতেছে। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি পড়ায় চোখ আর ফিরাইতে পারিলাম না। ঠাকুরের কলেবর মনে করিয়া বহুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। ভাব-উচ্ছ্বাসে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

আজ একাদশী, নিরম্বু করিব। আহারের কোন উৎপাত নাই ভাবিয়া, ভোরবেলা হইতে খুব একটা উৎসাহ আনন্দ ভিতরে চলিয়াছিল। আসনে বেশ নিবিষ্টভাবে বসিয়া আছি—এক গ্লাস দুধ লইয়া আত্মানন্দ আসিয়া বলিলেন—"দাদা, আজ বড় ঠাণ্ডা, চা চাই"। আমি বলিলাম—"আজ একাদশী, আমি নিরম্বু কর্‌বো—তোমরা গিয়ে চা করে' খাও"। আত্মানন্দ বলিল—বরদানন্দ,

জ্ঞানানন্দ তো চা প্রস্তুত করিতে জানে না"। আমি কোন উত্তর না দেওয়ায় আত্মানন্দ দুঃখিত-মনে চলিয়া গেল। আমি উৎপাত শান্তি হইল মনে করিয়া নাম করিতে লাগিলাম। কিন্তু নামে আর মন বসিল না। বহুচেষ্টা করিয়াও পূর্ব্বের ভাব অন্তরে আনিতে পারিলাম না। মনে শুষ্কতা ও জ্বালা বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম অকস্মাৎ একি হইল? একি আত্মানন্দ প্রভৃতিকে চা না করিয়া দেওয়ার ফল? আমি অমনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম এবং আত্মানন্দের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নিজ হইতে সমস্ত আয়োজন করিয়া উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত করিলাম। আত্মানন্দ, বরদানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বৃষ্টির সময়ে ঠাণ্ডাতে গরম গরম চা পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আমিও এক গ্লাস চা ঠাকুরের জন্য নিয়া আসিলাম। ঠাকুরকে চা নিবেদন করিতেই আমার কান্না পাইল। চা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সুখময় স্মৃতি প্রাণে উদয় হইল! সমস্তটি দিন নামানন্দে বিভোর হইয়া কাটাইলাম, ঠাকুরের একটি কথা আজ সারাদিন মনে হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনা সময়ে, ভাবভক্তি কিছুই আস্‌ছে না—প্রাণ শুষ্ক কাঠের ন্যায় কি কর্‌ব, ঠিক কর্‌তে না পেরে রাস্তায় বাহির হ'য়ে একটী কুলির পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার কর্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রাণ সরস হ'য়ে উঠল। তখন গিয়ে উপাসনা কর্‌লাম; উপাসনা খুব ভাল হ'ল। আর একদিন শুষ্কতায় কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, উপাসনায় মন বস্‌ছে না—একটি দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিলাম—আর অমনি মনটি সরস হ'ল, উপাসনাও খুব ভাল হ'ল।

শুনিয়াছি, যে কোন কারণে কেহ কারো প্রাণে ক্লেশ দিলে, তাহা দ্বারা ভগবৎ উপাসনা হয় না। শুনিয়াছি ভগবৎভক্ত কোন ব্যক্তির সৎ আচরণেও ভ্রম প্রযুক্ত যদি কেহ প্রাণে আঘাত পায়, তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার ভগবৎ উপাসনার ফল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

বর্ষার প্রারম্ভে বিষময় গঙ্গা—স্নানে বিপত্তি।

১২ই আষাঢ়,
দামপাড়, হরিদ্বার।

আজ রাত্রি সাড়ে তিনটায় জাগিলাম। দেখি মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। বৃষ্টির জল পড়িবে ভাবিয়া আসন হইতে শোওয়ার স্থান পৃথক্ করিয়াছি। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ সবই বৃথা। বিছানায় জল পড়িতে লাগিল। সমস্ত ঘর ভিজিয়া গেল। আসনের উপরে কোন প্রকারে একটু আচ্ছাদন করিয়া ধুনি জ্বালিলাম। হোম, সন্ধ্যা-তর্পণাদি যথানিয়মে সমাপন করিয়া চায়ের জল চাপাইলাম। বাহিরে যাইতে আজ আর ইচ্ছা হইল না।

গত্য কল্য গঙ্গাস্নানের সময়ে একটী সাধু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচারীজি, এ সময়ে

গঙ্গাস্নান করিবেন না, গঙ্গা স্পর্শও না করা ভাল। ওরূপ করিলে বিপদে পড়িবেন—গঙ্গা এখন ‘রজঃস্বলা’।” আমি ভাবিলাম, লোকটার বোধ হয় মাথার গোলমাল আছে—না হ’লে গঙ্গা স্পর্শ করিতে নিষেধ করে? আমি স্বচ্ছন্দে গঙ্গায় নামিয়া অবগাহন করিলাম। উপরে উঠিয়া গা পুঁছিবার সময়ে দেখি সর্ব্বাঙ্গ চুল্‌ চুল্‌ করিতেছে। অসম্ভব চুলকানিতে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন সেই সাধুটিকে যাইয়া বলিলাম—“ভাই, তোমার কথা না শুনিয়া বিপদে পড়িয়াছি। এখন কি করি বল।” সাধু আমাকে সর্ব্বাঙ্গে গোবর-মাটি মাখিয়া নীলধারার সমীপবর্ত্তী বদ্ধ খালে স্নান করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিয়া কতকটা সুস্থ হইলাম। সাধু বলিলেন—“বর্ষার প্রারম্ভে পর্ব্বতের সমস্ত আবর্জ্জনা এবং বহু প্রকার বিষ ধুইয়া জল আসিয়া গঙ্গায় পড়ে। তাই ঐ জল ভয়ানক বিষাক্ত হয়—স্পর্শ করিলেও নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে।” আমি বলিলাম—দেশে তো বর্ষায় গঙ্গাজল অনিষ্টকর হয় না? সাধু বলিল—গঙ্গা চলিতে চলিতে রৌদ্র, হাওয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভূমি সংযোগে পরিষ্কার হ’ন। আজও আমার শরীরে নানাস্থানে আমবাতের মত চাকা চাকা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। হাঁটু ও ঘাড়ে বেদনা হইয়াছে। গলায় ‘টন্‌সিল্‌’ ফুলিয়াছে। খালের জল ছাড়া কিছুদিন আর উপায় নাই। স্নানাহার সমস্ত উহাতেই করিতে হইবে। কিন্তু পরে এই গঙ্গার জলের সঙ্গে খালের যোগ হইলেই বিষম বিপদ। তখন জলাভাবে এ স্থান হইতে হয়ত সরিতে হইবে।

বিক্ষিপ্ত ও উদ্বেগপূর্ণ মন ঃ অন্যের কল্যাণকামনায় চিত্ত সুস্থির ঃ গায়ত্রী জপে অষ্টদল পদ্মস্থিত কেন্দ্রে নীলজ্যোতিঃ দর্শন।

সকালে ঠাণ্ডা লাগাইতে সাহস হইল না। আসনে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। নামে মন বসিল না, বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। ভয়ানক বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝাপ্টা হাওয়া—ঘরের সর্ব্বত্রই ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। আমি সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া আসনে বসিলাম। আসনের উপরে আচ্ছাদন দেওয়াতেও জল পড়া নিবারণ হইল না। পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কত প্রকার ভাবই মনে আসিতে লাগিল। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকলের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় মুনি-ঋষিদের কথা মনে পড়িল। এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে কত মুনি-ঋষি অনাবৃত শরীরে বৃক্ষমূলে বসিয়া ভগবৎ ধ্যানে বিভোর হইয়া আছেন। তাঁহাদের কথা ভাবিয়া কান্না পাইল। ঠাকুরকে বলিলাম—দয়াময়, আজ এই সময়ে, এই পর্ব্বতে কত যোগী-ঋষি বৃষ্টিতে ভিজিয়া নিমীলিতনয়নে একাগ্রভাবে তোমার দর্শন পাইতে অহর্নিশি ধ্যান করিতেছেন।—আহা! তোমার কণিকামাত্র কৃপা পাইতে তাঁহারা কতই না ক্লেশ করিতেছেন! যদি দয়া করিবে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদেরই কর। তোমার পতিতোদ্ধারণ পবিত্র নাম জগতে জয়যুক্ত হউক।

আমি তোমার সর্ব্বমঙ্গলময় অনুপম রূপ বহুকাল দেখিয়াছি—আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। যাঁহারা তোমাকে একবারও ভাবিয়াছেন, একবারও তোমার নাম লইয়াছেন—দয়া করিয়া তাঁহাদের তুমি দর্শন দিয়া চিরকালের মত কৃতার্থ কর। তোমার ভক্তজনের আনন্দ দেখিয়া ত্রিজগৎ ধন্য হউক!

এই ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতেই কি যে হইয়া গেলাম, প্রকাশ করিতে পারি না। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ঠাকুর আমাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া রাখিলেন। জয় গুরুদেব! বেলা ১২টার পরে আসন হইতে উঠিলাম। ঘর মুক্ত ও যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া নীলধারার খাল হইতে জল আনিলাম। এক ঘণ্টা সময় বাহিরের কাজে গেল। ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আসনে রহিলাম। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুর যথেষ্ট কৃপা করিলেন। মধ্যাহ্ন হোমের পর যদিও আজ্ঞাচক্রে ধ্যান রাখিয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলাম কিন্তু বহুদিনের অভ্যস্ত বলিয়া অষ্টদল পদ্মই প্রকাশিত হইল। পরিষ্কার বুঝিবার জন্য পদ্মের পাপড়িগুলি পৃথক্ পৃথক গণিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু পারিলাম না। পাপড়ির চতুর্দ্দিকে রশ্মির উজ্জ্বল ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। আমি পদ্মের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত মণ্ডলাকার সুনীল চক্রে দৃষ্টি রাখিয়া নাম করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কেন্দ্রস্থিত চক্র নীলজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া ঝিকিমিকি করিতেছে। সময় সময় শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি ধারণ করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই আবার বিলয় পাইতেছে। সংখ্যাপূর্ণ হইলে গায়ত্রী জপ ছাড়িয়া দিলাম। জ্যোতিঃও অন্তর্হিত হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নামে ও ধ্যানে পরমানন্দে অতিবাহিত হইল।

জ্যোতিঃ দর্শন চেষ্টায় বিফলতা ঃ

বর্ষা আরম্ভে তিন মাসের আহার সংগ্রহ।

১৩ই আষাঢ়।

সকালে প্রায় ৫টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া আসনে বসিলাম। শরীর আজ অতিশয় কাতর। ঘাড়ের ও গলার বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাণ্ডায় বাহিরে যাইতে সাহস হইল না। সন্ধ্যা, হোম, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি যথারীতি করিলাম। ৮টার সময় শরীর আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। ভাবিলাম বাহিরের কাজ করা যাউক, তাতে যদি একটু সুস্থ হই। আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম।

৮টার সময় ঘর 'মুক্ত' করিয়া হোমকাষ্ঠ প্রস্তুত করিলাম। তৎপরে বাসন লইয়া নীলধারায় চলিয়া গেলাম। আজ পায়খানা হইল না। মাথা খুব ধরিল। রাত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি মশায় কামড়াইয়াছিল, সে সব স্থানে চুলকানি আরম্ভ হইল। নিতান্ত অবসন্ন শরীরে আসনে আসিয়া বসিলাম। আসনে কিছুক্ষণ বসার পর শরীর আপনা আপনি সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। আমি সন্ধ্যা, হোম ১২টার মধ্যে সারিয়া লইয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম গত কল্য এই সময়ে অষ্টদল পদ্ম দর্শন হইয়াছিল। মনটিকে স্থিরভাবে চক্রে বসাইয়া

গায়ত্রী জপ করিলেই আজও সেইরূপ দর্শন হইতে পারে। আমি পুরাদমে কুম্ভক করিতে লাগিলাম। প্রত্যেকটী দমে দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত পুরাদমে কুম্ভক যোগে নাম, ধ্যান ও গায়ত্রী জপে কাটাইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুই দর্শন হইল না। চক্র, পদ্ম, জ্যোতিঃ বা রূপ কল্পনায়ও একবার আনিতে পারিলাম না। আমি করিব বলিয়া কিছু করিতে গেলেই যে বিফল হই—ইহা ঠাকুরেরই পরম দয়া! শুধু কৃপার ফলই যে ভোগ করিতেছি তাহা বুঝাইতেই ঠাকুরের এ সব খেলা।

প্রায় ৫টার সময় বরদানন্দ আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট পঁহুছিতে তিনি আমাকে বলিলেন—এখানে আমাদের চারি মাস বাস করিতে হইলে যে সব বস্তুর প্রয়োজন তাহা আসিয়াছে। গত কল্য স্বামী কেশবানন্দ একটি মারাঠী সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোককে আমাদের খবর নিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি ১০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া আমাদের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে বরদানন্দকে অনুরোধ করিলেন। বরদানন্দ দুই আড়াই মাসের প্রয়োজন মত চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত প্রভৃতি আনাইয়াছেন। তাহা আমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট টাকা ভদ্রলোককে ফিরাইয়া দিলেন। আত্মানন্দ তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইল। তার ইচ্ছা ছিল আরও কিছু আদায় করে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পোলের বাঁধ কবে খুলিয়া দেয় নিশ্চয় নাই। বাঁধ খুলিয়া দিলেই হরিদ্বার, কনখলের দিকে আর যাওয়ার উপায় নাই। নৌকা চলিতে পারে না। যতদিন পোল আবার না প্রস্তুত হইবে—এই দামপাড়ের চড়াতেই থাকিতে হইবে।

বরদানন্দ তিন মাসের মত আমাকে সমস্ত জিনিষ নিতে বলিলেন। আমি প্রায় ৮।৯ সের আটা, ৫ সের ডাল, ৪ সের চিনি, ৫ সের ঘৃত, এবং নুণ, লঙ্কা প্রয়োজন মত নিলাম। ঠাকুর দয়া করিয়া এই বন্দোবস্ত করিয়া না দিলে এই স্থান হইতে নিশ্চয়ই সরিয়া পড়িতে হইত। সঞ্চিতান্ন না থাকিলে লোকসংস্রবশূন্য দামপাড়ে থাকা সম্ভবই হইত না।

মণিপুর চক্রে ধ্যানের ফল ঃ ক্রোধে নাম, ধ্যান লোপ।

১৪ই আষাঢ়।

বৃষ্টি-বাদলে বড়ই গোলমাল করিতেছে দেখিতেছি। আজও যথাসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ৪টার সময়ে জাগিলাম। বিছানা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। তন্দ্রাবেশ হইল কিন্তু নাম চলা বন্ধ হইল না। সাড়ে পাঁচটার সময়ে আসনে উঠিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা, হোম, চণ্ডীপাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলাম। ত্রাটক ও কুম্ভক যোগে পাঁচশত গায়ত্রী জপ হইল। ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নাম জপ করিলাম। অবিচ্ছেদ কুম্ভকের সহিত মণিপুরে বসিয়া নাম করিতে বড়ই আরাম বোধ হইল। ঠাকুর আমাকে এইস্থানে বসিয়া সময় সময় নাম করিতে বলিয়াছেন। এই চক্রে বসিয়া নাম করাতে চিত্ত নামে খুব নিবিষ্ট হয়। ঠাকুরের ধ্যান কিন্তু থাকে না। নামের উৎপত্তি স্থানের অনুসন্ধানেই

অতিশয় ব্যস্ত থাকিতে হয়। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির দিকে লক্ষ্য করিলেই উহা যেন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কুম্ভক করিতে বড়ই আরাম বোধ হয়। এই চক্রে ধ্যান অভ্যাস অল্প আয়াসে সংযম আয়ত্ত হয়। শুনিয়াছি মুগ্ধকরী নাকি এই চক্র হইতেই ধ্যান প্রভাবে বিকশিত হইয়া পড়ে। ১০টার পর আসন ত্যাগ করিলাম। ১১টার মধ্যে শৌচাদি কার্য্য, বাসন মাজা এবং স্নান সমাপন করিয়া আসনে আসিয়া বসিলাম।

সন্ধ্যা শেষ করিয়া ৩০০ গায়ত্রী জপ করিতে ১২টা বাজিল। ১২টা হইতে ১টা পূজায় কাটাইলাম। তৎপরে ন্যাস আরম্ভ করিলাম। ন্যাস কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তভাবে হইল—পরে জানি না কি ভাবে কোন্ ফাঁকে মনটী কখন নাম-ধ্যান ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। হুঁস হইলে দেখিলাম, আত্মানন্দ ও বরদানন্দের উপরে আমার অত্যন্ত ক্রোধ ও বিরক্তি জন্মিয়াছে। উদ্বেগ ও ক্লেশে ভিতরটা আমার ছারখার হইয়া গিয়াছে। আমি অল্প আহার করি, তাই ঘৃত চিনি প্রভৃতি বিভাগে আমাকে তাহাদের অপেক্ষা কম দিয়াছে—ইহাই তাহাদের অপরাধ! হায় কপাল! আমি আবার পাহাড়ে তপস্যা করিতে আসিয়াছি! এ স্বভাবের হীনতা তো একটুকুও গেল না!

কর্ত্তা তিনি—তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত জুটিতেছে।

১০ই আষাঢ়।

অদ্য শেষ রাত্রি হইতে অপরাহ্ণ ৬টা পর্য্যন্ত বাহিরের নিত্য আবশ্যকীয় কার্য্য ব্যতীত আসনেই কাটাইলাম। নামে, ধ্যানে সমস্ত দিনটি বেশ আনন্দে গেল। আগামী কল্য জালিম সিং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এক বাক্স ভাল চা সঙ্গে করিয়া আনিবেন লিখিয়াছেন। আমার চা ফুরাইয়া গিয়াছে, ২।৩ দিন চলিতে পারে। ফয়জাবাদ হইতে তিনি সাহারাণপুর বদলি হইয়াছেন। এখানে আসিয়া একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছি। পাহাড়ের নীচে জনমানবশূন্য স্থানে আসিয়া রহিয়াছি, এস্থানেও আমার যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু আসিয়া জুটিতেছে, কারো নিকট আভাষেও জানাইতেছি না। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—একটু তফাতে গিয়ে থাক্‌লে ভগবানের কৃপা বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমি তো প্রতি কার্য্যেই ঠাকুরের হাত দেখিতেছি—কিন্তু তবু সে বিষয়ে একটা নিশ্চয় ধারণা জন্মিতেছে না। কর্ত্তা তিনি—পাহাড়ে পর্ব্বতে নির্জ্জন বন জঙ্গলেও তিনি রাজভোগে রাখিতে পারেন, আবার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রাজ অট্টালিকায়ও তিনি দীন-দুঃখী করিতে পারেন। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত ঘটিতেছে, আর সকলই অসার। ঠাকুর! তুমিই যে সর্ব্বেসর্ব্বা, সর্ব্বনিয়ন্তা, এইটুকু বুঁঝিতে পারিলেই যে সকল অশান্তি-উদ্বেগ, আপদ্-বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাই!

স্ত্রীলোকের সঙ্গ নিঃসঙ্গ সমান বোধই নিরাপদ।

১৬ই আষাঢ়, ১৩০০ সাল।

প্রত্যুষে শৌচাদি কার্য্য শেষ করিয়া আসনে বসিলাম। ১১টা পর্য্যন্ত আসনের কাজ করিয়া চণ্ডী ও গুরুগীতা পাঠান্তর আসন হইতে উঠিলাম। আজও সংখ্যা পূর্ব্বক নিয়মিত দশ হাজার জপ করা হইল। পরে বাসন মাজিয়া, স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে আসনে বসিলাম। প্রায় ৫টা পর্য্যন্ত আসনে রহিলাম। কিন্তু বড়ই নীরস শুষ্কতায় দিন অতিবাহিত হইল। ভালই লাগুক্ আর মন্দই লাগুক্, নিয়মমত আসনের কাজ প্রত্যহ করিয়া যাইব, ঠিক করিলাম। ভাল না লাগিলে করিব না, ইহা ঠিক নয়।

অদ্য বেলা প্রায় ৩টার সময়ে চোখ বুজিয়া আসনে বসিয়া আছি, একদল যুবতী স্ত্রীলোক অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। "দণ্ডবৎ, স্বামিজী" বলিয়া তাহারা আসনের সম্মুখে বসিল এবং সিকি, দুয়ানি, পয়সা দিতে লাগিল। আমি টাকা পয়সা গ্রহণ করি না বলায়ও, তাহারা বিরত হইল না। তখন আত্মানন্দকে ডাকিয়া উহা দিয়া দিলাম। মেয়েগুলির সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব অসাধারণ, পাঞ্জাবী বলিয়া বোধ হইল। ধমক্ দিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিব ভাবিতেই, ভিতরে বাধা পাইলাম। মনে হইল—দম্ভপূর্ব্বক নিষ্ঠা রক্ষা করিতে গিয়া, তেজঃ প্রকাশে কারো প্রাণে ক্লেশ দেওয়া অপেক্ষা বিপদ্‌কালে গুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণে রাখিয়া নাম করিতে পারিলেই যথার্থ কল্যাণ। স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিব, তাদের সঙ্গে হাসি-গল্প আহ্লাদ-আমোদ করিব, তাদের লইয়া মজিয়া থাকিব—ইহাও যেমন কাম, তাদের নিকটে বসিব না, তাদের প্রতি দৃষ্টি করিব না, তাদের কোন সম্বন্ধে থাকিব না, তাদের সঙ্গ বিষ ভাবিয়া সর্ব্বদা একান্তে থাকিব—ইহাও তেমনি কাম, প্রকারভেদ মাত্র। স্ত্রীলোকের সঙ্গ নিঃসঙ্গ উভয়ই যখন সমান বোধ হইবে তখনই নিরাপদ্—না হ'লে বাসনা-কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম কই? সাধারণ লোকে যে সকল স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য গ্রাহের ভিতরই গণ্য করে না, বিষধর সর্প মনে করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আমি ভয়ে পলায়ন করি, এরূপ যখন আমার অবস্থা তখন আর নিরাপদ্ হইব কিরূপে? নিজের নিষ্ঠা রাখিতে গিয়া অপরের উপর বিদ্বেষ সৃষ্টি করিলে নিষ্ঠা বজায়ের উপকার অপেক্ষা অনিষ্টই যে অনেক বেশী।

নামের উৎপত্তিস্থান—নাভিচক্র।

১৭ই আষাঢ়।

একটী কুস্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি ৪টার সময় জাগিয়া পড়িলাম। ১২ শত জপ করিয়া আসন হইতে উঠিলাম। শৌচাদি সমাপন করিয়া ৫টার সময় আসনে বসিলাম। নিদ্রাক্রিয়া সমাপনান্তর বরদানন্দ ও ঈশ্বরানন্দের সহিত চা পান করিলাম। শরীর আজ বড়ই অবসন্ন, মন তদপেক্ষাও অধিক নিস্তেজ, উৎসাহশূন্য। ভাবলাম—আসনে বসাই সার হইবে! কিন্তু ঠাকুরের কৃপা অদ্ভুত! নাম করিতে করিতে ধ্যান আসিয়া পড়িল, তাহাতে একটু নিবিষ্ট

হইতেই নূতন একটা অবস্থা অনুভব করিলাম। দেখিলাম—নাভিচক্র হইতে অতি সূক্ষ্ম স্বরে, অথচ পরিষ্কার ভাবে নাম আপনা-আপনি উঠিতেছে। ইহার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর কোন প্রকার সংস্রবই নাই, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এতকাল বায়ুর সহিত নাম সংযুক্ত বোধ হওয়ায়, উহা বায়ুরই একটা রকম মনে হইত, কিন্তু আজ দেখিতেছি নাম অতি সূক্ষ্ম, অথচ সুস্পষ্ট একটা সারবান কিছু। উহার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব—মন প্রবিষ্ট হয় না। সময় সময় দেখিতেছি, কুম্ভককালেও অভ্যন্তরস্থ বায়ুতেই নামটীকে চালায়—আজ অনুভব হইতেছে বায়ু বাহিরের স্থূল বস্তু, নাম অতি সূক্ষ্ম, সম্পূর্ণ আল্‌গা, স্বতন্ত্র জিনিষ। বায়ুতে নাম সংযুক্ত হইলে বায়ুর চঞ্চলতাবশতঃ নামও তদ্রূপ মনে হয়। এখন অনুভব করিতেছি—নামের উৎপত্তিস্থান নাভিচক্র। ইহাতে প্রবেশের ক্ষমতা আমার নাই। গভীর অজ্ঞাতস্থান হইতে জপের আলোড়নে, ঘুরপাক খাইয়া জলবিম্ব যেমন উঠিয়া থাকে নামও নাভিচক্রের কোন অলক্ষ্য স্থান হইতে বায়ুতে যুক্ত হইয়া সেই প্রকার আকারে বাহির হইতেছে। নাম বাস্তবিক করি না—উহার ধ্বনি শ্রবণ করি মাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু, শব্দ শ্রবণে সাহায্য করে।

ত্রিসন্ধ্যা কি ভাবে করি।

১৯শে আষাঢ়, ১৩০০ সাল।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকটে সন্ধ্যার ক্রম শিখিয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা করিতেছি। সন্ধ্যোপাসনার সময়ে ঠাকুর আমাকে যে আরাম দিতেছেন তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রাতঃসন্ধ্যা করার পূর্ব্বে গায়ত্রী ন্যাস করিয়া ঠাকুরের চরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক আচমন করি। পরে আপোমার্জ্জনা করিয়া "ওঁকারস্ত ব্রহ্ম ঋষি" মন্ত্রটী ঠাকুরেরই স্তবস্তুতি মনে করিয়া পাঠ করি। এই সময়ে মনে হইতে থাকে, ঠাকুর আমার সন্মুখে বসিয়া আমার স্তব শ্রবণ করিতেছেন। তৎপরে ১২ বার প্রাণায়াম করিয়া প্রতি প্রাণায়ামে, "ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ" ইত্যাদি মন্ত্রটী পাঠের সহিত উহার প্রত্যেকটী শব্দ গুরুদেবেরই রূপ বর্ণনা ভাবিয়া মণিপুরে ঠাকুরের স্বাভাবিক প্রকটরূপ ও বর্ণ ধ্যান করি। অনন্তর হৃদয়ে ঠাকুরের যে কালরূপ দর্শন করিয়াছি, তাহা ধ্যান করিয়া প্রতি কুম্ভকে ২ বার করিয়া সমস্তটী মন্ত্র স্মরণ করি। এই প্রকার ১২ বার কুম্ভক করিয়া ২৪ বার ঐ মন্ত্রটী পাঠ করি। তদনন্তর আজ্ঞা চক্রে প্রতি কুম্ভকে তিনবার ঐ মন্ত্র পাঠের সহিত ঠাকুরের যে শুভ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি, তাহাই ধ্যান করিয়া থাকি। ১২ বার এই কুম্ভকে ৩৬ বার মন্ত্র পাঠ হয়। এই প্রকার মানসে ঠাকুরকে বিশেষ বিশেষ চক্রে স্থাপন করিয়া, মন্ত্র পাঠে ধ্যান করাতে বড়ই আনন্দ পাই। 'আপোহিষ্ঠেতি, সিন্ধুদ্বীপ ঋষি' মন্ত্র পাঠকালে ঠাকুর সমস্ত জলে মিশিয়া রহিয়াছেন ভাবিয়া, তাহা সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিই। আচমনে ঠাকুরকে জল সহিত উদরস্থ করিয়া ধ্যান করি। পরে অঘমর্ষণ মন্ত্র ঠাকুরেরই স্তব মনে করিয়া, উহা পাঠান্তর গণ্ডূষপূর্ণ জলসহ ঠাকুরকে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকি তৎপরে ভিতর হইতে পাপরূপী পুরুষ ঐ জলে আকৃষ্ট হইল ধ্যানে বাম নাসা দ্বারা নিষ্কাসিত করিয়া উহা ঠাকুরেরই পরম পবিত্র চরণযুগলে স্থাপন করি। অঘমর্ষণ জপকালে পাপরূপী

পুরুষ জলে মিশিয়া গেল কল্পনায় তাহাকে সজোরে তিনবার প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া নাকি বধ করিতে হয়। আমিও প্রথম প্রথম তাহাই করিতাম। কিন্তু ঐ প্রকার করাতে আমার বড়ই প্রাণে লাগে। পাপরূপী পুরুষ যদি কেহ থাকেন, তিনি মহা অপরাধী বা অনিষ্টকারী হইলেও বধার্হ নহেন। বধ কাহাকেও করিতে নাই, সকলেই ভগবানের সৃষ্ট— তাঁহারই লীলার সাহায্যকারী। তাই ভগবানের ঐ অত্যাচারী পুত্রকে তাঁরই শ্রীচরণে কখন বা তাঁরই ক্রোড়ে শান্তভাবে স্থাপন করি। 'উদত্য-মিত্যস্ত' ঠাকুরেরই স্তব ভাবিয়া, ঠাকুরকেই ধ্যান করি। তদনন্তর আজ্ঞা চক্রস্থিত গুরুদেবকে ধ্যানে রাখিয়া অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী কুম্ভক সহিত জপ করি। অবশিষ্ট মন্ত্র সকল ঠাকুরেরই শ্রীরূপের বর্ণনা মনে করিয়া আবৃত্তি পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা শেষ করি। মানসে ঠাকুরের অনুপম রূপ সম্মুখে রাখিয়া, সন্ধ্যার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতি অক্ষর ঠাকুরকেই নির্দ্দেশ করিতেছে ভাবিয়া কি যে আরাম পাই, তাহা আর প্রকাশ করিতে পারি না। সন্ধ্যার একটী শব্দেরও অর্থ অথবা একটী মন্ত্রেরও তাৎপর্য্য আমি জানি না। চৌদ্দ শাস্ত্র আঠার পুরাণ আমার ঠাকুরেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা মনে করি। শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠে ও মন্ত্রের আবৃত্তিতে ইষ্ট মূর্ত্তিই বিকাশ পায় দেখিতেছি। ধন্য গুরুদেব। কোথা হইতে আমাকে কোথায় আনিয়া ফেলিলে।

চিত্তের একাগ্রতায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অনুভব।

রাত্রি ১২টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুনিদ্রা আর হইল না। কখন জাগ্রতাবস্থায়; কখন তন্দ্রাবস্থায় নাম করিতে করিতে প্রভাত হইল। যথামত সন্ধ্যা, হোম, ন্যাস, পূজা সমাপন করিলাম।

২০শে আষাঢ়,
১৩০০ সাল।

নামে চিত্ত এত নিবিষ্ট হইল যে, ১২টা বাজিয়া গেল—আসনত্যাগের প্রবৃত্তি হইল না। আজ এক নূতন অবস্থা অনুভব করিলাম। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে তাহাতে চিত্ত যখন অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া পড়িল—বাহিরের সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত হইল। তৎপরে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও অতিশয় বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। পরিষ্কার মনে হইল, যেন প্রত্যেকটী শ্বাস-প্রশ্বাস ঝড়, তুফান। এই সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। নামে চিত্ত একাগ্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কুম্ভক হইতে লাগিল। কিন্তু পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না করিলে, যথার্থ কুম্ভক হয় না। সমস্ত ইন্দ্রিয় ছিদ্র দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বায়ুর স্বাভাবিক গতির ঘাত-প্রতিঘাতে, কুম্ভকাবস্থায়ও চিত্তটিকে বিক্ষিপ্ত ও তরঙ্গায়িত করে। দেখিতেছি—মনটি কুম্ভককালে শ্বাস-প্রশ্বাস বর্জ্জিত একান্ত স্থানে অবস্থান করিলেও, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসই তথায় প্রবেশের একমাত্র পথ। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি চিত্ত স্থির হইলে শিরা ধমনী দিয়া সর্ব্বশরীরে যে রক্তের প্রবাহ চলে গঙ্গাধারার ন্যায় তাঁহার কুলুকুলু ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

নাম ও নামী এক।

আজ সাধন করিবার সময় মনে হইল, মহাত্মা মহাপুরুষদের মুখে বহুবার শুনিয়াছি—নাম ও নামী এক। ইহার অর্থ কি বুঝিতেছি না। তবে এইমাত্র মনে হয় যে প্রত্যেকটী শব্দই তো এক একটী বস্তু নির্দ্দেশ করে। শব্দ স্মরণ বা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটী যেন চক্ষে পড়ে। ‘জল’ বলামাত্র ‘জ’ এবং ‘ল’ কেহ ভাবে না—জ এবং ল শব্দের উপরেও কারো লক্ষ্য পড়ে না, তরল বস্তু জলটীই মাত্র মনে হয়। এইরূপ প্রত্যেকটী শব্দেরই তাৎপর্য্য কোন একটা বস্তু। বস্তুটী নির্দ্দেশ করিবার জন্যই শব্দ। ঘটী, বাটী, ভাত, রুটী প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ মাত্র ঐ বস্তুগুলি স্মরণ হয়। ইষ্টনামেও সেই প্রকার, যিনি তাৎপর্য্য ইষ্টনাম স্মরণমাত্রে তাঁহাকে মনে পড়িলেই নাম জপ সার্থক। ভগবানও বলিয়াছেন—

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি—পরমাংগতিম্॥

ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক জপেরই বিশেষত্ব বলিয়াছেন। নামের সঙ্গে ইষ্ট স্ফূর্ত্তি হইলেই নাম ও নামী এক হইল মনে করি। এখন ইহা ভিন্ন আর কিছু বুঝি না।

শালগ্রামের শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত স্বেদবিন্দু।

২২শে আষাঢ়।

আজ সকালে শৌচান্তে গঙ্গার ধারে জলের উপরে একটী সুন্দর কাল প্রস্তরখণ্ড দেখিলাম। প্রস্তরটী সুগোল, চেপ্টা, উপবীত আকারে একটী শ্বেত রেখায় বেষ্টিত—দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। ভাবিলাম—এটীও তো চক্রধারী স্বাভাবিক শিলা, দেখিতে যখন এত সুন্দর, তখন এটীকে নিয়া পূজা করিতে দোষ কি? আমি প্রস্তরটী তুলিয়া লইলাম এবং কুটীরে আসিয়া আমার শালগ্রামের পাশে রাখিয়া দিলাম, আসনের নিয়মিত কার্য্যে ব্যাপৃত আছি। একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া এক বাক্স উৎকৃষ্ট চা এবং শালগ্রাম চক্র দিয়া বলিলেন—বাবু জালিম সিং আপনাকে ইহা দিয়াছেন। শালগ্রামটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এতকাল যে শালগ্রাম পূজা করিয়া আসিয়াছি তাহা অপেক্ষা এটী সুশ্রী। এটী পূজা করিব ভাবিয়া আমার শালগ্রামের সঙ্গে রাখিয়া দিলাম। গঙ্গা হইতে যেটী আনিয়াছিলাম তাহা মসৃণ করিতে ঘৃতের হাঁড়িতে ডুবাইয়া রাখিলাম। শালগ্রাম পূজা পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সুতরাং জালিম সিংহের প্রদত্ত শালগ্রাম আর পূজা করিলাম না। কল্য হইতে করিব স্থির করিলাম। সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার শালগ্রামকে বলিতে লাগিলাম—"শালগ্রাম, আগামী কল্য আমি তোমাকে পরম পবিত্র গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিব। অনেক দিন আমি তোমাতে আমার ঠাকুরকে পূজা করিয়াছি। ঠাকুর দয়া করিয়া তোমার কলেবরে আমাকে তাঁহার বিস্তর বিভূতিও দর্শন করাইয়াছেন। তোমার শরীর

জ্যোতির্ম্ময় অণু পরমাণুতে গঠিত তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু আমি কি করিব, আমার তো কর্ত্তব্য আমার ঠাকুরকে উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করা। জালিম সিংহের শালগ্রামটি অপেক্ষাকৃত সুশ্রী, সুতরাং তাহাতেই কল্য হইতে ঠাকুরের পূজা আরম্ভ করিব। এতকাল ঠাকুরের পূজা করিয়াও তোমার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ জন্মিল না—ভগবৎ ইচ্ছায়ই যখন এই শালগ্রামটি আসিয়াছেন, তখন ইহাতেই ভগবানের পূজা করা বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায়।" এই প্রকার কত কি বলিয়া স্থিরমনে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে শালগ্রামের দিকে চাহিয়া দেখি—অবাক্ কাণ্ড! পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু পড়ার মত শালগ্রামের সর্ব্ব কলেবরে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি অমনি উহা হাতে লইয়া দেখিলাম। কোথাও একটী জলবিন্দুর সহিত অপরটী সংযুক্ত নয়—অতি ক্ষুদ্র পৃথক্ পৃথক্ ঘর্ম্মাকার অসংখ্য ফুট ফুট জলবিন্দু শালগ্রামের অঙ্গে কি প্রকারে জন্মিল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। শুষ্ক বস্ত্রাসনের উপরে শালগ্রাম বসিয়া থাকে। তুলসীপত্র অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই শুকাইয়া যায়। বেলা ১১টার সময়ে প্রচণ্ড রৌদ্র, ঘরের ভিতর বাহির উত্তাপে পরিপূর্ণ—শালগ্রামে জলবিন্দু কোথা হইতে আসিল। জলবিন্দুগুলি পরস্পর মিলাইয়া গেল না কেন? এই শালগ্রামের গা ঘেঁসিয়া জালিম সিংহের শালগ্রাম রাখিয়াছি, তাহাতে তো এক কণিকাও জলবিন্দু দেখা যায় না। একি আশ্চর্য্য! আমি শালগ্রামটি রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম—বুঝি এটিকে বিসর্জ্জন দিয়া জালিম সিংহের শালগ্রাম কল্য হইতে পূজা করিব শুনিয়াই, এই শালগ্রামের কষ্ট হইয়াছে, তাই এইভাবে উহা জানাইতেছেন। আমি শালগ্রামটি ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া পুঁছিয়া সিংহাসনের উপরে রাখিলাম এবং বলিতে লাগিলাম—শালগ্রাম, আমার সংকল্প বুঝিয়া কি তুমি কষ্ট পাইয়াছ? আমি তোমার আশ্রয় ত্যাগ করিব না। জালিম সিংহের শালগ্রাম যেমন রহিয়াছেন তেমনি থাকিবেন। পূজা আমি তোমারই করিব। জালিম সিংহের শালগ্রাম যে চৈতন্যযুক্ত তাহার তো কোন প্রমাণ পাই নাই, যদি পাই তখন বুঝিব।

বেলা ১১টার সময়ে আসন হইতে উঠিলাম। কাষ্ঠ সংগ্রহ, বাসন মাজা এবং স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া ১২টার সময়ে আসনে আসিলাম। আসনে বসিয়া শালগ্রামের দিকে দৃষ্টি করিতেই দেখি—আমার শালগ্রাম যেমন তেমনি রহিয়াছেন আর জালিম সিংহের শালগ্রামটি ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। অসংখ্য স্বেদবিন্দু শালগ্রামের সর্ব্বাঙ্গে ঘামাচির মত বাহির হইয়াছে। আমি শালগ্রামটিকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া সচন্দন তুলসীপত্র দ্বারা পূজা কারয়া রাখিয়া দিলাম। সমস্ত দিনে আর কোন শালগ্রামই ঘামাইল না। শালগ্রামের সর্ব্বাঙ্গে এই প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বেদবিন্দু নির্গত হওয়ার হেতু কি সারাদিন ভাবিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একটা অদ্ভুত কার্য্য দেখিলেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আমার প্রকৃতি। যা তা একটা কারণ পাইলেই সন্তুষ্ট হই, কিন্তু ঐ সব কারণের হেতু কি ভাবিলেই চক্ষুস্থির—তখন বুদ্ধি-বিদ্যায় কিছুই পাই না, অবাক হই মাত্র।

শিবানন্দ স্বামী ও তাহার সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম।

আজ একটী তেজঃপুঞ্জ কলেবর পরম সুন্দর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আমাদের আশ্রমে আসিয়া আসন করিলেন। ব্রহ্মচারীর বয়স আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক—মহারাষ্ট্রীয় দেহ, নাম শিবানন্দ দেখিয়া বড়ই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপে জানিলাম—তাঁহার নিকট একটী সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম আছে—তিনি নিত্য উহা পূজা করেন। গণ্ডকী নদীর পাড়ে আট ক্রোশ স্থান ঘুরিয়া তিনি উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। আর একটী ছিল, তাহাই এক ব্রহ্মচারী উহার সঙ্গে সঙ্গে চারি বৎসর থাকিয়া, নানাপ্রকার সেবায় পরিতুষ্ট করিয়া—আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এটী তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া নিজের জন্য রাখিয়াছেন। শালগ্রামটি আমি দেখিতে পাইলাম শিবানন্দ খুব আগ্রহের সহিত উহা আমাকে দেখাইলেন। উহার দিকে দৃষ্টি করিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম—একি আশ্চর্য্য! এমন সুন্দর সৌষ্ঠবপূর্ণ সুগঠন শালগ্রাম আপনা-আপনি কি প্রকারে প্রস্তুত হইল? অতি সুদক্ষ সুনিপুণ শিল্পকরও এমন নিখুঁতভাবে একটী শালগ্রাম গড়িতে পারে কিনা সন্দেহ। নীলাভ, কৃষ্ণবর্ণ, সুগোল শালগ্রামটী আপন দীপ্তিতে যেন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন! এত মসৃণ—মনে হয়, সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব উহাতে লক্ষিত হয়। আমার সমস্ত মনপ্রাণ শালগ্রামের অসামান্য রূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আমি শিবানন্দকে বলিলাম—আপনার শালগ্রামটি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই প্রকার একটী শালগ্রাম কি প্রকারে আমি পাইব বলিয়া দিবেন? শিবানন্দ বলিলেন—আপনার যখন শালগ্রামে এত অনুরাগ তখন উহা আপনি পাইয়াছেন মনে করুন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আপনাকে ঐরূপ একটী শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া দিব। আমি বলিলাম—গণ্ডকী নদী তো বহুদূরে—এখানে আপনি কি প্রকারে জুটাইবেন? যদি না পারেন—তবে কি করিবেন? আপনার আশার বাক্য তো আমার অদৃষ্টে বিফল হবে না? শিবানন্দ উত্তর করিলেন—যাহা বলিয়াছি তাহার অন্যথা হবে না—যদি না জোটে—আমার শালগ্রামই আপনাকে দিব। শিবানন্দের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল—বুঝিলাম ঠাকুর আমার আকাঙ্ক্ষা ষোল আনা পূর্ণ করিবেন। শিবানন্দের যথার্থ সদ্গুণের প্রশংসা করিয়া কয়েকটি কথা বলাতেই তাঁহার অন্তরের সদ্ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিল। শিবানন্দ খুব পরিতোষ লাভ করিয়া বলিলেন—"গুণী দাদা! তুমি জেনে রাখ, শালগ্রাম তুমি পাইয়াছ।"

অদ্ভুত স্বপ্ন—ঠাকুরের চরণামৃতপান।

২৩শে আষাঢ়, ১৩০০ সাল।

শেষরাত্রে উঠিয়া মাথাটি ভার ভার বোধ হইতেছে। শরীর নিতান্ত অবসন্ন। জ্বর হইয়াছে। ভাবিলাম—ভোগের জন্যই তো রোগের উৎপত্তি। অদৃষ্টে ভোগ থাকিলে যথায় যেভাবে থাকি না কেন, রোগে ধরিবেই। আহার-বিহার, চলা-ফেরা, সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা নিয়া ষোল আনা নিরাপদ ব্যবস্থায় থাকিয়াও তো লোকে রোগে পড়িতেছে। দেহধারীর

রোগ, ভোগ অবশ্যম্ভাবী, এজন্য আর নিত্যক্রিয়ায় বাধা দিব কেন? আমি প্রত্যুষে স্নানাহ্নিক করিলাম। ২।৩ ঘণ্টা পরেই শরীর সুস্থবোধ হইল।

গত রাত্রিতে একটী সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছি—তাহার স্মৃতিতে আমার সারাদিন আনন্দ, স্ফুর্ত্তিতে কাটিয়া গেল। স্বপ্নটী এই—গেণ্ডারিয়া পূবের ঘরে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বসিয়া আছি, ঠাকুরকে মনে হইল। অমনি যাইয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। ঠাকুর বলিলেন—চরণামৃত পান কর। আমি 'চরণামৃত কোথায়' বলিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছি—ঠাকুর আমার মাথাটি টানিয়া পায়ের উপর চাপিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন "অঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া চরণামৃত পান কর।" আমি চুষিতে লাগিলাম—দুগ্ধধারার মত সুস্বাদু রস আসিয়া আমার মুখ ভরিয়া যাইতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ পান করিয়া উঠিয়া বসিলাম এবং অবাক হইয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুর বলিলেন—কেমন পান কর্‌লে? চরণামৃত যে অমৃত, তাতে আর সন্দেহ আছে? আমি বলিলাম—হাঁ, এখনও আছে। সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হই নাই। ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া আবার মাথাটি চরণের উপর চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন—"আবার চোষ বেশ করে চোষ"। আমি আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া আবার চুষিতে লাগিলাম। মুখ ভরিয়া সুস্বাদু, সুগন্ধ চরণামৃত আসিতে লাগিল। আগ্রহের সহিত চরণামৃত পান করিতে করিতে জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্নটীর ভাব নিয়ত অন্তরে থাকায় সমস্তটী দিন পরম আনন্দে অতিবাহিত হইল। চরণামৃতের গুণ আমি জানি না—কোন কালে কল্পনাও করি নাই, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ঠাকুরের চরণামৃত পান করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। সারাদিন চিত্তটি সরস ও প্রফুল্ল রহিল, ৫ মিনিটের জন্যও ঠাকুরের স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। আহা! কবে আমার এমন শুভাদৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের চরণামৃত পান করিয়া ধন্য হইব!

রুদ্রাক্ষে শালগ্রাম দর্শন।

২৭শে আষাঢ়, ১৩০০ সাল।

শিবানন্দের শালগ্রাম দর্শনের পর হইতে আমি যেন কেমন হইয়া গিয়াছি। অহর্নিশি শালগ্রামটি যেন চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে। যেখানে যে কোন অবস্থায় থাকি ৫ মিনিটের জন্যও শালগ্রামটি ভুলিতে পারিতেছি না। ঠাকুরকে স্মরণ করিলেই মনে হয়, দয়াল ঠাকুর আমার ঐ শালগ্রামটির ভিতর বসিয়া আছেন! আমার শালগ্রাম পূজার সময় পুনঃপুনঃ মনে হইতে থাকে যেন ঐ শালগ্রামটিই পূজা করিতেছি! শালগ্রামটির জন্য চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। পূজার সময় মনের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে বলিলাম—গুরুদেব! দয়া করিয়া আমাকে তুমি সুস্থির কর, না হ'লে সাধন-ভজন করিব কিরূপে? সামান্য একটু শিলাখণ্ডের জন্যও আমার এত আসক্তি? একটী পুতুল দেখিয়া তাহা পাইতে কচি ছেলের যেমন বাপ-মার

নিকট আব্দার, তোমার নিকটও আমার তেমন আব্দার করিতে ইচ্ছা হইতেছে। শিলার লোভ আমার অন্তর হইতে একেবারে তুলিয়া নেও; না হ'লে উহা আমাকে দিয়ে সুস্থির কর। এই উদ্বেগ-অশান্তি আর আমি সহ্য করিতে পারি না। শিবানন্দ যখন দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, তখন তাহার আন্তরিক প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেও। মঙ্গলময় তুমি, তোমার ইচ্ছা বিনা যখন কিছুই হয় না, তখন এই সকল ভোগ তোমারই কৃপার দান মনে করিয়া যেন আদর করিতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ কর। মনে মনে এই প্রকার ভিতরের উদ্বেগ ঠাকুরকে জানাইতেছি, অকস্মাৎ শিবানন্দ আসিয়া আমার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। শিবানন্দ বলিলেন—"গুণী দাদা, কল্যই হরিদ্বার হইতে যেমন তুমি একটী চিহ্ন নিবে, তোমার নিকট হইতেও একটী নিশানি আদায় করিব।" আমি বলিলাম—"কি আদায় করিবে বল?" শিবানন্দ আমার গলার রুদ্রাক্ষ ছড়াটী চাহিল। শুনিয়াই আমার মাথা গরম হইয়া গেল। আমি বলিলাম—তোমার শালগ্রামের মত সহস্র শালগ্রাম পাইলেও এই রুদ্রাক্ষের একটী দানার সঙ্গে বিনিময় করিতে পারি না। এই মালা—আমার গুরুদত্ত। অন্য যাহা হয় তোমাকে আমার একটী নিশানি দিব। শিবানন্দ বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হবে"। শিবানন্দ চলিয়া গেলেন, পরে মনে হইল—শালগ্রাম পাওয়া বড়ই শক্ত সমস্যা দেখিতেছি। রুদ্রাক্ষ না পাইলে শিবানন্দ কখনই শালগ্রাম দিবেন না। শালগ্রাম আমার পক্ষে বড়ই দুর্লভ, কিন্তু রুদ্রাক্ষ তো তেমন দুর্লভ নয়। এক ছড়া কাশী হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া ঠাকুরের দ্বারা স্পর্শ করাইয়া নিলেই তো পারি। তাহাই করি না কেন? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে স্নানে যাইবার জন্য আসন হইতে উঠিলাম। মালাগুলি খুলিবার সময়ে হাতে লাগিয়া অকস্মাৎ রুদ্রাক্ষ মালাছড়া ছিঁড়িয়া আসনের উপর ছড়াইয়া পড়িল। আমি অমনি উহা কুড়াইয়া রাখিতে গিয়া দেখি—প্রত্যেকটী রুদ্রাক্ষ শিবানন্দের শালগ্রাম। অবাক্ কাণ্ড! আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। অর্দ্ধ মিনিটের জন্য এই দর্শন হইলেও সারাদিন ইহার স্মৃতিতে ভিতর আমার তোলপাড় করিতে লাগিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—চিরকাল এই মালা ও উপবীত ধারণ কর্‌বে। সন্ন্যাস অবস্থা হ'লেও ত্যাগ কর্‌বে না। অগ্নি-সেবাও যাবজ্জীবন কর্‌বে। হায়—আমি এমনই পাষণ্ড—সামান্য শিলাখণ্ডের লোভে আমার গুরুদত্ত বস্তু অন্যকে দিব সঙ্কল্প করিতেছিলাম। ঠাকুর, কতকাল তুমি আমাকে লইয়া এরূপ খেলা খেলিবে? তোমার আমোদ—আমার যে প্রাণ যায়! আর আমি শালগ্রাম চাহিব না। ঠাকুর, তুমি আমার তো কিছুরই অভাব রাখ নাই। জয় গুরুদেব! তোমার এসব খেলা যেন মনে থাকে।

সুলক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম প্রাপ্তি।

ভগবানের কৃপায় ৫।৬টী সমবয়স্ক ব্রহ্মচারী আশ্রমে একত্র হইয়াছি। সকলেই খুব উৎসাহশীল, ধর্ম্মপিপাসু ও কঠোর সাধক। বরদানন্দ, জ্ঞানানন্দ, কিছুকাল যাবৎ এখানে আছেন। ঈশ্বরানন্দ, শিবানন্দ ও ফণিদাদা ব্রহ্মচারী সম্প্রতি আসিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম আলাপে বড়ই

আরাম পাই। শালগ্রামের জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া সকলেই শিবানন্দকে তাঁহার শালগ্রামটী আমাকে দিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দ্বাদশীর দিন শিবানন্দ আমাকে শালগ্রাম দিবেন স্বীকার করিলেন। আত্মানন্দ, শিবানন্দের 'দিব-দিচ্ছি' কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া আমাকে বলিল—"দাদা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ঐ শালগ্রাম নিশ্চয়ই তোমাকে দিব। শিবানন্দের কথায় আমার সন্দেহ হয়। নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে—না হ'লে স্বীকার করিয়াও দিতেছে না কেন? শাস্ত্রে আছে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' ইহা তো মুনি-ঋষিদের কথা। সুতরাং শালা হ্যাংড়া যখন স্নান করিতে যাইবে, আমি উহার শালগ্রাম সরাইয়া রাখিব। যখন জিজ্ঞাসা করিবে শালগ্রাম কি হইল? বলিব গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী চড়ায় আমাদের সঙ্গ পাইয়া, তোর শালগ্রাম চতুর্ভুজ হইয়া স্বর্গে গিয়াছে। কিছুকাল আমাদের সঙ্গে বাস কর, তোকেও চতুর্ভুজ করিয়া স্বর্গে পাঠাব। হ্যাংড়া গোলমাল করিলে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাড়াইয়া দিব। ওকে আমি একবার ঠুকেছিলাম।" আত্মানন্দের অসম্ভব কার্য্য নাই ভাবিয়া উহাকে ওরূপ করিতে নিষেধ করিলাম।

২৮শে আষাঢ়।

শিবানন্দ আমাকে দ্বাদশীতে পারণের পরে শালগ্রাম দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি পারণের পূর্ব্বে যাইয়া শিবানন্দকে সাষ্টাঙ্গ করিয়া বলিলাম—দাদা, ভুক লাগা। হুকুম হয় তো প্রসাদ পায়—লেই। শিবানন্দ বলিলেন—হাঁ, বেসক্ পায় লেও।

আমি শিবানন্দ প্রভৃতিকে চা দিয়া, শ্রীফল ও চা পান করিলাম। পরে আসনে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ১টার সময় শুভক্ষণ জানিয়া শিবানন্দের নিকট উপস্থিত হইলাম। শিবানন্দ আমাকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন—"শালগ্রাম লে যাও।" আমি বলিলাম—শুধু শালগ্রাম নয়, তোমার আশীর্ব্বাদও চাই। পাছে রুদ্রাক্ষ মালা বা ওরূপ কোন বস্তু চাহিয়া বসে, এই সন্দেহে বলিলাম—এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন শালগ্রাম আবার তোমাকে ফিরাইয়া দিতে না হয়। আমার কয়েকটী শালগ্রাম আছে, একটি তুমি নেও। তোমার শালগ্রাম পূজা বাধা হবে, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। শিবানন্দ সন্তুষ্টমনে আমার কথায় সম্মত হইলেন। শিবানন্দকে আমার শালগ্রামটি দিয়া উহার শালগ্রামটি নিয়া আসিলাম। একখানা শুদ্ধ বস্ত্র উহাকে দিব বলাতে শিবানন্দ খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

অন্যের প্রশংসা শ্রবণে অভিমানে আঘাত।

আজ শুনিলাম গঙ্গার বাঁধ খুলিবে। বর্ষার জল খুব বেশী হইয়াছে। দামের কবাট খুলিয়া দিলে হরিদ্বার কনখলে যাওয়ার আর উপায় থাকিবে না। এই বেলবাগের চড়ায়ই থাকিতে হইবে। বরদানন্দ, ঈশ্বরানন্দ প্রভৃতি আজই এস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন। ফণিদাদা আসিয়া আমাকে বলিলেন—"ভাই, তুমি এখন কি করিবে? সহরের সর্ব্বপ্রকার সংস্রবে বঞ্চিত হইয়া, এই চড়ায় ২।৩ মাসের মত কি প্রকারে এখানে থাকিবে।

২৯-৩২শে আষাঢ়।

হরিদ্বারে গঙ্গার উপরে ঐ পাহাড়ে আমার গোফা আছে। বার মাস ওখানেই আমি থাকি। একটী ব্রাহ্মণ আমার যাহা কিছু আবশ্যক প্রদান করেন। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমার সঙ্গে থাকিতে পার। ঐ ব্রাহ্মণ তোমাকেও খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া রাখিবেন।” আমি ভাবিয়া দেখিলাম— যথার্থই এই স্থানে ২।৩ মাস থাকা অসম্ভব। আমি ফণিদাদার গোফাটী দেখিতে চাহিলাম। বেলা ১০টার সময়ে ফণিদাদার সঙ্গে হরিদ্বার রওনা হইলাম। দামের উপর যাইয়া দেখি কেশবানন্দ আসিতেছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তিনি আমাদিগকে ফিরিয়া তাঁহার সহিত আশ্রমে যাইতে বলিলেন। অন্যত্র থাকার ইচ্ছা করিয়াছি শুনিয়া তিনি অনুমান করিলেন, আত্মানন্দের কোন গর্হিত আচরণ অসহ্য হওয়াতে, আমরা দামপাড় ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমরা কেশবানন্দের সঙ্গে আশ্রমে আসিলাম। গঙ্গার বাঁধ খুলিতে আরও ২।৫ দিন বিলম্ব হইবে শুনিলাম। সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া এখানেই এই কয়দিন থাকিব স্থির করিলাম। এস্থান ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। কেশবানন্দ স্বামীর সহিত আশ্রমে আসিয়া অনেক আলাপ হইল। বর্ষার সময়ে আমাদের থাকার ও সাধন-ভজনের কোন অসুবিধা না হয় তাহা দেখিবার জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছেন। ভাবিয়াছিলাম, ফণিদাদার সঙ্গে হরিদ্বারে যাইয়া থাকিব। ঠাকুরের তাহা ইচ্ছা নয়—তাহা হইল না। আমরা সকলেই চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। কেশবানন্দজীর কথায় সে সঙ্কল্প সকলেই ত্যাগ করিলাম।

মধ্যাহ্নে আমি আমার আসনে বসিয়া নাম করিতেছি, কেশবানন্দ অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে বসিয়া আশ্রমের শান্তি-অশান্তির আলোচনা করিতে লাগিলেন। আত্মানন্দ ইতিমধ্যে দু’দিন কয়েকটী ইয়ারের সঙ্গে মদ খাইয়া সারারাত্রি যে উৎপাত করিয়াছিল, তাহাও জানিলেন। আত্মানন্দকে ৩.৪ দিনের মধ্যেই অন্যত্র চালান দিবেন বলিলেন। ব্রহ্মচারীদের নিকটে স্বামিজী আমার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ২।১টী কথা কানে আসিল—উহা আমার বড়ই ভাল লাগিল। ভিতরে একটু গর্ব্বিত হইয়া ভাবিলাম, এবার স্বামিজীকে বলিব—“স্বামিজী! আমাদের কল্যাণই তো আপনার উদ্দেশ্য, আমাদের কার্য্যাকার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দোষের সংশোধনই তো আপনার কার্য্য, কিন্তু আপনি কেবল আমার গুণেরই প্রশংসা করেন দেখিতেছি। একটী দোষের উল্লেখ করিয়া তো তাহা ত্যাগ করিতে অনুশাসন করেন না? আপনি দোষের কথা না বলিলে কি প্রকারে তাহা ত্যাগ করিব। এসব ভাবিতেছি, স্বামিজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজীর নিকট বসিতেই তিনি খুব উৎসাহ দিয়া আমাকে আশ্রমে থাকিতে বলিলেন। আত্মানন্দের অত্যাচার-উপদ্রবের কথা তুলিয়া বলিলেন—তোমাদের সকলের সাধন-ভজনে কোন প্রকার বিঘ্ন না হয়, সেজন্য আত্মানন্দকে অবিলম্বে সরাইয়া দিব। স্বামিজী ব্রহ্মচারীদের ভজন-নিষ্ঠার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন—এখানে যে কয়টী আছেন, তাদের মধ্যে ফণিভূষণ ব্রহ্মচারী সর্ব্বোত্তম, উঁহার আর তুলনা নাই। স্বামিজীর মুখে এই কথাটী শুনিয়া ভিতরে গিয়া লাগিল, মাথাটি গরম

হইয়া উঠিল; কেশবানন্দের উপরে বিরক্তি জন্মিল। ভাবিলাম, দু'চার কথা বেশ করিয়া শুনাইয়া দেই। কে সর্ব্বোত্তম, কে মধ্যম, কে অধম তাহা কেশবানন্দ কি প্রকারে জানিলেন? তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন না অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন সাধন-ভজন লইয়া আছি—বাজে কথা বাজে কার্য্য কাকে বলে জানি না, সৎগুরুর আশ্রয় পাইয়াছি, এসব সত্বেও ফণিভূষণ আমা অপেক্ষা প্রশংসার পাত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন? আমার আর স্বামিজীর নিকটে বসিতেও ভাল লাগিল না। নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম। এক একবার মনে হইতে লাগিল, স্বামিজী তো আমার বা ফণিভূষণের সঙ্গ কখনও করেন নাই। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট তিনি কি প্রকারে বুঝিবেন? বোধ হয়, এই সব ভিক্-মাঙ্গা পেটসর্ব্বস্ব ব্রহ্মচারীরাই আমার কোন দোষের কথা স্বামিজীকে বলিয়া থাকিবে। আসনে বসিয়াও কিছুক্ষণ সকলের উপরে একটা বিরক্তি, আক্রোশ রহিল। পরে হঠাৎ ঠাকুরের স্মৃতিতে মোহ কাটিয়া গেল। ভাবিলাম—হায় রে কপাল! আমি আবার সাধন-ভজন করিতে পাহাড়ে আসিয়াছি! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমার প্রকৃতির দোষ দেখাইতে স্বামিজীকে অনুরোধ করিব সংকল্প করিয়াছিলাম। স্বামিজী আমায় কোন দোষের কথাই বলেন নাই। অন্যের যথার্থ গুণের প্রশংসাই মাত্র করিয়াছেন। অন্যের প্রশংসা শুনিয়া আমার সহ্য হইল না—বুক শুকাইয়া গেল, ভিতরে অভিমানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল! হা অদৃষ্ট! প্রকৃতি যখন আমার এত নীচ—তখন সাধন-ভজন সমস্তই আমার ভণ্ডামী; শুধু প্রশংসালাভের জন্যই যাহা কিছু করিতেছি। অন্যের প্রশংসা শুনিয়া অশান্তির জ্বালা—ইহা অপেক্ষা স্বভাবের নীচতা আর কি হইতে পারে? ঠাকুর! এই জঘন্যকে তোমার পরম পবিত্র শ্রীচরণে আশ্রয় দিলে কি প্রকারে? স্বভাবের হীনতা দেখিয়া সমস্ত দিন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া কাটাইলাম। বুঝিলাম, অন্যের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি করা—সঙ্গে সঙ্গে 'আহা উহু' করিয়া দুঃখপ্রকাশ করা সহজ, কিন্তু অন্যের সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া শুনিয়া আনন্দ করা সহজ নয়, বড়ই কঠিন।

বাস্তু সাপ দর্শনে আতঙ্ক।

১-৭ই শ্রাবণ
দামপাড়, হরিদ্বার।

শিবানন্দের নিকট হইতে শালগ্রামটি পাইয়া মনটি প্রফুল্ল হইয়াছে। শেষ রাত্রে উঠিয়া হোম, সন্ধ্যা, আহ্নিক, ন্যাস, পূজা, পাঠ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইতে লাগিলাম। মনে করিলাম, এই আনন্দে ঠাকুর আমাকে যত কাল রাখিবেন—এই আসন ত্যাগ করিব না। যথাবিধি শালগ্রাম পূজা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল কিন্তু শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা আমার জানা নাই। এতকাল নিজের মনোমত নাম জপ করিয়া শালগ্রামকে তুলসী গঙ্গাজল দিয়াছি। এখন শাস্ত্রবিধিমত পূজা করিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় আশ্রমস্থ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। এক একজন এক এক প্রকার পদ্ধতি বলিলেন তাহাতে আমার শ্রদ্ধা জন্মিল না। ফণিদাদা আমাকে বলিলেন "বহুকাল হয় একটি নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—যাঁহার জীবনে একদিনও ত্রিসন্ধ্যা বাদ যায় নাই—আমাকে শালগ্রাম পূজা-

পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শালগ্রাম পূজা কখনও আমায় করিতে হয় নাই। সেই কাগজখানা আছে কিনা, জানি না। পুস্তকের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।" ফণিদাদা বহুক্ষণ পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান করিয়া অতি জীর্ণ একখানা কাগজে 'শালগ্রাম পূজা-পদ্ধতি' পাইলেন। আমাকে আনিয়া দিয়া বলিলেন, "গুনীদাদা, তোমার প্রয়োজন হইবে বলিয়াই, এতকাল এই কাগজখানা আমার নিকটে রহিয়াছে।" আমি উহা নিয়া, সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। শুভদিনে শুভক্ষণে ঠাকুরকে শিবানন্দের কণ্ঠশালগ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিধি পূজা করিব সংকল্প করিলাম। বরদানন্দ আমাকে বলিলেন—"দাদা, যেদিন শালগ্রাম অভিষেক করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে, সেইদিন শালগ্রামকে পরিপাটিরূপে ভোগ দিয়া আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইও।" আমি বরদানন্দের উপরেই সেই কার্য্যের ভার দিলাম। খরচ যাহা পড়ে আমি দিব বলিলাম। আগামী দ্বাদশীতে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিব। সেই দিন হইতে আমার ব্রহ্মচর্য্যের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে।

বেলা ৯টার সময়ে আসনে বসিয়া নিঃশব্দ প্রাণায়ামের সঙ্গে নাম করিতেছি, পশ্চাৎ দিকে বেড়ার বাহিরে, ঠিক যেন কাঁধের উপরে 'ফোঁস্ ফোঁস্', 'খট্ খট্' শব্দ হইতে লাগিল। আমি অমনি আসন হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম একটি বৃহদাকার কৃষ্ণসর্প বেড়া ফাঁক করিয়া ভিতরে আসার চেষ্টা করিতেছে। ঐ বেড়াটি ঠেস দিয়া আমি আসনে বসি। সর্পটি কোন প্রকারে শক্ত বেড়া ভেদ করিতে পারিলেই প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িবে। আমি বরদানন্দ প্রভৃতিকে ডাকিতে লাগিলাম। শব্দ শুনিয়াই সর্পটি অদৃশ্য হইল। কখন কোন্ দিকে গেল ঠিক করিতে পারিলাম না। আত্মানন্দ ও বরদানন্দ আমাকে বলিলেন—"একটি ভয়ঙ্কর প্রাচীন জাতসাপ এই শিশু গাছের তলায় গর্ত্ত করিয়া আছেন। আপনার আসনের সংলগ্ন ঠিক পশ্চাৎ দিকে বেড়ার বাহিরেই তাহার বাসা। বেড়ার বাহির হইতে ঐ গর্ত্তটি আপনার আসনের নীচে গিয়াছে। আপনি আসনে বসিলেই জাতসাপের মাথার উপরে আপনাকে বসিতে হয়। এই ভাবে এই স্থানে আসন রাখা ভাল মনে হয় না। আসনের স্থান পরিবর্ত্তন করুন। এইটি বহু পুরাতন বাস্তু সাপ। কখনও কারো কোন অনিষ্ট করে না। এখানে এইরূপ একটি সাপ আছে অনেকেই জানে। বাস্তু সাপের দর্শনলাভ দুর্লভ। আপনি সৌভাগ্যবান অনায়াসে দেবাংশী সাপের দর্শন পাইলেন।" উহাদের কথা শুনিয়া আসনে আসিয়া বসিলাম। নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া ১১টার সময়ে উঠিলাম। বেলা ১২টার সময় সন্ধ্যাহোম করিয়া আসনে বসিলাম, এবং খুব সরুনালে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিতে লাগিলাম। সর্পটিকে মনে পড়ায় প্রার্থনা আসিল—"সর্পরাজ। আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা কর। তোমার পরিচয় না জানায় আমি তোমার অপমান করিয়াছি। তোমাকে তাড়াইয়া দিতে বরদানন্দ আত্মানন্দকে ডাকিয়াছি। কি করিব? প্রকৃতিগত সংস্কারে তোমাকে আদর করিবার আমার ক্ষমতা নাই। তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়, দূরে থাকিয়া একবার দর্শন দাও—তোমাকে প্রণাম

করিয়া কৃতার্থ হই।" অতঃপর আসনে বসিয়া নিবিষ্টমনে নাম করিতেছি—অকস্মাৎ সম্মুখের জানালায় 'সর্ সর্' শব্দ হইতে লাগিল। চোখ মেলিয়া দেখি, সম্মুখের বেড়ার ফাঁক দিয়া বৃহদাকার কৃষ্ণ সর্প কুটীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রায় এক হাত ভিতরে আসিয়া বিস্তৃত ফণা দক্ষিণে বামে হেলাইয়া 'ফোঁস্ ফোঁস্' করিতেছে। আমি দেখিয়াই ভয়ে আসন ত্যাগ করিয়া দু'এক লাফে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম এবং ব্রহ্মচারীদের নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। সকলে আসিয়া পড়িল। সর্পটি গৃহে প্রবেশ করিয়া লোকের তাড়া পাওয়ায় কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া গেলেন। সর্পটির ঘরে প্রবেশের চেষ্টা কেন? এ কি মানুষের গায়ের গন্ধ পাইয়া, না নিঃশব্দ প্রাণায়ামের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া—বুঝিতেছি না। এ যে ঘরে বসিয়া সাধন-ভজন করাও বিষম শক্ত হইয়া উঠিল! সাপের রূপ ভাবিলেই যে আতঙ্কে প্রাণ যায়!

আমাকে ঊর্দ্ধরেতা করিতে সিদ্ধপুরুষের আগ্রহ।

আজ একটী পর্য্যটক সন্ন্যাসী চণ্ডীপাহাড়ে যাইতে আমাদের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর চেহারা দেখিয়া মনে হইল—কোন শক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ হইবেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা সকলেই খুব আনন্দলাভ করিলাম। আমাদের আগ্রহ-অনুরোধে তিনি একদিন এই আশ্রমে থাকিতে সম্মত হইলেন। সমস্ত দিন আমরা সকলে সকল কাজ ফেলিয়া তাঁহারই সঙ্গ করিলাম। সন্ন্যাসীর আমার প্রতি বড়ই কৃপাদৃষ্টি হইল। তিনি আমাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচারীজি! আপনাকে আমার বড়ই ভাল লাগিতেছে। আপনার দেহ দেখিতেছি, সাধন-ভজন-তপস্যার খুব অনুকূল। গঠন বড়ই চমৎকার। আপনাকে একটি দুর্লভ অবস্থা প্রদান করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনার নাভিকুণ্ডটি ৫।৭ মিনিটের জন্য যদি আমাকে স্পর্শ করিতে দেন, উহা নাড়িয়া নাড়িভুঁড়ি যথাযথরূপে স্থাপন করিয়া দিলে, আপনার বীর্য্যের গতি ঊর্দ্ধদিকে হইবে—বিনা আয়াসেই ঊর্দ্ধরেতা হইবেন। আমি ওরূপ করিতে প্রস্তুত আছি, আপনি রাজী আছেন কি? সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসী একটু পরে আবার কহিলেন—"বহু সাধন-ভজন তপস্যা ও সংযমাদি করিয়া যে অবস্থা লাভ করা সুদুর্লভ, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহা লাভ করিতে পারেন। আপনার কি ইহাতে প্রবৃত্তি হয় না?" আমি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে বলিলাম—আমার গুরুদেব দিতে অসমর্থ, এমন অবস্থা কি আপনি আমাকে দিবেন? আমার গুরুতে একনিষ্ঠা জন্মে এবং ব্যভিচারে আমার প্রবৃত্তি না হয় আপনি আমাকে দয়া করিয়া শুধু এই আশীর্ব্বাদ করুন। আমি আর কিছু চাই না।

ঠাকুরের জটা ঃ চণ্ডীর রূপ ঃ 'সর্ব্ব দেবময়ো গুরু'।

শেষ রাত্রে নিয়মিত সময়ে জাগিয়া সন্ধ্যা করিতে করিতে ভোর হইল। ভূতাপসরণ, আসনশুদ্ধি ও বহুপ্রকার ন্যাসান্তে বিধিমত গণেশাদি দেবতা সকলের পূজা করিলাম। মূল ন্যাস করিতে বেলা

অধিক হইল। আজ মনে হইতে লাগিল—শালগ্রাম আসার পর হইতে প্রত্যহই একটি না একটি সন্তুষ্টির বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। দেখা যাক, আজ ঠাকুর কি বস্ত্র আনেন! ইহা ভাবিয়া পূজার চেষ্টায় আছি—এমন সময়ে ছোড়দাদার প্রেরিত ১খানা তসরের ধুতি আসিল। পাইয়া কত যে আনন্দিত হইলাম বলিতে পারি না। শিবানন্দকে একখানা পবিত্র বস্ত্র দিব কথা দিয়াছিলাম। আজ ঠাকুর দয়া করিয়া সেই দায় হইতে মুক্ত করিলেন। শিবানন্দকে উহা দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

আজ মা যোগমায়া আমাকে বড়ই কৃপা করিলেন। শ্রীচণ্ডী পাঠকালে বড়ই সুন্দর একটি ভাব আসিল, বহুকাল যাবৎ চণ্ডী পড়িতেছি বটে, কিন্তু চণ্ডীর উপরে শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মিল না। ভালবাসিতে চাহি বটে, কিন্তু জানি না কেন পারি না। আজ হঠাৎ মনে হইল—চণ্ডী কে? গুরুদেবের কোন্ অঙ্গে চণ্ডীর আবাসস্থান! ইহা ভাবিতেই ঠাকুরের সম্মুখের জটাটি মনে আসিতে লাগিল। যতদিন হইতে ঠাকুরের পূজা করিয়া আসিতেছি, মানসে কোন দিনই শ্বেতপুষ্প বা তুলসী ঠাকুরের সাম্‌নের জটায় দিতে পারি নাই। লাল জবা ও বিল্বপত্রই জানি না কেন দিতে ইচ্ছা হইয়াছে। একদিন একটি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—ঠাকুর সম্মুখের বড় জটাটি ছিঁড়িয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন "ইহা তুমি নেও"। ঠাকুরকে এই স্বপ্ন বলিয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—" 'এই জটা শক্তি'। সুতরাং ভগবতী যোগমায়া অথবা কালী এই জটাতে রহিয়াছেন।" ঠাকুরের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিন হইতেই এই জটার ধ্যান আমার চলিতেছে। এই জটাটি বড়ই ভাল লাগে। এই জটা ছাড়িয়া ঠাকুরের ধ্যান কখনও আমি জটার সৃষ্টির পরে করিতে পারি নাই। মনে হয়, তাই বুঝি মা ভগবতী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে নিজের স্থানে—এই চণ্ডীপাহাড়ে আনিয়াছেন। আজ চণ্ডীকে গুরুদেবের জটায় ভাবিয়া স্তব পাঠের সময় কান্না আসিল। ঠাকুর আমার স্বয়ং ভগবান, তাঁর এক একটি অঙ্গে এক একটী দেবতা রহিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ও এই দেহেরই ভিতরে। মা চণ্ডী আদ্যাশক্তি, পরাশক্তি—সকলের উপরে। তাই ঠাকুর তাঁকে মস্তকে স্থান দিয়াছেন। ভগবতীর পায়ের নীচে ভগবান হর শয়ান রহিয়াছেন। আমরা শাক্ত—এই শক্তিই আমাদের কুলদেবতা। জয় মা কালী! জয় মা ভগবতী! জয় মা সিদ্ধেশ্বরী!

দেবদেবীর প্রতি পূর্ব্বে আমার একটা অশ্রদ্ধা ছিল। ঠাকুরের এক এক অঙ্গে এক এক দেবতার অধিষ্ঠান। পড়িয়া শুনিয়াও এমন একটা সংস্কার জন্মিয়াছে, এখন আর কোন দেবতাকেই অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হয় না। দেবতা কেন—পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই আমার ঠাকুরের অঙ্গীভূত—সকলেরই শক্তি এক ভগবান। এই সমস্ত লইয়াই তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পূর্ণতা। একটিও বাদ দিবার বা তুচ্ছ করিবার উপায় নাই। ইহা বাগানের ফুলগাছ নয় যে, একটি চারা তুলিয়া ফেলিলে অন্যটিকে স্পর্শ করিবে না। বৃক্ষের যেমন শাখা-প্রশাখা, ইহাও নিশ্চয় তেমনই। সমস্ত সৃষ্টি ঠাকুরের অবয়ব—কাকে ছোট কাকে বড় বলিব?—মূলে সবই এক! যখন যে অঙ্গ দ্বারা যে কার্য্য সাধিতে যত

শক্তির প্রয়োজন, ঠাকুর তাহাই করিতেছেন। সুতরাং একটী অঙ্গুলীতে হাতে বা পায়ে—এই একই শক্তির কার্য্য। এত দিন মহা অপরাধ করিয়াছি। কত দেব-দেবী, ঋষি, মুনি, সাধু ও মহাত্মাকে অগ্রাহ্য করিয়াছি—বলিয়াছি, আমি এক গুরুরই অধীন—আর কারো ধার ধারি না। আমি কি অজ্ঞানেই ছিলাম! গুরু যাঁকে বলি, এই সমস্ত লইয়াই যে তাঁহার স্বরূপ, 'সর্ব্ব দেবময়ো গুরু'। জয় গুরুদেব! তুমিই সব! তুমিই সব!

তৃতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য শেষ ঃ কণ্ঠশালগ্রাম।

হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যে আমার নাম 'গুণীদাদা ব্রহ্মচারী' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলে মন্ত্র, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী কামাখ্যা দেবীর এলাকায় আমার জন্মস্থান। সুতরাং নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র আমার জানা আছে—ইহাই অনেকের সংস্কার। হৃষীকেশ হইতে কয়েকটি সাধু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মচারীজি? আপ্‌কো পাছ হৃষীকেশছে আয়া হ্যায়। হাম লোকনকো কুছ্‌ গুণ বাৎলাইয়ে। শালা মচ্ছর বড়া দিক্ কর্‌তা হ্যায়? আসনমে বৈঠ্‌নে নেহি দেতা। বড়া কাট্‌তা হ্যায়" সাধুদিগকে 'আমি কিছু জানি না' অনেক বুঝাইয়া বলাতে, বুঝিলেন। দর্শনার্থী যাঁহারা আসেন তাঁহারাও আমাকে মহাগুণী মনে করিয়া নানা গুণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আত্মানন্দ আমাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রচার করে এবং যাত্রীদের ডাকিয়া আনিয়া আমাকে দর্শন করাইয়া পয়সা লয়; সেই পয়সা দ্বারা সে মদ আনিয়া খায় আর সারা রাত্রি মাতলামী করে।—ভজন-সাধন বিষম বিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছে। এ স্থান বোধ হয় এবার ছাড়িতেই হইবে।

গত বৎসর ঠাকুর আমাকে পুনশ্চ দুই বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছিলেন। অদ্য তাহার এক বৎসর শেষ হইল। আগামী কল্য চতুর্থ বর্ষের ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইবে। কল্য শালগ্রামের অভিষেক করিব ইচ্ছা করিয়াছি। ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া উহাতে স্থাপন পূর্ব্বক বিধিমত পূজা আরম্ভ করিব। শালগ্রামে ইষ্ট পূজাই বোধ হয় আগামী বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অনুষ্ঠান হইবে। শালগ্রামটি কণ্ঠশালগ্রাম—পূজা শেষ হইলেই কণ্ঠায় ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। ঠাকুরও আমাকে কণ্ঠশালগ্রামের কথাই বলিয়াছিলেন। একটী মার্ব্বেলের মত এটির আয়তন। দাদা শালগ্রাম কণ্ঠায় রাখিতে একটি রূপার কৌটা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। দেখিতেছি এই শালগ্রামটি তাতে বেশ ধরিবে। শালগ্রাম কণ্ঠেই থাকিবেন।

কণ্ঠশালগ্রাম অভিষেক ও পূজা।

অদ্য আমার শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা হইবে। অতি প্রত্যুষে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, শৌচান্তে নীলধারায় স্নান-তর্পণ করিয়া আসিলাম। আসন শুদ্ধির পর আসনে বসিয়া অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস,

ব্যাপক ন্যাস ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস সমাপনান্তে প্রাণায়াম কুম্ভক দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিলাম। তৎপরে তুলসী চন্দনাদি সংগ্রহ করিয়া শালগ্রাম পূজার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পঞ্চগব্য দ্বারা শোধিত ৮ই শ্রাবণ। করিয়া বিধিমত পঞ্চামৃত দ্বারা শালগ্রামকে স্নান করাইলাম। পরে নির্ম্মল গন্ধবারি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সিংহাসনে তুলসীপত্রোপরি শালগ্রামকে স্থাপন করিলাম। তৎপরে ঠাকুরকে স্মরণ পূর্ব্বক খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—“ঠাকুর! আজ পর্য্যন্ত আমার কোন আকাঙ্ক্ষা তুমি অপূর্ণ রাখ নাই। আশাতীত কৃপালাভ করিয়াছি। শালগ্রাম পূজার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তুমিই প্রাণে দিয়াছ। যেমন বলিয়াছিলে, শালগ্রামটিও ঠিক তেমনই তোমার কৃপায় জুটিয়াছে। এখন দয়া করিয়া তুমি এই শিলার প্রতি অণু-পরমাণুতে অবস্থান কর—শালগ্রামটি তোমারই কলেবর হউক। দেবদেবী আমি কখনও বুঝি না, ভগবানকেও জানি না!—আমার সুখ-শান্তি, আরাম-আনন্দের আধার তোমাকেই মনে করি। ক্ষুদ্র আমি তোমার হাতের সামান্য এক গণ্ডুষ জলে আমার পিপাসার পরিতৃপ্তি! আমি তাহাই চাই। তোমার নদী-নালা সমুদ্র প্রভৃতিতে আমার প্রয়োজন কি? ঠাকুর, যতকাল শালগ্রামে তোমার পূজা করিব—আশীর্ব্বাদ কর, যেন এমন ভাবে করি, যাহাতে তোমার আনন্দ হয়; এই প্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে শালগ্রামটি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দাঁড়াইলাম। তৎপরে বক্ষে স্থাপন করিয়া কাতরপ্রাণে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলাম। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে চক্ষের জলে ভাসাইতে লাগিলেন। পরিষ্কার মনে হইতে লাগিল—ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে শালগ্রামে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে তাঁহার অসাধারণ কৃপার পরিচয় দিলেন। শালগ্রামটি হাতের তালুতে করিয়া উহা বুকের উপর ধরিয়া রাখিতে কষ্ট হইতে লাগিল—অত্যন্ত ভারি বোধ হইল। আমি অমনি উহা আসনের উপরে রাখিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর নারায়ণের পূজা আরম্ভ করিলাম। ১০৮ বার ইষ্টমন্ত্র সংযোগে গায়ত্রী জপ করিয়া এক একটি সচন্দন তুলসী ঠাকুরের অঙ্গ বিশেষে অর্পণ করিতে লাগিলাম। ঐ ভাবে ১০৮টি তুলসীপত্র দিতে বেলা প্রায় ৬টা হইল। এই সময়ে ঠাকুরের কৃপায় তৈলধারার মত অবিরাম অশ্রু বর্ষণ হইল। পূজা সমাপন হইতেই বরদানন্দ বিস্তর লুচি, তরকারী, মোহনভোগ, পায়স আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সকলেই খুব পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। একটি ভাল ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা একটি সিধা প্রস্তুত করিয়া দান করিলাম। সকলেই আমার প্রতি-প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কণ্ঠশালগ্রাম পূজার পরে কৌটায় করিয়া কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিলাম। ঠাকুরকে বুকে রাখিয়াছি এই স্মৃতিতে সারাদিন আনন্দে অতিবাহিত হইল।

ঠাকুরের নিকট যাইতে চিঠি—আমার বিচার।

৯ই শ্রাবণ।

আজ সকালে দু'খানা পত্র পাইলাম। দু'খানাই গেণ্ডারিয়া হইতে আসিয়াছে। জনৈক গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন—"গোঁসাই বলিলেন, যখনই থাকিতে ইচ্ছা হইবে না—কেবল লজ্জার খাতিরে থাকিতে হইতেছে বুঝিবে, তখনই চলিয়া আসিবে। যতক্ষণ আনন্দ স্ফূর্ত্তি ততক্ষণ থাকিবে।" পত্র পাঠ করিয়া মনে হইল, লেখার একটু কারিগরি আছে। যোগজীবন লিখিয়াছেন—"গত রাত্রে বাবা আমাকে বলিলেন, 'ব্রহ্মচারীকে হরিদ্বার হইতে আসিতে বল।' তাঁরই কথামত লিখিলাম।" যোগজীবনের পত্রখানা পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুরের সঙ্গলাভের অযোগ্য আমি, ঠাকুর আমাকে আবার ডাকিয়াছেন, ভাবিতেই চক্ষে জল আসিল। সঙ্কল্প করিলাম অচিরেই গেণ্ডারিয়া যাত্রা করিব। মধ্যাহ্নে আসনে বসিয়া কতক্ষণ নাম করার পরে মন আমার ফিরিয়া গেল। ভাবিলাম—যখন ঠাকুরের অনন্ত আকাশব্যাপী ছায়ারূপ ক্রমশঃ ছোট ও ঘন হইতে হইতে প্রমাণ আকার ধারণ করে এবং উহা ধীরে ধীরে পরিষ্কার ও স্পষ্ট হইতে থাকে, আমি তখন চঞ্চলনয়নে দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে ও অধোদিকে দৃষ্টি করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করি, "ঠাকুর দয়া কর—আমাকে দর্শন দিও না। আদরের বস্তু যতদিন আদর করিতে না পারিব দর্শন চাই না। তোমার কৃপায় যদি কখনও আমার বিশ্বাস-ভক্তিলাভ হয়, তোমাতে একান্ত অনুরাগ জন্মে, তোমার যাহাতে যথার্থ আনন্দ ও তৃপ্তি তাহা আমাকে দিয়া করাইয়া নেও—তবেই তোমার নয়ন-মন স্নিগ্ধকর ঐ ভুবনমোহন রূপ দর্শন করাও, না হইলে তোমার স্মৃতি লইয়াই যেন এ জীবন শেষ হয় আশীর্ব্বাদ করিও।" বিশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসা ঠাকুর যতদিন দয়া করিয়া আমাকে না দিবেন ততদিন এ ঠাকুর দর্শন তো দর্শনই নয়। সুতরাং নিকটে গিয়া লাভ কি? এই অবস্থায় ঠাকুরের ত্রিসীমায়ও যাইব না।

আজ শেষ রাত্রি হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনটি ঠাকুরের নামে-ধ্যানে পরমানন্দে কাটিয়া গেল। নারায়ণের দিকে তাকাইলে শরীর-মন বড়ই শীতল হয়। চিত্তটি সরস ও প্রফুল্ল হয়। সন্ধ্যার পরে ধুনির হোমাগ্নিতে ডাল রুটী প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলাম। প্রসাদ পাইয়া খুব তৃপ্তি হইল।

ঠাকুরের নামে ও ধ্যানে নিত্য নূতন অবস্থা সম্ভোগ।

১০ই শ্রাবণ,
১৩০০ সাল।

ঠাকুর আমাকে আকাঙ্ক্ষামত শালগ্রামটি জুটাইয়া দিয়া, কি যে আনন্দে রাখিয়াছেন, বলিতে পারি না। শেষ রাত্রি হইতে সমস্ত দিনের কার্য্যগুলি নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। হোম, ন্যাস, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা-পাঠ প্রত্যেকটি কার্য্যেই ঠাকুর আমাকে বিশেষভাবে কৃপা করিতেছেন। একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে যখন বিভোর করিয়া ফেলে, রুটীন্ মত অপরটি ধরিতে আমার কষ্ট হয় না—আহার করিতে করিতে একটি উপাদেয় বস্তু ত্যাগ করিয়া অপরটি ধরার মত মনে হয়। প্রত্যেকটি

কার্য্যেরই যখন ঠাকুর একমাত্র লক্ষ্য, তখন প্রত্যেকটি কার্য্যই তো তাঁহার সম্বন্ধে মধুময়। প্রতিদিন মনে হইতেছে, ঠাকুর কতদিন আর আমাকে এই আরামে রাখিবেন। ঠাকুরের নামও প্রতিদিন এক, ধ্যানও এক, অথচ তাহা হইতে নিত্য নূতন ভাব উচ্ছ্বাস আনন্দের উদ্ভব—এ বড় অদ্ভুত! ঠাকুরের আর এক অপরিসীম কৃপা এই—নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে, সচন্দন তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল দ্বারা ঠাকুরের পূজা করিতে করিতে জাগিয়া পড়ি। প্রায়ই দিবসের নিত্যক্রিয়াগুলি, রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় করিয়া থাকি। যে কয়দিন ঠাকুর আমাকে এই অবস্থায় রাখিবেন, এখানেই থাকিব। গেণ্ডারিয়া যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সাধন-ভজনের প্রতিকূল যে সকল উপাধি সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতেছে তাহা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলার যথেষ্ট উপায় এখনও আছে। সেজন্য মহামায়ার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইব কেন? যেদিন শালগ্রাম কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে নিত্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাবিধ সুখাদ্য আসিতেছে। এই চক্র যাহার নিকটে থাকেন তাহার নাকি বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। তা হলে তো বিষম বিপদ!

মহামায়ার শাসন ঃ পুনরায় ঠাকুরের আদেশ চিঠি ঃ বিষম সমস্যা ঃ আসন তোলায় মন উচাটন।

ভগবতী মহামায়া এবার আমাকে তাঁর দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধায় ফেলিয়া ঘুরপাক দিয়া বেশ রঙ্গ দেখিতেছেন। কয়েকদিন যাবৎ কখন কখন আমি তাঁর বিষম ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। সময় সময় নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলিতেছি। কি উপায়ে আমি এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইব জানি না।

১১ই-২৫শে শ্রাবণ।

পাঞ্জাবের কোন ভদ্র পরিবারের অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ২০।২২ বৎসরের একটি যুবতী আমাদের আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছেন। স্বামী সম্প্রতি সাধু হইয়াছেন। তাঁহারই অনুসন্ধানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মেয়েটি একাকিনী হরিদ্বারে আসিয়াছেন। স্বামী হরিদ্বারে নিশ্চয়ই একবার চণ্ডীদর্শনে যাইবেন অনুমানে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হন। এই স্থানে থাকিয়া স্বামীর খবর নেওয়া খুব সহজ; তাই আত্মানন্দ, বরদানন্দ প্রভৃতির নিকট কান্নাকাটি করিয়া এখানে ২।৫ দিন বাস করিবার অনুমতি নিয়াছেন। আমি এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আত্মানন্দ আমাকে শাস্ত্র আওড়াইয়া বুঝাইল—"দাদা! আত্মদানেও বিপন্নকে রক্ষা করিতে হয়; কেহ আশ্রয় চাহিলে তাহাকে কোন অবস্থায়ই ত্যাগ করিতে নাই।" আশ্রমস্থ অনেকেরই উহাকে রাখিবার ইচ্ছা বুঝিয়া আর গোলমাল করিতে প্রবৃত্তি হইল না। 'চাচা আপন বাঁচা' ভাবিয়া নিজ কুটীরে প্রবেশ করিলাম। এখন দেখিতেছি বিষম উৎপাতে পড়িলাম। মেয়েটির থাকিবার স্থান আমার কুটীরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে একটী শূন্য ঘরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মানন্দ উহাকে বলিয়াছে "আরে তিন চার

দিন এখানে থাক্ আমি তোর আদ্‌মিকে এনে দিব। আমার বহুৎ সিদ্ধায় জানা আছে। তোর আদ্‌মি যমালয়ে থাক্‌লেও, তাকে আমি টেনে আন্‌ব, নিশ্চয় জানিস্! তারপর গুণীদাদা একটা গুণ বাৎলাইয়া দিলেই মরদ চিরকাল তোর সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার মত থাক্‌বে। গুণীদাদা বড় ক্রোধী, তাঁকে একটু খুসী রাখ্‌তে চেষ্টা কর্।" আত্মানন্দ জানে আমি যদি কোনও আপত্তি না করি স্ত্রীলোকটিকে যতকাল ইচ্ছা আশ্রমে রাখিতে পারিবে। আত্মানন্দের কথার ভাব বুঝিয়া আমাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যুবতী নিপুণতার সহিত নানাপ্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। আমি উহাকে সরাইবার জন্য প্রত্যহ আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীদের নিকট জেদ করিতে লাগিলাম। কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। কয়দিন হয় উহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে স্ত্রী লইয়া এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলায়, সে আজ যাই, কাল যাই, বলিয়া দিন কাটাইতেছে। আমি একটু জেদ করিয়া বলায় এখন সে পরিষ্কার বলিতেছে—"আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইবে না। যতকাল ইচ্ছা আশ্রমে থাকিবে।" আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। বুঝিলাম আত্মানন্দ প্রভৃতি তাহাকে আশ্রমে থাকিতে ভিতরে ভিতরে উৎসাহ দিতেছে। একদিন তুমুল ঝগড়ার পর, আমি উহাকে জোর করিয়া বাহির করিবার জন্য কেনেলের ম্যানেজার প্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম—দেখুন, আমি বড় বিপন্ন হইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়াছি। বহু দূরদেশ হইতে আমি নির্জ্জনে, নিরাপদে ভগবানের নাম করিব বলিয়া দামপাড় গঙ্গার চড়ায় একটী কুটীর করিয়া রহিয়াছি। এতকাল বেশ আনন্দে ছিলাম। সম্প্রতি এক পাঞ্জাবী তাহার যুবতী স্ত্রীকে লইয়া আমাদের আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছে। তাকে বিপন্ন দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম। এখন সে আর অন্যত্র যাইতে চায় না। সে ফৌজদারী করিবে, তবু আশ্রম ছাড়িবে না বলিতেছে। এ সময়ে আপনারা দয়া করিয়া যাহাতে নিরাপদে ভজন-সাধন করিতে পারি, তদ্রূপ একটু ব্যবস্থা করুন। ম্যানেজারবাবু ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা বিস্তৃতভাবে সকল কথা শুনিয়া দুইটী চাপ্‌রাশি লইয়া আশ্রমে আসিলেন এবং বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক পাঞ্জাবীকে আশ্রম হইতে সরাইয়া দিলেন। সে আশ্রম সীমার বাহিরে, গঙ্গায় যাইবার পথে, একটী বৃক্ষমূলে আসন করিয়া বসিল—প্রতিহিংসা নেওয়াই যেন তার অভিপ্রায়। সন্ধ্যার পর প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অনাবৃত স্থানে গঙ্গার উপরে পাঞ্জাবী আছে মনে করিয়া, তাহার জন্য বড় কষ্ট হইতে লাগিল। অধিক রাত্রিতে দু'বার তাহার অনুসন্ধান করিলাম। এই দুর্য্যোগের সময় তাহাদের আনিয়া আশ্রমে রাখিব ভাবিলাম কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

আজ নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে, বাসন মাজা ও কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য বেলা ১১টার সময় কুটীর হইতে যেমন বাহিরে আসিলাম, বরদানন্দ একখানা কার্ড হাতে লইয়া আমাকে দিয়া বলিলেন—ভাই ব্রহ্মচারী, দেখ মহামায়ার কাণ্ড। এ স্থান মহামায়ার, তিনিই সকলকে শাসন করেন। তিনি ভিন্ন অন্যে কাহাকেও শাসন করে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না। দেখ কাল তুমি একজনকে তাড়াইয়াছ, আজই তোমার নামে সমন জারী হইয়াছে। কার্ডখানা পড়িয়া দেখিলাম—কোন গুরুভ্রাতা

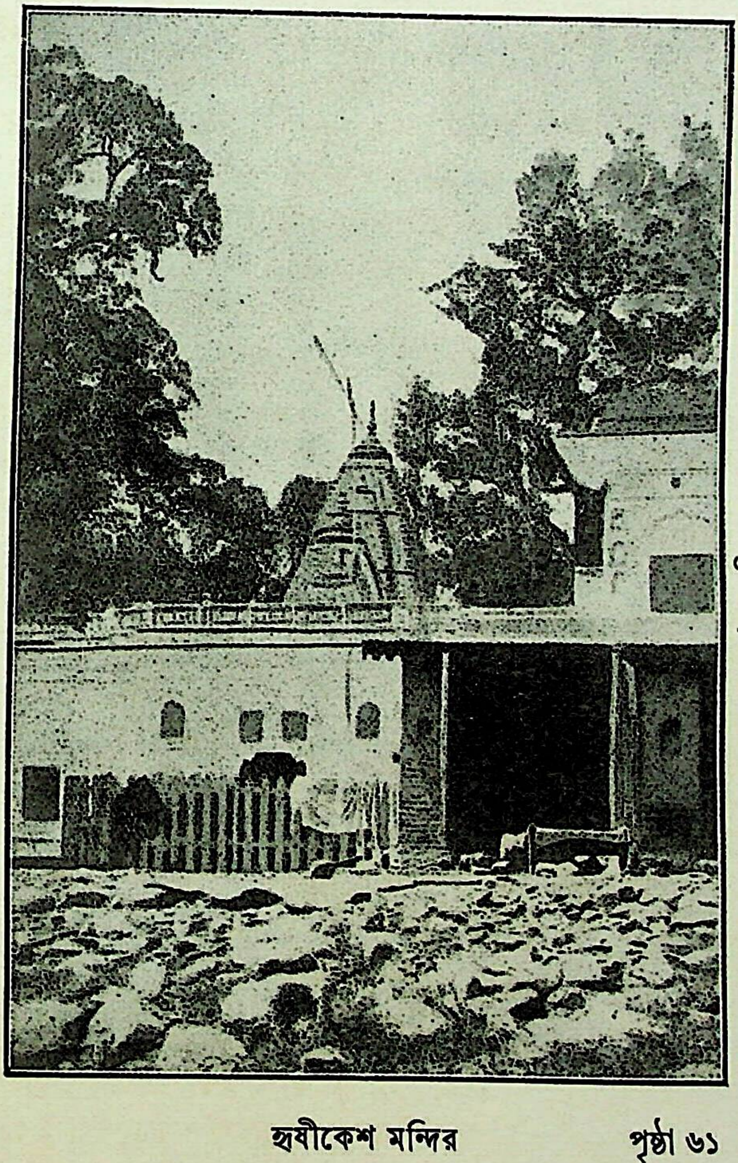

হৃষীকেশ মন্দির পৃষ্ঠা ৬১

লিখিয়াছেন, "তোমার ঠাকুর বলিলেন 'ব্রহ্মচারী ঢাকা চলিয়া আসুক।' তুমি পত্র পাঠ ঢাকা রওনা হইবে। তুমি আর যাহা যাহা জানিতে চাহিয়াছ তাহা ঢাকাতে আসিলে জানিতে পারিবে।" পুঃ—আসিতে বিলম্ব করিও না।

গুরুভ্রাতাটির পত্র পড়িয়া অবাক্। এইপ্রকার পত্র হঠাৎ আবার কেন লিখিলেন ভাবিতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে ঐ গুরুভ্রাতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে একটু দু'মনা হইয়াছিলাম—ঠাকুরের যথার্থ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় ঠাকুর আমার মনের ভাব জানিয়াই গুরুভ্রাতাটিকে পুনরায় পরিষ্কার করিয়া চিঠি লিখিতে বলিয়াছেন। তাই ঢাকা যাইতে এই আদেশ।

ঠাকুরের আদেশপত্র পাইয়া বিষম সমস্যায় পড়িলাম। গেণ্ডারিয়া যাওয়ার কথা মনে হইলে বুক আমার কাঁপিয়া উঠে। পাহাড়ে আসিবার সময়ে ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মচারী এবার হয় এদিক্, না হয় ওদিক্ হবে। হরিদ্বার গিয়ে ঠিক মত চল্‌তে পার্‌লে খাঁটি ব্রহ্মচারী হ'য়ে সন্ন্যাসী হবেন, না হ'লে গৃহস্থলী কর্‌তে হবে।" এবার গেণ্ডারিয়া গেলে ঠাকুর আমাকে গৃহস্থ হইতে বলিবেন, না সন্ন্যাস পথে চালাইবেন—জানি না। সে যাহা হউক, উপস্থিত হরিদ্বার ছাড়িয়া যাইতে আমার একেবারেই ইচ্ছা হইতেছে না। এখানে দিন দিন শরীর আমার সুস্থ হইতেছে। সাধন-ভজনে উৎসাহ আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুরের নামে, ধ্যানে পরমানন্দে সারাদিন কাটাইতেছি। আশ্রমে কোন প্রকার উৎপাত অশান্তিও আর নাই। সকল দিকে এত আরামে রাখিয়া, ঠাকুর কেন আবার আমাকে আহ্বান করিতেছেন, বুঝিতেছি না। ভজনের এমন উৎকৃষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব মনে করিয়া কান্না পাইল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম, 'গুরুদেব! কি জন্য তুমি কি করিতেছ কিছুই বুঝি না। রোগী ডাক্তারকে হিতকারী জানিয়াও পাকা ফোড়ায় অস্ত্রোপচারকালে, যেমন অনিচ্ছা ও আতঙ্ক প্রকাশ করে এবং 'আহা-উহু' চীৎকার করিয়া ডাক্তারকে গালি দেয়, আমারও অবস্থা সেই প্রকার হইয়াছে। আমার কিছুতেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না, দারুণ ক্লেশ হইতেছে। এই স্থানের উপর যাহাতে আমার বিরক্তি জন্মে তাহা করিয়া দেও। না হ'লে এ স্থান ত্যাগ করা আমার অতিশয় ক্লেশকর হইবে। মনের দুঃখ ঠাকুরকে জানাইয়া নিয়ম মত নিত্যক্রিয়া করিতে লাগিলাম—কিন্তু সময় সময় ঠাকুরের আদেশ স্মরণ করিয়া মনে বিষম উদ্বেগ হইতে লাগিল। এই স্থানে আমার যতই আসক্তি হউক না কেন—এখানে ভজনে আমি যতই আনন্দ পাই না কেন, ঠাকুরের আদেশ কি প্রকারে অগ্রাহ্য করিব, এই ভাবিয়া স্থানের উপরে বিরক্তি জন্মাইতে আসনটি তুলিয়া ফেলিলাম এবং কুটীরের বাহিরে বিল্বমূলে, কখনও বা শিংশপাতলে বসিয়া নিত্যকর্ম্ম করিতে লাগিলাম। আসন তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ঠাকুর বলিয়াছেন—"সাধুদের আসন তুলিলে, সেই

স্থানে আর টিকিতে পারেন না। অন্যত্র গিয়ে আসন না করা পর্য্যন্ত স্থিরও হইতে পারেন না।” বিষম উদ্বেগে আমারও ভজন-সাধন ছুটিয়া গেল। অবিলম্বে ঢাকা পঁহুছিব স্থির করিলাম।

হৃষীকেশ যাত্রা ঃ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ঃ ভীমগড় ও সপ্তস্রোত দর্শন ঃ তপস্বী সাধু।

এই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আসন তুলিয়া ফেলিয়াছি। একদিনও আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকটে যাইব বলিয়া ভিক্ষা করায় ৬।৵ টাকা আমার জুটিয়াছে। এখন এই স্থান ত্যাগ করিলেই হয়। এতদিন হরিদ্বারে রহিলাম, হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী তীর্থগুলি একবার দর্শন করিলাম না। এমন কি আসন ছাড়িয়া হরিদ্বারেরও ঠাকুর-বিগ্রহাদি কিছুই পর্য্যন্ত দেখি নাই। দু'চার দিন এই সকল তীর্থস্থান দেখিতে ইচ্ছা হইল। সেই মত আমি ঝোলাঝুলি বাঁধিয়া হৃষীকেশ, লছমন্ ঝোলা প্রভৃতি দেখিতে প্রস্তুত হইলাম। অতি প্রত্যুষে আসনের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি শেষ করিয়া চা পান করিলাম। তৎপরে বরদানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া এক্কা গাড়ীতে হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম। হৃষীকেশে যাওয়ার সময়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে ইচ্ছা হইল। আমি ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে এক্কা রাখিয়া যাত্রীদের স্নানের তামাসা দেখিতে লাগিলাম। অসংখ্য পাঞ্জাবী যুবতী চিরন্তন প্রথা অনুসারে সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে, স্বামী, শ্বশুর, ভাসুরের সহিত এক ঘাটে স্নান করিতেছে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। পাঞ্জাবী মেয়েরা লজ্জাশীলা হইলেও, পরিধেয় বস্ত্র উপরে রাখিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জলে নামে। পরিচিত অপরিচিত যে কেহ থাকুক না কেন, ভ্রূক্ষেপ নাই। পুরুষ ছেলেরাও তাহাদের পানে তাকায় না। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান তর্পণ করিয়া হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ যাওয়ার সময়ে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুন্দর গোফা দেখিতে পাইলাম। এই সকল গোফাতে এক সময়ে কত ভজনানন্দী সাধু সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। এখন এ সব স্থান শূন্য—জনপ্রাণী কিছুই নাই। দেখিয়া এ সকল গোফায় থাকিতে লোভ জন্মিল। কিছুদূর চলিয়া ভীমগড়ে উপস্থিত হইলাম। এখানে নাকি প্রবল পরাক্রমশালী ভীম নিজের অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে ভাগীরথী-গঙ্গার প্রবাহ স্থগিত রাখিয়াছিলেন। ভীমের নয়নরঞ্জন শিষ্ট, শান্ত প্রফুল্ল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভীমের মন্দিরের সম্মুখে একটী পুকুর। এই পুকুরে গঙ্গার জল নলের ভিতর দিয়া আসিয়া অপর দিকে অবিরাম চলিয়া যাইতেছে। শুনিলাম, দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে সরকার বাহাদুরই নাকি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থানটি বড়ই মনোরম। ভীমগড় হইতে সপ্তস্রোতে চলিলাম। সপ্তস্রোতে পঁহুছিতে রাস্তা একটু দুর্গম; কিন্তু মনের উৎসাহ-আনন্দে পথের ক্লেশ কিছুই অনুভূত হইল না। পতিতপাবনী গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই স্থানে আসিয়া সপ্তর্ষিগণের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। জগজ্জনপূজ্য

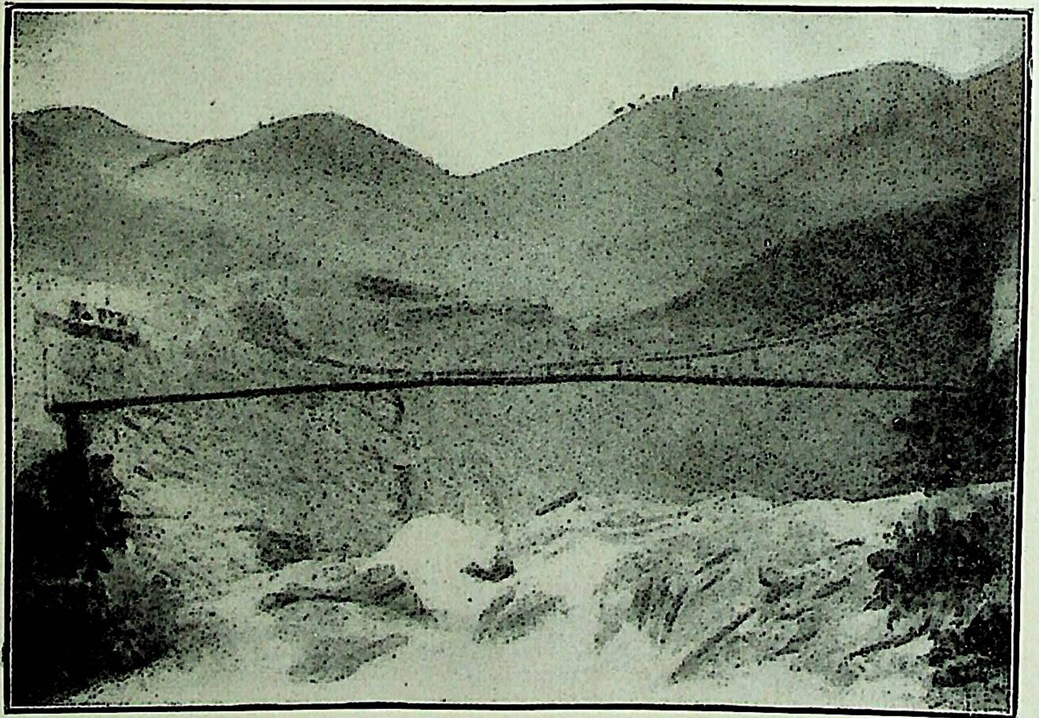

লছমন ঝোলা

পৃষ্ঠা ৬২

শ্রীউমাশঙ্কর সর

ঋষিগণের মর্য্যাদা করিতে তিনি সপ্তধা বিভক্ত হইলেন এবং ঋষিগণের সাতটি আশ্রমই পরিক্রমা পূর্ব্বক আবার এক ধারায় মিলিত হইয়া নিম্নদিকে প্রবাহিত হইলেন। সপ্তস্রোতের চারটি ধারা আমি দেখিতে পাইলাম। সংযোগস্থলে স্নান করিয়া, সন্ধ্যা ও দেবদেবী, ঋষি, মুনি, পিতৃপুরুষ প্রভৃতির তর্পণ করিলাম। গঙ্গার উপরে পাহাড়ের ধারে কয়েকটি সাধু কুটীর করিয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একটী ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। তিনি সম্মুখে প্রজ্বলিত ধুনি রাখিয়া জপে মগ্ন রহিয়াছেন। এক একবার জপ শেষ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন—সমস্ত দিন এইভাবেই জপে অতিবাহিত হয়। কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না—মৌনী। আর একটি জটাজুটধারী কৃশকায় দীর্ঘাকৃতি উদাসী গঙ্গার ভিতরে একটি প্রস্তরের উপরে সূর্য্যাভিমুখে উর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শুনিলাম, ইনি উদয় হইতে সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দিকে অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া অস্তকালে সূর্য্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নিজ কুটীরে চলিয়া যান। সাধুদের ভজন-নিষ্ঠা, কঠোর তপস্যা ও অধ্যবসায় দেখিয়া নিজ জীবনে ধিক্কার আসিল। সাধুদের প্রণাম করিয়া হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম। সপ্তস্রোতের পাহাড়শ্রেণী দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না। মনে হইল, এই সকল পাহাড়ের কোন একটিতে শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র আসিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় ভগবান্ বেদব্যাস এই স্থানেই সমর-নিহত কুরুগণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করাইয়াছিলেন। অবশেষে এই স্থানেই পূর্ণকাম ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারি ও কুন্তীর সহিত হোমাগ্নিতে কলেবর আহুতি দিয়া অক্ষয়লোক লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ধর্ম্মাবতার মহামনা বিদুর—দূর হইতে পর্ব্বতোপরি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন করিয়া স্বীয় তেজঃ তাঁহাতে সঞ্চার পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ আমি এই সপ্তস্রোতের সাধু-সন্ন্যাসী-গৃহস্থজনগণ ও বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম। তৎপরে বেলা অবসানে হৃষীকেশ পঁহুছিলাম।

হৃষীকেশে পঁহুছিয়া একটী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার আমাদিগকে খুব যত্ন করিয়া দোতালায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন সকালবেলা হৃষীকেশের নানা স্থান দর্শন করিলাম। ছোট ছোট কুটীরে সাধুরা আপন আপন সাধন-ভজনে রত দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। হৃষীকেশের গঙ্গায় স্নান তর্পণ করিয়া বড়ই আরাম পাইলাম। একটু বেলায় সামান্য জলযোগ করিয়া লছমনঝোলায় রওনা হইলাম। লছমনঝোলায় দেখিলাম—সাধুদের থাকিবার কোন ব্যবস্থা নাই। লছমনঝোলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, লছমনজীকে দর্শনান্তে পুনরায় হৃষীকেশে পঁহুছিলাম। হৃষীকেশে রাত্রিবাস হইল।

বিল্বকেশ্বর পাহাড়ে বিল্বকেশ্বর মহাদেব।

প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান-তর্পণান্তে হরিদ্বারে যাত্রা করিলাম। কতক দূর যাইয়া সতীর তপোবন দেখিতে পাইলাম। এ সকল পাহাড়-পর্ব্বতের প্রভাব এতই অদ্ভুত, মনে হয়, যে কেহ শুধু পড়িয়া থাকিলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। একটি নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন—

"হরিদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
স্নাত্বা কনখলে তীর্থে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

আমি কনখলে পঁহুছিয়া সতী যেখানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই দক্ষযজ্ঞস্থান দর্শন করিলাম—এবং সেই সময়ের চিত্র স্মরণ করিয়া দেবদেবী, ঋষিমুনি প্রভৃতিকে নমস্কার করিলাম। পরে বিল্বকেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির গঠনসৌষ্ঠব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। তপোধন মুনি ঋষিগণের তপস্যার সুবিধার জন্যই যেন এই স্থানটি নির্ম্মিত হইয়াছে। হরিদ্বারের সম্মুখে উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে বিল্বকেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত; বিস্তৃত পর্ব্বতের অভ্যন্তরে হইলেও এই স্থানটি স্বতন্ত্র পাহাড় বলিয়া মনে হয়। অতি গভীর পরিখা দ্বারা এই স্থানটি মণ্ডলাকারে বেষ্টিত। পরিখার ধারে পর্ব্বতের গায়ে অনেক সুন্দর সুন্দর গোফা রহিয়াছে। পরিখার অপর পারে নিবিড় অরণ্যময় ভীষণ পাহাড়। শুনিলাম পরিখায় গঙ্গাজল প্রবাহিত হয়। বিল্বকেশ্বর পাহাড়ে পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় হইতে কোন বন্যজন্তুর এখানে আসিবার উপায় নাই। স্থানটি নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, বহুসংখ্যক প্রাচীন বৃক্ষরাজীতে পরিপূর্ণ। বিরক্ত সাধু সন্ন্যাসীদের ভজন-সাধনের পক্ষে এমন একটী স্থানও এপর্য্যন্ত দেখি নাই। যোগী-ঋষিদের তীব্র তপস্যার অগ্নি পাহাড়ের স্তরে স্তরে থাকিয়া এই স্থানটিকে অগ্নিময় করিয়া রাখিয়াছে। এই আগুনের আঁচ অন্তরে আসিয়া স্পর্শ করিতে লাগিল। একটু স্থির হইয়া বসিলেই আপনা-আপনি চিত্তটি জমাট্ হইয়া আসে। বিল্বকেশ্বর মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আশ্রমের দিকে প্রস্থান করিলাম।

আজ দ্বাদশী, বিকালে কিছু ছোলাভাজা শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া দিয়া খাইলাম। ঢাকা চলিয়া যাইব বলিয়া বরদানন্দ আমাকে আজ খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত রাজী হইলাম। রাত্রি প্রায় দশটার সময় আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী ভ্রাতাদের সঙ্গে বসিয়া আহার করায় বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। বরদানন্দ, শিবানন্দ, ফণিভূষণ, ঈশ্বরানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারীদের মধুর সঙ্গে এতকাল বড়ই আরামে কাটাইলাম। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য যাঁহারা সংসার-সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন—এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে যাঁহারা দেশে দেশে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরিয়া দিন কাটাইতেছেন—এ সংসারে তাঁহারা সাধারণ নন।

হৃষীকেশে যাওয়ার পূর্ব্বেই আসন তুলিয়া ফেলিয়াছি। আসন তোলার দরুণ আশ্রমে আসিয়া

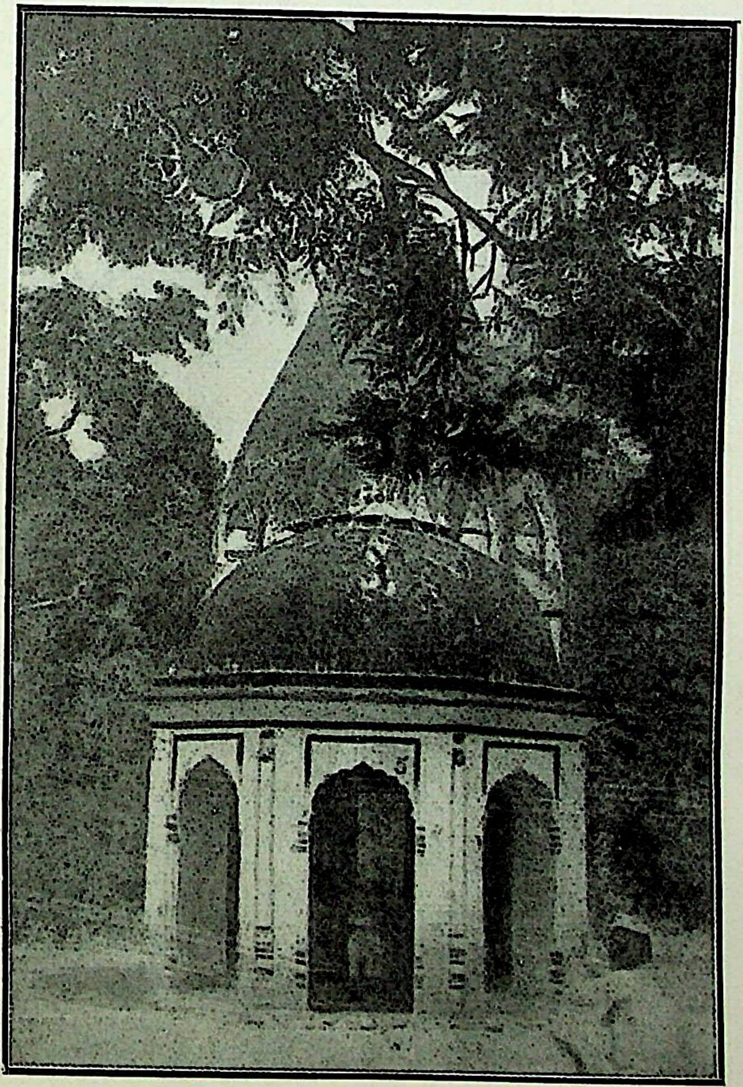

বিল্বকেশ্বর পৃষ্ঠা ৬৪

ঘরে মন বসিতেছে না—এত শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছি বলিয়া বিষম অস্থিরতা
আসিয়াছে। কখন ঘরে কখন বেলতলায় কখন গঙ্গাতীরে বসিয়া কোনমতে বার হাজার নাম ও
২৭ শ্রাবণ, বার শত গায়ত্রী জপ করিলাম। আজই এই স্থান ত্যাগ করিব স্থির
১৩০০ সাল। করিয়া আসন বাঁধিয়া ফেলিলাম। বরদানন্দ আসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন—
"আজ তোমার যাওয়া হবে না—আজ ত্র্যহস্পর্শ।" আমি আর কি করিব?
কল্য নিশ্চয় যাইব স্থির করিয়া রাখিলাম। ফণিদাদা, শিবানন্দ, ঈশ্বরানন্দ প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে
দিনটি অতিবাহিত হইল।

হরিদ্বার ত্যাগ ঃ গঙ্গার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ঃ জ্বালাপুর যাত্রা।

গত কল্য গঙ্গার জল অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর আট ইঞ্চি উঠিলে পোলের তক্তার সমান
হইবে। সুতরাং আর ৩।৪ ইঞ্চি জল বৃদ্ধি পাইলেই তক্তা তুলিয়া ফেলিবে। কল্যই তক্তা
২৭শে শ্রাবণ। তুলিবার সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল। কেনেলের ম্যানেজার বলিয়াছেন—
আমাকে সংবাদ না দিয়া পোল খুলিবেন না। আমি নিশ্চিন্ত আছি।
আজই আমি এস্থান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম। সারাদিন ঘর-বাহির করিয়া কাটাইলাম।
গঙ্গার ধারে যাইয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা গঙ্গে! এতদিন তোমার সুশীতল চরণতলে
আশ্রয় লইয়া পরমানন্দে কাটাইলাম; এখন আমার গুরুদেবের নিকট যাইতেছি; আমাকে
আশীর্ব্বাদ কর। দয়াময়ি! যদি দয়া কর, তবে এই আশীর্ব্বাদ কর—যেন আমার ঠাকুরকে
আমি সকল তীর্থের মূলাধার, তাঁর চরণযুগলকে সকল তীর্থের সার জানিয়া তাঁহাতেই অনন্যমনে
ভক্তি করিতে পারি; সুখ-সম্পদ যাহা কিছু আরাম ঐ চরণছায়াতেই লাভ করি—তাঁহার
চরণ ছাড়া আর কিছুতেই যেন আকৃষ্ট না হই।"

গঙ্গাস্নানের পর ৪টার সময় আহার করিলাম। ঝোলা, বস্তা বাঁধিয়া ষ্টেশনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এই সময়ে মনে হইল, ঘরের এবং বাহিরের সমস্ত জিনিষ বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত আমার জন্য কাঁদিতেছে। আমি ধূনচিতে ধূপধূনা চন্দনাদি জালাইয়া ঘরের ও বাহিরের সমস্ত বস্তুর আরতি করিতে লাগিলাম এবং প্রত্যেকটিরই চরণোদ্দেশে নমস্কার করিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিতে লাগিলাম—সমস্তই আমার জীবন্ত বোধ হইতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা আমার এসব কার্য্যে গেল, পরে আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের আলিঙ্গন করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। জালাপুরের ষ্টেশন্‌মাষ্টার আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহুবার অনুরোধ করিতেছেন। তথায়ই নামিব স্থির করিয়া জালাপুরের টিকেট করিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে জালাপুর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। রাত্রি ও পরদিন জালাপুরের ষ্টেশন্‌মাষ্টারের সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনায় আনন্দলাভ করিয়া, জালিম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে

সাহারাণপুর যাত্রা করিলাম। সাহারাণপুরে যাইতে জালিম সিং বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ৩০শে শ্রাবণ বেলা ৯টার সময়ে সাহারাণপুর পঁহুছিলাম। জালিম সিং খুব আদর করিলেন। রাত্রে তাঁহার কোয়ার্টারে রহিলাম।

ভজন প্রতিকূল সাহারাণপুর ঃ জ্বালা-যন্ত্রণার কারণ নির্ণয়।

১-৩রা ভাদ্র,
১৩০০ সাল।

সাহারাণপুর পঁহুছিবার পর, জালিম সিং আমাকে খোলা-মেলা, নির্জ্জন ও পরিষ্কার একখানা ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া আসন করিয়া বসিলাম। জালিম সিং আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই কয়েক দিন তাঁহার নিকটে থাকি আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু এস্থানে একদিন থাকিয়াই বুঝিলাম, থাকা সহজ নয়। সকল প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও, এইস্থানে ভজনে মন বসে না। এরূপ কেন যে হয় জানি না। আসনে স্থির হইয়া বসিতে উদয়াস্ত চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ১০ মিনিটের জন্যও এ পর্য্যন্ত পারিলাম না। ভজন-সাধন ছুটিয়া গেল ; মাথা আগুন হইয়া উঠিল। আসনের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজগুলি কোন রকমে সমাধা করিয়া বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বেড়াইয়াও আরাম নাই। কি যে যম-যাতনা ভোগ হইতে লাগিল, প্রকাশ করার জো নাই। আমি জালিম সিংহকে সকল কথা খুলিয়া বলায় তিনি বুঝিলেন। তিনিও বলিলেন, "ভজন-সাধনের ভাব-বিরোধী এইপ্রকার স্থান আমিও ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই। বোধ হয় দুনিয়াদারী ছাড়া এই স্থানে ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। জালিম সিং আমাকে একখানা বল্কলাম্বর দিলেন। আরও কম্বলাদি অনেক জিনিষ নিতে জেদ করিতে লাগিলেন, অনাবশ্যক বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলাম না। আমাকে সাহারাণপুরে রাখিতে জালিম সিংহের অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া ৪;৫ দিন রহিলাম। কিন্তু বহু চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও, একটি দিন এক ঘণ্টার জন্য সুস্থির হইতে পারিলাম না। নাম করা যায় না, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। ধ্যানের বিষয় কোথায় গিয়াছে, খোঁজ-খবর পাইতেছি না। অনর্থক রাজসিক ও তামসিক ভাব সকল কোথা হইতে আসিয়া মনটিকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। চিত্তও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। এই জ্বালা-যন্ত্রণা অস্থিরতার কারণ কি, অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইল। আমি খুব দৃঢ় হইয়া আসনে বসিলাম। বহু চেষ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ধরিয়া প্রবেশ করিয়া দেখি, নাভিমূল হইতে একপ্রকার উত্তাপ উঠিয়া মেরুদণ্ডে গিয়া লাগিতেছে। মেরুদণ্ডের সেই স্থান সুর্ সুর্ করিয়া একপ্রকার জ্বালার সৃষ্টি করিতেছে। ঐ জ্বালার গ্যাস্ বুকে ও মস্তকে গিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া

পড়িতেছে, তাহাতে প্রাণ-মন অস্থির করিয়া সময় সময় ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তুলে। এ সমস্তই শারীরিক। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের উৎপত্তি ও উত্তেজনা শুধু শারীরিক ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু তাহা হইলেও এ সকলের এতই পরাক্রম যে, উহারা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া স্থূলত্বে পরিণত করে। ঠাকুর, এসব উৎপাত আর কতকাল ?

স্বপ্নে ঠাকুরের অপ্রাকৃত প্রসাদ।

৭ই ভাদ্র অপরাহ্ণ ৬টার সময়ে ফয়জাবাদের টিকেট করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। রাত্রে কোন কষ্ট হইল না। অত্যন্ত গরম বোধ হইতেছিল। একজন বৈষ্ণব সারারাত্রি বসিয়া আমাকে বাতাস করিলেন। বহুবার নিষেধ করাতেও তিনি থামিলেন না। অপরিচিত সাধুর এই প্রকার দয়া আমার উপরে কেন হইল জানি না—সকলই ঠাকুরের খেলা মনে করি। শেষ রাত্রিতে একটী সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া পড়িলাম।

স্বপ্নটি এই,—"পশ্চিমাঞ্চলে নানা স্থানে ঘুরিয়া একদিন বেলা অবসানে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। যোগজীবন আমার জন্য ঠাকুরের প্রসাদ রাখিয়াছিলেন। তাহা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজ হইতে না বলিলে প্রসাদ পাইব না, স্থির করিয়া আমি ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আমাকে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। আমি ঠাকুরের নিকটে বসিয়া উহা পাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রসাদে কোন স্বাদই পাইলাম না। কোন রসই প্রসাদে নাই কেন ভাবিতে লাগিলাম। এই সময়ে একপ্রকার গন্ধ প্রসাদ হইতে বাহির হইতে লাগিল। গন্ধ ঠাকুরের গাত্রগন্ধের ন্যায়—শরীর মন স্নিগ্ধকর পদ্ম-গন্ধের অনুরূপ। এই গন্ধ এতই মধুর যে, আমি উহাতে মুগ্ধ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি, এই গন্ধে আকর্ষণ করিয়া লইল। আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। এমন সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল।" স্বপ্নটি দেখিয়া অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ঠাকুরের কথা পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—যথার্থ প্রসাদ যদি পাওয়া যায়, তাতে কোন আস্বাদই পাবে না—একপ্রকার সুগন্ধ মাত্র পাবে।

বস্তি যাত্রা।

বেলা প্রায় ৯টার সময় ফয়জাবাদ ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ষ্টেশন্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আমাকে দেখিয়াই আগ্রহের সহিত আসিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরমানন্দে দিনটি কাটাইলাম। নিত্যকর্ম্মের কোন বিঘ্ন ঘটিল না। সন্ধ্যার পর রান্না করিয়া আহার করিলাম।

প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচান্তে মহেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অযোধ্যা ঘাটে পঁহুছিলাম। সরযূর শীতল জলে স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইলাম। সন্ধ্যা তর্পণ সারিয়া ষ্টেশনঘাটে উপস্থিত হইলাম। অসংখ্য লোকের ভিড় দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। সংখ্যাতিরিক্ত লোক জাহাজে উঠিয়া পড়ায়, লাঠি চালাইয়া একদল লোক সাধারণকে জাহাজে উঠিতে বাধা দিতে লাগিল। আমি নিরুপায় দেখিয়া, একজন উচ্চ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলাম, "বাবু সাব্! হাম পড়ে রহেঙ্গে;" কর্ম্মচারীটি আমাকে বলিলেন, "আপ সাধু হ্যায়, চলা আইয়ে সিধা, কই নেহি রোখেগা।" যাহারা লাঠি মারিতেছিল, আমাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিল। আমি জাহাজে উঠিয়া বস্তির টিকেট করিয়া বসিলাম। অল্পক্ষণ পরেই লকরমণ্ডী ঘাটে পঁহুছিলাম। কিছুক্ষণ হাঁটিয়া বালিচড়া পার হইয়া ট্রেন পাইলাম। ট্রেনে বসিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা প্রায় ১০টার সময়ে বস্তি ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে একখানা এক্কাগাড়ি ভাড়া করিয়া হাঁসপাতালের দিকে চলিলাম। ভদ্রলোকটি রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। হাঁসপাতাল কম্পাউণ্ডের বাহিরে, দরজার সম্মুখে এক্কা রাখিয়া আমি নামিয়া পড়িলাম। রাস্তার পাশে জলাশয় দেখিয়া প্রয়োজনে তথায় গেলাম। এসময় এক্কাওয়ালা গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছাড়িয়া দিল। আমার ঝোলা—ঝালী, গাঁটুরী-বস্তা সমস্ত লইয়া এক্কাওয়ালা পলায়ন করিল। আমি এক্কার পিছনে পিছনে একটু ছুটিয়া হয়রাণ হইলাম। আর বৃথা চেষ্টা না করিয়া হাঁসপাতালে চলিয়া আসিলাম। দাদা আমাকে দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। এক্কাওয়ালাকে ধরিতে আর কোন বিশেষ চেষ্টা হইল না। আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি দাদা খরিদ করিয়া দিলেন। কণ্ঠশালগ্রাম কণ্ঠে ছিলেন। কম্বলাদি কতকগুলি জিনিষপত্র জালাপুর হইতে দাদার নামে পার্শ্বেল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সুতরাং কতকগুলি জিনিষ চুরি যাওয়াতেও বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। দাদার নিকট ৩।৪ দিন থাকিব সংকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু দাদার এই মমতায় এতই আরাম বোধ হইল যে অধিক দিন বস্তিতে থাকিতে হইল।

কলিকাতা অভয়বাবুর বাড়ীতে ঠাকুরের সংবাদ।

বস্তিতে কয়েক দিন কাটাইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। রাস্তায় বেশ আরামে কাটাইয়া বেলা প্রায় ১০টার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বৃষ্টি হওয়ার খুব সম্ভাবনা দেখিয়া একখানা ১৮ই ভাদ্র, ১৩০০ সাল। গাড়িতে ভাগিনেয়দের বাসায় ঝামাপুকুরে আসিয়া উঠিলাম। ছেলেরা স্কুলে গিয়াছে। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হওয়ায় অবিলম্বে স্নান-আহ্নিক সমাপন করিয়া শালগ্রামকে এক পয়সার মটরভাজা ও সরবৎ নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ পাইলাম। শূন্য বাসায় ভাল লাগিল না। এখানে সৎসঙ্গীও পাইব না জানিয়া, নিকটে শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসায় চলিয়া আসিলাম। তিনি খুব আদর যত্ন করিয়া আমার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নীচে একখানা পরিষ্কার

ঘরে আমি আসন করিলাম। শ্রীযুক্ত অভয়বাবু আমার গুরুভ্রাতা, পূর্ব্বপরিচিত, সৎসঙ্গী ও পরম সুহৃৎ। কলিকাতায় যে দু'চার দিন থাকিব, এই স্থানেই অবস্থান করিয়া ঢাকা যাইব, মনে মনে স্থির করিলাম; কিন্তু অভয়বাবুর মুখে শুনিলাম, ঠাকুর ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিয়া লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আছেন। সঙ্গে গেণ্ডারিয়া আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। অভয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুরের এ সময়ে অকস্মাৎ কলিকাতা আসিবার কারণ কি?"

অভয়বাবু বলিলেন—গত শ্রাবণ মাসে গোঁসাইজীর গলায় ঘা হইয়া কয়দিন রক্ত পড়িয়াছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গলায় ক্যান্‌সার হওয়াতে কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। গোঁসাইয়েরও গলার ঘা যদি বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় শিষ্যেরা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতা লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা তাঁর চিকিৎসা করাইতে হয় নাই। তিনি সুস্থ হইয়াছেন। রাখালবাবু খুব আগ্রহের সহিত নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ঠাকুরের কি বিনা চিকিৎসায়ই গলার ঘা সারিয়া গেল? অভয়বাবু উত্তর করিলেন,—গেণ্ডারিয়া হইতে কলিকাতা আসার সময়ে গোয়ালন্দ ষ্টীমারে পরলোকগত প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয় প্রকাশ হইয়া গোঁসাইজীকে বলেন, আপনার গলার ঘা সাধারণ অসুখ কালকচুর রস ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবেন সারিয়া যাইবে। গোঁসাই কলিকাতা আসিয়া তাহাই করিলেন। ঘাও সারিয়া গিয়াছে। এখন বেশ সুস্থ আছেন। ঠাকুরের সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থিতির বিষয় শুনিয়া প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল। কতক্ষণে ঠাকুরের নিকটে যাইব তাহাই মনে হইতে লাগিল।

ঠাকুর দর্শন ঃ সঙ্গে থাকার অনুমতি।

বেলা প্রায় ২টার সময়ে অভয়বাবুর সহিত সুকিয়া ষ্ট্রীটে রওনা হইলাম। সুকিয়া ষ্ট্রীটের প্রায় শেষভাগে রাস্তার দিকে গাড়িবারান্দাওয়ালা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ঠাকুর এই বাড়ীর দোতালায় আছেন শুনিলাম। অভয়বাবুকে অগ্রগামী করিয়া পশ্চিমদিকের বাহিরের লোহার ঘুরান সিঁড়ি দিয়া দক্ষিণদিকে গাড়িবারান্দায় উপস্থিত হইলাম। আহারান্তে ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ঠাকুর হলঘরের কতকাংশ পরদা খাটাইয়া একাকী আসনে বসিয়া থাকেন; সুতরাং ওখান হইতেই ঠাকুরকে দর্শন করিয়া সষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর! দয়া করিয়া পাহাড় হইতে যেমন টানিয়া আনিলে, তোমাতে বিশ্বাস-ভক্তি দিয়া অবশিষ্ট দিন তোমারই সঙ্গে রাখ—এই আকাঙ্ক্ষা করি।" ঠাকুর এই সময় মগ্নাবস্থায় ছিলেন, অস্পষ্ট 'হুঁ হুঁ' শব্দে আমার প্রার্থনায় সায় দিয়া মাথা তুলিয়া বসিলেন, এবং আমাকে দেখিয়া স্নেহপূর্ণ হাসিমুখে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কোথা হ'তে এ'লে? হরিদ্বার হ'তে কবে এসেছ? আজ আহার হয়েছে কিনা?" আমার আহার হয় নাই বলাতে, ঠাকুর যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—"কিছু

খাবার এনে দে।" যোগজীবন উৎকৃষ্ট খাবার আনিয়া ঠাকুরের নিকট ধরিলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে দিবাভাগে আহার, বিশেষতঃ মিষ্টি খাওয়া আমার পক্ষে নিষেধ থাকিলেও, ঠাকুরই আমাকে সম্মুখে বসাইয়া রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি স্বহস্তে প্রদান করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইলেন। পরে একটু সময় চুপ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের এত আদর-যত্ন পাইয়াও আমি উদ্বেগশূন্য হইতে পারিলাম না। ঠাকুরের কথা মনে হওয়ায় ভিতরে বিষম তোলপাড় আরম্ভ হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"এবার ব্রহ্মচারী হয় এদিক্ না হয় ওদিক্ হবে। হরিদ্বারে গিয়ে ঠিক মত চল্‌তে পার্‌লে খাঁটী ব্রহ্মচারী হ'য়ে সন্ন্যাসপথে চল্‌বে, না হয় গৃহস্থালী কর্‌তে হবে।" এবার আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না। পাহাড়ে থাকা আমার সার্থক হইয়াছে কি না, ঠাকুর আমাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া চিরকালের মত সন্ন্যাসপথে চালাইবেন কি না অথবা গৃহস্থালী করিতে পাঠাইবেন ঠাকুরই জানেন। এ বিষয়ে ঠাকুরের পরিষ্কার কথা না পাওয়া পর্য্যন্ত আর শান্তি নাই। আমি এ সকল ভাবিতেছি এমন সময় ঠাকুর খাতায় লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি পড়িলাম—"তোমাকে যে উদ্দেশ্যে পাহাড়ে পাঠান হয়েছিল তাহা সফল হইয়াছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে অথবা যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পার। আজই তুমি এখানে আসন আনিতে পার।" ঠাকুরের দয়া দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। ঠাকুর আমার শালগ্রামটি দেখিতে চাহিলেন। আমি কণ্ঠ হইতে উহা খুলিয়া ঠাকুরকে দেখাইলাম। ঠাকুর একটু সময় উহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"চক্রটি খুব ভাল।" আমি আজই সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিব স্থির করিয়া, ঠাকুরকে জানাইলাম এবং প্রণাম করিয়া অভয়বাবুর সঙ্গে তাঁহার বাসায় আসিলাম। ভাতে সিদ্ধ ভাত কোন প্রকারে রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলাম। অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে প্রসাদ পাইয়া ঝোলাঝুলি সহিত সুকিয়া ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম। ৪১নং বাড়ীর পশ্চিমদিকের গলিপথে কয়েক ফুট উত্তরদিকে চলিয়া ঘুরান লোহার সিঁড়ি পাইলাম। উপরে উঠিয়া পশ্চিমদিকের সরু বারান্দা দিয়া বাড়ীর দক্ষিণে প্রকাণ্ড গাড়ীবারান্দায় পঁহুছিলাম। বাড়ীর পশ্চিমের কোঠাখানা রাখালবাবুর বৈঠকখানা ঘর। উহার ভিতরে টেবিল, চেয়ার, সাজসজ্জা, আস্‌বাব্ দেখিয়া অবাক্ হইলাম। এই বৈঠকখানাঘরের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে উহা অপেক্ষা বড় একখানা হলরুম। ঠাকুর এই হলরুমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গাড়ীবারান্দায় যাওয়ার দরজার ২।৩ ফুট উত্তরে দেওয়াল ঘেঁসিয়া পশ্চিমমুখে আসন করিয়াছেন। আমি গাড়ীবারান্দার উপর গিয়া দেখি—বহুলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; হলরুমও লোকে পরিপূর্ণ। আমি ঘরের সম্মুখে বারান্দায় সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ামাত্র ঠাকুর আমাকে দেখিয়া 'হুঁ হুঁ' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে যাইতেই ঠাকুর আমাকে তাঁর বামপার্শ্বের দরজার পশ্চিমধারে দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া উত্তরমুখে আসন পাতিতে বলিলেন। ঠাকুরের আসন হইতে প্রায় চারি হাত অন্তরে উত্তর-

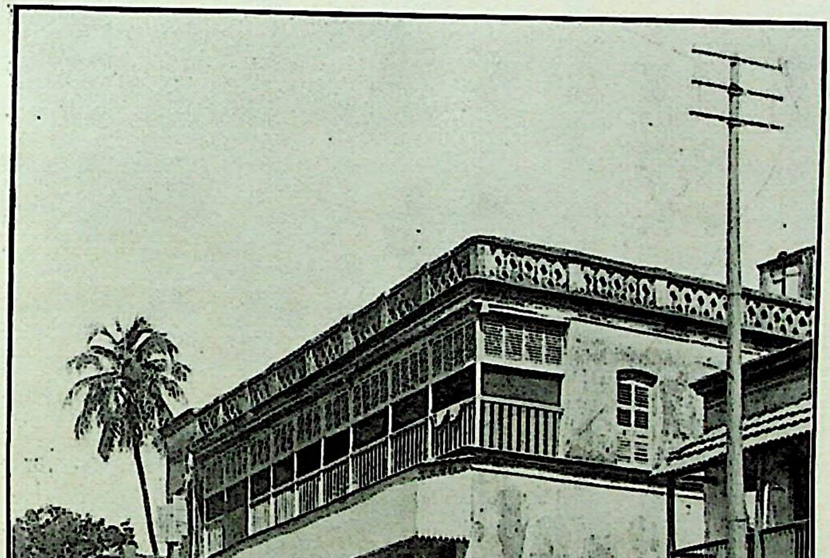

৪১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট (রাখাল বাবুর বাড়ী)   পৃষ্ঠা ৭০

মুখে আমি আসন করিয়া বসিলাম। ঠাকুর ইঙ্গিতে বলিলেন—"দিনরাত তুমি এখানেই থাকিও।" ঠাকুরের এই অসাধারণ দয়া দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমি স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

পরলোক সম্বন্ধে কথা ঃ গীতা ও ভাগবতের ধর্ম্ম।

আজ গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে পরলোক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃত্যুর পরে সকলকেই কি একস্থানে যাইতে হয়? মৃত বন্ধুবান্ধবরা কেহ পরলোকের পরিচয় দেন না কেন?"

ঠাকুর লিখিলেন—"মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, পরলোক জানিতে ব্যাকুল হয়। পরলোকের কথা শুনে, বলে। কিন্তু মরিয়া গেলে সে ব্যক্তি নিজের বন্ধুদের নিকট আসিয়া কোন কথা বলিতে যত্ন করে না।—ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, পরলোক সকলের পক্ষে এক প্রকার নহে। ধার্ম্মিক, যিনি নানা কামনা করিয়া ধর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহার পরলোক এক। যিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহার অন্য প্রকার। পাপীদিগের প্রকৃতি অনুসারে নানাপ্রকার পরলোকের অবস্থা। এজন্য যাঁহারা পরলোকে যান, সক্ষম হইলেও, পৃথিবীর লোকদিগকে তাহা বলা প্রয়োজন মনে করেন না।—বলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না।"

প্রশ্ন—'গীতার ধর্ম্ম ও ভাগবতের ধর্ম্ম কি এক? ইহাতে কি একই অবস্থা লাভ হয়?'

ঠাকুর লিখিলেন—"ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবৎ এই দুইখানি গ্রন্থ উপনিষদের ভাষ্য স্বরূপ। গীতা এবং ভাগবতের প্রণালী মত সাধন করিলে ঋষিদিগের প্রাণের কথা—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়; তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের দুইটি ভাব নিত্য এবং লীলা। নিত্য সাধন গীতা দ্বারা হয়; লীলা সাধন ভাগবৎ দ্বারা হয়। 'ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি, শোকং তরতি চাত্মবিৎ। রসোব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দি ভবতি নান্যথা॥' ব্রহ্মবিৎ পরমপদ লাভ করেন, আত্মাবৎ শোক হইতে মুক্ত হন। রস স্বরূপ ব্রহ্মের রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়—অন্য উপায়ে আনন্দ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ, ভগবত্তত্ত্ব,—এই তিন প্রকার সাধন ইহার অভ্যন্তরে।"

ভক্তি ভালবাসা নয় ঃ ভক্তি গোপনীয়া।

প্রশ্ন—'ভক্তি ও ভালবাসা, সবই কি মায়া?'

ঠাকুর—"ভক্তি ভালবাসা নয়। ভক্তি ভজন, ভালবাসা আসক্তি। পুত্রকে স্নেহ

করি, বন্ধুকে ভালবাসি, এ সকল মায়া। পুত্রকে পূজা করি, কন্যাকে পূজা করি স্ত্রীকে ভক্তি করি, পূজা করি। পূজা কি।—ভগবানের পাদপদ্ম সেই ভাবে পূজা করিলে—ভক্তি। এ সব মায়া নয়।”

প্রশ্ন—‘ভক্তি কি প্রকারে লাভ হয়? রক্ষাই বা কি প্রকারে করা যায়?’

ঠাকুর—“ভক্তি সাধ্য সাধনায় হয় না। যাহার হয় সেই ধন্য। ভক্তিতে বিচার নাই। পুত্র ধুলি মাখা থাক্‌, আর পরিষ্কার থাক্‌—পিতা অমনি তাকে কোলে তুলে নেন্‌। পুত্র হওয়ার পূর্ব্বে অপত্যস্নেহ কেমন কেহই বুঝে না। ভক্তি অহৈতুকী—ভাল-মন্দ বিচার করেন না। ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য—তিনজন বৃদ্ধ ছিলেন। ভক্তিদেবী বৃন্দাবনে যাইয়া যুবতী হইলেন। জ্ঞান, বৈরাগ্য বৃদ্ধই রহিলেন। ভক্তিকে কৃপণের ধনের ন্যায় গোপনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সহিত উহার তুলনা করিয়া থাকেন। বালিকা মুক্তদেহে ঘুরিয়া বেড়ায়, যুবতী হইলে স্তন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। স্বামী ব্যতীত পিতা মাতা গুরুজন কেহ তাহা দেখিতে পান না—ভক্তিও তদ্রূপ। ভগবান ব্যতীত সকলেরই নিকট সন্তর্পণে গোপনে রক্ষণীয়া। প্রথম প্রথম যখন ভাবের উচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল, একটু চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তখন ভাবিতাম—লোকে দেখুক। পরে দেখি—ইহা কি করিয়া গোপন করিব? তখন ইহা হৃদয়ের নিভৃত স্থানে গোপন করিতে ইচ্ছা হইত। ভক্তি গোপনীয়া।”

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—“প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা”, লোকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেই ক্ষতি। যেমন কোন বৃক্ষে ফল ধরিলে, কালো হাঁড়িতে চুণের দাগ দিয়া অথবা খড়ের মানুষ দিয়া রাখে, সেই রকম সাধনের অবস্থা লাভ হইলে বালক, উন্মত্ত ও পিশাচবৎ আবরণ দিয়া রাখিতে হয়। ইহা অপেক্ষা একজন যদি গালাগালি দেয়, তাহাতেও উপকার হয়। ভাব ইত্যাদি চেপে রাখাই ভাল। খুব চেষ্টা করিতে হইবে, না পারিলে নিরুপায়। মোটে কিছু না হয়, চুপ করে বসে থাকে সেও ভাল, কিন্তু কিছু হ’য়ে অহঙ্কার হইলেই সর্ব্বনাশ। কুকুর বানরকে লাই দিলেই ঘাড়ে চড়িবে। আসা মাত্রই যদি শাসন করা যায়, তবে দূরে গিয়ে বসে থাকে, কিছু খাবার দিলে ত খেলে। প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ।

সন্ধ্যার সময়ে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তনের আনন্দে সকলেই মাতিয়া গেলেন। ঠাকুর

নির্ব্বাত প্রদীপের মত একই ভাবে সমাধিস্থ। কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর স্বহস্তে হরিরলুটের বাতাসা চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ গুরুভ্রাতারা ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আনন্দ করিয়া আপন আপন আবাসে চলিয়া গেলেন। আমি ঠাকুরের তিন চারি হাত অন্তরে নিজ আসনে শয়ন করিয়া সুখে রাত্রি কাটাইলাম।

১৯-২০ ভাদ্র।

শেষ রাত্রি ৪টার সময় জাগিলাম। উঠিয়া দেখি সকলেই নিদ্রায় অভিভূত। ঠাকুর নিজ আসনে সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া বাড়ীর কোথায় জল, কোথায় কল, কোথায় পায়খানা, কিছুই জানিয়া নিতে পারি নাই। সুতরাং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অভয়বাবুর বাসায় চলিয়া গেলাম। সেখানে শৌচান্তে স্নান করিয়া শালগ্রামের জন্য ফুল তুলসী গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিলাম। নিয়মিত সন্ধ্যা, তর্পণ ও ন্যাস করিয়া শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিলাম। বেলা ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শালগ্রামকে গঙ্গাজল তুলসীপত্র অর্পণ করিলাম। ঠাকুরের নিকটে বসিয়া শালগ্রাম পূজার বড়ই আনন্দ পাইলাম। সাড়ে তিনটার সময়ে অভয়বাবুর বাড়ী যাইয়া ভিক্ষান্ন রান্না করিয়া শালগ্রামকে ভোগ দিলাম। আহারান্তে সন্ধ্যার সময় সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিলাম। দর্শনার্থী বহুলোক ঠাকুরের আসন-ঘর (হলরুমটি) পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে দেখিলাম।

শাসনে নয়, ভালবাসায় সংশোধন ঃ

অতিথির অবৈধ আব্‌দার পূরণ করা উচিত কি না ?

একটী অবস্থাপন্ন কৃতবিদ্য গুরুভ্রাতা ছেলের দুশ্চরিত্র ও অবাধ্যতায় ক্লেশ পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছোট ছোট ছেলেপিলেরা কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'লে তাদের কিভাবে শাসন করা যায় ?"

ঠাকুর—"শাসন করা ক্রোধ পূর্ব্বক করিলে শাসনের ফল হয় না। ধীরভাবে বিচারকের ন্যায় বালকদের শাসন করা প্রয়োজন। তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু শুনিলে, বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে। ছেলে-পিলেদের সর্ব্বদা অসৎ সঙ্গে যাইতে নিষেধ করা, অসৎ সঙ্গের দোষ নানা পুস্তক হইতে দেখান ;—ইহাতে না শুনিলে অন্য প্রকার শাসন—প্রহার নহে। কঠোর শাসনের দ্বারা ভাল হইবে না। এ কলির ধর্ম্ম—কালগুণে এসব হইবে। উহাদিগকে পিতামাতা সর্ব্বদা ঐ অন্যায় কার্য্যের বিষময় ফল দেখাইবেন। এ যুগে শাসনের দ্বারা কোন ফল হইবে না—ভালবাসিয়া সংশোধন করিতে হইবে। পিতামাতার কথায় যদি সন্তানের মর্ম্মে আঘাত লাগে, তাহাতে প্রায়ই মৃত্যু হয়—নতুবা গৃহত্যাগ করে।"

একজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'গুরুজ্ঞানে অতিথি-সেবা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু অতিথি যদি মদ গাঁজা খাইতে চাহেন, অথবা ঐরূপ একটা অন্যায় জেদ করেন, তাহার কোন প্রতিবাদ করিব কি না ?'

ঠাকুর—"অতিথির ধর্ম্মমতে ভ্রম থাকিলে তাহার সংশোধন করিয়া অতিথি-সেবা করিবে না। তখন তাঁহার প্রয়োজনীয় অর্থাৎ ধর্ম্মতঃ যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর যদি তিনি থাকেন, তবে তাঁহার মতের অবৈধতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অতিথির অর্থ—যিনি কোন দিন আসেন নাই, অথচ ক্ষুধার্ত্ত। অতিথি গুরু, তিনি যাহা সেবা করেন তাহা দিতে বাধ্য। অতিথির নাম-ধাম কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। ক্ষুধার সময়ে তাঁহাকে সংশোধন করিতে বসা, নিষ্ঠুরতা। ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন না হইলে যিনি নেশার জন্য মাদক সেবন করেন—সে অতিথিকে মাদক দ্রব্য দিতে বাধ্য নহি। বাহিরের মদ শরীরের উপর কার্য্য করে। যদি নেশা না হয় তবে ইহা ধর্ম্মপথের বাধক নহে। কিন্তু কাম ক্রোধ—ইহার মত মাদক আর নাই। এই মাদকে ধর্ম্ম নষ্ট হয়; ভগবান হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইহা যিনি ত্যাগ না করেন, তিনিই মাদক সেবন করেন।"

সন্ধ্যার সময়ে সংকীর্ত্তনের খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে আনন্দ করিয়া গুরুভ্রাতারা চলিয়া গেলেন।

কলিকাতায় ভিক্ষায় অসুবিধা ঃ ঠাকুরের ভাণ্ডার হইতে ভিক্ষা নিতে আদেশ।

আজও শেষ রাত্রে উঠিয়া অভয়বাবুর বাড়ী গেলাম। শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া স্নানান্তে ফুল-তুলসী সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের নিকট আসিলাম। সন্ধ্যা, তর্পণ, হোম এবং ন্যাস করিতে বেলা ৯টা হইল। চণ্ডী, গীতা প্রভৃতি ঠাকুরের ৩।৪ হাত অন্তরে বসিয়া পাঠ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। বিশেষতঃ তিনি ১১টা পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। আমি ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিয়া ১২টি সচন্দন তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল শালগ্রামকে প্রদান করিলাম। পরে অপরাহ্ণে ৩টা পর্য্যন্ত নাম জপের সঙ্গে ঠাকুরের রূপ শালগ্রামে ধ্যান করিয়া তুলসী গঙ্গাজল ঠাকুরের চরণে দিলাম। আহারের জন্য বড়ই অসুবিধা উদ্বেগ বোধ হইতেছে। কলিকাতা সহরে ভিক্ষার বড় অসুবিধা। অপরিচিত স্থলে নিন্দা ও অবজ্ঞা ভোগ হয়, পরিচিত স্থলেও লজ্জা, সঙ্কোচ ও অভিমানে বাধা দেয়। সাড়ে তিনটার সময়ে আসন ছাড়িয়া উঠিলাম এবং ভিক্ষায় বাহির হইলাম। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ী ভিক্ষা করিয়া, তথায়ই রান্না করিয়া প্রসাদ পাইলাম। কল্য আবার কোথায় ভিক্ষা করিব ভাবনা আসিল, উদ্বেগও বোধ হইতে লাগিল। আমি মনে মনে ঠাকুরকে ভিক্ষার অসুবিধা

জানাইলাম। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্র, ঠাকুর একখানা কাগজে লিখিয়া যোগজীবনকে দিলেন এবং উহা দিদিমাকে শুনাইতে বলিলেন। যোগজীবন আমাকেও পড়িয়া শুনাইলেন —"ব্রহ্মচারী যতদিন কলিকাতা থাকিবেন, অন্যত্র ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। এখান হইতে নিজের প্রয়োজন মত বস্তু গ্রহণ করিয়া পাক করিয়া খাইবেন। এখানকার সমস্তই ভিক্ষান্ন। এজন্য অন্য স্থানে ভিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। যদি ইচ্ছা হয়, মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করিতে পারেন। আহারের মাত্রা ও সময় স্থির না থাকিলে শরীর ভগ্ন হয়। শরীর অসুস্থ হইলে সাধন-ভজন কিছুই হয় না। সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।" ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আমার উপরে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আগামী কল্য হইতেই ঠাকুরের ভাণ্ডার হইতে আমি একপাকে রান্না করিবার মত বস্তু গ্রহণ করিয়া প্রসাদ পাইব স্থির করিলাম।

যোগজীবন কর্ত্তৃক ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ ঃ ঠাকুরের তিন গণ্ডূষ জলদান।

এই কয়েক দিন শালগ্রাম পূজার পর অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণবাবুর বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়াছি। তথায় মেয়েরা আমাকে বড়ই যত্ন করেন। উননটি ধরাইয়া ভিক্ষার উপকরণ সম্মুখে আনিয়া দেন। নিজের প্রয়োজন মত একপাকে রান্নার বস্তু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী সকল ফিরাইয়া দেই। ভাতে ভাত, কখনও বা খিচুড়ী রান্না করিয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করি। ঐ সময়ে ঐ বাসায় অনেক গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। অভয়বাবু প্রভৃতির মুখে ঠাকুরের অনেক কথা শুনিলাম। আমি হরিদ্বারে ছিলাম বলিয়া এ সকল কথা কিছুই জানি নাই। ঠাকুরের লীলা-কাহিনী, কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ শুনিতে ও ভাবিতে বড়ই আনন্দ পাই। তাই অতীত কয়েকটি ঘটনার বিষয় যেমন শুনিলাম, ডায়েরীতে লিখিতেছি। শুনিলাম, গত চৈত্রমাসের শেষ ভাগে আমাদের পরমারাধ্যা ঠাকুরমাতা ৺স্বর্ণময়ী দেবী ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ঠাকুরের সম্মুখে দেহত্যাগ করেন। ঠাকুর সন্ন্যাসী ; সুতরাং মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য ও পিণ্ডদানে অধিকার নাই বলিয়া, পুত্র যোগজীবনকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন এবং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে কেশববাবুর নববিধান মন্দিরের পশ্চাৎদিকে ৯০.৫ নম্বর শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসায় উঠিলেন। তথায় থাকিয়া একাদশ দিবসে যোগজীবনকে লইয়া গঙ্গাতীরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাবান্ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া যোগজীবন দ্বারা কুলপ্রথা অনুসারে যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিলেন। এ সময়ে ঠাকুরও স্বয়ং তিন গণ্ডূষ গঙ্গাজল লইয়া মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। ঠাকুর তখন লিখিয়াছিলেন,—"মাঠাকরুন

যোগজীবনের শ্রাদ্ধ ও আমার প্রদত্ত তিন গণ্ডূষ গঙ্গাজল আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।” শ্রাদ্ধান্তে ঠাকুর যোগজীবন প্রভৃতিকে লইয়া বাসায় আসিলেন।

শ্রাদ্ধবাসরে মুকুন্দের কীর্ত্তন ঃ কার্ত্তনে শক্তি-সঞ্চার।

ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাগণ বাসার সংলগ্ন সম্মুখের বিস্তৃত জমিটি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ছাউনি দিয়া কীর্ত্তনের আসর পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর বাসায় পঁহুছিবামাত্র, ভক্ত কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ দাসের মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে দর্শকবৃন্দ আসিয়া কীর্ত্তনস্থল পরিপূর্ণ করিল। ঠাকুর শিষ্যগণ সহিত কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ভূমিতে লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে দাঁড়াইলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দ মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ঠাকুর উর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক ভাবাবেশে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।—কলিজীবের ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই।” ঠাকুরের এই হৃদয়স্পর্শী মধুর বাণী বালক-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই অন্তরে প্রবেশ করিল। সকলেরই গণ্ড বহিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য! শ্রবণমঙ্গল মধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ কম্পিত হইতে লাগিল। মস্তকের লম্বিত জটাভার খাড়া হইয়া উঠিল। ঠাকুর সম্মুখে পশ্চাতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে উচ্চ হরিধ্বনি হইতে লাগিল। সমাগত ব্যক্তিগণ বিস্ময়ের সহিত ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুরের গদ্‌গদ্ কণ্ঠের হরিধ্বনিতে কি জানি কি এক মহাশক্তি সঞ্চারিত হইল। দর্শকমণ্ডলী নানা স্থানে ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সংকীর্ত্তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া বহুক্ষণ সমান উদ্যমে চলিল। মহাভাবের বন্যায় ভক্ত গুরুভ্রাতারা দিশাহারা হইলেন। ঠাকুর কতক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। চারিদিক্ হইতে গগনভেদী হরিধ্বনি উত্থিত হইল। ঠাকুর ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। তখন সংকীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি ধীরে ধীরে নীরব হইল।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের সুস্বাদু ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া কাঙ্গালীদের চাউল, ডাল ও পয়সা বিতরণ করাইলেন। সহরের গুরুভ্রাতাভগ্নিগণ পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া ঠাকুরের সঙ্গলাভে ধন্য হইলেন। বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত হইল।

ঠাকুরমা'র মৃত্যুতে তত্ত্ব প্রকাশ ঃ জীবাত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ ঃ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা কেন ?

গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরমা দেহত্যাগের পর কি করিলেন ? সাধারণ লোকের দেহত্যাগের পর কি হয় ?" ঠাকুর লিখিলেন—"মাতার মৃত্যুতে অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হয়। মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া, ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ঘুরিতে থাকেন। দেহ ঘর হইতে বাহিরে আনিলে প্রশস্ত আকাশে আত্মা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করেন। তখন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। যদি পুণ্যাত্মা হয় তবে পিতৃলোকে অথবা মাতৃলোকে লইয়া যান এবং তাঁহাকে লইয়া এক বৎসর কাল আনন্দ করেন। এক বৎসর পরে যাঁহার যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। এই এক বৎসর শ্রাদ্ধের ফল ভোগ করেন। পাপাত্মা হইলে এক বৎসর উৎকট পাপ-যন্ত্রণা ভোগ করেন।—এই প্রকার অনেক ঘটনা মাতা জানাইতেছেন। ইহা আমার পক্ষে আনন্দজনক ঘটনা।"

একটি ব্রাহ্মভাবাপন্ন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—জীবাত্মা পরলোকগত কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ করে ? দুঃখী-দরিদ্র, কাঙ্গালীদের না খাওয়াইয়া শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা কেন ? ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন—"জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ,—এই ত্রিবিধ দেহেতেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। স্থূল দেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইলে তাহা স্থূল দেহ গ্রহণ করে। উত্তম পদার্থ হইলে প্রতিগ্রাসেই তৃপ্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহে কেবল আহারের বস্তু দর্শনমাত্র তৃপ্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। কারণ শরীরে, শরীর নিজে কিছু করিতে পারে না। কোন ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ যদি খাদ্যবস্তু দ্বারা স্বীয় জঠরাগ্নিতে হোম করেন, তদ্দ্বারা পরলোকবাসীর কারণ দেহের তৃপ্তি হয়,—ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হয়। এইজন্যই শ্রাদ্ধপাত্র, ঘৃত, পায়স ব্রাহ্মণকে দেওয়ার প্রথা আছে।" ঠাকুর পরলোক আত্মার তৃপ্তি, পুষ্টি ও মুক্তি বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন।

ঠাকুরমা'র শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে ঠাকুরের লেখা—"যথাবিধি গয়ায় পিণ্ডদানে প্রেতাত্মার মুক্তি হয়। মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর পিতৃলোক মাতৃলোকদিগের সহিত আসিয়া সকলেই আমাকে বলিলেন যে, একাদশ দিবসে যোগজীবন তাঁর শ্রাদ্ধ করিবে,—তাঁর নামে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিবে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে ও

দুঃখীকে দান করিবে। অপর পক্ষে গয়ায় গিয়া পিণ্ড দান করিবে। অপর পক্ষে, আশ্বিন মাসে দান—যথাসাধ্য তণ্ডুল, বস্ত্র, জলপাত্র, ফল-মূল, খাদ্যবস্তু ইত্যাদি। শাস্ত্রমতে এখন পিণ্ডদান হইতে পারে না। উন্মাদ রোগের সময় যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত না হইতে মৃত্যু হইয়াছে। এজন্য হয় এক বৎসর পরে কুশ-পুত্তল করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, অথবা অপর পক্ষের সময় গয়ায় গিয়া পিণ্ড দান করিতে হইবে। এখন মাত্র তণ্ডুল, বস্ত্র, ভোজনপাত্র, জলপাত্র এবং অন্যান্য বস্তু তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দুঃখীদিগকে দান করিতে হইবে।"

ঐ সময় ঠাকুরমার দেহত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও লিখিলেন—"আমার মাতাঠাকুরাণী বিধুর কোলে দুধ খাইতেছিলেন, এমন সময়ে আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখি এখন বাহিরে নেওয়া কর্ত্তব্য। বাহিরে নিয়া শোয়াইলাম। মুখের সুন্দর শোভা হইল। মনে হইল যেন সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া শান্তি পাইলেন। ঠিক এই সময় আমার পানে তাকাইয়া রহিলেন। চারিদিকে হরিনাম হইতেছিল। কেলে কুকুর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।

পরমহংসদেবের উৎসবে নিমন্ত্রণ।

১৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার;
১৩০০ সাল।

আজ জন্মাষ্টমী। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধিস্থানে আজ খুব সমারোহের কীর্ত্তনোৎসব। ঠাকুর সশিষ্যে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। গুরুভ্রাতারা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। আমাকে সকলে যাইতে বলিলেন। ঠাকুর না বলিলে আমি নিজ হইতে যাইতে সাহস পাই না, সকলকে জানাইলাম। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলেই তো আপনার সঙ্গে উৎসবে যাইবে, ব্রহ্মচারী যাইবে না? ঠাকুর বলিলেন,—"যেতে আর আপত্তি কি! তবে শালগ্রাম পূজা শেষ করে, ইচ্ছা হলে যেতে পারে।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া বুঝিলাম; আমার যাওয়া হবে না। আমি ৩টা পর্য্যন্ত শালগ্রামকে তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া নিয়ম মত পূজা করিলাম। পরে শূন্য বাসায় থাকিতে আর ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর বাসায় গেলাম। অভয়বাবুর বাসার ছোট ছেলেপিলেগুলিও ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়াছে। পরিবারটিতে ধর্ম্ম যেন সর্ব্বদাই বিরাজমান। খেলা করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী বাসার একটী ছোট বালিকা, অভয়বাবুর ভাইঝি—রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ ভাই, তোর গুরু তো ভগবান, আমার গুরু ভগবান নন?" রাধারাণী উত্তর করিল—"হাঁ ভাই, সকলেরই গুরু ভগবান; তবে কারো ভেবে চিন্তে, কারো সত্যি সত্যি!" মেয়েটির বয়স ৬ বৎসর মাত্র।

সত্যদাসীর অলৌকিক অবস্থা ও দীক্ষা।

অভয়বাবুর ভাগিনেয়ী বালিকা সত্যদাসীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বজন্মে সে কোন পাহাড়বাসী মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছিল। তাঁহারই কৃপায় সময় সময় বালিকার গুরুস্মৃতি হয়। তখন সে ফুল চন্দন সংগ্রহ করিয়া গুরুর আসনের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করে। এই পূজার সময়ে কখন কখন ভক্তিভাবে বাহ্যসংজ্ঞাবিলুপ্ত হয়। ৩।৪ ঘণ্টাকাল সমাধিস্থ হইয়া থাকে। যুক্তবর্ণের ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় গুরুর স্তব-স্তুতি করে; তখন গুরুর চরণ-চিহ্ন পরিষ্কাররূপে আসনে পড়ে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের লক্ষণ সমস্ত পুনঃপুনঃ দেখিয়া বাসার সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন। ঠাকুরের এই বাসায় আসিবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে সত্যদাসীকে তাঁহার গুরু বলিলেন—"মা, এখানে খুব শীঘ্রই এক মহাপুরুষ আসিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিও।" সত্যদাসী গুরুকে বলিল—"আপনি তো রয়েছেন, আবার অন্যের কাছে দীক্ষা কেন?" মহাপুরুষ বলিলেন—"বর্ত্তমান যুগে কতকগুলি লোক ইঁহার আশ্রয় পাইয়া মোক্ষলাভ করিবে—ইহাই ভগবানের বিধান।" ঠাকুর মাতৃশ্রাদ্ধ করাইতে যোগজীবনকে লইয়া ৪।৫ দিনের মধ্যেই এই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যদাসী ঠাকুরের নিকট গুরুর আদেশ জানাইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিল। ঠাকুর বলিলেন—"তোমার গুরুর আদেশ আমার শিরোধার্য্য। অবিলম্বেই তোমাকে দীক্ষা দিব।" অচিরেই ঠাকুর সত্যদাসীকে সাধন দিলেন। সাধনের সময়ে গুরুশক্তি প্রভাবে সত্যদাসী আসন হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ঘরের ভিতরে শূন্যে অবস্থান করিয়াছিল। ধন্য সত্যদাসী! ধন্য গুরুদেবের অসাধারণ কৃপা! এই কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

সত্যদাসীর নানাপ্রকার অলৌকিক অবস্থা দেখিয়া, তাহার পিতামাতা রোগ অনুমানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং সত্যদাসীর কল্যাণের জন্য পুনঃপুনঃ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর তাহাতে লিখিলেন—"সত্যদাসীর পিতামাতা তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। কারণ ইঁহারা কখনই এরূপ অবস্থা দেখেন নাই। সংসারের সমস্ত লোক পীড়া বলিয়া চীৎকার করিতেছে। একজন কি দু'জন যদি বলে পীড়া নহে, তাহাতে কোন ফল হয় না। তবে রোগ বলিয়া মহাত্মাদিগকে আরাম করিয়া দেও বলিয়া, পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলে অবজ্ঞা করা হয়। মহাত্মাগণ 'রোগ নয়' বলিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, সেকথা না শুনায় লাভ কি? পীড়া কোথায়? জ্বর আছে? ভেদ বমি কি হয়? উদরে ব্যথা আছে? হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ, প্লীহা, পাকাশয়, মূত্রাশয়, গর্ভাশয়, এ সম্বন্ধে শারীরিক পীড়া আছে? যদি না থাকে, তবে পীড়া নাম কেন?"

মোহিনীবাবুর দীক্ষায় অনুভূতি।

শুনিলাম, এই বাসায় হুগলী জেলার অন্তঃপাতি রণবাজপুর নিবাসী, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, সত্যনিষ্ঠ, পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুরের কৃপা তাঁহার উপরে অসাধারণ। সাধন গ্রহণের পর তাঁর অবস্থা বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল।—শুনিয়া আনন্দ হইল। দীক্ষাগ্রহণের পরই মোহিনীবাবুর যে অবস্থালাভ হইয়াছিল, ছোড়্‌দাদার ডায়েরী হইতে অতি সংক্ষেপ তাহা আমি এই স্থানে তুলিয়া দিলাম। মোহিনীবাবু লিখিয়াছেন—"আমি রাত্রি ১টার সময়ে দীক্ষা পাইয়া, পরদিন প্রত্যূষে যেমন নীচে নামিয়াছি, আমার হঠাৎ সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব্ব তড়িৎপ্রবাহ সর্ সর্ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুতে আপনা আপনি গুরুদত্ত নাম, মিষ্ট হইতে মিষ্ট হইয়া চলিতে লাগিল। আমি এক আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলাম। যে দিকে তাকাই সমস্তই আনন্দ ক্ষরণ করিতেছে; গাছ, লতা, পাতা, সমস্ত পৃথিবী সুবর্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল।—আমি মধুময় হইয়া গেলাম। আর আনন্দবেগ ধারণ করিতে পারিলাম না। পাখীগুলি ডাকিতেছে, যেন মধুবর্ষণ করিতেছে; সমস্তই মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধুরং। এই অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন প্রায় মাসেক কাল সম্ভোগ করিয়াছি।"

মোহিনীবাবুর সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, বিনয়, উপাসনায় ভাব-উচ্ছ্বাসের প্রবণতা দেখিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মোহিনীবাবুর দ্বারা ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত যোগ-ধর্ম্মের যথার্থ পরখ্ হইবে, ব্রাহ্মেরা অনেকে এরূপ মনে করিয়াছিলেন। মোহিনীবাবুর সঙ্গলাভে তাঁহারা উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইয়া ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছুকাল হয় তাঁহারাও ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

জ্ঞানবাবুর দীক্ষা।

শুনিলাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী আনগুণা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাজরা মহাশয়ের দীক্ষাও এই বাসায় হইয়াছিল। তাঁহার দীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনা সকল বড়ই সুন্দর। সংসারে নানা প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তির ভিতরেও ঠাকুর নিজ জনকে কি ভাবে আকর্ষণ করিয়া চরণতলে স্থান দেন, জ্ঞানবাবুর দীক্ষাগ্রহণ তাহার একটী নিদর্শন। এই সম্বন্ধে জ্ঞানবাবু নিজে যাহা ছোটদাদার ডায়েরীতে বিস্তৃতভাবে লিখিয়া দিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম। জ্ঞানবাবু লিখিয়াছেন—"আমি ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলাম। পদ্ধতি মত উপাসনায় অশ্রু পুলকাদি ভাব হইত, কিন্তু কোন ভাব স্থায়ী হইত না, প্রাণের অভাবও মিটিত না। এ সকল বিষয় গোঁসাইয়ের শিষ্য আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্তকে জানাইলে তিনি বলিলেন—"গুরুকরণ না হ'লে ধর্ম্মের কোন ভাব স্থায়ী হয় না।" তিনি গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষা লইতে উপদেশ দেন। গোঁসাই তখন শ্যামবাজারে ছিলেন। আমি দেবেনদাদার সঙ্গগুণে গোঁসাইয়ের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলাম

যে, প্রত্যহ কলেজে না যাইয়া বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতাম। গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা দেবেনদাদাকে জানাইতে বলিলাম। দেবেনদা গোঁসাইকে আমার কথা জানাইলে, গোঁসাই বলিলেন—"উহার বীর্য্য অত্যন্ত তরল হইয়াছে। শীঘ্র পড়া ছাড়িয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া না গেলে, পাগল হইয়া যাইবে।" তাহাতে দেবেনদা জিজ্ঞাসা করিলেন —তবে এখন ইহার কি কর্ত্তব্য? গোঁসাই বলিলেন—"উহার পক্ষে এখন কাশী যাইয়া বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার আরতি দর্শন, গঙ্গাস্নান ও সাধু-দর্শন কর্ত্তব্য।" আমি গোঁসাইয়ের আদেশমত শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের এক শিষ্যের সঙ্গে কাশী পঁহুছিলাম। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—সাধু-দর্শন মানসে আপনি আমার নিকট আসিলেন, আমি আপনাকে দীক্ষা দিব—এই অভিপ্রায়ে গোস্বামী মহাশয় আপনাকে কাশী পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদের প্রথা মত পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলাম। তৎপরে রাণীগঞ্জ আসিয়া দেড়মাস রীতিমত সাধন করিলাম। কিন্তু তাহাতে অন্তরের সমস্ত সরস ভাব শুকাইয়া গেল। প্রত্যুত প্রাণে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হইল। এই সময়ে আমি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নগেন্দ্রবাবুর পরামর্শে গোঁসাইকে সমস্ত অবস্থা লিখিয়া জানাইলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। ১২৯৮ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাজলে এই সাধন ত্যাগ করিলাম। বৈশাখ মাসে ভূতানন্দ স্বামী কলিকাতায় আসিলেন। আমি রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতাম। গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে জীবনের ব্যাকুলতার পরিচয় দেই এবং লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে দীক্ষা পাওয়ার কথা বলি। তিনি উত্তরে বলিলেন—"আরে বেটা তোম্ এইছা বুরবাক্ হ্যায়। পাঁচ রুপিয়ামে যোগ মিল্‌তা হ্যায়, যো লাখ রুপিয়ামে নাহি মিল্‌তা হ্যায়?" গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লইতে ইচ্ছা করিয়াছি শুনিয়া তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হো যায়গা।"

তৎপরে গোস্বামী মহাশয় এই বৎসর বৈশাখ মাসে কলিকাতায় আসিয়া অভয়বাবুর বাসায় উঠিলেন। আমি দেবেনদার নিকট খবর পাইয়া তথায় যাই এবং নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর দিনে ভোর রাত্রি ৪টার সময়ে সাধন পাই। সাধন পাইবার সময় ভিতরে যেন একটা বৈদ্যুতিক স্রোতের মত অনুভব করিলাম। তাহাতে আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। এখন আমার মনে হয় যেন আমার প্রাণের অভাব পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা পাওয়ার বিবরণ ঠাকুরকে বলাতে তিনি বলিলেন—"ইহা তোমার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। ইহাতে তোমার কল্যাণই হইয়াছে।"

সদাশিবরূপে ঠাকুরকে দর্শন ঃ ভাণ্ডার অফুরন্ত।

এই বাসায় ঠাকুরের অবস্থানকালে সহরের গুরুভগিনীরা মধ্যাহ্নে আসিয়া ঠাকুরকে ফুল-চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিতেন। এই পূজার সময়ে গুরুভগিনীরা কখন কখন ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া

পড়িতেন। একদিন ব্রাহ্মভাবাপন্ন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়, মেয়েদের পূজা দেখিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দরজা যেমন একটু ফাঁক করিলেন, দেখিলেন—ঠাকুর সদাশিবরূপে বসিয়া আছেন। শুভ্র জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, তিনি ধ্যানস্থ। ইহা দেখিয়াই গুরুভ্রাতাটি বম্ বম্ বলিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শুনিলাম, গুরুভগিনীরা কেহ ঠাকুরের চরণে ফুল-চন্দনাদি দিতে পারিতেন না;—কেবল মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে সচন্দন পুষ্পমাল্যে ঠাকুরকে সাজাইতেন।

প্রতিদিনই মধ্যাহ্নে অভয়বাবুর বাসায় মহোৎসব ব্যাপার হইত। ৪০।৫০ জন লোক প্রসাদ পাইতেন। একদিন ঠাকুরের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দায়, মেয়েরা পরস্পর বলাবলি করিতেছেন—'আজ কি হইবে, ভাণ্ডারে যে চাউল বাড়ন্ত'। ঠাকুর অমনি মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন—"জালায় চাউল আছে, দেখ গিয়ে।" মেয়েরা বলিলেন—"আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, কিছুই নাই।" ঠাকুর বলিলেন—"আচ্ছা, আর একবার গিয়া দেখ না।" ঠাকুরের কথামত তাঁহারা গিয়া জালায় হাত দিয়া দেখিলেন—অর্দ্ধ জালার অধিক চাউল রহিয়াছে। অভয়বাবু ও হরিনারায়ণবাবুর স্ত্রীর মুখে শুনিলাম—যতদিন গোঁসাই ঐ বাড়ীতে ছিলেন, জালার চাউল আর ফুরাইল না। ঠাকুর ১৫।১৬ দিন ঐ বাসায় থাকিয়া ঢাকা গেলেন। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে নিয়া যাইতে খুব আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঠাকুর স্বীকার করিয়াছিলেন, আবার যখন কলিকাতা আসিবেন, রাখালবাবুর বাড়ী যাইয়া থাকিবেন। তাই, এবার সুকিয়া ষ্ট্রীটে।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা।

বেলা অবসানে অভয়বাবুর বাড়ী হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গুরুভ্রাতাদের লইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের উৎসব খুব সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বাসায় আসিয়া সকলেই পরমহংসদেবের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিল। ঠাকুরও অনেক কথা বলিলেন। গয়াতে দীক্ষা গ্রহণের পর, ঠাকুর কলিকাতা আসিয়া বরাহনগর মনি মল্লিকদের বাগানে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে দেখিয়াই বলেন—"একি! তোমার যে গর্ভলক্ষণ হ'য়েছে!" ঠাকুর তখন তাঁহাকে দীক্ষালাভের সমস্ত পরিচয় দেন। পরমহংসদেব শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আর একবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের দর্শন-মানসে যান। পরমহংসদেব একটু অসুস্থ ছিলেন। শিষ্যেরা ঠাকুরকে নিকটে যাইতে বাধা দিতে লাগিল। পরমহংসদেব তখন হাতে তালি দিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর সম্মুখে যাওয়ামাত্রেই পরমহংসদেব বলিলেন, "আহা! তোকে দেখে যে আমার হৃদ্‌পদ্মটি ফুটে উঠ্‌ল!" এই বলিয়াই সমাধিস্থ হইলেন। একবার ঠাকুর পশ্চিমাঞ্চলে বহু স্থান ঘুরিয়া কলিকাতা আসিলেন। এক দিন

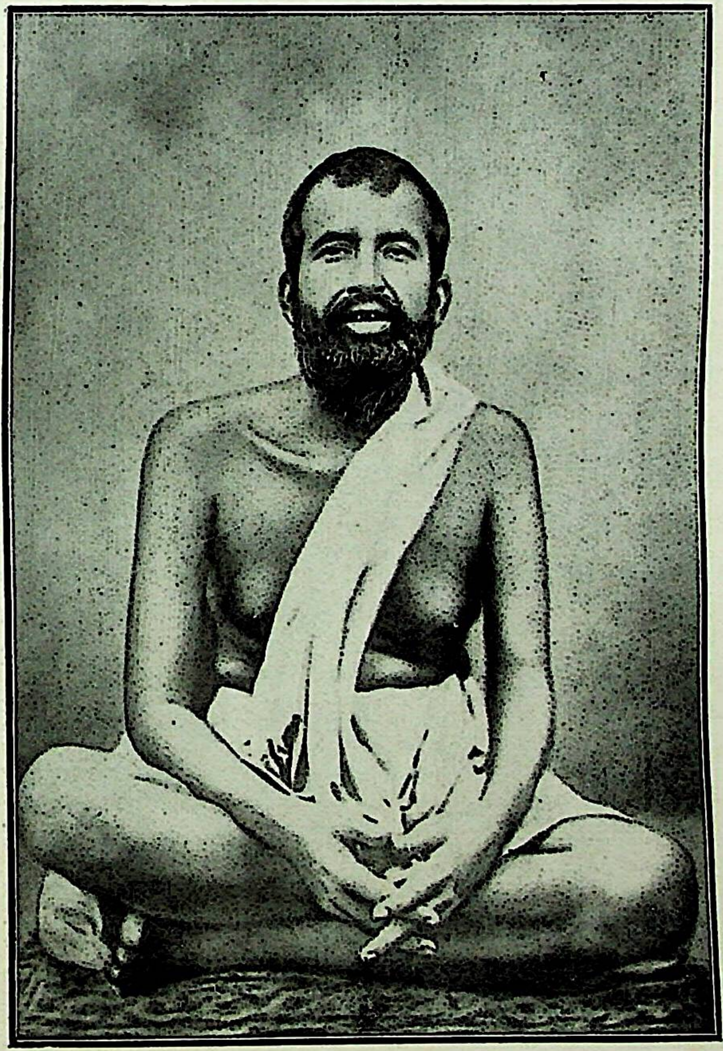

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পৃষ্ঠা। ৮২

পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত তো ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম দেখ্‌লি, বল দেখি?" ঠাকুর কহিলেন—"কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা, কোথাও বার আনা, কোথাও চৌদ্দ আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোল আনা এখানে।" পরমহংসদেব শুনিয়া ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে ঠাকুর লিখিলেন—"এক দিন পরমহংসদেব কেশববাবুকে দেখিয়া আসিয়া বলিলেন যে, "আজ কেশব আমাকে পূজা করেছে, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, উহার লোকেরা পাছে টের পায়। তা দরজা বন্ধই থাকবে।" কেশববাবু প্রকাশ্যে উঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে, এতদিন সকলে উদ্ধার হইয়া যাইত।

ইহার পরে ঠাকুর আবার লিখিলেন—"কেশববাবুর মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, শরীর মৃতদেহের ন্যায় প্রভাহীন হইয়াছে। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'গোঁসাই! যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইল না। পথহারা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন পথের সন্ধান পাইলাম বলিয়া আশা হইতেছিল, এমন সময় এই পীড়া।' আমাকে বলিলেন—'তুমি নাকি নূতন মত অবলম্বন করিয়াছ?' আমি বলিলাম—'নূতন পুরাতন বুঝি না। ভগবানকে লাভ করিব বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। এখন কত পরিবার ব্রাহ্মসমাজে, তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং সামাজিক বাহিরের বিষয় লইয়া গোল করিতে আসি নাই। ভগবানকে পাইলাম ইহা প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে কিছুতেই ফিরিব না, যে কোন উপায় ধরিতে হয় ধরিব। বাহিরের উপায় কিছুই নয়। মৃত্যুকালে আমি কৃতার্থ, আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তুমি সত্য—ইহা বলিয়া মরিব, এই আকাঙ্ক্ষা, আশীর্ব্বাদ করুন।' কেশববাবু বলিলেন—'এ সম্বন্ধে আমার অনেক বলিবার আছে। যদি আরোগ্যলাভ করি তোমাকে ডাকাইব।' দুঃখের বিষয় তাঁহার লীলাসংবরণ হইল।"

এঁড়েদহে ও সপ্তগ্রামে অস্বাভাবিকরূপে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন।

এক দিন ঠাকুর পরমহংসদেবের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে বলিলেন—"ভগবানের বিগ্রহাদি ও চিত্রপট, এখন ভাবশুদ্ধরূপে প্রায়ই অঙ্কিত হয় না।" পরমহংসদেব শুনিয়া

বলিলেন,—"তুমি, এঁড়েদহে মন্দিরের বারান্দায় যে চিত্রপট আছে, তা দেখেছ ?" ঠাকুর বলিলেন—"না।" পরমহংসদেব বলিলেন—"ঐ চিত্রপট খুব ভাবশুদ্ধরূপে আঁকা হ'য়েছে। এক সময়ে গিয়ে দেখে এস না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"আপনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে হ'তে পারে।" তখন পরমহংসদেব যাওয়ার একটা দিন স্থির করিয়া দিলেন। ঠাকুর ঐ দিন পরমহংসদেবের সহিত এঁড়েদহে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, দরজা বন্ধ। তখন উঁহারা বাহিরে থাকিয়া, ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তী (মহাপ্রভুর সময়ের) একটি বৈষ্ণবের সমাধি দর্শন করিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে তথায় লুটাইতে লাগিলেন। পরে ঐ স্থান হইতে আসিয়া বিগ্রহের আঙ্গিনার পাশে একখানা ঘরে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরকে ভাবাবেশে বিহ্বল দেখিয়া পরমহংসদেব গান ধরিলেন। ঠাকুর ঐ সময়ে আঙ্গিনায় পড়িয়া গড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকার পর ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তিনি বিগ্রহ দর্শনের জন্য মন্দিরের নিকটে আসিলেন। দেখিলেন, তখনও দরজা বন্ধ। পূজারী ভিতর দিক্ হইতে সম্মুখের দরজা বন্ধ করিয়া পশ্চাদ্দিকের দরজায় তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর দরজার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ অমনি দরজাটি খুলিয়া গেল। সকলেই দেখিয়া অবাক ! সঙ্গীরা সকলে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিলেন, অপর কোন দিকে দরজা খোলা আছে কিনা ? কিন্তু সকলেই মন্দিরের পশ্চাৎ দিকের দরজা তালাবন্ধ দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পূজারী আসিয়া দরজা খোলা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং প্রসাদী মালা পরমহংসদেব ও ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন। পরমহংসদেব বারান্দার সেই সুন্দর চিত্রপটখানা ঠাকুরকে দেখাইয়া চলিয়া আসিলেন। এই প্রকার ঘটনা আর একবার থৈপাড়ায় হইয়াছিল।

শ্রীধরের মুখে শুনিলাম—ঠাকুর একদিন মহেন্দ্রবাবু, শ্রীধর প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের লইয়া, সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পাটে, ষড়ভুজ মহাপ্রভুর বিগ্রহ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পূজারী দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, ভিতর হইতে মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দরজা খুলিয়া দিতে অনুরোধ করায় বলিলেন—"পাঁচ সিকা প্রণামী না দিলে, দরজা খুলিব না।" ঠাকুর পূজারীর জেদ্ দেখিয়া বলিলেন—"তা হ'লে দর্শন কর্‌বে না।" ঠাকুর আর কিছু না বলিয়া মন্দিরের আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—মন্দিরের দরজা তখন অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন—"মহাপ্রভু দরজার পাশে দাঁড়ায়ে আমাদিগকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছেন।" ভিতর হইতে খিল দেওয়া দরজা অকস্মাৎ আপনা-আপনি খুলিয়া গেল দেখিয়া, পূজারী নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে ঠাকুরের নিকট পুনঃপুনঃ ক্ষমা চাহিলেন। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ও ঐ ঘটনা এই প্রকারই হইয়াছিল, বলিলেন।

ঠাকুরকে রামকৃষ্ণ পরহংসদেবের শিষ্য বলিয়া রটনা করায় জনৈক শিষ্যকে ঠাকুরের শাসন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমবয়স্ক আমাদের একটী ব্রাহ্মগুরুভ্রাতা বলিলেন—"গোস্বামী মহাশয়ের যাহা কিছু লাভ হয়েছে সমস্তই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপায়। পরমহংসদেবের নিকটেই উনি দীক্ষা নিয়াছেন। 'মানস সরোবরের পরমহংস পরমহংস' যে উনি বলেন, ও কথা কিছু নয়। আমি তো বহুকাল ওঁর সঙ্গে সঙ্গে। গয়াতেও সঙ্গে ছিলাম। মানস সরোবরের পরমহংসের নিকট দীক্ষা নিলে, আমি কি জানিতাম না?" গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এ সকল কথা শুনিয়া প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা গোঁসাইকে নিজেদের দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এখন গোঁসাইয়ের শিষ্যরাও যদি ঐরূপ মিথ্যা কথা বলেন, তাহা হইলে গোঁসাইয়ের কথায় সাধারণের সন্দেহ আসিতে পারে। সুতরাং এই বিষয়ে পরিষ্কার মীমাংসা নিতান্তই আবশ্যক। এই ভাবিয়া মিত্র মহাশয় সকলের সাক্ষাতে ঠাকুরকে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। ঠাকুর গুরুভ্রাতাটিকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন—"মানস সরোবরের পরমহংসজীর নিকটে আমি দীক্ষা নেই নাই, রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকটে দীক্ষা নিয়েছি,—একথা আপনি কোথায় পেলেন? আপনি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী। আপনি এখনই এখান থেকে চ'লে যান। আপনার মুখ দেখ্‌তে নাই।"—সকলের সমক্ষে গুরুভ্রাতাটিকে এই প্রকার অনেক কথা বলিয়া শাসন করাতে, গুরুভ্রাতাটি অভিমানে দারুণ আঘাত পাইলেন এবং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অভয়বাবুর বাসায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

আমার শালগ্রাম সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা ঃ
শালগ্রাম পূজা।

শেষ রাত্রে উঠিয়া শৌচান্তে, গঙ্গায় যাইয়া স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ সমাধা করিয়া আসিতে ভোর হইল।

২২শে ভাদ্র, বুধবার। রাস্তায় যাতায়াতে প্রায় হাজার গায়ত্রী জপ করিলাম। আজ একাদশী—হরিবাসর। ভগবানের নাম করিয়া দিনটি কাটাইব মনে করিয়া আনন্দ হইল। ন্যাসান্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা জপ করিয়া গঙ্গাজল তুলসীপত্র শালগ্রামকে অর্পণ করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ৩টার সময় পূজা শেষ হইল।

ঠাকুর আজ বেলা ৩টার সময়ে অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া আমার শালগ্রামটি চাহিলেন। আমি উহা ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর শালগ্রামটি লইয়া বারান্দায় গেলেন। বামহস্তের তালুতে

উহা রাখিয়া একদৃষ্টে উহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। পরে দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক তুড়ি দিতে দিতে "হরি বোল, হরি বোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শালগ্রামটি আমার হাতে দিয়া নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। ঠাকুর একটু স্থিরভাবে থাকিয়া একখানা খাতায় লিখিয়া সকলের নিকট ধরিলেন। সকলে পড়িলেন—"ব্রহ্মচারীর শালগ্রামে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী মহাবিষ্ণু, চারিদিকে ক্ষীরোদ সমুদ্র, গলে বনমালা, কর্ণে কুণ্ডল।" অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"ভারতবর্ষে এইরূপ শালগ্রাম আর দু'টি আছেন; একটি কোন সাধুর নিকটে আর একটি নর্ম্মদার তীরে। ইনি ক্ষীরোদার্ণবশায়ী অষ্টভুজ মহাবিষ্ণু।"

ঠাকুর শালগ্রামের অনেক মাহাত্ম্য বলিলেন—ঠাকুর বলিলেন—"এটি বড় উৎকৃষ্ট চক্র। এরূপ চক্র বড় দুর্লভ। মহাবিষ্ণু ইহার ভিতরে থাকিয়া নিজের ভিতর হইতে একটি একটি করিয়া দশটি অবতার প্রকাশ করিয়া আমাকে দেখাইলেন। দেখাইয়াই আবার উহা ভিতরে নিলেন।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম—এ আবার কি? শালগ্রামের মধ্যে আমি তো একমাত্র গুরুদেবেরই পূজা করি। তিনি কি তবে মহাবিষ্ণু! মহাবিষ্ণু তো অনন্তদেব! অনন্তদেব তো স্বয়ং ভগবান নন? এই ভাবিয়া মনটি একটু উদ্বিগ্ন হইল। তখন ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখি ঠাকুরের রূপটি খুব সুন্দর গৌরবর্ণ হইয়াছে। মনে হইয়াছিল, গৌরাঙ্গপ্রভুই স্বয়ং ভগবান। নিত্যানন্দই অনন্ত। শালগ্রামে বুঝি গৌরাঙ্গ নাই। গুরুদেব বুঝি নিত্যানন্দ প্রভু। আমার এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বোধ হয় ঠাকুর গৌর হইলেন। এমন সুন্দর গৌরবর্ণ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঠাকুরকে দেখি নাই। আর আর দিন ঠাকুর আমার দিকে বাম পার্শ্ব রাখিয়া এমনভাবে বসেন যে, ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের বামদিকই মাত্র আমার দৃষ্টিতে পড়ে; কিন্তু অদ্য দেখিলাম, ঠাকুর আমার দিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া আছেন এবং সময় সময় আমার পানে সরল স্নিগ্ধ দৃষ্টি করিতেছেন। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—"গুরুর চক্ষুতে বা ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিও।" ঠাকুর আড় হইয়া বসাতে তাঁহার সমস্ত ললাট বা চক্ষুর্দ্বয় দেখিতে পাইতাম না; এজন্য অদ্য সকালে ঠাকুরকে সাম্‌নাসাম্‌নি দেখিতে মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ঠাকুর বুঝি তাহাই মনে করিয়া এখন আমার আশা পূর্ণ করিলেন। শালগ্রাম মধ্যে আমি গুরুদেবেরই পূজা করি। মহাবিষ্ণু, জিষ্ণু, আমি বুঝি না। ঠাকুর শালগ্রামে স্বয়ং আমার পূজা গ্রহণ করেন কি না, পরিষ্কার বুঝিবার জন্য, অদ্য আমি ফুল তুলসী ঠাকুরের শ্রীচরণোদ্দেশে শালগ্রামে অর্পণ করিতে করিতে মনে মনে বলিলাম—'ঠাকুর! বাস্তবিকই যদি তুমি ইহার ভিতরে থাকিয়া আমার পূজা গ্রহণ কর, তবে এই তুলসী তোমার চরণে দিতেছি, তুমি যে ইহা পাইলে তাহা আমাকে জানাও।' এই কথা বলিয়া তুলসী দেওয়ামাত্র, ঠাকুরের দিকে চহিয়া দেখি, ঠাকুর চঞ্চলদৃষ্টিতে শালগ্রামের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া খপ্‌ করিয়া নিজের পদাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ করে

ধরিলেন এবং বাম করে করঙ্গ হইতে জল লইয়া শালগ্রামের পানে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ দু'তিন বার ধুইয়া ফেলিয়া আবার চক্ষু বুজিলেন। আমি পদাঙ্গুষ্ঠেই তুলসী দিয়াছিলাম। তুলসী দেওয়ার সময়ে আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। মনে হইতেছিল—ঠাকুর যেন আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—ভিন্ন ভিন্ন শালগ্রাম পূজায় কি একই ফললাভ হয়? শালগ্রাম পূজায় কি উপকার হয়? ঠাকুর লিখিলেন—"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ মনুষ্যের এই তিন গুণ। এই তিন গুণের সঙ্গে প্রত্যেক শালগ্রাম চক্রের মিলন আছে। যে চক্রের সহিত সাধকের অধিক মিল, সেই চক্র সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিলে, ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ দেখা যায়।"

নিরম্বু একাদশীর নিয়ম ও ফল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ঠাকুর আকার-ইঙ্গিতে আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং একাদশী নিরম্বু করি বলিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। পুনঃপুনঃ সস্নেহদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। হরিদ্বারে নিরম্বু একাদশী করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও পারি নাই, তাহা ঠাকুরকে বলায়, ঠাকুর বলিলেন—"তাতে কোন ক্ষতি হয়নি।" জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'একাদশী করায় যথার্থ ই কি কোন ফল হয়?'

ঠাকুর বলিলেন—"প্রকৃতরূপে একাদশী কর্তে পার্লে তার ফল পাওয়া যায়। প্রকৃতরূপে একাদশী কর্তে হ'লে, পূর্ব্বদিনে সংযম কর্তে হয়। একাদশীর দিনে নিরম্বু থাক্তে হয়। তার পর দিন পারণ কর্তে হয়। কিন্তু একাদশী কর্তে প্রথম প্রথম দু'একবার কষ্টবোধ হয়। পরে অভ্যাস হ'য়ে গেলে খুব আমোদ বোধ হয়। একাদশীর দু'রকম উপকার। প্রথমতঃ, অনেক দিনের ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জ্বরের এবং অন্যান্য অনেক রোগের উপকার হয়। দ্বিতীয়তঃ, মনের সঙ্গে শরীরের এবং শরীরের সঙ্গে তিথি-নক্ষত্রের যোগ থাকাতে, একাদশীতে নাম, সাধন-ভজন কর্তে বেশ মনোনিবেশ হয়। একাদশীর দিন জল খেতে হ'লে গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ফল খাওয়া উচিত নয়। ডাব-নারকেল বা অন্যান্য ফল খাওয়া ভাল নয়। বেল একটু ভাল, কিন্তু তাও প্রশস্ত নয়। পাহাড়ে ফুটি, শিঙ্গাড়া ভাল—তা খুব হাল্কা ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক। অতি অল্প জল খেতে হয়। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব দু'মতের একাদশীর উপবাস। গৃহীদের দশমী-বিদ্ধ একাদশী অর্থাৎ স্মার্ত্তমতে করা ভাল। ভেকধারী বৈষ্ণবেরা দ্বাদশীযুক্ত একাদশী করেন। শান্তিপুরের

গোস্বামী মহাশয়েরা প্রথমোক্ত একাদশী করেন এবং স্মৃতিমতে চলেন। নিত্যানন্দ বংশের গোস্বামীরা বৈষ্ণব মতে একাদশী করেন।"

মুক্তি, পরলোক, শ্রাদ্ধ-তর্পণ ও রুগ্ণাবস্থায় অলৌকিক দর্শনাদি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

আজ বহুলোক আসিয়া হলঘর পরিপূর্ণ করিয়া বসিল। অনেকে ঠাকুরকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। তন্মধ্যে দু'চারটি কথা লিখিয়া রাখিতেছি। একজন প্রশ্ন করিলেন—'যাঁহারা মুক্ত হ'ন তাঁহারা আবার সংসারে আসেন কি?' ঠাকুর লিখিলেন—"মুক্তি অনেক প্রকার। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণ-দেহ। বাসনা লয় হইলে স্থূল-দেহের লয় হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম এবং কারণ-দেহ থাকে। সূক্ষ্মদেহ যে যে বাসনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা লয় হইলেও কারণ—দেহ থাকে। সমস্ত বাসনার একেবারে নিবৃত্তি না হইলে কারণ-দেহের লয় হয় না। এই কারণ-দেহের লয়েই সম্পূর্ণ মুক্তি। কারণ-দেহের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্বিঘ্ন অবস্থায় পঁহুছায় না। দু'টী একটি বাসনার আতিশয্যেও সূক্ষ্মদেহ ধারণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ হইতে পারে। কারণ-দেহ গেলেই সে সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দের আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যায়। সেখানে সর্ব্বদাই তার ভগবানের লীলা দর্শন হইয়া থাকে। ইহাকে গোলকধাম—কৈলাস বলে। নাম করিতে করিতে প্রকৃতই এ সব অবস্থা লাভ হয়।

"শাস্ত্রকর্ত্তারা মুক্তিলাভ বিষয়ে কি সুন্দর নিয়মই করিয়া গিয়াছেন! গয়ায় পিণ্ডদানে লোকের উপকার হয়। যাহার এ সম্বন্ধে কোন সংস্কার নাই, তাহার উপকার না হইতে পারে। বিশ্বাস অনুরূপ কার্য্যই উপকারী। গয়ায় পিণ্ড দিলে উপকার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। চেহারা পর্য্যন্ত বদল হইয়া যায়। সূক্ষ্ম দেহের দর্শনে পুষ্টি হয়, স্থূল দেহের আহারে পুষ্টি হয়; কারণ-দেহ কেবল লোকের শুভ ইচ্ছায় পুষ্টিসাধন করে। এখানে পুষ্টি শব্দে সন্তোষ বুঝিতে হইবে। গয়ায় পিণ্ড,—দেখিয়া সূক্ষ্মদেহের বাসনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল মনের শুভ ইচ্ছা হইতে কারণ-দেহের নাশ হইয়া থাকে।"

জিজ্ঞাসা করা হইল—এই সাধন যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কি উপকার হইতেছে?—তাঁহাদের সকলেরই মুক্তিলাভ হইবে?

ঠাকুর লিখিলেন—“সকলেই উপযুক্ত সময়ে এই সাধন পাইয়াছেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া বোধ হইলে, দীনবন্ধু দয়া করেন। অভিমানী দয়ার পাত্র নহে। বাহিরের উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে। প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে এ সাধনের উপকারিতা অনুভব করিবে। জন্মান্তরের অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে। কার্য্য করুক আর নাই করুক, ভিতরে যে বীজ পড়িয়াছে, তাহাতে সময়ে অবশ্যই ফললাভ করিবে। পূর্ব্বে যে পাপ অতি সহজে করা গিয়াছে, তাহাতে যদি এখন বোধ হয় যে, কে যেন বাধা দিতেছে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এ সাধনে তাহাকে ধরিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল শুভ ইচ্ছা ছিল না, তাহা যদি এখন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা সাধনের ফল বুঝিতে হইবে। এমন কোন কল-কৌশল নাই যে, হাতে হাতে মুক্তি হইবে।”

একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন—পিতৃলোকে সকলেরই কি যাইতে হয়? ঠাকুর—“যাহাদের কর্ম্ম আছে, তাহাদেরই পিতৃলোকে যাইতে হয়।”

প্রশ্ন—যাহাদের গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন আছে কি?

ঠাকুর—“যাহাদের গয়াতে পিণ্ডদান যথাবিধি হইয়াছে, তাহাদের পুনরায় শ্রাদ্ধ মাটিতে জল ঢালার ন্যায়।”

প্রশ্ন—তবে তর্পণকে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ধরেছে কেন?

ঠাকুর—“নিত্য তর্পণের কথা ভিন্ন; উহা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রত্যেক বংশে এক একজন ক'রে পিতৃদেবতা আছেন। এই তর্পণ করাতে তাঁদের তৃপ্তি হয়। সকলেরই তর্পণ করা বিশেষ প্রয়োজন।”

প্রশ্ন—মৃত্যুর পরে ভূত কাহারা হয়?

উত্তর—“অনেক দিন রোগে ভুগিতে ভুগিতে একটী অবিশ্বাস জন্মে। সাধারণতঃ তাহারাই ভূতযোনী প্রাপ্ত হয়।”

একটি গুরুভ্রাতার অত্যন্ত কঠিন পীড়া হইয়াছিল। সেই সময়ে তাহার কতকগুলি অলৌকিক অবস্থা হইয়াছিল। তাহা ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর লিখিলেন—“পূর্ব্ব শরীরের পুরাতন পরমাণু পরিবর্ত্তনের সময়ে নানাপ্রকার অবস্থা হয়। এই সময়ে কোন কোন দেহে, জ্বর-বিকার, কোন কোন দেহে উদরি, কোন দেহে নিউমোনিয়া, এইরূপ অবস্থা হয়। প্রলয় হইতে সৃষ্টি, সৃষ্টি হইতে প্রলয় যাহা হইবে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। বেদ, পুরাণ,

তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। আমার দ্বারভাঙ্গায় ও ঢাকায় এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। দ্বারভাঙ্গায় সাতজন ডাক্তার একমতে বলিলেন, অন্ত ৩ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইবে। সেই দিন সন্ধ্যা হইতে আমি উঠিয়া বসিলাম। তিন দিন পরে কলিকাতা আসিলাম। ঢাকাতেও মৃত্যু হইবে বলিয়া ডাক্তার মত প্রকাশ করিল; আমি উঠিয়া বসিলাম।”

ঠাকুরের মমতা।

২৬শে ভাদ্র,
৪১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

রাত্রি ৪টার সময়ে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা আরম্ভ করিলাম। গত কল্য নিরম্বু করিয়াছি। শরীর দুর্ব্বল, গঙ্গায় আজ যাওয়া হইবে না। প্রতিদিনের মত ১০ মিনিট বিশ্রামান্তে ঠাকুর সাড়ে চারটার সময়ে আসনে উঠিয়া বসিলেন। অমনি আলমারী খুলিয়া আমার হাতে একটি পাথরের বাটি দিয়া কতকগুলি রসগোল্লা দেখাইয়া বলিলেন—“এসব নিয়ে তোমার শালগ্রামকে ভোগ লাগায়ে প্রসাদ পাও।” গত কল্য ঠাকুরের আলমারীতে রসগোল্লা দেখি নাই। আমার শয়নের পর তিনি আমার জন্য রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছেন। কোলের ছেলের ক্ষুধা পাইলে, মা যেমন কোন দিকে না তাকাইয়া তাকে খাওয়াইতে অস্থির হইয়া পড়েন, ঠাকুরও সেইরূপ আমাকে রসগোল্লা দিয়া উহা তাড়াতাড়ি খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বারংবার বলিতে লাগিলেন—“শালগ্রামকে নিবেদন করে, প্রসাদ পাওনা!” আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। গত কল্য নিরম্বু একাদশী করিয়া রহিয়াছি। অথচ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই ঠাকুর আমাকে রসগোল্লা খাইতে পুনঃপুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। মমতাবশতঃ ঠাকুর চিরন্তন প্রথাও মনে হয় ভুলিয়া গেলেন। শৌচ, স্নান, শালগ্রামের পূজা কিছুই হয় নাই। আমি ঠাকুরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী না হই, এই অভিপ্রায়ে বলিলাম—আমি এখনও পায়খানা যাই নাই, স্নানও করি নাই। ঠাকুর শুনিয়া বোধ হয় বুঝিলেন, আমার পায়খানার বেগ হইয়াছে। তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—“যাও, যাও, পায়খানায় যাও।” আমিও অমনি নীচে চলিয়া গেলাম। ঠাকুরের ঘরে যে সকল গুরুভ্রাতারা শয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে এখনও উঠেন নাই। আমি শৌচান্তে স্নান করিয়া আসনে আসিলাম। শালগ্রামকে স্নান করাইয়া কয়েকটি তুলসী প্রদান করিলাম। পরে রসগোল্লা শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া তন্ময়ধ্যানে উহা ভোজন করিতে লাগিলাম। ঠাকুর এই সময়ে এক-একবার স্নেহদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমি পরমানন্দে রসগোল্লা খাইতে লাগিলাম। এই সময়ে ঠাকুরের চা প্রস্তুত হইয়া আসিল। ঠাকুর চা সেবা করিতে লাগিলেন। আমার চা খাওয়ার অভ্যাস বহু দিনের। কিন্তু তাহা এখানে পাওয়ার জো নাই। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি গুরুভ্রাতাই মাত্র চা পাইয়া থাকেন। আমার

চা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। আমি মনে মনে ঠাকুরকে বলিলাম—ঠাকুর! চা এখানে খাওয়ার যখন সুবিধা নাই, তখন খাওয়ার স্পৃহা দয়া করিয়া তুলিয়া নেও। এই সময়ে ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া, পাত্র হইতে বাটি দ্বারা চা তুলিয়া উহা আমাকে নিতে বারংবার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। নিজ হইতে ঠাকুর যাচিয়া প্রসাদ দিতেছেন দেখিয়া, পরমসৌভাগ্য জ্ঞানে উহা আমি গ্রহণ করিলাম; এবং খুব আনন্দের সহিত প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। সাধারণ সাধারণ কার্য্যে ঠাকুরের অসাধারণ দয়া, দুর্দ্দৈবদোষে এখন আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা বটে, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় এমন একদিন আমার আসিতে পারে, যখন ঠাকুরের এ সকল কার্য্য স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি লুটাপুটি খাইব।

ঠাকুর মধ্যাহ্ন ১২টার সময়ে আহার করিতে ভিতর বাড়ীতে গেলেন। আমিও মধ্যাহ্নিক সন্ধ্যা, সমাপন করিয়া নারায়ণ পূজা আরম্ভ করিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে ঠাকুর স্নান আহার করিয়া আসনে আসিলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি তাহাতে মন না দিয়া শালগ্রাম পূজা করিতে লাগিলাম।

তত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ ঃ স্বপ্নে তত্ত্ব প্রকাশের উপদেশ।

জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে নাকি মানুষ সুখী হয়? তত্ত্বজ্ঞানীর প্রধান লক্ষণ কি?'

ঠাকুর লিখিয়া দিলেন;—একটী তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলেই চরিত্রে লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। সে ব্যক্তি প্রাণান্তেও পরনিন্দা করিবে না; নিজের প্রশংসা বিষতুল্য বোধ করিবে। বৃক্ষ, লতা, কীট পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মনুষ্য সর্ব্বজীবে তাঁর দয়া হইবে। যাহার জীবে দয়া নাই, পরনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা আছে, তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। বাহিরে অনেক পূজা-অর্চ্চনা, জপ-তপ করিয়াও যদি হিংসা থাকে, তাহা ধর্ম্ম নহে। অহিংসা না হইলে ধর্ম্ম হয় না।

বিচার বিহীন কখনই হইবে না। দয়াতেও বিচার চাই। যতটুকু সাধ্য ও কর্ত্তব্য ততটুকু মাত্র দয়া করিবে। অতিরিক্ত দয়া করিয়া অনেক বড় বড় সাধু মারা গিয়াছেন। দয়া করিতে যোগীদের খুব বিচার করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁহারা বিষম বিপদে পতিত হইবেন। যোগী যখন দেখিবেন, এই ব্যক্তিকে এই পরিমাণে দয়া করিলে প্রকৃত উপকার হইবে, তখনই তিনি দয়া করিবেন।

কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে নিজেদের উৎকৃষ্ট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। ঠাকুর শুনিয়া লিখিলেন,—সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, শেষ রাত্রে একটু নিদ্রা গেলে, সমস্ত বিষয় স্বপ্নে

দেখা যায়। দিবা নিদ্রা বিশেষ অপকারী—তাহাতে বুদ্ধিনাশ ও সাধনের অনিষ্ট হয়। রাত্রিতেও নিদ্রা বেশী উচিত নহে। বসিয়া সাধন করিবার সময়ে, কিছুক্ষণ পরে আলস্য তন্দ্রার আবির্ভাব হয়,—তাতে কিছু অপকার করে না। এরূপ বসিয়া বসিয়া যোগনিদ্রায় অনিষ্ট হয় না। তখন অনেক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়,—দর্শন প্রভৃতিও হয়। তবে, জোর করিয়া এরূপ করিবে না। যদি কেহ কখনও কোন স্বপ্নে কোনও তত্ত্বলাভ করেন, তাহা কি প্রকাশ করিতে আছে? যে বলে এবং যে শুনে—উভয়েরই অনিষ্ট। স্বপ্নে কোন আশ্চর্য্য কিছু দেখিলে, গুরু সম্বন্ধে কোন শক্তির কিছু প্রকাশ দেখিলে, তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে। সব কথাই কি ঢাক-ঢোল লইয়া বাজারে বলিয়া বেড়াইতে হইবে? যতটুকু বিশ্বাস করিবে, ততটুকু ফল পাইবে। ভগবান নিজে আসিয়াও যদি বলেন, 'আমি ভগবান আসিয়াছি' তাহা হইলেও সন্দিগ্ধ আত্মা সে কথা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। স্বপ্নের কথাই যদি বিশ্বাস করিত, তবে এতদিনে সকলে উদ্ধার পাইত। কেহ কিছু বিশ্বাস করে না। পূর্ব্বে অনেকানেক স্বপ্ন দেখান হইত। দেখিতে পাই, কেহ কিছু বিশ্বাস করে না। এজন্য এখন আর দেখান ঠিক মনে হয় না। বিশ্বাসের কেহ কিছু পাইলে, তাহা প্রকাশ করিলে অবিশ্বাস আসে; এবং তজ্জন্য ভুগিতে হয়। স্বপ্নে কেন, প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কেহই কিছু বিশ্বাস করিতেছেন না, বলিলেও বিশ্বাস হয় না।

দেব দেবী কল্পনা নয় ঃ সাধনের সপ্ত সোপান ঃ ত্রিবিধ কর্ম্ম ঃ উদ্ধারের উপায়।

ঠাকুরকে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কালী, দুর্গা প্রভৃতি কি কল্পনা, না, সত্য সত্যই কিছু?'

ঠাকুর লিখিলেন,—"এ সমস্ত কিছুই কল্পনা নহে। সাধনের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সাধকেরই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রথম ব্রহ্ম, দ্বিতীয় আত্মা, তৃতীয় ভগবান। প্রথমাবস্থায় মনুষ্য সমস্তই ব্রহ্মময় দর্শন করেন,—সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সে দেখিতে পায় যে, সে কোন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা চালিত হইতেছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সেই শক্তিতে ব্যাপ্ত এবং চালিত হইতেছে। ইহার পরেই ভগবৎ

দর্শনের অবস্থা লাভ হয়। তখন ব্রহ্মের লীলা দর্শন হইতে থাকে ;—কালী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবতা প্রত্যক্ষ হয়,—রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণ দৃষ্টিগোচর হন। সমস্ত ঋষিগণ এবং কলিযুগে শাক্যসিংহ প্রভৃতি অবতার ও সাধকগণ ইহার প্রমাণ দিতেছেন। ইহা জল্পনা-কল্পনা নহে।”

প্রশ্ন—‘মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া জীব কি প্রকারে ক্রমোন্নতি লাভ করে ?’

ঠাকুর লিখিলেন—নূতন মনুষ্য জন্ম—তাহারা কুকি, ভীল প্রভৃতি নিরক্ষর বন্য লোকের মধ্যে দশ জন্ম পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে ;—পরে নিকটবর্ত্তী লোক-সমাজে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ অনেক জন্ম পরে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। বিষয়জ্ঞান প্রথম জন্ম হইতেই লাভ হইতে থাকে। মনুষ্যের মধ্যে জড়ত্ব, বৃক্ষত্ব, জীবত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, একত্ব ও রস।—মনুষ্যের এই সমস্ত সোপান, অথবা সপ্ত ভূমি। যেরূপ ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ প্রকাশিত হয় ; মনুষ্যাত্মা সেইরূপ প্রথম প্রথম সপ্তসোপান আরোহণ করিয়া, ‘রসোবৈ সঃ’ এই শব্দ সর্ব্বদা গান করে।

প্রশ্ন—সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্ম কাহাকে বলে ? কি উপায়ে এই সকল কর্ম্ম কাটাইয়া জীব উদ্ধার হয় ?

ঠাকুর—চৌরাশি লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া একবারই মনুষ্য হয়। সেই জন্মে যে কর্ম্ম করে তাহাকে প্রারব্ধ, সঞ্চিত, বর্ত্তমান বলে। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম শেষ করিতে অনেকবার জন্ম মৃত্যু হয় ; তাহা মানব জন্মের ঘটনা মাত্র। এইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ,—এই ত্রিবিধ দেহ নষ্ট হইয়া মায়া হইতে মুক্ত হয়। মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি ভগবানের ভজন পূজন না করে—তবে পুনর্ব্বার অধোগতি আরম্ভ হইয়া পুনঃ চৌরাশি লক্ষযোনী ভ্রমণ করিতে থাকে। মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি একবার ভগবানের নাম শুনার মত শুনে ও বলার মত বলে, ডাকার মত ডাকে, অর্থাৎ যেমন শিশু মা শব্দ শুনে, মা বলিয়া ডাকে, তাহাতে মা শিশুর নিকট দৌড়িয়া আসেন।

শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে আদেশ—না পারায় ঠাকুরের ভরসা দান।

গত কল্য শালগ্রাম পূজার সময়ে একবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—ধ্যানটি কোথায় রাখিব ? ঠাকুর বলিলেন,—“শালগ্রামে।” এতকাল আমি নাভিমূলে ধ্যান করিয়া আসিয়াছি।

এখন আমার ইচ্ছা হয়, সময়ে সময়ে হৃদয়ে ধ্যান করি। যাহাতে হৃদয়ে ধ্যান করিতে অনুমতি পাই, তাহারই অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। শালগ্রামে ধ্যান রাখার কথা শুনিয়া, আজ তাহা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন প্রকারেই চিত্ত নিবেশ করিতে পারিলাম না। বারংবার আপনা-আপনি অজ্ঞাতসারে নাভিচক্রে ধ্যান আসিতে লাগিল। বারংবারই আবার শালগ্রামে মন স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই প্রকার পুনঃপুনঃ চেষ্টায় অতিশয় শ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। প্রায় দেড় দুই ঘণ্টা এই প্রকার চেষ্টা যত্নেও শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে অসমর্থ হওয়ায়, ঠাকুরের উপর ক্রোধ জন্মিল। ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চ্চনা কিছুই হইল না। মনে হইতে লাগিল যেন ভিতরের একটা নাড়ি ছিঁড়িয়া গেল। ঐ সময় এক একবার ভিতরের অসহ্য জ্বালায় ও বিরক্তিতে কান্না আসিয়া পড়িল। কখনও বা ধ্যান ছাড়িয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মনে করিলাম চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ঠাকুরের নিকট যা' তা' কল্পনা করিব। ঠাকুরকে না ভাবিয়া, সহজে যাহা ভাবিতে পারি শালগ্রামে তাহাই ভাবিব। ঠাকুর যেমন আমার অন্তরের বস্তু লইয়াছেন, ঠাকুরকেও আমি তেমনই স্থানভ্রষ্ট করিব,—তাঁহার আসনে স্ত্রীমূর্ত্তি বসাইব,—শিলাচক্র হইতে ঠাকুরকে সরাইব। আবার মনে হইল, এত গোলমালের প্রয়োজন কি ? শালগ্রামটিকে একটা আঘাতেই চুরমার করিয়া ফেলি না কেন ? এই ভাবিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, দাঁত কড়মড় করিতে লাগিলাম ; এবং হরিদ্বারের পাথরটি হাতে লইয়া ঘা মারিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু ভিতরে অকস্মাৎ বাধা পাইয়া বিরত হইলাম। তখন ভাবিলাম, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা যাউক্—'হৃদয়ে বা আবার নাভিতে ধ্যান করিতে পারি কি না ? শালগ্রামে ধ্যান আমা দ্বারা হইবে না। এই সময়ে ঠাকুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইলেন। আমার চক্ষু রক্তবর্ণ ও ভিতরের জ্বালায় মাথা অত্যন্ত গরম হইয়াছিল। মাথায় যন্ত্রণা এবং সর্ব্ব শরীর 'ছন্‌ছন্' করিতেছিল। ঠাকুর আমার দিকে স্নেহ-দৃষ্টি করিয়া আমাকে কথা বলার অবসর দিলেন। আমি অর্দ্ধ কান্নার স্বরে বলিতে লাগিলাম—বিস্তর চেষ্টা করিয়াও আমি শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে পারিতেছি না। শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে না পারায় আজ আমার পূজা হইল না। দিনটা আমার বৃথা গেল মনে হইতেছে। আর নাভিচক্রে ধ্যান ছাড়িয়া, শালগ্রামে ধ্যানের চেষ্টায় যেরূপ কষ্ট পাইয়াছি,—জীবনে এমন কষ্ট কখন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয় যেন প্রাণের একটা বস্তু আপনি ছিঁড়িয়া নিয়াছেন।

ঠাকুর বলিলেন—"প্রথম প্রথম শালগ্রামে ধ্যান রাখ্‌তে পার্‌বে কেন ? শালগ্রামে ধ্যান করার অবস্থা অনেক পরে হয়। শালগ্রামে ধ্যান কর্‌তে না পার্‌লে ভিতরেই ধ্যান করো। শালগ্রামে ধ্যান করার চেষ্টা ধীরে ধীরে কর্‌তে কর্‌তে পরে ক্রমে ঠিক হ'য়ে যাবে।" একটু পরে ঠাকুর লিখিলেন—"শালগ্রাম পূজা বড় কঠিন। কারণ মূলাধার প্রভৃতির কেবল একচক্রে সহজে মন স্থির করা যায়, কিন্তু শালগ্রাম চক্রে মন স্থির

করা সহজসাধ্য নহে। সাধক দৃষ্টি সাধন অর্থাৎ যোগ অভ্যাসের পর শালগ্রাম চক্র ভেদ করিতে পারিলে, এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড মধ্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। তখন প্রত্যেক পরমাণুতে বিষ্ণু দর্শন করা যায়। এই কারণে প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ শালগ্রাম চক্র পূজা ও ধ্যান করিয়া আসিতেছেন।”

ঠাকুরের এই সকল কথা শুনিয়া আমি সুস্থ হইলাম। হৃদয়ে বা দেহস্থ অন্য কোন চক্রে ধ্যান করা অপেক্ষা শালগ্রামে ধ্যান করা উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও শক্ত জানিয়া, শালগ্রামেই ধ্যান যেন করিতে পারি এই ইচ্ছা হইল। কিন্তু ইচ্ছা হইলে কি হইবে? চেষ্টা-সাধ্যে তো কুলায় না।

ঠাকুরের দয়ায় শালগ্রামে ধ্যান ও তাহাতে আনন্দ।

২৪শে ভাদ্র।

অদ্য মধ্যাহ্নে শালগ্রাম পূজার সময়ে একবার ভাবিলাম, ধ্যানটি কোথায় রাখি! শালগ্রামে ধ্যান রাখা তো হয়ই না, কিন্তু উহাই নাকি উৎকৃষ্ট। সুতরাং নাভিচক্রে ধ্যান করিলেও, সময় সময় দু'পাঁচ মিনিটের জন্য শালগ্রামেও দৃষ্টি করিব। তারপর ঠাকুর যখন হয় করাইয়া নিবেন। আমার চেষ্টা-যত্নে কিছুই হইবে না। এই স্থির করিয়া শালগ্রামকে প্রণামান্তর, উহাতে যেন ধ্যান রাখিতে পারি, ঠাকুরের চরণে মনে মনে প্রার্থনা করিয়া শালগ্রামে দৃষ্টি করিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের আশ্চর্য্য দয়া দেখিলাম। ঠাকুরকে শালগ্রামে একবার ভাবিয়া, যেমনই উহাতে ধ্যান রাখিতে চেষ্টা করিলাম, ঠাকুরের অপরিসীম কৃপায় উহাতে যেন নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম;—চক্ষু আর অন্যদিকে আনিতে পারিলাম না। মনটি শালগ্রামের ভিতরে ঠাকুরের রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়িল;—অন্য কোন দিকে টলিল না। একইভাবে তিনটি ঘণ্টা আমার কাটিয়া গেল। আমি এই অবস্থা দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। নাভি বা হৃদয়ের দিকে সময় সময় তখন ইচ্ছা করিয়া দৃষ্টি দিতে লাগিলাম; কিন্তু দেখিলাম, তাহাতে আর ভাল লাগে না। শালগ্রামেই অধিক আনন্দ। বুঝিলাম ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে দয়া করিলেন। কল্য যেভাবে ধ্যানের চেষ্টায় আমার মাথা ধরিয়াছিল, শরীর গরম ও মন অত্যন্ত উদ্বেগে অস্থির হইয়াছিল, আজ অনায়াসে আপনা-আপনি তাহা হইয়া গেল; কোন চেষ্টাই করিতে হইল না। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়? আমি ঐ সময়ে ঠাকুরের চরণে নমস্কার করিয়া মনে মনে একান্তভাবে বিশ্বাস ও প্রেম প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের পাশে বসিয়া শালগ্রামে ঠাকুরের পূজা—এ যে কত আনন্দ, তাহা বলিতে পারি না। পূজার সময়ে ঠাকুর আমার পানে সময়ে সময়ে আড়চোখে তাকাইতে লাগিলেন। সে সময়ে ঠাকুরের চোখের ও মুখের যে কি শোভা তাহা প্রকাশ করা যায় না। কখন কখন দু'এক সেকেণ্ডের জন্য চোখে চোখ পড়াতে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম! আমি উচ্ছ্বাস কোন প্রকারে চাপিতে পারিলাম বটে কিন্তু অশ্রুনীরে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম।

এইভাবে ৬টা পর্য্যন্ত পূজা করিয়া ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিব উদ্যোগ করিতেছি, ঠাকুর ইঙ্গিতে আমাকে বলিলেন—"শালগ্রাম পূজা শেষ হ'লে তুমি স্তব পাঠ কর না? নমস্কার মন্ত্র প'ড়ে শালগ্রামকে নমস্কার কর না?" আমি কহিলাম—এখানে উচ্চৈঃস্বরে স্তব পড়িতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ঠাকুর বলিলেন—"শালগ্রাম পূজা ক'রে উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ ক'রো, আর নমস্কার মন্ত্র প'ড়ে শালগ্রামকে নমস্কার ক'রো, এতে সঙ্কোচ ক'রো না।" শালগ্রাম পূজার পর মনে মনে 'নমস্তে সতে তে' ইত্যাদি স্তব আমি প্রতিদিনই পড়িয়া থাকি, কিন্তু নমস্কার মন্ত্রটি অনেক সময় মনে থাকে না। আমার মনে হইল উহা পড়িয়া শালগ্রামকে নমস্কার করিতেই ঠাকুর আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। হরিদ্বারে যাওয়ার পূর্ব্বে ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় একদিন একটি নমস্কার মন্ত্র স্বহস্তে লিখিয়া আমাদিগকে দিয়া বলিয়াছিলেন—"রাত্র শয়নকালে এবং ঘুম হতে উঠ্‌বার সময়, সাধন কর্‌তে ব'সে এবং সাধনের পর উঠ্‌বার সময় ভগবানকে স্মরণ ক'রে এই মন্ত্র প'ড়ে নমস্কার ক'রো। ভগবৎবুদ্ধিতে যেখানে যখন নমস্কার কর্‌বে এই মন্ত্র প'ড়ে ক'রো। ভগবানের অন্তর্দ্ধানকালে—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ঋষি মুনি দেবদেবী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী এই মন্ত্র প'ড়ে ভগবানকে নমস্কার ক'রেছিলেন। এই মন্ত্র প'ড়ে ভগবানকে নমস্কার কর্‌লে—সেই নমস্কার ভগবানের চরণে পৌঁছাবে এরূপ বর আছে।" এই বলিয়া ঠাকুর স্বহস্তে লিখিত নমস্কার মন্ত্রটি আমাদিগকে দিলেন এবং গুরুভ্রাতাদের সকলকে ইহা জানাইতে বলিলেন। মন্ত্রটি এই:—

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে
পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায়
নমো নমঃ॥

আমি মন্ত্র পড়িয়া শালগ্রামকে নমস্কার করিলাম।

চারিদ্বার রক্ষার উপায়।

অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে গুরুভ্রাতারা আসিয়া ক্রমে ক্রমে হলঘরটি পরিপূর্ণ করিলেন। বাহিরেরও অনেক লোক আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অহরহ পাপ-সঞ্চয় করি, কি উপায়ে তাহা সংযত রাখা যায়? ঠাকুর লিখিয়া দিলেন—

১। যে ব্যক্তি, অক্ষঃক্রীড়া, পরস্বাপহরণ ও নীচ জাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশতঃ কাহাকেও প্রহার করেন না—তাঁহার হস্ত-দ্বার রক্ষিত হয়।

২। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যা বাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন—তাঁহার বাক্-দ্বার সুরক্ষিত হয়।

৩। যে ব্যক্তি অতি ভোজন ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া দেহ রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহার ও প্রতিনিয়ত সাধুগণের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠর-দ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

৪। যে ব্যক্তি এক পত্নী সত্বে সম্ভোগের জন্য অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ ও পরস্ত্রী-গমন না করেন, এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় স্ত্রী-গমন না করেন তিনি উপস্থ-দ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

যে মহাত্মা ঐরূপে চারিদ্বার রক্ষা করিতে পারেন তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া গণ্য করা যায়। যাঁহার ঐ চারিদ্বার রক্ষিত না হয় তাঁহার সমস্ত কার্য্য বিফল হয়।

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আহারে ভিন্ন রিপুর উত্তেজনা ঃ

আহারে ধর্ম্মের যোগ।

জিজ্ঞাসা করা হইল, কি কি বস্তু আহারে কোন্ কোন্ রসে কোন্ কোন্ রিপু বৃদ্ধি হয়? রিপুদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, আমাদের আহারাদি বিষয়ে কি নিয়মে চলা উচিত?

ঠাকুর লিখিলেন—বালক শৈশবে নিজে মলত্যাগ করিয়া নিজে ভক্ষণ করে, এবং অতি আনন্দে হাস্য করে; কিন্তু পিতা-মাতা ঘৃণায় নাকে হাত দেন। সেই প্রকার ক্রোধী যদি লঙ্কা সর্ষপ পিত্তবৃদ্ধিকর উত্তেজক বস্তু ভোজন করে; কামুক যদি মৎস্য, মাংস, ঘৃত, মধু এবং মিঠাই ইত্যাদি খায়; লোভী যদি অধিক তিক্ত খায়; অহঙ্কারী যদি অধিক মসুরের ডাল খায়; সংসারমোহে আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক

অম্বল খায়; অভিমানী যদি অধিক লবণ খায়; তাহা হইলে ঐ শিশুর ন্যায় আহার করা হয়। জ্ঞানী পুরুষগণ দেখিয়া অবাক্ হন।

মৎস্য, মাংস, অধিক লঙ্কা, অধিক সর্ষপ, অধিক অম্ল, অধিক মিষ্ট, মধু ইত্যাদি, ক্ষীর এই সমস্ত আহার এবং মসুর ডাল মাসকড়াই, এ সকল কামোদ্দীপক। কাম-ক্রোধ মনের কার্য্য। মন শারীরিক পরিণতি। যাহাতে শরীরের উত্তেজনা হয় এমন বস্তু আহার না করা ভাল। আহার যাহা অভ্যস্ত তাহা হঠাৎ ত্যাগ করা উচিত নয়। যাঁহারা অধিক লঙ্কা খান, হঠাৎ লঙ্কা ছাড়িলে পীড়া জন্মে। এ সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রের ব্যবস্থা অতি উত্তম। শুশ্রুত, চরকে অভ্যস্ত আহার কিরূপ এবং রোগ বিনিশ্চয় গ্রন্থ—(যাহাকে নিদান বলে, তাহার টিকা—বিজয় রক্ষিতের টিকাতে) অভ্যস্ত পথ্যাপথ্যের বিষয় লেখা আছে। এ বিষয় অন্য শাস্ত্রে লেখা নাই।

আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ আছে। কারণ, শরীর্ ও আত্মা একত্র আছে। এই আহার অতি সাবধানে না করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এক ব্যক্তি লঙ্কা খায় না, তাঁহাকে লঙ্কা দিলে সমস্ত দিন শরীরে জ্বালা হইবে, ধর্ম্মসাধন রহিত হইবে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—মৎস্য আহারে কি অপরাধ হয় ?

ঠাকুর লিখিলেন—"যাহার যাঁহা আহার তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু যদি আমার মনে মৎস্য মাংস আহার দোষ জ্ঞান হয় তবে ত্যাগ করিতেই হইবে।

কাম-ক্রোধ অধর্ম্ম নহে ঃ ধর্ম্ম-অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে।

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও লিখিলেন—কাম-ক্রোধ অধর্ম্ম নহে। তাহা হইলে মনুষ্যের আত্মার প্রকৃতির মধ্যে থাকিত না। কাম-ক্রোধের অবৈধ ব্যবহারই পাপ। যাহার প্রকৃতি যেরূপ, সে তদনুরূপ কার্য্য করে। সত্ত্ব, রজ, তম—প্রকৃতির তিনটি অবস্থা এই তিন অবস্থা যতদিন থাকিবে, তাহার সহিত সংগ্রাম হইবে। কাম-ক্রোধ যদি বৈধভাবে চালিত হয় তাহা অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে, তাহাতে শত শত নরহত্যা হয়, তথাপি তাহা অধর্ম্ম নহে। যতদিন কাম-ক্রোধ থাকিবে, সময়ে সময়ে মনে উদয় হইবে। মনে উদয় হইলেই অপরাধী নহে। মনে উদয় হইলে যদি নিবারণের চেষ্টা করি, তাহা হইলে পাপ নহে। তাহাতে ইচ্ছা পূর্ব্বক, আনন্দসহ যোগ দেওয়াই পাপ। সংগ্রাম করিতে গিয়া পরাস্ত হই, তাহাও

অপরাধ নহে। যতদিন ত্রিগুণের অধীন থাকিব, ততদিন গুণ অনুসারে আমাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে। যদি তোমার ভগবানের নাম অবলম্বন থাকে, তবে ত্রিগুণ নষ্ট হইয়া শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইতে থাকিবে। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে। মনুষ্য সমাজ যাহা পাপ-পুণ্য স্থির করিয়াছে -ভগবান তাহার দ্বারা তাহা দেখিয়া সে ভাবে বিচার করেন না;—তিনি মনুষ্যের হৃদয় দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন।

নিমের পাতায় উত্তেজনা কমে। রোজ ৩টি কোমল নিমপাতা চর্ব্বণ করিয়া অল্প একটু জল খাইতে হয়।

শালগ্রাম আরতির আদেশঃ কাম ও প্রেম।

বিকালে ঘড়ি দেখিয়া ঠাকুর আমাকে রান্না করিতে যাইতে বলিলেন। দেড় ঘণ্টার মধ্যে উনন ধরান, রান্না, হোম, আহার ও ঘর-ধোয়া, বাসন-মাজা সমস্ত করিতে হইবে। আমি ভিতর বাড়ী যাইয়া দিদিমার নিকট হইতে ডাল, চাউল নিয়া উনন ধরাইয়া রান্না করিলাম। পরম তৃপ্তিতে আহার করিয়া, বাসন মাজিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে ঠাকুর আমাকে শালগ্রামের আরতি করিতে বলেন। আরতির সরঞ্জাম আমার কিছু নাই, সুতরাং ধুপধুনা দিয়া সাধারণভাবে শালগ্রামের আরতি করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তনের পর ঠাকুর—“হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥’ ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥’ ‘জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ’॥”—এই ৩টি শ্লোক পাঠ করিয়া ‘হরিবোল হরিবোল হরিবোল’ বলিয়া হরিলুটের বাতাসা স্বহস্তে ছড়াইয়া দিলেন। প্রসাদ পাইয়া গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া সৎ-প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। কাম সম্বন্ধে নানা-প্রকার প্রশ্ন উঠিল। ঠাকুর লিখিলেন—কাম শারীরিক গুণের সামিল। বহির্ম্মুখ থাকিলেই কাম, শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া পড়িলেই প্রেম। তখন আত্মার অঙ্গ অথবা আত্মা। শারীরিক গুণ সহজে ছাড়ে না। আহার সংযম একমাত্র ব্যবস্থা। যাঁহারা বিষয়-কর্ম্ম করেন তাঁহারা, এ নিয়ম পালন করিতে পারেন না। কিন্তু বিষয়-কর্ম্ম না থাকিলেও বাসনা, কামনা, পাপ যায় না।”

রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে ঠাকুর আমাকে শয়ন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ঠাকুরের চরণতলে শয়ন করিলাম।

দৈনিক কার্য্য।

৪১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

এবার আসিয়া দেখিতেছি, ঠাকুর ৪টার সময়ে একবার শয়ন করেন মাত্র। সাড়ে চার ফুট আসনের উপরে ঠাকুর হাত পা ছড়াইয়া লম্বা হইয়া শোন না; দক্ষিণ পার্শ্বে কাত হইয়া পা দু'টি গুটাইয়া লয়েন এবং উত্থিত বাম পদের উরু এবং হাঁটুর উপরে দক্ষিণ পদের পাতা স্থাপন পূর্ব্বক, ডান হাতের বাহূপরি মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম করেন। এই একই ভাবে শয়ন, গেণ্ডারিয়া হইতে দেখিয়া আসিতেছি। এক দিনের জন্যও অন্যপ্রকার দেখি নাই। গেণ্ডারিয়ায় ঠাকুর ৪টার সময়ে অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য শয়ন করিতেন। তখন কিছুক্ষণ নিদ্রিত হইতেন। ট্রেনের শব্দ পাইয়া ঠিক সাড়ে চারটার সময়ে আসনে উঠিয়া বসিতেন; কিন্তু, এখন ঠাকুর নিদ্রিত হন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ঘড়িধরা ঠিক ১০ মিনিট পরেই নিজ হইতে আসনে উঠিয়া বসেন, এবং ভোরকীর্ত্তন করতাল বাজাইয়া করিতে থাকেন। ঠাকুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে আমি নীচে চলিয়া যাই। শৌচান্তে গঙ্গায় জগন্নাথঘাটে উপস্থিত হইয়া স্নান সন্ধ্যা তর্পণ করিয়া বাসায় আসি। রাস্তায় এক ভদ্রলোকের বাগান হইতে ফুল-তুলসী শালগ্রামের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনি। সাতটা হইতে সাড়ে সাতটার মধ্যে ঠাকুর চা সেবা করিয়া থাকেন। আমি চা বহুকাল যাবৎ খাইয়া আসিতেছি; কিন্তু এখানে চা চাহিলে পাইব না, ইহা বুঝিয়াই বুঝি ঠাকুর দু'একবার চা মুখে দিয়া নিজ পাত্র হইতে প্রায় অর্দ্ধেক চা আমাকে ২।৩ দিন দিলেন। গুরুভ্রাতারা মহামুস্কিলে পড়িলেন। ঠাকুর আমারই জন্য পরিমাণের কম, চা সেবা করেন ভাবিয়া গুরুভ্রাতারা আমাকে অগত্যা চা দিবেন স্থির করিলেন। ঠাকুরকে চা দিয়া আমার চা আনিতে একটু বিলম্ব হইলেই ঠাকুর আমাকে চা দিয়া ফেলেন—ইহা দেখিয়া সকলেই আমার উপর অতিশয় বিরক্ত ও রুষ্ট হইলেন; এবং ঠাকুরকে চা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকেও চা দিতে লাগিলেন। আমার চায়ের ব্যবস্থা করিতে ঠাকুরের এই কৌশল দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। চা পানের পর ন্যাস সমাপন করিয়া শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করি। ঠাকুরের নিকট 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি' গ্রন্থ পাঠ হইতে থাকে। এই পাঠ প্রায় এক ঘণ্টাকাল হয়। তৎপরে ঠাকুর 'গ্রন্থসাহেব' ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ করেন। এই পাঠ বড়ই মধুর। এগারটার সময়ে ঠাকুর ভিতর-বাড়ী চলিয়া যান। শৌচান্তে স্নান করিয়া প্রায় ১২টার সময়ে আহারে বসেন। দিদিমা, শান্তি ও কুতুবুড়ি মাত্র আহারের সময়ে ঠাকুরের নিকট থাকিতে পারেন। ১২টার পরে আসনে বসিয়া ঠাকুর ৩টা কখনও বা ৪টা পর্য্যন্ত একই ভাবে অবস্থান করেন। এই সময়ে ঠাকুরের গণ্ড বাহিয়া তৈলধারার ন্যায় অশ্রুবর্ষণ হইয়া থাকে। প্রায় ৪টার সময়ে গুরুভ্রাতাগণ ও সহরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সকল আসিয়া পড়েন। তাহাদের সঙ্গে ঠাকুর আকারে-ইঙ্গিতে আলাপাদি করিতে থাকেন। আমার রান্নার সময়টি কিন্তু, ঠাকুর কখনও ভোলেন

না। ঘড়ি দেখিয়া প্রত্যহই বলেন—"ব্রহ্মচারী! তোমার সময় হয়েছে, রান্না কর্‌তে যাও।" আমি অমনি রান্না করিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাই। উনন ধরাইয়া ভাতে সিদ্ধ ভাত রান্না করিতেও এক ঘণ্টার কমে হয় না। তৎপরে হোম, আহার, বাসন-মাজা প্রভৃতি শেষ করিতে নির্দ্দিষ্ট সময় প্রায় অতিবাহিত হইয়া যায়। কুতু আমাকে ডাল কখন বা তরকারী রান্না করিতে জেদ করে। আমার সময়ে তাহা কুলায় না দেখিয়া, ৪টার সময় উননটি ধরাইয়া রাখে। রান্নার সামগ্রী সকলও প্রায়ই সংগ্রহ করিয়া দেয়। কুতুর অসাধারণ সহানুভূতি ও মমতায় দিন দিন উহার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি।

আহারান্তে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর তখন আমাকে শালগ্রামের আরতি করিতে বলেন। আমি ধূপধূনা জ্বালাইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে ত্রিদীপ দ্বারা শালগ্রামের আরতি করি। আরতি শেষ হইলে সন্ধ্যা কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। আমিও বারান্দায় যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করি। সংকীর্ত্তনের গোলমালে সন্ধ্যা ঠিকমত হয় না। বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। সংকীর্ত্তন প্রায় দেড় ঘণ্টায় শেষ হইয়া যায়। আমি তখন নিজ আসনে আসিয়া বসি। রাত্রি ৯টা হইলেই ঠাকুর আমাকে শয়ন করিতে ইঙ্গিত করেন। ঠাকুরের আহারের পূর্ব্বেই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়ি। গুরুভ্রাতারা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গ করিয়া আপন আপন আবাসে চলিয়া যান। কেহ কেহ ঠাকুরের ঘরেই শয়ন করেন।

রাত্রি প্রায় ১২টার সময়ে আমি জাগিয়া পড়ি। তখন হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসি এবং একখানা বড় পাখা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতে থাকি। ঠাকুর এই সময়ে একবার শৌচে যান। এই সময়ে প্রায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক আলাপ হয়, গল্প হয়, নানা প্রশ্নের মীমাংসা হয়। নিজ হইতে ঠাকুর সমাধি অবস্থায় যাহা যাহা বলেন তাহা শুনিয়া থাকি। তৎপরে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়ে একটু মিষ্টি মুখে দিয়া জলপান করেন। পরে ৪টার সময়ে আসনে কাত হইয়া ১০ মিনিটের জন্য বিশ্রাম করেন।

গুরু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

আজ অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি গুণের অধীন? আমার মনে মনে এই ভাব ছিল যে, সদ্‌গুরুর আশ্রিত ব্যক্তিরা সদ্‌গুরুরই অধীন, অন্য কিছুরই অধীন নয়—ঠাকুর এই প্রকারই বলিবেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনিয়া ঠাকুর লিখিলেন,—"হাঁ, সকলেই গুণের অধীন। গুরুর অধীন মানুষ অনেক পরে হয়। অতি অল্প লোকেই গুরুর অধীন।" একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি প্রকারে চলিলে গুরুতে বিশ্বাস জন্মে? ঠাকুর লিখিলেন—"গুরুতে বিশ্বাস হওয়া অতি কঠিন। বিশ্বাস

হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিলে—বিশ্বাস হইবে, মনে হইল; আশ্চর্য্য দেখিলাম, তখন মনে হইল, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যদি বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য দেখিলাম, মনে হইল, এ লোকটা ভেল্কি জানে আমাকে ভেল্কি দেখাইতেছে! এই উপায়ে বিশ্বাস হয় না। একজন বসিয়া, সেই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া, ঘরে সেই বেড়ায়, একই সময়ে এইরূপ বিবিধ ঘটনা—সাধারণ মনুষ্যকে দেখাইলে কি বুঝাইলে, বুঝে না। এজন্য নিজে সাধারণ লোকের মতই চলিবে, নতুবা গোলমাল হয়। এ সকল বিষয় গোপন রাখাই ভাল। খুলে বলা ভাল নয়। বিশ্বাস হইবার একমাত্র পথ এই,—গুরু যাহা উপদেশ দেন তাহা আচরণ করা। আচরণ করিতে করিতে হৃদয়ের বিকাশ হইলেই, বিশ্বাস হইবে।

একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবানের উপাসনা করিতে কি গুরুর একান্তই প্রয়োজন? গুরু ছাড়া কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না?

ঠাকুর লিখিলেন—মানব-জীবনে যাহা কিছু শিক্ষা করি, তাহাতেই গুরুর প্রয়োজন। সংসারের মধ্যে যাহা দর্শন করি, শ্রবণ করি, ঘ্রাণ করি, স্পর্শ করি, আস্বাদ করি, এই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিয়াও যদি সেই সমস্তের তত্ত্ব জানিতে হয়, তবে ঐ সকল বিষয় যিনি অবগত আছেন তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে হয়। সেইরূপ ঈশ্বর আছেন, আমি আছি, জগৎ আছে—এগুলি সহজ জ্ঞানে সকলেই জানে। যদি কেহ সহজ জ্ঞানে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার উত্তর জানিতে চান, তবে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্ ভিন্ন অন্য পণ্ডিত ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশদানে অধিকারী নহেন। এজন্য গুরু ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

ঠাকুর আবার লিখিলেন—হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় প্রায় লক্ষ সাধুর সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩ জন যথার্থ তত্ত্বদর্শী। আর সকলে বেশভূষা সম্প্রদায় ও মতামত লইয়া ব্যস্ত। ঐ তিনজনের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'সাধুরা এত কঠোরতা করিয়াও তত্ত্বলাভ করেন না কেন?' তিনি হিন্দিতে বলিলেন—'বাবা, আমি ক্ষুদ্র কীট কি বলিব?' অনেক ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে বলিলেন—এখন কেহ ভগবানকে চায় না। মান, মর্য্যাদা, মহান্তগিরি চায়। তাহা পায়। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

প্রশ্ন—কি প্রকারে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়? সাধারণ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে উপকার হয় না? তাদের বাক্যে তো বিশ্বাস হয় না?

ঠাকুর—দেববেত্তা ও ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মেতে শান্তিলাভ করিয়াছেন—এইরূপ গুরুকে অবলম্বন করিবে। যিনি ব্রাহ্মণ, বাসনাহীন, সমস্ত রিপু যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, যাঁহার সমস্ত শরীর নির্ম্মল অর্থাৎ অঙ্গহীন নহে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে গরিষ্ঠা ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন—এমন গুরুকে আশ্রয় করিবে।"

ঠাকুর আবার লিখিলেন—যাঁহারা যথার্থ মহাজন, তাঁহাদের আশ্রয় লইতে হইবে। লোকের মুখে শুনিয়া যে অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক কি সাধু, তাহাতে উপকার হয় না। বিশেষতঃ প্রকৃত সাধু কে, তাহা শুনিলে বুঝা যায় না। এজন্য পূর্ব্বপুরুষদিগের পথে চলিতে চলিতে প্রকৃত সাধুর সহিত দেখা হইলে সকল দিকে নিরাপদ্। প্রত্যেক গুরুরই বাক্যের সহিত একটা-না-একটা শক্তি আছে; বিশ্বাস পূর্ব্বক করিলে তাহা নিশ্চয়ই কার্য্য করিবে। গুরুবাক্য বোধ হইয়াও বিশ্বাস হয় না। প্রত্যেক বাক্যে বিশ্বাস হওয়া,—পূর্ব্বজন্মের সাধনের সঙ্গে বিশেষ যোগ আছে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধে উপদেশ যিনি দেন তিনি আর্য্য ঋষি-শাস্ত্র মতে গুরু নহেন।

জিজ্ঞাসা করা হইল—গুরুর নিকট নাকি অন্যের পূজা করিতেই নাই?

ঠাকুর লিখিলেন—"গুরুর অনুমতি থাকিলে করিতে পারে। গুরুতে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান দর্শন হইলে, পৃথক্ স্থানে গুরু ভিন্ন পূজা নিষেধ।

আজ বহুক্ষণ ধরিয়া গুরু বিষয়ে আলোচনা হইল। ঠাকুরকে শালগ্রামে পূজা করি, ঠাকুরেরই আদেশমত। না হ'লে শিববাক্যমতে আমার নরক হইত—

"গুরু সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্য দেবতাং।
স যাতি নরকে ঘোরে সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥"

ঠাকুরের মৌন থাকা সম্বন্ধে অভিমত।

২৫—৩০শে ভাদ্র।

স্থকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া দেখিতেছি, বিস্তারিত ডায়েরী লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। উদয়াস্তের মধ্যে ১৫ মিনিট সময়ও আমি অবসর পাই না। বিকালে ও রাত্রে ঠাকুরের যে সকল অমূল্য উপদেশ শুনিয়া থাকি, পেন্‌সিল দ্বারা আল্‌গা কাগজে তাহা লিখিয়া রাখি। কিন্তু দিন তারিখ অনেক সময় জানা না থাকায়, ঠিকমত সুশৃঙ্খলভাবে, তাহা ডায়েরীতে তুলিয়া নেওয়া যাইতেছে না। সুতরাং উপদেশ ও

ঘটনা ঠিক ঠিক হইলেও, সময়ের উলট-পালট অনেক স্থলে হওয়া সম্ভবনা। মধ্যাহ্নে শৌচ, স্নান ও ভোজনার্থে ঠাকুর যখন ভিতর-বাড়ী যান, তখন অবসর ও নির্জ্জন পাইয়া আল্‌গা কাগজে লেখা ও ঠাকুরের লিখিত খাতার নকল, যথাসাধ্য করিতেছি।

পরমারাধ্য পরমহংসজীর আদেশ মত ঠাকুরের মৌন থাকার কাল বহুদিন হয় অতীত হইয়াছে। ঠাকুর এখনও কেন মৌন আছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় লিখিলেন—"মৌন থাকিতেই ভাল লাগে। কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।" দিনের বেলা ঠাকুর সকলরেই কথার উত্তর সাদা খাতায় পেন্‌সিলে লিখিয়া দেন রাত্রে অস্ফুট স্বরে, কখন বা আমাদের মত পরিষ্কারভাবে কথা বলেন। সুতরাং ঠকুরের লিখিত ভাষা ও মুখের উপদেশ যাহা লিখিয়া রাখিতেছি, একপ্রকার হইতেছে না। আমরা ঠাকুরের একটি মুখের কথা শুনিতে পাইলে কৃতার্থ হইলাম মনে করি। আবার অনেকে ঠাকুরের মৌনবস্থাই আকাঙ্ক্ষা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে দিন অসিয়া ঠাকুরের লেখা খাতা পড়িয়া বলিলেন—"গোঁসাই যদি আরও কিছুকাল মৌন থাকেন, বড় কল্যাণ হয়,—আমরা অনেকগুলি নূতন জিনিস পাইব। গোঁসাই মৌনই থাকুন। এই খাতা অপূর্ব্ব একখানা গ্রন্থ হইবে।"

শালগ্রামের ঘর্ম্ম ঃ শালগ্রাম পূজায় সাধারণের বিদ্বেষ।

আজ উনন ধরাইয়া রান্না করিতে একটু বিলম্ব হইল। যথাসময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইতে পারিব না ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং, আগুন আগুন খিচুড়ী শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া অমনি কৌটায় বন্ধ করিলাম। প্রতিদিনই ভোগ নিবেদনের পর শালগ্রামের সম্মুখে ধুপধূনা জ্বালাইয়া একটু সময় বসিয়া থাকি। আজ আর তাহা করিতে অবসর পাইলাম না। তাড়াতাড়ি আহার করিয়া, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর ঐ সময়ে খুব ব্যস্ততা দেখাইয়া বলিলেন,—"শীঘ্র শালগ্রাম খোল। ভোগ দিয়াই শালগ্রামকে কৌটায় বন্ধ ক'রে রেখেছ! গরমে ঠাকুর যে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্ছেন,—হাত গুটায়ে ব'সে কষ্ট প্রকাশ কচ্ছেন! শীঘ্র বাতাস কর—এই পাখা নেও।" এই বলিয়া ঠাকুর আমাকে পাখা দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ কৌটা হইতে শালগ্রাম খুলিয়া দেখি, শিশিরবিন্দুর মত শালগ্রামের সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম রহিয়াছে। দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। হায়, ঠাকুরকে আমি এত ক্লেশ দিলাম! তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবীনবাবু ও শ্রীপতিবাবু আসিয়া শালগ্রামকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত বাতাস করায়, ঠাকুরের শরীর শীতল হইল। ঘাম শুকাইয়া গেল। তখন ঠাকুর বলিলেন—এখন শালগ্রামকে কৌটায় রাখ। শালগ্রামকে ভোগ দিয়ে আরতি ক'রো। একখানা চামর আনায়ে

নেও। চামরের হাওয়া বড় ঠাণ্ডা। উহা দ্বারাই শালগ্রামকে বাতাস কর্‌তে হয়।” দু’দিনের মধ্যেই চামর আসিল। এখন আবার কাঁসরের জন্য বারংবার বলিতেছেন। ভগবানের ইচ্ছায় একখানা ছোট কাঁসর অভয়বাবু আনিয়া দিলেন। আরতির সময় ঠাকুর স্বয়ং উহা বাজাইয়া থাকেন।

আজকাল সন্ধ্যার সময়ে শালগ্রামের আরতিতে বড়ই ধূমধাম হয়। খোল করতাল তালে তালে বাজিতে থাকে। আমি পরমানন্দে আরতি করি। এই আরতি দেখিয়া অনেকেই খুব আনন্দ-উৎসাহ প্রকাশ করেন। আবার কেহ কেহ বিরক্তও হন। গুরুভাতাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মভাবাপন্ন, ঠাকুরকে কাঁসর বাজাইতে দেখিয়া তাঁহারা বড়ই দুঃখিত ও বিস্মিত। আর হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মেরা বলেন, “একি ? গোঁসাইয়ের কাছে পৌত্তলিকতা আরম্ভ হইল ? তিনিই বা কেন ইহা প্রশ্রয় দিতেছেন ?” গোঁড়া হিন্দু গুরুভ্রাতারা বলিতেছেন—“এ আবার কেমন পূজা, গুরুদেবের নিকটে শালগ্রামের আরতি ! দেখে গা জ্ব’লে যায়। আরতি কর্‌তে হয়, গুরুরই আরতি কর। গুরুর কাছে শালগ্রামের আরতি কেন ?” সাধারণের এ সকল বিরক্তির ভাবে আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম। ব্রাহ্ম বা হিন্দু কেহই আমাকে সহানুভূতি করিতেছেন না ; বরং যাহাতে শালগ্রামে আমার অশ্রদ্ধা হয়, এমনই সব কথা বলিতেছেন। সকলের বিরুদ্ধভাবে আমার যে কি অবস্থা ঘটবে, বলিতে পারি না। গুরুদেবই আমার ভরসা। দেখা যাক্, কতদূর কি দাঁড়ায়।

সদ্‌গুরু সম্বন্ধে নানা কথা।

কয়েকটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে শাস্ত্রে কি প্রকার ব্যবস্থা আছে ? সদ্‌গুরুর নিকটে যে দীক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেই সদ্‌গুরু কি প্রকার ? আপন আপন গুরুকে তো সকলেই সদ্‌গুরু বলে ? ঠাকুর লিখিলেন—দীক্ষা সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যবস্থা। বৈদিক নিয়মে, বেদ-বেদান্ত-বেত্তা, আশ্রমী—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের কোন আশ্রমের যিনি নিয়মিত আচার প্রতিপালন করেন,—এমন বেদজ্ঞ, সদাচারী, আশ্রমী ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরু শব্দ-বাচ্য। বৈদিক সদ্‌গুরুর নিকট কেবল ব্রাহ্মণ ওঁকার মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন,—অন্য জাতির অধিকার নাই। দ্বিতীয় তান্ত্রিক। কলিতে যে সকল দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, বৈদিক আশ্রম ও সদাচার প্রতিপালনে অক্ষম, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাদেব দয়া করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারিবর্ণের এবং সমস্ত বর্ণশঙ্কর মনুষ্যের অধিকার আছে। তন্ত্র সাধনের তিনটি সোপান,—পশু, বীর, দিব্য। এই ত্রিবিধ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া যে ব্যক্তি

মন্ত্রার্থের সহিত মন্ত্র-চৈতন্য করিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধ মন্ত্রের সহিত ওঁকার যোগ হইয়া থাকে। সিদ্ধমন্ত্রে যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তিনিই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরু মহাদেবের আজ্ঞানুসারে সর্ব্ববর্ণকে ওঁকারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করেন। তাহা সাধন করিলে নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিও তিন জন্মে মুক্তিলাভ করেন। সত্য, সত্য, সত্য,—শিববাক্য।

প্রশ্ন—আমাদের দেশে পঞ্চ উপাসনা প্রচলিত আছে। আমাদের কি প্রকার উপাসনায় কল্যাণ হইতে পারে?

ঠাকুর—পঞ্চ দেবতার পূজা বিষয়ে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহার মীমাংসা আছে। অত দূর অনুসন্ধান করিতে অভিলাষ না হইলে, প্রচলিত প্রণালীমত চলিলেই হইতে পারে। উপাসনা দুই নিয়মে প্রচলিত—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বঙ্গদেশে বৈদিক উপাসনা প্রচলিত নাই বলিলেই হয়, কেবল গায়ত্রী-সন্ধ্যা ব্রাহ্মণগণ করেন। তাহার উপর তান্ত্রিক দীক্ষা লইয়া থাকেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর এই পঞ্চ দেবতার কোন এক দেব-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। প্রতিদিন পূজার সময় ঐ পঞ্চ দেবতার পূজা অগ্রে করিয়া, পরে ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়। ইহাতে নিষ্ঠা হইলে সমস্তই লাভ করা যায়। 'নারদ-পঞ্চরাত্রে' ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে—'হরের্ণাম, হরের্ণাম, হরের্ণামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করিলেই ভববন্ধন হইতে মুক্তি হয়। মূল কথা,—শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে ধর্ম্মলাভ হয়।

প্রশ্ন—বিশ্বাস-ভক্তি নাই, অথচ দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা,—এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য?

ঠাকুর—নিজের বিশ্বাস না হইলে মন্ত্রাদি লওয়া কেবল সমাজের নিয়ম রক্ষা করা। সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়, ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া, ক্রমে শাস্ত্রানুসারে চলিতে চলিতে একটি কিছু ধরিয়া বিশ্বাস করে। নতুবা ভগবান্ মানবাত্মাতে যে ধর্ম্মভাব দিয়াছেন তাহাতে স্বাভাবিক বিশ্বাস হইলে চলিতে পারে। শাস্ত্রে অথবা আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাস না থাকিলে, যদি ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা হয়, তবে পূর্ব্বপুরুষগণ, দেশের প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকগণ, যে পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন সেই মহাজনদিগের পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

ভীষণ স্বপ্ন--মাতৃহত্যা।

আজ সকালবেলা হইতে মাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোন্ প্রাণে মার নিকট যাইব—মাকে দেখিব ? স্বপ্নে মার উপরে যে বিষম ব্যবহার করিয়াছি—তাহা স্মরণ হইলে বুক কাঁপিয়া উঠে—ক্লেশে প্রাণ ফাটিয়া যায়। মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আসনে আসিলেন, পরে ঠাকুরকে বলিলাম—ফরক্কাবাদ হইতে চণ্ডীপাহাড়ে যাওয়ার দিন আমি একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওরূপ স্বপ্ন আমি দেখ্‌লাম কেন—মনে হ'লে প্রাণ বড় অস্থির হয়।

ঠাকুর আমার কথা শেষ না হইতে সমস্ত জানেন এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে আমার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—“হাঁ, হাঁ, স্বপ্নটি বল না—শুনি।” আমি কহিলাম —কুতু, মাঠাকৃরুণ ও যোগজীবনের সহিত আপনার নিকটে বসে আছি—অকস্মাৎ দেখ্‌লাম আমার মা একটু দূরে আড়াল থেকে আমাকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছেন—আপনি তখন মাকে দেখে বল্‌লেন—'তোমার ঐ মাকে বধ কর্‌তে পার ? নেও এই খাঁড়াখানা নেও।' আপনি বলা মাত্র আমি খাঁড়া হাতে নিয়ে মাকে বধ কর্‌তে ছুট্‌লাম--ভাবলাম আপনার আদেশমত মাকে এখন বধ করি—পরে আপনার পায়ে পড়ে কেঁদে মাকে পুনর্জ্জীবিতা কর্‌বো। মার নিকট পঁহুছিয়া এক ঘায়ে মাকে দু'ভাগ ক'রে ফেল্‌লাম। তখনই আমি কেমন যেন হ'য়ে গেলাম। খাঁড়াখানা হাতে লয়ে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌লাম। ঐ সময়ে আপনি আসন হ'তে উঠে—ছুটে আমার নিকটে এলেন এবং আমাকে বুকে জড়ায়ে ধর্‌লেন। আমি অমনি স্থির হলাম। আপনি বল্‌লেন—এর চিহ্নও রাখ্‌তে নাই। মাটিতে পুঁতে ফেল। আমি অবিলম্বে একটি গর্ত্ত ক'রে মাকে পুঁতে ফেল্‌লাম। তখন আপনি আমাকে হাত ধরে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গেলেন—আর অমনি জেগে পড়্‌লাম। ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—“সুন্দর স্বপ্ন দেখেছ—ও ভেবে উদ্বেগ কেন ? ঐ মা তোমার গর্ভধারিণী নয়। মায়া পিশাচী মাতৃরূপে আড়াল থেকে তোমাকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিল—তাকেই বধ করেছ।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার প্রাণটি ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ক্লেশের আর লেশমাত্র রহিল না। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—স্বপ্নে কি জীবনের যথার্থ উন্নতি লাভ হইতে পারে ? ঠাকুর বলিলেন—“খুব পারে। একটা সুদীর্ঘ জীবন জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত ২।৫ মিনিটের স্বপ্নে কাটিয়া যায়। সব স্বপ্নই অলীক নয়।” গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার কথা মনে হইল। তিনি বলিয়াছিলেন—তিন রাত্রি শৃঙ্খলা মত পর পর একই স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। জন্ম হইতে সমস্ত বাল্যকাল প্রথম রাত্রে, পরে যৌবনকাল দ্বিতীয় রাত্রে, তৎপরে বৃদ্ধাবস্থা মৃত্যু পর্য্যন্ত তৃতীয় রাত্রে—এইপ্রকার একজন্ম শিশুকাল হইতে ৬০।৭০ বৎসরে মৃত্যু পর্য্যন্ত—এক দিন এক দিন করিয়া স্বপ্নে ভোগ হইয়াছে। আজ অপরাহ্ণে বৈষ্ণবভাবাপন্ন কয়েকটি কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে পরস্পর আলোচনার পর

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভাবে উপাসনা কি ?

জানিতে চাহিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাধাকৃষ্ণ উপাসনার অধিকার কখন হয় ? পঞ্চদেবতার উপাসনার পরে কি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ?

ঠাকুর লিখিলেন—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, অনেক জন্মগ্রহণ করিতে করিতে জীবের ধর্ম্মে মতি হয়। প্রথম গণেশ উপাসনা, পরে সূর্য্যের উপাসনা, পরে শৈব, তৎপরে বৈষ্ণব অতঃপর শাক্ত,—এই শক্তি উপাসনার পর মুক্তি। তখন রাধাকৃষ্ণ উপাসনার অধিকার জন্মে। ঐ সময়ে যদি সদ্‌গুরুর কৃপা হয়, তবে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বসুধা পান করিয়া কৃতার্থ হয়। ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসক, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব। মাধুর্য্যভাবের উপাসক বৈষ্ণব। রাম-সীতা, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ উপাসক যদি ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসক হন, তবে তাঁহাদিগকে শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য মতই, ঐশ্বর্য্য উপাসক বলিতে হইবে। কালী, দুর্গা, শিব, সূর্য্য, গণপতি, নারায়ণ উপাসক যদি মাধুর্য্যভাবের উপাসক হন, তবে তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতা তাহার প্রমাণ। শিব পার্ব্বতী, রাম সীতা, লক্ষ্মীনারায়ণ,—এই সমস্ত যদি মাধুর্য্যভাবের হয়, তাহা হইলেই পরাধর্ম্ম হইবে। আর ঐশ্বর্য্যভাবের হইলে ঈশ্বরোপাসনা হইবে। রামপ্রসাদের মত বৈষ্ণব কে ? কালী, দুর্গা এ সব নাম শাক্ত নহে। শাক্ত ঐশ্বর্য্যে।

'সেবা, বন্দনা আউর অধীনতা'।

কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রতিদিন আমরা গান করি, 'সেবা, বন্দনা আউর অধীনতা, সহজে মিলওয়ে গোঁসাই'—এ কথার অর্থ কি ?

ঠাকুর উত্তর দিলেন,—দীনহীন, বিনীত হওয়া অপেক্ষা ভগবানকে লাভের আর সহজ উপায় নাই। সেবা-বন্দনা ও অধীনতা,—ইহাই সকল প্রকার সাধন হ'তে শ্রেষ্ঠ ও সহজ। অনেক লোককে, অনেক মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়েছে কিন্তু তাঁরা ইহা হ'তে ভগবান লাভের আর সহজ উপায় বল্‌তে পারেন নাই। আমারও বিশ্বাস, ইহা হ'তে আর সহজ কিছু নাই। এই শ্রেষ্ঠ সাধন ও সহজ সাধন। এতে ভগবানের প্রতি মহাভাব এনে দেয়। কায়মনোবাক্যে সকলের অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদির সাধ্যানুসারে সেবা কর্‌তে হবে। দয়া-

সহানুভূতি না হ'লে যথার্থ সেবা হয় না। যেমন নিজের প্রয়োজন হ'লে তা পূর্ণ করতে ইচ্ছা হয়, সেই প্রকার অন্যের প্রয়োজন যদি মনে লাগে, তবে তা পূর্ণ করতে ব্যাকুলতা জন্মে। মা শিশুর সেবা করেন—ঐভাবে। শিশুর অভাব দেখ্‌লে মা অস্থির। এরই নাম সেবা। না হ'লে ভিতরে অনুরাগ নাই, দেখা-দেখি কিছু খেতে দিলাম, অথবা অন্য প্রকার সাহায্য কর্‌লাম—তাহাকে যথার্থ সেবা বলে না। বৃক্ষ-সেবা, পতি-সেবা, সন্তান-সেবা, প্রভু-সেবা, ভৃত্য-সেবা, পত্নী-সেবা—ঐভাবে হ'লেই সেবা, নইলে সেবা নাম করা উচিত নয়। যেখানে সেবা কর্‌তে গিয়ে অভিমান হয়,—নিজের বিশেষ অনিষ্ট হয়—সেখানে সেবা কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই, তাতে অপকার হবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বন্দনা—সকলের বন্দনা কর্‌তে হ'বে। যেখানে যতটুকু সত্য পাওয়া যায়, সেখানে ততটুকু গ্রহণ কর্‌বে। যা'র মধ্য হ'তে বা যে কোন স্থান হ'তে সত্য পাওয়া যায়, কি উপদেশ শুনা যায়, সেই স্থানকে, সেই বস্তু কি সেই ব্যক্তিকে বিশেষরূপে বন্দনা কর্‌তে হবে। ভগবানের নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে সেই সত্য পালন কর্‌তে পার। এতে যদি ব্যাকুলতা না আসে, তা হ'লে যাতে ব্যাকুলতার জন্য ব্যাকুলতা আসে তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর্‌তে হবে। তবেই সত্য হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। নিজের শক্তিতে কোন সত্য পাওয়া যায় না। যে সময়ে নিজে অতি দীনহীনভাবে ঐ সত্য প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয় এবং আত্মা অতি দীন ভাব, বিনীত ভাব ধারণ করে তখনই ভগবানের অসীম দয়াতে সেই সত্য হৃদয়ে প্রকাশিত হ'য়ে জীবনকে ধন্য করে। এ রকম না হ'লে সত্য পাওয়া যায় না ; পরিবর্ত্তনও ঘটে না।

বন্দনা তিন প্রকার—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। কায়িক বন্দনা—ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম, হাতজোড়, নমস্কার ইত্যাদি। বাচনিক বন্দনা—তাঁকে বা সেই জিনিষকে স্তব-স্তুতি ইত্যাদি। মানসিক বন্দনা—মনেতে ঐরূপ বন্দনার ভাব।

যাঁর নিকট হ'তে ঐরূপ সত্য পাওয়া যায়, তাঁকে অনাদর কিম্বা হাস্য-বিদ্রূপ করা উচিত নয়। গুরুজ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁর নিকট বিনীত থাকৃতে হবে। তবেই বিশেষ ফল পাওয়া যাবে।

অধীনতা—সবাই গুরুজন। সকলেরই অধীন হবে। তাঁদের নিকট বিনীত

ও অধীন থাক্‌তে হবে। সকলকেই প্রভু মনে কর্‌বে। তাঁদের দেখে ভীত হবে। তাঁদের মহিমা কীর্ত্তন কর্‌বে। সকলেই যেন তোমাকে আপন বলে মনে কর্‌তে পারে। এরূপ কর্‌লে আর দেরী নাই। এসব বিষয় কোথাও বল্‌তে নাই ;—এসব ভাব গোপন রাখ্‌লেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

এক দিবস ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে আলোচনা সভায় ডাক্তার পি, কে, রায়ের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"বিশ্বাস লাভ কর্‌তে হ'লে বিশ্বাসীর পদানত হ'তেই হবে।"—সে কথা মনে হইল। ঠাকুর একটু অপেক্ষা করিয়া লিখিলেন—

(১) ঋষিমার্গ—পথ। (২) শুদ্ধি—পরম সাধন। (৩) জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—জীব নিস্তারের উপায়। (৪) বিশ্বাস—ধর্ম্ম-ভিত্তি। (৫) জীবন-গঠন—ব্রত। (৬) সত্যপথ—অবলম্বনীয়। (৭) প্রেম ও প্রীতিকথা—যথার্থ কথা। (৮) একজনই উপাস্য। (৯) একাগ্রতা—সুস্থাবস্থা। (১০) সংশয়—পীড়া। (১১) সাধুসঙ্গ—ঔষধ।

ঠাকুর 'সবা, বন্দনা আউর অধীনতা' এবং এই প্রকার প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন শুনিয়া, গুরুভ্রাতারা খুব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

স্বপ্নে আশীর্ব্বাদ।

কিছুদিন যাবৎ ভিতরের দুরবস্থা দেখিয়া বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। ঠাকুর আমাকে এত আদর করিতেছেন, এত ভালবাসিতেছেন, চতুর্দ্দিকে বিদ্বেষাগ্নির তাপে নিজ শ্রীঅঙ্গের সুশীতল ছায়ায় আমাকে এত ভাবে ঠাণ্ডা রাখিতেছেন কিন্তু আমি ঠাকুরের জন্য কি করিতেছি? ঠাকুরের অবিরল কৃপাধারা, যাহা নিয়ত আমার উপরে বর্ষিত হইতেছে, তাহা অনুভবের অবস্থা আমার এখনও হইল না। বহুকাল যাবৎ দু'টি অবস্থা লাভের জন্য অন্তরে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ঠাকুর তাহা পূরণ করিতেছেন কই? ঠাকুরের কৃপায় অসাধারণ অবস্থা লাভ করিয়া তাহা সম্ভোগ করিবার বৃত্তি যদি আমার না জন্মিল তাহা হইলে ঠাকুরের এই কৃপাবর্ষণের প্রয়োজন কি? আজ খুব আকুলভাবে মনে মনে ঠাকুরের চরণে জানাইলাম—গুরুদেব! তুমি আমাকে এত দয়া করিতেছ, কিন্তু বিশ্বাস-ভক্তি অভাবে তাহা আমি ভোগ করিতে পারিতেছি না। যদি যথার্থই তুমি আমাকে সুখী করিতে চাও, কৃতার্থ করিতে চাও, তাহা হলে তোমাতে স্বাভাবিক স্থির বিশ্বাস ও একান্ত ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আপনার করিয়া লও। না হ'লে তোমার স্মৃতি ও সংশ্রবের চিত্র চিরকালের জন্য অন্তর হইতে কাড়িয়া লও। এই অবিশ্বাস ও শুষ্কতার জালা আর আমি সহ্য করিতে পারি না। সারাদিন নামের সঙ্গে এই ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে আমার দিন কাটিয়া গেল।

রাত্রে যথাসময়ে শয়ন করিয়াও নিদ্রা হইল না। বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। অধিক রাত্রে নিদ্রিত

হইয়া পড়িলাম। সুতরাং আর আর দিনের মত ঠিক সময়ে জাগিতে পারিলাম না। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ আমাকে হাতে তালি দিয়া জাগাইলেন। আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়া ঐ সময়ে ঘুমের ঘোরে কাঁদিতেছিলাম। হাত তালির শব্দ পাইয়া জাগিয়া পড়িলাম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখ্‌লে?" আমি বলিতে লাগিলাম—'দেখিলাম, আমি একটি আকস্মিক আপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফল হইলাম। তখন একান্ত নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখনই দেখিলাম, আপনি আমার সম্মুখে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। একটু পরেই আপনার সমাধি ছুটিতে লাগিল। তখন একবার আমার দিকে তাকাইলেন এবং 'চোঁ চোঁ' শব্দে তালু হইতে জিহ্বা টানিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে লাগিলেন। আমাকে নিকটে দেখিয়া নমস্কার করিলেন এবং পদধূলি নিতে হাত বাড়াইলেন। আমার তখন মনে হইল, পদধূলি দিব কি না? গুরুকে পাদস্পর্শ করিতে দেওয়া তো মহাপাপ। তখনই আবার ভাবিলাম, আমি তো দিতে চাইনা, তিনিই নিতে চান। তাঁর যাহাতে তৃপ্তি তাহাতে আমি বাধা দিব কেন? গুরু দ্বারা আমার কোন প্রকারই অনিষ্ট বা অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। গুরু কোন্ কার্য্যে কি ভাবে কাহার কল্যাণ করেন তাহা আমি কি জানি? নিশ্চয়ই আমারই কল্যাণের জন্য ঠাকুর ইহা করিতেছেন। এই ভাব আসামাত্র, আর আমি আপত্তি করিলাম না। আপনাকে অনায়াসে পায়ের ধূলি দিলাম। আপনি উহা মস্তকে ধারণ করিয়া, আমাকে কোলে নিতে হাত বাড়াইলেন। আমি তখন ঝাঁপাইয়া আপনার কোলে যাইয়া শিশুর মত শুইয়া পড়িলাম। আপনি আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলাম—আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। তখনই আপনার হাতের তালিতে আমি জাগিয়া পড়িলাম। ঠাকুর স্বপ্ন শুনিয়া 'হুঁ হুঁ' করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে স্বপ্ন-কথায় সায় দিলেন। আমি হাত মুখ ধুইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। একটুকু পরেই দেখি ঠাকুর ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন এবং আমার দিকে এক-একবার তাকাইতেছেন। আমি ঠাকুরের চরণে দৃষ্টি রাখিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

জীবের স্বাধীনতার সীমা।

আজ শনিবার। বহুলোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। জনৈক গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মানুষের কি কিছু স্বাধীনতা আছে?'

ঠাকুর লিখিলেন—হাঁ, স্বাধীনতা কিছু আছে। যেমন একটা গরুর গলায় দড়ি বাঁধা থাকিলে দড়ি যতটা লম্বা, ঘুরিতে-ফিরিতে পারে,—দড়ির অতিরিক্ত যাইতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যও আপন প্রবৃত্তির বিষয় যতটুকু, মাত্র ততটুকুই স্বাধীনভাবে করিতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ, যতদূর হইতে দৃশ্য দেখে, শব্দ শুনে, তাহার উপরে যাইবার ক্ষমতা নাই। নিজের ছেলেকে যেমন ভালবাসে

অন্যের ছেলেকে তেমন ভালবাসিতে পারে না। হাজার চেষ্টা করিলেও অন্তরে সে প্রকার ভাব আনিতে পারে না; সুতরাং মনুষ্য বাঁধা গরুর মত স্বাধীন। মোহ অজ্ঞানতা যতদিন, ততদিন জীব আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। প্রত্যেক জীবের এক একটি কার্য্য আছে। সেই কার্য্য সাধনের জন্য যতটুকু স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহা আছে। যেমন গরুর গলায় যতটুকু দড়ি বাঁধা চলিতে পারে। সমস্ত জীব কেবল উপাধিতে আবৃত বলিয়া অন্ধবৎ আছে। উপাধি যত কাটে ততই দেবত্ব লাভ করে। এইজন্য জীবকে চিৎকণ বলিয়াছেন। জীব মুক্ত, শিব।

ধর্ম্মের জন্য সংসারত্যাগ কি দোষ? ধর্ম্মের লক্ষণ।

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় সাধন-ভজন কিছুতেই করা যায় না; সুতরাং ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ করা কি দোষ?

ঠাকুর লিখিলেন—মানুষ কিছুদিন সাংসারে থাকিয়া সাধন করিলে এবং তাপে দগ্ধ হইলে,—অগ্নি পরীক্ষিত হইলে, যেখানে যাউক, কেহ নষ্ট করিতে পারে না। মনে বৈরাগ্য আসিবামাত্র যদি যায়, তবে অনেক পতনের কারণের মধ্যে পতিত হইতে হয়। সেই সময়ে সাবধান না হইলেই সর্ব্বনাশ। ধর্ম্মপথে থাকিবে। ইহাতে সংসার থাকে থাকুক না হয় যাউক। অসত্য অবলম্বন করিয়া কখনই কেহ অর্থ করিবে না, বরং ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাইবে। ধর্ম্ম সতীর মত, দাতার মত, ভক্তের মত এবং বীরের মত রক্ষা করিতে হইবে। যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানেই জয়। মানুষে কি করিতে পারে? স্বয়ং ভগবান ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

কেহ বলিলেন—"শাস্ত্র পুরাণাদিতে তো ধর্ম্মের কত লক্ষণ দিয়াছেন। প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহাতো কিছুই বুঝি না।"

ঠাকুর—"টাকা, শরীর, ধর্ম্ম। উহাদের উপযুক্ত ব্যবহারই ধর্ম্ম। সকল বিষয়ের অপব্যবহার, অপব্যয়ই পাপ। কীর্ত্তনে একটু নৃত্য করিল, একটু ভাব হইল, ইহাকেই এখন ধর্ম্ম বলে। ইহা ধর্ম্ম সন্দেহ নাই ঃ কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ,—সত্য, ন্যায়, জীবে দয়া, পিতামাতা ও গুরুজনকে ভক্তি, সৎসঙ্গে স্পৃহা, পরস্ত্রী দর্শনে সাবধানতা, পরধনে অলোভ,—এইগুলি প্রথম অঙ্গ। হরিনামের ফল ধরিতে

আরম্ভ হইলে প্রথমে ঐগুলি দেখা যায়। উহা না হইলে জীবনে ধর্ম্মের আরম্ভই হইল না।

একদিন অন্নপূর্ণার মা গোঁসাইকে বলিলেন—'বাবা আমি বড় টাকা হারাই, আমার কি হবে?' গোঁসাই বলিলেন—"যিনি টাকা হারান, তিনি সবই হারান, তিনি ধর্ম্মও হারান। টাকা হারাবার জিনিষ নহে, দান কর। আমি গেঁজে ক'রে টাকা ল'য়ে যাই, খরচ হ'য়ে গেলে নিশ্চিন্ত হই।"

কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—শাস্ত্রে ভগবান লাভের ব্যবস্থা ও সাধন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? ঠাকুর—"শিশুর আহার একপ্রকার, বালকের একপ্রকার, যুবকের একপ্রকার, বৃদ্ধের একপ্রকার, আবার রোগীর একপ্রকার। প্রত্যেকে আপন আপন আহারে পুষ্টিলাভ করে। একজনের আহার অন্যজনকে দিলে জীবন নষ্ট হয়। সকলের এক নিয়মে হয় না। শরীরের প্রকৃতি মানসিক প্রকৃতি ভিন্ন; সুতরাং নিয়মও ভিন্ন ভিন্ন।

ঋষিবাক্যই সার।

অদ্য ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। অনেক কথার পর তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'গোঁসাই! মানুষের মুখ চেয়ে, লোকলজ্জা ক'রে জীবন নষ্ট কর্‌লাম। এখন লোকে বড়লোক বলে, সেই অভিমানেই মারা গেলাম— যথার্থ ধর্ম্ম হ'ল না। লোকের লজ্জায় ধর্ম্ম হারালাম, কিন্তু লোকের কিছুই হ'ল না—ক্ষতি আমারই হ'ল। ঠাকুর প্রতাপবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন—'আপনি গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর্‌বেন। কেবল ইংরাজী ভাবে থাকবেন না। উপকার পাবেন।"

ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি লোকের সহিত, আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ এবং শাস্ত্রসদাচার বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর, ঠাকুর লিখিলেন—"ধর্ম্মের নূতন কথা বলিতে সেই ঋষিদিগেরই শক্তি ছিল। তাঁহারা দয়া করিয়া যে সকল ধর্ম্ম মত শাস্ত্ররূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তাঁহাদের উপদেশ যথার্থারূপে পালন করিতে ইচ্ছা হয়। এখন শারীরিক, সামাজিক ও অন্যান্য অনেক কারণে প্রকৃত শাস্ত্র, সদাচারের অনুগত হওয়াও কঠিন বোধ হইতেছে। ঋষিবাক্যই সার,—এখন ইহাই বুঝিতেছি।

একাগ্রতা লাভের উপায়।

কিছুদিন হয় দেশপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও র‍্যাঙ্‌লার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন এবং ঠাকুর সকলকে কিছু সময়ের জন্য অন্য ঘরে যাইতে বলিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ঠাকুর লিখিলেন—"যাওয়ার সময় তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়া গেলেন, 'গোঁসাই জীবন বৃথা গেল। মনে করিতাম ধর্ম্ম হইয়াছে; এখন দেখি, কিছুই হয় নাই। এই কষ্ট নিবারণের উপায়'।" ঠাকুর উত্তর কি দিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। বসু-মহাশয় খুব তৃপ্তিলাভ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এক দিবস ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া বিবিধ বিষয় আলোচনা করিলেন। সে সকল কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ব্রজেন্দ্রবাবু যাওয়ার সময়ে রাখালবাবু প্রভৃতিকে বলিয়া গেলেন—"সমস্ত 'ফিলসফির' উপর গোঁসাই হেগে দিয়েছেন। কোথায় দাঁড়িয়ে যে তিনি কথা বলেন কিছুই বুঝ্‌লাম না, সে অগাধ সমুদ্রে প্রবেশও করিতে পারিলাম না।"

আজ নিষ্ঠাবান কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মন তো কিছুতেই স্থির হয় না? একাগ্রতা কি প্রকারে লাভ করা যায়?'

ঠাকুর লিখিলেন—একাগ্রতা অভ্যাস অনেক প্রকার। কিন্তু যতপ্রকার আছে, সমস্তই সাময়িক। যতক্ষণ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণই অল্প অল্প মনঃস্থির হয়, এ জন্য বাহিরের উপায় সাময়িক মাত্র। মনের সংকল্প-বিকল্প নষ্ট না হইলে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। ভগবান আছেন, এটি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এই তিনটিই একাগ্রতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রথমে স্মরণ—সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বঘটনায় স্মরণ, দ্বিতীয় মনন—অস্তিত্ব বোধ হইলেই মন সেই দিকে আপনা হইতে যায়,—যেমন সর্পেরা আলো দেখিলে চোখ আর ফিরাইতে পারে না। তৃতীয় নিদিধ্যাসন—গরু যেমন জাওর কাটে। স্মরণে, মননে যাহা স্বাদ পাইয়াছে পুনঃপুনঃ তাহা ভোগ করা। এই তিনটিই একাগ্রতা লাভের বিশেষ উপায়।

প্রশ্ন—মনের উপরে আমাদের কর্ত্তৃত্ব হয় না কেন?

ঠাকুর—"মনের সংকল্প-বিকল্প সর্ব্বদাই হইতেছে। ইহাতে মন অস্থির হয়, মনের উপর কর্ত্তৃত্ব আসে না। ইহার প্রধান কারণ, দুইটি ইন্দ্রিয় প্রবল,—জিহ্বা ও উপস্থ।

উপস্থ অনায়াসে লোকে দমন করিতে পারে, কিন্তু জিহ্বাকে সহজে বশে আনা যায় না। কেহ নিন্দা করিল, কটু বাক্য বলিল, জিহ্বা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিল। এই জিহ্বা বশীভূত হইলে নিন্দা প্রশংসায় চঞ্চল করিতে পারে না।”

ঠাকুর আবার লিখিলেন—সাধুসঙ্গ, সর্ব্বদা নিত্যানিত্য বিচার অর্থাৎ সংসারের অসারতা চিন্তা এবং মনে মনে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নাম জপ করা,—এই সকল উপায় গ্রহণ করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়—মনের উপর কর্ত্তৃত্ব জন্মে।

মণিবাবুর মা ও ভগ্নীর কথা।

মণিবাবুর মা ও ভগ্নীর ঠাকুর-দর্শনের কথা সংক্ষেপে ছোটদাদার ডায়েরী হইতে এই স্থানে তুলিয়া দিলাম :—

মণিবাবু—এই বাটীতে গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থানকালে আমাদেয় অঞ্চলের অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে যান। কিন্তু আমার মায়ের দর্শন হইল না। তিনি চলিতে অসমর্থা এই কথা গোঁসাইকে বলায় তিনি বলিলেন—“আমি বাদুড়বাগান যাবার সময় তোমাদের বাড়ী হ’য়ে যাব।” আমি আফিসে গেলাম মা’কে বলিয়া গেলাম যে, গোঁসাইকে ঠাকুরঘরে বসাইও। এক টাকার সন্দেশ আনাইয়া তুমি স্বহস্তে ঠাকুরকে খাওয়াইও। আফিস হইতে আসিয়া মা’কে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘মা, গোঁসাই এসেছিলেন? তাঁকে কেমন দেখলে?’ মা বলিলেন—‘তোমার গোঁসাই বেশ। তিনি ঠাকুরঘরে আসনে বসিবামাত্র ঠাকুরঘর আলোকময় হইয়া উঠিল। ঠাকুর সিংহাসন হইতে নামিয়া গোঁসাইর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পরে সিংহাসনে উঠিলেন।’ আমি বলিলাম—‘মা! এও কি হয়?’ পরে গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—“মা কি কখন মিথ্যা কথা কন্?”

মণিবাবুর ভগ্নী শ্রীমতী ভোগমায়া আজ আমার নিকটে ঠাকুরের সম্বন্ধে গল্প করিলেন—আমি ও ডাক্তার অমৃত মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী (ব্রহ্মজ্ঞানী) ও আমার ভা’জ (গুরুভগ্নী) সৌরীন্দ্রের মাতা তিনজনে একদিন বেলা ২টার সময় বাদুড়বাগানের ৩৩নং গোপাল মিত্রের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেইদিন তিনি একটি গান গাহিয়াছিলেন সেটী এই—‘ধরম্ করম্ সকলি গেল লো, শ্যামাপূজা আর হ’লোনা।’ গানের পর মাঠাকুরুণকে লইয়া মাণিকতলার মা’র বাড়ীতে যাই। তিনি আমার মাঠাকুরাণীকে একটি গান গাহিতে বলেন। মাঠাকুরুণ গাইলেন—‘হরি হে তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে, তোমার মহিমা ভক্ত ভিন্ন কে আর জানে।’

তৎপরদিন আমরা পুনরায় গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বদিনের সঙ্গীতের

মর্ম্ম বুঝিতে চাই। তিনি বলিলেন—"রাধারাণী সখীদিগকে বল্‌ছেন—(আয়ান ঘোষের ইষ্টদেবী কালী) আমি শ্যামা-পূজা কর্‌তে চাই কিন্তু শ্যাম আসিয়া দর্শন দেন। আমি আর কি কর্‌ব? আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু হয় না, শ্যামা পূজাও হয় না। সুতরাং আমার কিছু হ'ল না।" গোস্বামী মহাশয় আবার বলিলেন—"যখন তোমরা নিজের ইষ্টদেবকে বা গুরুকে ধ্যান কর্‌বে তখন তিনি যে মূর্ত্তিতে দর্শন দিবেন তাকেই আদর কর্‌বে। যদি কুকুর বিড়াল আসেন তা'হলে তাকেও আদর কর্‌বে—ধ্যান ভঙ্গ কর্‌বে না।" তারপর অমৃতবাবুর স্ত্রী বলিলেন—'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি' তবে কি ক'রে অন্য মূর্ত্তি আস্‌বে? গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—"আপনারা যে এক ব্রহ্ম বলেন সেই ব্রহ্মই গুরু। এই মস্তকেই গুরু আছেন। ব্রহ্মতালুতে গুরু রয়েছেন। আপনারা যে নিরাকার মূর্ত্তি ধ্যান করেন, তাঁকে ডাকেন, তিনিও এই গুরু। তিনি অনন্ত, তাঁর অন্ত নাই। যখন ধ্রুব বনে গিয়ে তাঁকে ডেকেছিলেন তখন তিনি ধ্রুবের পেছনে থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। যখন বাঘ আস্‌ছেন—তখন ধ্রুব তাকে বল্‌ছেন—তুমি আমার ইষ্টদেব এলে? কিন্তু সে বাঘটাও ধ্রুবের কোন হিংসা ক'রল না। তারপর সেই অনন্ত নারদ মূর্ত্তি হ'য়ে এসে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। আপনারা যা করেন তাও ঠিক। কিন্তু গুরু না কর্‌লে শীঘ্র দেখা পাওয়া যায় না।" তখন অমৃতবাবুর স্ত্রী বল্‌লেন—গুরুর মূর্ত্তি কিরূপ ভাব্‌বে? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন—শিবের যে মূর্ত্তি সেই মূর্ত্তি ধ্যান কর্‌বে।" আমি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'যে গুরু বর্ত্তমান আছেন সেই গুরুকেই ধ্যান কর্‌ব?' তাতে তিনি বল্‌লেন—"মস্তকে ধ্যান কর্‌বেন শিবমূর্ত্তি জটাজুটধর, গঙ্গা জটায় কুলুকুলু কর্‌ছেন, সাপ জড়ায়ে আছেন। আর এ ধ্যান কর্‌তে পারেন তো আরো ভালই হয়, যে মা ভগবতী পাশে ব'সে আছেন।"

আমি সেই সময় দেখ্‌তে পেলাম গোস্বামী মহাশয়ের মূর্ত্তি শিবমূর্ত্তি, দুই স্কন্ধে দু'টি সর্প ফণা ধ'রে আছেন, একটি সর্প মস্তকের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া ফণা ধরিয়া রহিয়াছেন এবং বাম উরুর উপরে মাতাঠাকুরুণ অন্নপূর্ণারূপে ব'সে আছেন। হাতে গলে রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে লাল শাড়ী। চরণ দু'খানি রাঙ্গা টুক্‌টুক্ কর্‌ছে—এই মূর্ত্তি আমরা তিনজনেই দেখলাম।

দেবদেবীর আবির্ভাব।

আজ ৫টার সময়ে রান্না করিতে যাইয়া দেখি, কুতু আমার রান্নার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। কুতুর এই প্রকার নিঃস্বার্থ সেবার ভাব দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। উহার গুণে উহার প্রতি দিন দিন

আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি। পাহাড় হইতে এবার আসার পর শান্তি, দিদিমা প্রভৃতি সকলেই আমাকে খুব আদর-যত্ন করিতেছেন। ইহা আমার পক্ষে নূতন।

গতরাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময়ে আমি ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতেছি দেখিলাম, ঠাকুর পা দু'টী ছড়াইয়া দিয়া নিজেই টিপিতেছেন। ঐ সময়ে আমি গিয়া পা দু'টী ধরিলাম এবং টিপিতে লাগিলাম। ঠাকুর একটু সময় পরে আমাকে বলিলেন—"একি! একি! তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নারায়ণটিও যে! এ কেন? (নারায়ণকে) তুমি কেন? আহা কি সুন্দর, কেমন সুন্দর সূর্য্যমণ্ডল,—তার মধ্যে নারায়ণ। এমন উৎকৃষ্ট চক্র বড় দেখা যায় না। গোপালভট্টের যে শালগ্রাম চক্র ছিলেন,—যিনি বিগ্রহ হ'য়ে এখনও শ্রীবৃন্দাবনে রাধারমণ নামে পূজিত হ'তেছেন, তাহাও এইরূপ অষ্টভুজ মহাবিষ্ণু-চক্র।" ঠাকুর বহুক্ষণ ধরিয়া এই শালগ্রামের মাহাত্ম্য বলিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমি চতুর্ভুজ অষ্টভুজ বুঝি না। আমি যাঁকে ধ্যান করি তিনি উহাতে আছেন কিনা এবং উহাতে থাকিয়া আমার পূজা গ্রহণ করেন কিনা? ঠাকুর লিখিলেন—হাঁ নিশ্চয়। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা কর্‌তে কর্‌তে সকলই প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে। চতুর্ভুজ অষ্টভুজও প্রকাশ পাবে। এ সংসারে চতুর্ভুজ পর্য্যন্তই প্রকাশ। গৃহস্থেরা চতুর্ভুজ বিষ্ণুরই পূজা করেন। বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্তই তাঁরা যেতে পারেন। অষ্টভুজ লাভ কারো কারো ভাগ্যে হয়।"

এই প্রকার অনেক কথার পর, একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া একবার দক্ষিণে একবার বামে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং আওড়াইয়া আওড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"কি, তুমি কোথা হ'তে এসেছ? গুষ্‌করা থেকে? বেশ! গৃহস্থেরা তোমার সেবাপূজা কেমন কচ্ছেন? তুমি আবার কোথা থেকে?—তোমার সিংহাসন কোথায়? শ্যামসুন্দর! লোকে তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন তো?" এই প্রকার বহু ঠাকুর-দেবতার নাম করিয়া ডাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। এসব আলাপ কাণে শুনিলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি উঁহাদের অসুবিধা হইতেছে বুঝিয়া, গুরুদেবের চরণ ছাড়িয়া সরিয়া পড়িলাম এবং নিজ আসনে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্যামসুন্দর, রাধাগোবিন্দ ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি ঠাকুরদের সহিত আলাপ করিয়া কোথাকার কোন্ ঠাকুর পরিচয় গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তর বিদায় দিলেন। আমি যেন নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় অবাক্ হইয়া রহিলাম। ঠাকুরের এসব কি, কিছুই বুঝিতেছি না।

অলৌকিক দর্শনে লাভ কি ?

এই সময়ে ঠাকুর আমার দিকে তাকাইয়া কচি বালকটির মত ‘হুঁ হুঁ’ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং আব্দারে ছেলের মত হাত পাতিয়া পুনঃপুনঃ খাবার চাহিতে লাগিলেন। আমি ঠাকুরের হাতে একটু মিষ্টি ও কমণ্ডলুর জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“এবার কি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ হইবে আর বিশ্বাস জন্মিবে ? ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, তা নিশ্চয়ই। তোমার কেন, যাঁরা অত্যন্ত দুঃখকষ্টের ভিতরে নিতান্ত দুরবস্থায় আছেন, তাঁদেরও হ’বে। দু’দিন আগে আর পরে, হ’তেই হবে।” আমি বলিলাম—‘একটিবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি ভক্তি-বিশ্বাস-ভালবাসার চক্ষে আপনাকে দেখে আমার মৃত্যু হয়; জীবন আমার সার্থক মনে কর্‌ব। ঠাকুর বলিলেন—“যে ভাবে চল্‌ছ, যেরূপ ধ্যান, পূজা কর্‌ছ; সেইরূপ ক’র। তাতেই ক্রমে ক্রমে সব হ’য়ে আস্‌বে,—বিশ্বাস-ভক্তি সব জন্মাবে।” বিশ্বাস কখনও দে’খে-শু’নে হয় না। অনেকে বলে যে, অলৌকিক একটি কিছু দেখ্‌লেই বিশ্বাস হ’বে। কিন্তু তা’ ভুল। অনেককে অনেক দেখান গিয়েছে। তাতে তাদের কোন লাভ তো হয়ই নাই, বরং ক্ষতিই হ’য়েছে। বিশ্বাস যে জিনিস, তা দেখ্‌লে-শুন্‌লে হয় না। উহা ভগবানের কৃপাতেই লাভ হয়। তুমি অলৌকিক কিছু দেখ্‌তে চাও ?” আমি বলিলাম –‘অদ্ভুত বা অলৌকিক আমি কিছু দেখ্‌তে চাই না। আমি কিছু দেখে যদি তা আপনা অপেক্ষা আমার অধিক ভাল লাগে, তাহ’লেই তো আমার সর্ব্বনাশ! সুন্দর কিছু দেখ্‌বার কৌতূহল আমার অন্তরে যেন উদিত না হয়।’

ঠাকুর—তুমি যেমন কর্‌ছ করে যাও,—ওতেই সব হবে। আপন সাধন-ভজনের কথা কোথাও প্রকাশ কর্‌লে থাকে না,—অনিষ্ট হয়। সাবধানে থেকো। যার যেরূপ ভজন, তিনি নিষ্ঠাপূর্ব্বক কর্‌বেন। প্রত্যেক সাধক আপন আপন মর্য্যাদা, রক্ষা ক’রে চল্‌বেন;—ইহা শিব্‌বাক্য।

এই বলিয়া ঠাকুর চোখ বুজিলেন। আমিও বাতাস করিতে লাগিলাম।

মা কালী ও ঠাকুর।

কিছুক্ষণ পরে ভাবাবেশে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—মা, বুড়ি মা, তুমি এমন কেন ? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই কেন ? সারা দিন রাত ছেলেকে ফেলে কোথায় থাক ? চব্বিশ ঘণ্টা তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব’সে থাকি। এত সময় ব’সে থাক্‌লেও তোমার

একবার ছেলে ব'লে মনে হয় না? লোকে আবার তোমায় বলে 'দায়াময়ী'! দয়া তো তোমার ভারি! চব্বিশ ঘণ্টা ছেলে ফেলে থাক। ছেলে দিনরাত ব'সে থাকে। আবার এসেও কথাবার্ত্তা নাই। কেবল খেতে দে, ক্ষুধা পেয়েছে, ব'লে গোলমাল কর। যদি কোন দিন খাবার কিছু না থাকে, দিতে না পারি, তাহ'লে অমনি আমার রক্ত খেয়ে যাও। আমার রক্ত না খেলে কি তোমার পেট ভরে না? সাধে কি তোমায় নির্ব্বোধ বলি? মেয়েমানুষের কোন কালে বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি থাক্‌লে দশ হাত কাপড় প'রেও কাছা দেওনা কেন? বুদ্ধি নাই ব'লেই ছেলের কষ্টও বোঝ না ইত্যাদি—প্রতিদিন শেষ রাত্রে ঠাকুর মা কালীর স্তব-স্তুতি করেন। কখনও বা শ্যামা বিষয়ক গান করেন। যথা—

"ভবে সেই সে পরমানন্দ,　　যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে॥
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে;　　শ্যামা নাম বিনা না শুনে শ্রবণে।
সন্ধ্যা-পূজা কিছুই না মানে,　　সদা রহে শ্যামার চরণ ধ্যানে॥
যে জন শ্যামার চরণ ক'রেছে স্থূল,　　সহজে হ'য়েছে বিষয়েতে ভুল।
ভবার্ণবে পাবে সে কুল,　　বল তার মূল হারাবে কেমনে।
রাজা রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে,　　লোকে নিন্দা শুন্‌বে কেনে।
তার আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,　　শ্যামা নামামৃত পীযূষ পানে॥"

আবার কোন কোন দিন কালীর সঙ্গে ঝগড়াও করেন। গেণ্ডারিয়া থাকিতেও প্রত্যহ শেষ রাত্রে মা কালীর আবির্ভাব হেতু ঠাকুরের নানাপ্রকার ভাব দেখিয়াছি। এ সময় ঠাকুর প্রায়ই ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু অবস্থায় থাকেন।

ঠাকুরের চাহনি।

গুরুভ্রাতারা অনেকে প্রতিদিন যতই আমার শালগ্রামে নিষ্ঠা ভঙ্গ করিবার জন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর ততই আমাকে দয়া করিতে লাগিলেন। প্রতিদিনই ঠাকুর আমাকে ঠাণ্ডা রাখিতে বিশেষভাবে কৃপা করিতেছেন। শালগ্রাম পূজার সহানুভূতি দেখাইতে কখনও নিজ হস্তে ঠাকুর আটা চিনি ঘৃত মাখিয়া ভোগের জন্য শালগ্রামকে দিয়া থাকেন; কখনও বা ডাব সরবৎ আনাইয়া শালগ্রামের জন্য রাখিয়া দেন। শালগ্রাম পূজা প্রায় আড়াইটা তিনটার সময় শেষ হয়। ঐ সময়ে আমারও কখন ক্ষুধা, কখন পিপাসা পায়। বোধ হয় এইজন্যই ঠাকুর ঐ সময়ে কিছু খাবার শালগ্রামকে দিয়া প্রসাদ পাইতে বলেন। কোন কোন দিন খাবার-মিষ্টি আলমারী হইতে

বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলেন—"খেয়ে নেও। শালগ্রামের প্রসাদ হ'য়েছে,—খেয়ে ফেল।" ওসব বস্তু শালগ্রামকে নিবেদন করিতে হইলেই দু'পাঁচ মিনিট অন্ততঃ বিলম্ব হইবে। এই বিলম্বটুকুও ঠাকুরের যেন সহ্য হয় না। তিনি নিজেই শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া আমাকে দিয়া থাকেন। ঠাকুরের এসব দয়াতে যেমনই আমি উৎসাহ আনন্দে প্রফুল্ল রহিয়াছি,—গুরুভ্রাতারা তেমনই বিরক্ত ও বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছেন। শালগ্রাম-পূজার সময়ে ঠাকুর কখনও কখনও আমার পানে নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে চাহিয়া, আমাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। সম্মুখের জটা মুখের উপর ধরিয়া, উহার ভিতর দিয়া 'দুষ্টু' ছেলের মত তাকাইয়া আমার দৃষ্টি পড়া মাত্র, আবার মুখ ঢাকিয়া ফেলেন। ঐ সময়ে ঠাকুরের চক্ষে চোখ পড়িলেই কেমন যেন হইয়া পড়ি। সারাদিন ঐ চাহনি আর ভুলিতে পারি না, কি যে আনন্দে ঠাকুর আমাকে রাখিয়াছেন, বলিতে পারি না।

নিত্য ভজনে সম্বন্ধ।

কিছুদিন যাবৎ ঠাকুরকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে নামী অর্থাৎ ইষ্টমূর্ত্তি যখন সুস্পষ্ট প্রতি নিয়ত অন্তরে উদয় হইতে থাকেন, তখন ঘন ঘন ঘনিষ্ঠতা হেতু তাঁহার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। সংসারে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও আনন্দজনক, ইষ্টদেবে সেই ভাবই আরোপ করিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয়। ইষ্টদেবের স্নেহ মমতা ভালবাসার ভিতর দিয়া যে ভাব অন্তরে আসিয়া স্পর্শ করে, সর্ব্বদা তাহারই ধ্যান-ধারণা দ্বারা ইষ্টদেবের সহিত একটা স্থায়ী সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায়। আমার কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের উপর কোন একটা ভাবই স্থির হইল না! বৈষ্ণবদের শান্ত, দাস্য, সখ্যাদিভাব ব্যতীত, অন্য কোন ভাব মানব-প্রকৃতিতে আছে কি না, জানি না। ঠাকুরের সদয় ব্যবহারে যখন যে ভাব অন্তরে জাগিয়া উঠে তখনই তাহা লইয়া ভজনে দিন কাটাই। সুতরাং কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাব এ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় নাই। এইভাবেই থাকিব, না কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব রাখিয়া উপাসনা করিব—তাহা জানিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি ভাবে সাধন করিব? যখন যে ভাব ভাল লাগে, তখনই সে ভাব লইয়া সাধন করিব, না সর্ব্বদা একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব অন্তরে রাখিয়া, সেই ভাবে করিব?' ঠাকুর লিখিলেন—"যখন যাহা ভাল লাগে তাহা লইয়া সাধন করিলে একটি কোন অবস্থা দাঁড়ায় না; যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে, সর্ব্বদা তাহাই অন্তরে পোষণ করিয়া সাধন করিবে।" আমি ঠাকুরের কথায় বুঝিলাম—ঠাকুর যথার্থই আমার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক, নিজের করিয়া লইলেন। অনেক দিন যাবৎ ঠাকুর, হাব-ভাবে, আকার-

ইঙ্গিতে, কথায়-বার্ত্তায় ও ব্যবহারে আমার অন্তরে যে ভাব ফুটাইয়া তুলিতেছেন, বুঝিলাম—ঠাকুরের সঙ্গে সেই ভাব লইয়াই আমার সম্বন্ধ। আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। দয়াল ঠাকুর! দয়া করিয়া আমাকে বিশ্বাস ভক্তি—ভালবাসা দেও। দূরে থাকিয়া ভালবাসিতে চাই না—যদি কখনও ভালবাসি তবে যেন মনে প্রাণে এক হয়ে ভালবাসিতে পারি। যতদিন লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ থাকিবে ততদিন ভালবাসার ঐকান্তিকতা জন্মে না। লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ দুর হইলেই তোমার উপরে প্রকৃত ভালবাসা ও প্রেম জন্মিবে। এই প্রেমই চাই। যাঁকে ভালবাসিব, তাঁকে লইয়া মাখামাখি করিব—কখনও তাঁকে কোলে করিব, কখনও তাঁর কোলে বসিব—কখনও তাঁর পায়ে লুটাব, তাঁকে মাথায় রাখিব আবার কখনও তাঁর কাঁধে উঠিব,—ইহা যে পর্য্যন্ত না হবে সে পর্য্যন্ত ভালবাসা কোথায়? ঠাকুর কবে আমাকে দয়া করিয়া সে অবস্থা দিবেন?

সাধন সঙ্কেত।

আজ একজন গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্ম্মজীবন গঠনের প্রকৃষ্ট প্রণালী?

ঠাকুর লিখিলেন—চিত্তের স্থিরতা লাভ করাই ধর্ম্মার্থীর প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ, সমস্তই এই স্থিরতা লাভের উপর নির্ভর করে। সাধুগণ স্থিরতা লাভের নানা উপায়ের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নাম সংকীর্ত্তন, উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ আশু ফলপ্রদ। এই জন্য সাধকদিগকে প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা, ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও স্তব-স্তুতি পাঠ করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। চঞ্চলমতি বালককে যেমন উচ্চৈঃস্বরে আপনার পাঠ আবৃত্তি করিয়া তাহা অভ্যস্ত করিতে হয়, চঞ্চলমতি সাধককেও সেইরূপ সজনে নির্জ্জনে প্রথমাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে স্তব স্তুতি ও সঙ্গীতাদি করিয়া ভগবানের পূজা করিতে হয়। নাম সাধন ও প্রাণায়াম প্রভৃতিও চিত্তের স্থিরতা লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বর্ণিত আছে।

প্রতিদিন একই স্তব পাঠ, একই সংকীর্ত্তন গান, একই নাম জপ করা বিধেয়। সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি সম্বন্ধে অনেক নিত্য নূতন সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যেদিন যেরূপ ভাবের উদয় হইল, সেদিন তদনুরূপ কীর্ত্তনাদি করেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সাধক ভাবের অধীন হইয়া পড়েন, ভাব তাঁহার অধীন কখনও হয় না। ভাবস্রোত বন্ধ করা কখনও উচিত নহে সত্য, কিন্তু ভাবের বশ হওয়া অকর্ত্তব্য—একে ত ভাব বিকাশের ব্যাঘাত, অপর চরিত্র গঠনের ব্যাঘাত জন্মিয়া

থাকে। প্রবল ভাবাবেশ হইলে সে ভাবকে অসঙ্কুচিতভাবে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়াই উচিত; কিন্তু সর্ব্বদাই আপনাকে এরূপ ভাবের অধীন হইতে দেওয়া উচিত নয়—যাহাতে ভাব আসিলে পূজা আরাধনা প্রভৃতি হইবে, না আসিলে হইবে না! কিন্তু যেদিন যেরূপ ভাব আসে, সেদিন কেবল সেরূপ ভাবের সঙ্গীত পাঠাদি করিলে পরিণামে সাধক বস্তুতই একেবারে আত্মশক্তিহীন হইয়া ভাবের বশীভূত হইয়া পড়েন। এই কারণেই একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষ্ঠা সহকারে, একটা নির্দ্দিষ্ট পাঠ ও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্তের স্থিরতা, ভাবের গাঢ়তা এবং চরিত্রের শক্তি সাধিত হইয়া থাকে।

যেমন পাঠ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে, তেমন আসন সম্বন্ধেও একটা স্থিরতা থাকা ভাল। প্রতিদিন সাধনের সময় একই আসনে, একই গৃহে, একই দিকে অভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। যেমন শয্যা বা শয়নগৃহ পরিবর্ত্তন করিলে সকলেরই প্রথম প্রথম অল্পাধিক পরিমাণে সুনিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ আসন, স্থান বা অভিমুখ পরিবর্ত্তন করিলে, সাধনের কালে চিত্ত-স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। প্রাচীন কালে গুরূপদেশ হইতে সাধনার্থিগণ ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই এই সকল সাধন সঙ্কেত শিক্ষা করিতেন। বর্ত্তমানের বৈপ্লাবিক ভাবে সে সকল শিক্ষা-প্রণালী বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে, অনেকেরই পক্ষে এই সকল সামান্য সাহায্যও দুর্ল্লভ হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা আত্ম চেষ্টাতে ধর্ম্মসাধন করিবার প্রয়াসী, তাহাদিগকে এ সকল সঙ্কেত বলিয়া দেয় এমন কেহই নাই, অথচ এ সকল সঙ্কেত না জানাতে যে সাধন তিন সপ্তাহে হইত, তাহা তিন বৎসরেও হইতে পারে না। এই সকল অতি সামান্য উপদেশের অভাবেই অনেক সরল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি বহুকাল-ব্যাপী চেষ্টার পরেও স্ব স্ব ধর্ম্মজীবনে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত করিতে পারেন না।

ন্যাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

আজ নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি আমাকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ তত্ত্বের ন্যাস কি ভাবে করিতে হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া নিতে অবসর পাই নাই। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবৎ দেখিয়া নিজের বুদ্ধিমত ন্যাস করিয়া যাইতেছি। ঠিক মত হইতেছে কি না, তাহা বুঝিতেছি না—সন্দেহ হয়। তাহাতে ঠাকুর লিখিলেন—"ন্যাস কিরূপ

কর ? কিসে সন্দেহ বল ?" আমি যে ভাবে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতের ন্যাস করিয়া থাকি, ঠাকুরকে পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—"এসব ঠিকই হ'চ্ছে। তারপর।" আমি—'পঞ্চতন্মাত্রের ন্যাস—শব্দের—কর্ণে, স্পর্শের—হৃদয়ে, রূপের—নাভিতে, রসের—জিহ্বাতে, ও গন্ধের—পায়ুতে করিয়া থাকি।'

ঠাকুর বলিলেন—"না, ওরূপ নয়। শব্দ-তন্মাত্রের—কৃষ্ণবর্ণে, স্পর্শের—নীলবর্ণে, রূপ-তন্মাত্রের—রক্তবর্ণে, রস-তন্মাত্রের—শ্বেতবর্ণে, এবং গন্ধ-তন্মাত্রের—পীতবর্ণের রূপধ্যানে কর্‌তে হয়।"

আমি—এ সব রূপের ধ্যান কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, না কোন বিশেষ বিশেষ স্থানে রাখিব ?

ঠাকুর—"হৃদয়ে, ললাটে অথবা সহস্রারে।" মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের ন্যাস যে ভাবে যে যে স্থানে করি, ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর কহিলেন—"ঠিক্ ঠিক্ই হ'তেছে, তবে চিত্তের সহস্রারে কর্‌তে হয়।"

আজ আমার অনেকগুলি সন্দেহের বিষয় সংশোধিত হইয়া গেল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কিরূপ ধ্যান সর্ব্বদা রাখ্‌তে চেষ্টা করব ? ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন—"এসব খুব গোপনে কর্‌তে হয়,—কোথাও প্রকাশ ক'র না।" জয়, দয়াল ঠাকুর! এ সব সাধন তুমি আমাকে কেন দিতেছ, জানি না। তোমার রূপ ধ্যান করিতে করিতে কবে আমি, তুমি হইব!

গুরুব্রহ্ম অর্থ কি ? আমাদের গুরু কে ?

আজ অপরাহ্নে বহু গুরুভ্রাতা ঠাকুরের নিকট আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম ও গুরুসম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর লিখিয়া কখন বা অস্ফুটস্বরে বলিয়া তাঁহাদের কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরুব্রহ্ম এ কথার অর্থ কি ?

ঠাকুর লিখিলেন—শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে এক অবস্থা আসে, তাহাতে গুরু দর্শন হয় এবং গুরুর মধ্যে নামের চৈতন্যরূপ দর্শন হয়। তখনই গুরু ও ব্রহ্ম এক হইয়া যান। যাহাদের ঐরূপ অবস্থা ও দর্শনলাভ হয়, তাঁহাদেরই নিকটে গুরু ব্রহ্ম।

জিজ্ঞাসা করা হইল—আমাদের গুরু কে ? আপনি কখন কখন পরমহংসজীর কথা বলেন।

উত্তর—তোমরা গুরু বলিতে আমাকে বুঝিবে। পরমহংসজী আমার গুরু। তিনি আমাকে নাম দিয়াছেন, আর আমি তোমাদের নাম দেই।

নাম-সাধনে কি অবস্থা হয় ? অদ্বৈতবাদ কি ?

প্রশ্ন—শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিলে কি অবস্থা লাভ হয় ? ভগবানকে লাভ করিয়া কি তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া যায় ?

ঠাকুর লিখিলেন—শ্বাসে-প্রশ্বাসে এই নাম-সাধনই যথার্থ সাধন। ইহাতে কামাদি সমস্ত রিপুর বিনাশ হইবে। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা আসিবে, বিশ্বাস পাইবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে নানাপ্রকার দর্শন হইয়া থাকে। ভগবান যে আমাদের অনেক দূরে আছেন, তাহা নহে,—তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কাছে বর্ত্তমান। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে পাপরাশি জ্বলিয়া গেলে, তাঁহার দর্শনলাভ হয়। এই ভাবে নাম করিতে করিতে সম্মুখে একখানা আরশীর মত প্রকাশিত হয়। গ্রহ-উপগ্রহাদি সমস্তই স্পষ্টভাবে দৃষ্টিভূত হয়, ক্রমে অন্তরের ময়লানাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। তখন মনুষ্য-জন্ম সফল হয়। মনুষ্য যতই কেন উন্নত হউক্ না, একেবারে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যায় না। কেহ যদি সমুদ্রগর্ভে, সমুদ্র পরিমাণ করিবার জন্য অহঙ্কার করিয়া ডুব দেয় এবং যদি তাহার পৃথক্ ভাব জ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা—মনুষ্য চিদানন্দ-সাগরে ডুবিলেও তাহার সেই প্রকার অবস্থা হয়। অন্য লোক মনে ভাবে যে, সে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহার পার্থক্য বোধ থাকে, তখন সে ভগবানের রাস-লীলা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে থাকে এবং ধন্য হয়। যখন জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে তখন সে কখনও মধুর সাগরে, কখন বা চিনির সাগরে ডুবিয়া থাকে।—ইহা কেবল কল্পনামাত্র, কেননা সেই আনন্দের তুলনা নাই। তখন জীবাত্মা যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন, কেন এই আনন্দে থাকিলাম। মধুরং, মধুরং, মধুরং !

ঠাকুর আবার লিখিলেন—"অদ্বৈতবাদ মত নহে, আত্মার একপ্রকার অবস্থা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইলে তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। যাহা দেখেন, ব্রহ্মসত্ত্বাই দেখেন। অনন্তসাগরে একটি জল-কণা প্রবেশ করিলে সে চারিদিকে হিল্লোল কল্লোল দেখে, কখনও ডুবে, কখনও ভাসে। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে ঋষিগণ, মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিবেন কেন ? ইহাই পরম গতি, পরম সম্পদ।

পঞ্চকোষ ভেদের লক্ষণ।

জনৈক গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'জীবাত্মা পঞ্চকোষের ভিতরে আছেন শুনিতে পাই। পঞ্চকোষের কোন্ কোষ ভেদ হইল তাহা কি লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইবে ?'

ঠাকুর লিখিলেন—"অন্নময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব বস্তুতে আকর্ষণ থাকে না। প্রাণময় কোষভেদে, শারীরিক উত্তেজনা থাকে না। মনোময় কোষভেদে সঙ্কল্প-বিকল্প যায়। বিজ্ঞানময় কোষভেদে সংশয়-বুদ্ধি থাকে না; আর আনন্দময় কোষ-ভেদে পার্থিব আনন্দে মুগ্ধ করিতে পারে না।" যে সকল চক্র আমাদের শরীরে আছে তাহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর লিখিলেন—"চক্র শরীরে ছয়টি। ইহার সহিত বাহিরের শক্তির যোগ। স্থুল শরীরে, সূক্ষ্ম শরীরে, কারণ শরীরে তারপর আত্মাতে। গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উপদেশ শুনিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝা যায় না।"

অতি-নিদ্রায় ঠাকুরের অনুশাসন।

১লা আশ্বিন,
৪১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা আসিয়া এতদিন বড়ই আরামে কাটাইয়াছি। দিনরাত ঠাকুরের অবিচ্ছেদ সঙ্গলাভে, একটানা সাধন-ভজন করিয়া কি যে আনন্দলাভ করিয়াছি প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। কিন্তু, কিছুদিন যাবৎ বড়ই উদ্বেগভোগ হইতেছে। প্রত্যহই গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আফিস-আদালত হইতে একেবারে সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হন্। সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের পর তাঁহারা আপন-আপন বাড়ী-ঘরে চলিয়া যান। আবার অনেকে আফিস হইতে বাসায় যাইয়া আহারান্তে সাড়ে আটটা ন'টার মধ্যে এখানে আসিয়া থাকেন। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত, তাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্পাদি করিয়া, ঠাকুরের ঘরেই শয়ন করেন। এই শ্রেণীর গুরুভ্রাতাদের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুর হলঘরের এককোণে নিজ আসনে বসিয়া থাকেন, বাকী সমস্ত ঘরই খালি থাকে। সুতরাং ম্যাটিং-করা হলঘরে যাহার যেখানে ইচ্ছা পড়িয়া থাকেন। আজকাল প্রায় ৮।১০টি লোক এই ঘরে নিত্য শয়ন করিতেছেন। আমি রাত্রি সাড়ে এগারটা বারটার সময় যখন উঠি, সকলকেই নিদ্রায় অভিভূত দেখি। মহেন্দ্রবাবু, মণিবাবু, অচিন্ত্যবাবু প্রভৃতি ৩।৪টি গুরুভ্রাতা কোন কোন দিন জাগিয়া থাকেন। রাত্রি ১১টা হইতে সাড়ে চা'রটা পর্য্যন্ত ৮।১০টি গুরুভ্রাতার এক সময়ে বিবিধ

প্রকার নাক ডাকার 'ঘড়্‌ঘড়্‌', 'ফড়্‌ফড়্‌' বিরক্তিকর শব্দে আমার মাথা আগুন হইয়া যায়। ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকেন বলিয়া, তাঁহার এই সকল শব্দে কোন উদ্বেগই বোধ হয় না। সমস্তটি ভোগ আমাকেই ভুগিতে হয়। গুরুভ্রাতাদের 'ঘড়্‌ঘড়ানি' শব্দে—নামে মন বসে না, ঠাকুরের ভাবাবেশের ও সমাধির কথাগুলি পরিষ্কার শুনিবারও সুবিধা হয় না। পাখা করিতে করিতে এক-একবার উঠিয়া কোন গুরুভ্রাতাকে চিৎ হইতে কাৎ করিয়া দেই, কাহাকেও হাত ধরিয়া টানিয়া পাশ ফিরিতে বলি, আবার কারো কারো 'ঘড়্‌ঘড়ানি' কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া নাকে-মুখে, কাপড়, জামা, চাদর যাহা পাই চাপা দিয়া সরিয়া পড়ি। সারা রাত আমাকে ৬।৭ বার আসন হইতে উঠিয়া এই সব নিয়া থাকিতে হয়। স্থির হইয়া অর্দ্ধঘণ্টাও এক ভাবে বসিয়া নাম করিতে পারি না। ঠাকুর ৩টার সময়ে বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিয়া একটু মিষ্টি মুখে দিয়া জল খান এবং গুরুভ্রাতাদের নাকের 'ঘড়্‌ঘড়ানি' শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, অতি-নিদ্রার অশেষ দোষ বলিতে থাকেন। গুরুভ্রাতারা অনেকে তাহা শুনিয়া অথবা পুনঃপুনঃ আমার টানা হেঁচ্‌ড়ানিতে উদ্ব্যস্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাখালবাবুর বৈঠকখানা ঘরে, সুখে নিদ্রা যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে আমার আরো অসুবিধা হইয়াছে। যখন তখন ধাক্কা দিয়া উহাদের শব্দ বন্ধ করার সুবিধা পাইতেছি না।

ঠাকুর সকলকে ৩টার সময়ে উঠিয়া সাধন করিতে, বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ তাহা গ্রাহ্য করিতেছেন না। অবশেষে ঠাকুর সন্দেশ, রসগোল্লার লোভ দেখাইয়া কাহাকেও বাগে আনিতে পারিতেছেন না। প্রত্যহই শেষ রাত্রের জন্য অর্দ্ধসের তিনপোয়া সন্দেশ রসগোল্লা আসে। ঠাকুর তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া আমাকে দিয়া বলেন—"সকলকে দিয়া দেও।" আমি নিদ্রিত গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে বসিয়া, 'রসগোল্লা', 'রসগোল্লা' বলিতেই কেহ কেহ ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া বসেন এবং রসগোল্লা লইয়া বাহিরে চলিয়া যান। কেহ কেহ চোখ-বুজা অবস্থায়ই বিছানায় বসিয়া রসগোল্লা মুখে দেন এবং হাতখানা মাথায় পুঁছিয়া আবার শয়ন করেন। আবার কোন কোন গুরুভ্রাতা মাথাও না তুলিয়া চোখ-বুজা অবস্থায়ই রসগোল্লা পাওয়ার জন্য ঘন ঘন হাতখানা নাড়িতে থাকেন এবং রসগোল্লা পাইয়া উহা মুখে দিয়া আবার পূর্ব্ববৎ নাক ডাকাইতে থাকেন। আর যে সকল গুরুভ্রাতারা 'রসগোল্লা' শব্দে, উহা পাইবার জন্য শুধু হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকেন, আমি সর্ব্বশেষ রসগোল্লা তুলিয়া তাঁহাদের নাকের উপরে রস নিঙ্‌ড়াইয়া দিয়া, সজোরে রসগোল্লা মুখে ফেলিয়া দেই। শ্বাস টানিতে যাইয়া নাকের ভিতরে রস যাওয়ায় কেহ কেহ দমবন্ধ হইয়া উঠিয়া পড়ে এবং রাগিয়া যা ইচ্ছা তাই গালি দিতে দিতে বাহিরে চলিয়া যায়। আমি ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি বলিয়াই রক্ষা পাই। সকল কার্য্য আমি ঠাকুরের অভিপ্রায়ের অনুকূলেই করিতেছি মনে করিয়া তৃপ্ত থাকি। কয়দিন এদের ভাব দেখিয়া ঠাকুর নিদ্রিত ব্যক্তিদের ডাকিয়া প্রসাদ দিতে বারণ করিয়াছেন। এখন জগ্রাত গুরুভ্রাতাদের প্রসাদ বণ্টন করিয়া অবশিষ্ট আমিই খাইয়া থাকি। সকালে গুরুভ্রাতারা ইহা লইয়া আমার সঙ্গে ঝগড়া করেন। গত রাত্রে ঠাকুর ইহাদের শাসন করিয়া বলিলেন—

"মানুষের নিদ্রা দেখে বুঝা যায়, তার ভিতরে কোন্ গুণ প্রবল। নিদ্রাকে জোর করে ত্যাগ কর্‌তে হবে। জোর ক'রে ত্যাগ না কর্‌লে, সহজে ত্যাগ হয় না। জীবন মানুষের কয়টি দিনের জন্য। ৫০।৬০ বৎসরের জীবন, অর্দ্ধ সময়ই চাক্‌রী-বাক্‌রী বাহিরের কাজে যায়, তারপর যে সময়টুকু থাকে তা'ও আহারাদি কাজে অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। অবশিষ্ট যে সময় থাকে, তা' নিদ্রায় ব্যয় কর্‌লে, সাধন-ভজন কর্‌বে কখন? সারাদিন আহারের চেষ্টা রাত্রে নিদ্রা—এই অবস্থায়ই সময় যাচ্ছে। ভগবানের নাম কবে কর্‌বে! যাদের দিবসে আহারের চেষ্টা কর্‌তে হয় না, তারাও নাম করেনা; কেবল গলাবাজী কর্‌বে আর রাত্রে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমাবে। বাবুদের সাধন কর্‌তে বল্‌লে, প্রাণায়াম কর্‌তে বল্‌লে, বলেন—'মহাশয় প্রাণায়াম কর্‌তে হাঁপ ধরে, দম বন্ধ হ'য়ে আসে, বড় কষ্ট হয়'। যদি বলি ব'সে নাম কর, বলে—'মশায় ঘুম পায়, বিরক্তি বোধ হয়, নাম মনে আসে না।' যদি বলি, শুধু আসনে ব'সে থাক, বলে—'মশায় বড় ঢুল পায়।' এরূপ কর্‌লে আর সাধন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? সাধন-ভজন কর্‌বে না, কেবল পরনিন্দা, পরালোচনা কর্‌বে আর বল্‌বে—'আমার কাম যায় না কেন? ক্রোধ যায় না কেন? কেনইবা যাবে? কাম, ক্রোধ যা'তে যায়, তাহার তোমরা কি কর? একটি ঘণ্টাও যদি স্থির হ'য়ে বসে নাম কর, তা'হলেও কথা বল্‌তে পার। এক ঘণ্টা নাম কর্‌লেও সাধনের একটি উপকারিতা বুঝ্‌তে পার,—তা কর কই? রাত্রে এদের নিদ্রাবস্থা দেখ্‌লে বড়ই কষ্ট হয়। নিদ্রায় নিদ্রায়ই দিন কেটে গেল। যাদের মোহ বেশী,—তমগুণ বেশী,—তাদেরই নিদ্রা বেশী। মোহেতে নিদ্রা হয়। নিদ্রাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মোহও নষ্ট হ'য়ে যায়।" এইরূপ প্রায় ১৫।২০ মিনিট বলিয়া ঠাকুর নিদ্রিত লোকদের জাগাইতেই যেন উচ্চৈঃস্বরে একটি গান করিতে লাগিলেন, গানটি তাড়াতাড়ি সমস্ত লিখিতে পারিলাম না, মধ্যের একটুমাত্র এই :—

—অলসে ঘুমাবে যত,　　অজ্ঞানে ঘেরিবে তত,
জীবনের সত্য জ্যোতিঃ　　নয়নে আর হেরিবে না।
হাসিছে শমন দেখ……………
এখনও সময় আছে, উঠে গাও শ্যামা গুণ।

প্রায় প্রতিরাত্রেই ঠাকুর নিদ্রাত্যাগের বিষয় কিছু-না-কিছু উপদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ সময়ে অধিকাংশ লোকই নিদ্রাবস্থায় থাকেন।

দিবানিদ্রার অপকারিতা ঃ যোগতন্দ্রার লক্ষণ।

কয়েক দিন হয় একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন—নিবিষ্টভাবে নাম করিতে করিতে আমার তন্দ্রার মত হয়। বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কিন্তু ভিতরে পরিষ্কার জ্ঞান থাকে। নাম যে করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারি—এ আবার কি অবস্থা, এমন হয় কেন? ঠাকুর লিখিলেন—“এই প্রকার অবস্থা হ'লে, তুমি ভাগ্যবান—একে যোগতন্দ্রা বলে—সাধারণ নিদ্রা নয়। যোগনিদ্রা হ'লে, ক্রমে সমাধি অবস্থা লাভ হয়'।”

গুরুভ্রাতাটি ঠাকুরের কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আহারান্তে প্রত্যহই তিনি রাখালবাবুর বৈঠকখানা ঘরে ইজি-চেয়ারে বসিয়া নাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়েন। ২।৩ ঘণ্টা সময় নাক ডাকিয়া স্বচ্ছন্দে ঘুমাইয়া থাকেন। তাঁর নাকডাকা বন্ধ করিতে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকে, তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, ধমক দিয়া বলেন—'আমাকে জাগালে কেন? আমার নিদ্রা কি তোমাদের মত নিদ্রা? গোঁসাই বলেছেন—আমার এ সাধারণ নিদ্রা নয়; যোগতন্দ্রা। কিছুকাল এই ভাবে চল্‌লে শীঘ্রই আমার সমাধি হবে। সাবধান! আমাকে যোগতন্দ্রা অবস্থায় কখনও তোমরা বিরক্ত করিও না।”

দিনের বেলায় যাহারা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া একটুকু নাম করিতে ইচ্ছা করেন, এই গুরুভ্রাতাটির নাক ডাকার শব্দে তাহাদের বড়ই বিঘ্ন হয়। আজ মহেন্দ্রবাবু গুরুভ্রাতাটির কথা উল্লেখ করিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই ব্যক্তির নাক ডাকার শব্দে আমরা একটু স্থির হ'য়ে নাম করিতে পারি না। আমরা সময় সময় উহার নাক ডাকার শব্দ বন্ধ করিতে ডাকিলে, আমাদের ধমক দিয়া বলেন, 'গোঁসাই ব'লেছেন—এ আমার যোগতন্দ্রা, শীঘ্রই সমাধি হবে।” এ যে বিষম উৎপাত। ঠাকুর লিখিলেন,—“উহার এ যোগনিদ্রা নয়—রোগ। চিকিৎসা প্রয়োজন। ব'লে দিবেন,—এখানে দিনের বেলা ব'সে ব'সে না ঘুমায়। দিবানিদ্রা গুরুতর অপরাধ। ব্রাহ্মণ বালকদের উপনয়নের সময় প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হয়, 'মা দিবাস্বাপ্‌সী—আমি দিবসে নিদ্রা যাব না।' দিবানিদ্রায় আয়ুক্ষয় হয়, বুদ্ধি নষ্ট প্রাণ নষ্ট হয়। বংশ লোপ হয়। যত প্রকার উৎকট পীড়া, দিবানিদ্রা তাহার আদি কারণ। এত যে দোষ, এত যে ক্ষতি, তবু কয়জন লোক দিবানিদ্রা যায় না?”

প্রশ্ন করা হইল—যোগতন্দ্রা কি কি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে?

ঠাকুর লিখিলেন—“প্রথম নাম করিতে করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হইয়া নিদ্রার ন্যায় হইবে। দ্বিতীয় নিদ্রাভাব আসিলে মধ্যে মধ্যে একরূপ ভাষার কোন কোন কথা শুনা যাইবে। তৃতীয়—ভবিষ্যৎ অবস্থার দর্শন স্বপ্নের ন্যায় হইবে। শরীরে কোন জ্ঞান থাকিবে না কিন্তু ভিতরে জ্ঞান থাকিবে।”

একটু পরে ঠাকুর আবার লিখিলেন—প্রয়োজন থাকিলে নিদ্রার অভাবে পীড়া হয়, ইহা সত্য। কিন্তু সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না গিয়া, ৪টার পর যদি অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করে তা'তে নিজের জীবনের ঘটনা জানা যায়।

তপস্যা ও পুরুষকার।

একজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবৎ কৃপায়ই যখন সমস্ত হয়, তখন তপস্যা ও পুরুষকারের প্রয়োজন কি?'

ঠাকুর লিখিলেন—পুরুষকার যদি কার্য্য না করে, তবে প্রকৃত আত্ম-পরিচয় হয় না। রামায়ণে বিশ্বামিত্রের তপস্যা পাঠ করিলে, এ বিষয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। পুরুষকার কৃষিকার্য্যে কৃষকের কার্য্যের ন্যায়। কৃষক ভূমি প্রস্তুত করে, শস্য রোপণ করে, এই পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য—তাহার পরে আর তাহার ক্ষমতা নাই। আকাশ হইতে জল বর্ষণ না হ'লে, সে জল সেচন করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। আন্তরিক উদ্যম—তপস্যা। ইহা প্রযুক্ত হইলেই মেঘ হইতে জল বর্ষণের ন্যায় কৃপা বর্ষণ হয়।

ঠাকুর একটু থামিয়া আবার লিখিলেন—"তপস্যা দ্বারা আত্মা যত নির্ম্মল হইবে, ততই নিজকে নিকৃষ্ট মনে হইবে। শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে। কিন্তু তপস্যা দ্বারা নিজকে নিকৃষ্ট মনে করিলেও শরীর, মনকে শাসন করিতে একপ্রকার অহঙ্কার জন্মে, তাহাতে মনে হয় আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত, আমি মনুষ্য এই ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরে আছে, তপস্যা দ্বারা ইহা প্রবল হয়। এই সময়ে আত্ম-সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পারি না। মনে করিয়া গেলাম—আমার সমস্ত অর্পণ করিয়া আসিব। কিন্তু অমনি ভিতর হইতে যেন রোদন আসে। কে যেন নিষেধ করে, পারিবে না। এখন যদি বলে মর, তবে কি করিবে? যদি বলে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিধান করিয়া বনে যাও—তখন কি করিবে? এই মানসিক সংগ্রাম, প্রত্যেক সাধকের অন্তরকে আলোড়িত করে। এইজন্য সম্পুর্ণরূপে আপনাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিবে। ডাক্তার যেমন পচা ঘা কাটিতে কাটিতে অস্থি ভেদ করিয়া মজ্জার মধ্যে যে বিষম রোগ তাহা

ধরিয়া, কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ শুনা কথায় অথবা গ্রন্থের উপদেশে হঠাৎ কিছু স্থির করিবে না। আপনাকে বিচার করিয়া যাহা যথার্থ আমার অবস্থা, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিবে। যদি আমার আত্মার ভাব হয়, অবস্থা হয়; তবে চুপ করিয়া তাহার গতি দেখিলে পরমানন্দ লাভ করিব। ধর্ম্মভাব পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে দেবতা করিল। আমি সেই পতিত, এইরূপ হইলাম কিরূপে? অতি আশ্চর্য্য! আর যদি পাপ ভিতরে চোরের মত লুকাইয়া থাকে, তবে সমস্ত দিন সাধন-ভজন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাকে নরকে আনিল কিরূপে—ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইব! শ্রেয়, প্রেয়, দুইটি ক্রিয়া মানুষের অভ্যন্তরে কার্য্য করে। তপস্যা দ্বারা, সৎসঙ্গ দ্বারা আত্মার ধর্ম্মবল প্রবল হয়—তখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ভগবৎ আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে।

চন্দন ঘসা ও উপাসনা।

আর আর দিনের মত রাত্রিতে ১২টার সময়ে জাগিয়া আসনে বসিলাম। নিয়মিতরূপে সকালবেলা পর্য্যন্ত নাম একটানা চলিল না। কখনও তন্দ্রা, কখনও নাম, কখনও বা ঠাকুরের কথা শুনিয়া সময় কাটান গেল। শেষ রাত্রে আরতির সময় প্রত্যহই যেরূপ হয়—আজও সেই প্রকারই হইল। ঠাকুর কাঁশর বাজাইলেন। তৎপরে ঠাকুর রসগোল্লা দু'টি আমাকে দিয়া শালগ্রামকে ভোগ দিতে বলিলেন। আমি উহা ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া রাখিয়া দিলাম। খুব ভোরে স্নান, সন্ধ্যা তর্পণাদি সারিয়া ফুল সংগ্রহ করিলাম। বিস্তর ফুল জুটিল। বাসায় আসিয়া ঠাকুর পূজার আয়োজন করা গেল। চন্দন ঘসিবার সময়ে গত কল্য ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"দশমাসের গর্ভবতীর মত ধীরে ধীরে চন্দন ঘস্‌তে হয় এবং তাতে নিজেকে মিশাইয়া দিতে হয়।" আজ চন্দন ঘসার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কৃপায় খুব একটি ভাব আসিয়া পড়িল। মনে হইল, এই চন্দনই ধন্য—ইহা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া থাকিবে। বারংবার আমি চন্দনকে নমস্কার করিতে লাগিলাম, এবং চন্দনের সঙ্গে মিশিয়া যেন ঠাকুরের চরণে লাগিতে পারি—এই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এই চন্দন ঘসাই, সকল পূজা-অর্চ্চনা। অন্য পূজার আর প্রয়োজন কি? এই অধিকার পাইলেই আমার পক্ষে ঠাকুরের বিশেষ দয়া ভাবিব। চন্দন ঘসা শেষ হইলে, উহা ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলাম। তিনি আঙ্গুলে করিয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন,—অবশিষ্ট শালগ্রাম পূজার জন্য রাখিলাম। এই সময়ে চা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর চা সেবার পূর্ব্বেই আমার পরিমাণ মত চা আমাকে দিলেন। আমি উহা শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলাম।

গতকল্যের রসগোল্লা দু'টিও খাইলাম। রসগোল্লা দু'টি খাইতে আমার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। অন্যান্যকে না দিয়া ঠাকুরের দেওয়া বস্তু নিজে ভোগ করা যেন কেমন লাগিল। কিন্তু কাকে কি দিব ?—বহুলোক,—তাই নিজেই খাইলাম। জলখাওয়ার পরে ন্যাস করিতে লাগিলাম, খুব আনন্দ হইল। এই সময়ে জনৈক বাউল আসিলেন এবং সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তাঁর সঙ্গীত খুব লাগিয়া গেল। সকলেই ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে, গুরুভ্রাতা পরেশবাবু ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য একখানা মলিদা চাদর আনিয়া দিয়াছিলেন। আজ ঠাকুর তাহা মনোহর দাস বাবাজীকে দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বাবাজী খুব সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। একদিনও ব্যবহার না করিয়া ঠাকুরের এ ভাবে মলিদা দান গুরুভ্রাতাদের কাহারই ভাল লাগিল না।

যথার্থ দান ও দানের পাত্র।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্তমনোহর দাস বাবাজীকে ঠাকুর নূতন মলিদার চাদরখানা দিলেন দেখিয়া অনেকে মনে দুঃখ পাইলেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৪টার সময়ে একটি গুরুভ্রাতা উৎকৃষ্ট একখানা ফ্লানেলের চাদর আনিয়া ঠাকুরকে দিলেন। ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিয়া গায়ে দিয়া বসিলেন। দু'টি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—'এই চাদরখানাই বা কয়দিন আপনি গায়ে দিবেন ? বাবাজী কাল আসিলে, তাকেই হয়ত কাল আপনি এখানাও দিয়া ফেলিবেন ; আপনি ব্যবহার না করিয়া দিলে, আমাদের বড় কষ্ট হয়।' ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের কথা শুনিয়া চাদরখানা ছুড়িয়া ফেলিলেন এবং লিখিয়া দিলেন—"সম্পূর্ণ স্বত্ব ত্যাগই দান। যাহাকে দিবে সে অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও, দাতা কিছু বলিতে পারেন না। কারণ তখন সে বস্তু তাহার নহে। দাতা যদি কিছুমাত্র মনে করেন যে, আমার অভিপ্রায় মত আমার দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে,—ইহাকে দান বলে না,—ইহাকে গচ্ছিত রাখা বলে। শাস্ত্রে ইহাকে ন্যস্ত বস্তু বলিয়াছেন। ন্যস্ত বস্তু অর্থাৎ এরূপ দান করা ও গ্রহণ করা উভয়ই পাপ। তোমাদের মনে এ ভাব আছে।

আমি যাচ্‌ঞা করি না। যদি আমার কোন ব্যবহারে যাচ্‌ঞার ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা আমার অপরাধ সন্দেহ নাই। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহি। সুতরাং আমার ত্রুটী থাকা অসম্ভব নহে। যখনই ত্রুটী দেখিবে তখনই বন্ধুভাবে বলিবে,—মনে মনে রাখিও না। যিনি আমার দোষ দেখাইয়া দেন তিনি আমার পরম বন্ধু—আমি তাঁহাকে ভালবাসি। হাজার রসগোল্লা দেও, কাপড় দেও—তাহাতে ভবি ভোলে না, কেবল দোষ দেখাইলে ভোলে। ভগবৎ কৃপায় তোমাদের মঙ্গল হউক।

জনৈক গুরুভ্রাতা কহিলেন—সকলেই কি দানের পাত্র ? যে যাহা চাহিবে তাহাকেই কি তা দিতে হইবে ? আমরা তো দানের পাত্রাপাত্র বুঝি না ?

ঠাকুর—যে সর্ব্বদা যাচ্‌ঞা করে সে ব্যক্তি দানের পাত্র নহে। যে খোযামোদ করে সে দানের পাত্র নহে। ভয়, স্নেহ, লজ্জা, মান এবং বংশমর্য্যাদা, প্রত্যুপকার—প্রত্যাশা,—এ সমস্ত ভাবে দান, অপাত্রে দান,—প্রকৃত দান নহে। স্বর্গ-কামনা, পাপ-মোচন, পরকালের জন্য সংগ্রহ ইত্যাদি ভাবে দান করিলে তাহা দান মধ্যে গণ্য নহে। দান করিয়া অনুতাপ হইলে, তাহা দান নহে। যেমন পিপাসা হইলে অতি ব্যগ্রতার সহিত জলপান করে—সেইরূপ যিনি প্রকৃত দাতা তিনি দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি দুঃখ দূর করিতে পারেন তাহাতে কুণ্ঠিত হন না। দান করিলে আনন্দের সীমা থাকে না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা দাতা,—মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন।

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার লিখিলেন– আমার এখানে যাহারা আসিবে তাহাদিগকে আর কেহই কিছু বলিবে না। অনেক সময়ে তাহাদের অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা অনিষ্ট হয়। আমার এখানে তোমাদের বিশেষ অধিকার নাই। তোমাদের যেমন অধিকার,—তেমন সমস্ত নরনারীর। আমার একটু সেবা-শুশ্রূষা কর বলিয়া আপনার, আর সকলে পর;—ইহা কখনও ভাবিবে না। আর আমার এখানে যিনি আসিবেন—তাঁর সমস্ত ভার তাঁরই উপর। যেমন তীর্থাদিতে যায়। 'গোঁসাইয়ের নিকট গেলাম, কেহ খাইতে দিল না,'– এখানে কুটুম্বিতা নাই—চক্ষু-লজ্জা নাই। আমি এই ভাবে আছি—যে প্রতিদিন ভিক্ষারূপে যাহা দেন তাহা গ্রহণ করি। এখানে আমার নিজের কিছুই নাই ;—যখন যাহা ঘটে, পরামর্শ দি। অনেক সময় আমার স্বপাক খাইতে ইচ্ছা হয় ; অসুবিধা বলিয়া তাহা করি না। যাহারা টাকা-কড়ি দিয়া তুষ্ট করিতে যায়, তাহারা চিরদিনই ধর্ম্মরাজ্যে নিন্দিত। ভগবান তাহাদের দোষ তাহাদের অন্তরে মাখাইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন ;—তাহাতে তাহারা ঐহিক, পারত্রিক হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা আর শাস্তি কি ? যাঁহারা ভগবৎ-ভক্ত তাহারা একটু জানিতে পারিলে আর তাহাদের গৃহে পদার্পণ করেন না। ইহাও অল্প শাস্তি নহে।

অবিশ্বাস ও ধ্যানেতে জ্বালা।

বাবাজী বিদায় হইলে ঠাকুর স্নানাহার করিতে ভিতর বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিলাম। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, গোপালভট্ট গোস্বামী যে চক্র পূজা করিয়া ধ্যান প্রভাবে তাহা হইতে রাধারমণ বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—আমার এই চক্রও তাহাই। ইহা শুনিয়া অবধি মনে মনে আমার দৃঢ়সঙ্কল্প আসিয়াছে, এই শালগ্রাম চক্রে ঠাকুর পূজা করিতে করিতে, ইহার উপরে ঠাকুরের শ্রীরূপ প্রকট করিব। আমি একান্তপ্রাণে ঐ ভাবে শালগ্রামে গঙ্গাজল তুলসীপত্র অর্পণ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে ঠাকুর আহারান্তে আসনে আসিয়া বসিলেন এবং শালগ্রামের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আবার পূজা দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমার অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি, সর্ব্বশক্তিমান, স্বয়ং পরমেশ্বর, সম্মুখে থাকিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, আমার পূজা হৃষ্টান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছেন—এই ভাবটি প্রাণে উদয় হওয়ায়—ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ঠাকুরের নিকট বিশ্বাস-ভক্তির জন্য, অত্যন্ত ব্যাকুলঅন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে অবিশ্বাস বিষম বিষ মনে হইতে লাগিল। যত প্রকার ক্লেশ আছে অবিশ্বাস সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইতে লাগিল। আমি খুব একান্তপ্রাণে কত কি প্রার্থনা করিলাম। এই সময়ে ঠাকুর এক একবার আমার পানে তাকাইতে লাগিলেন। আমার কিন্তু ঠাকুরের উপর বড়ই অভিমান জন্মিল। আমি ঐ অভিমানে মনে মনে ঠাকুরকে না বলিলাম এমন কিছুই নাই। অবশেষে স্থির করিলাম—এই অপরাধী জীবন রাখিয়া লাভ কি? আত্মহত্যা করাই ভাল। অবিশ্বাস জনিত ক্লেশ আর সহ্য করিতে পারিব না। কিছু বিষ আনিয়া রাখিব। ঠাকুরের কৃপায় ঠাকুরের প্রতি যখন ছিটা ফোঁটা বিশ্বাসও জন্মিবে, সেই সময়ে বিষ পান করিয়া ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে ঐ ভাব লইয়া দেহত্যাগ করিব। মনের ক্লেশে কতপ্রকার যে আত্মহত্যা করার সঙ্কল্প আসিল ও এই বিষয়ে দৃঢ়তা জন্মিতে লাগিল তাহা বলিতে পারি না। যখনই হউক আত্মহত্যা আমার করিতেই হইবে। অবিশ্বাস লইয়া লক্ষ বৎসর জীবিত থাকাও কিছুই নয়; বিশ্বাস লইয়া এক মিনিট বাঁচিলেও জীবন ধন্য। আজ সর্ব্বদা এই ভাবেই প্রার্থনা চলিল। 'ঠাকুর! একবার আমাকে এক মিনিটের জন্য বিশ্বাস দেও—বিশ্বাস ভক্তির সহিত এক মিনিট তোমার শ্রীরূপ দর্শন করিয়া দেহপাত হউক,—পরে সহস্র বৎসরের জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি। আর অপরাধী করিও না। অবিশ্বাস দূর কর। আমার আর কিছু চাহিবার নাই। এইভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নামের সহিত প্রার্থনা করিতে করিতে শরীর আমার অবসন্ন হইয়া পড়িল, অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইতে লাগিল। শরীরে শীতের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। একটু পরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি মনিপুরে ধ্যান করিতে করিতে ঐ স্থানে উত্তাপ বোধ হইতে লাগিল; যেন কেহ থাকিয়া থাকিয়া আগুনের সেক দিতেছে। নিঃশব্দ প্রাণায়ামের দমের সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ এই জ্বালা আগুনে পোড়ার মত এতই বৃদ্ধি হইল যে,

সাধন ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল ; কিন্তু তাহাও পারিলাম না। জ্বালা তীব্র হইলেও সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা আরাম আসিতে লাগিল। এই আরাম ঝাল খাইয়া আরামের মত বা চুলকাইয়া সুখ পাওয়ার মত। কষ্টবোধ হইলেও ছাড়িতে প্রবৃত্তি হইল না। আজ সহস্রারে ধ্যানকালে গাড়ীর চাকার মত জ্যোতির্ম্ময় শ্বেত বৈদ্যুতিক চক্র ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিতে লাগিলাম।

কতক্ষন এই অবস্থার পর, ঠাকুর রাখালবাবুকে দেখিয়া আমার জন্য ঘৃত মিশ্রিত গরম দুধ আনিতে বলিলেন। উহা খাইয়া আমি একটু সুস্থ হইলাম। ঠাকুর আজ সময় সময় আমার প্রতি এক একভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই দৃষ্টিতে যে কত স্নেহ, কত দয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল তাহা বলা যায় না। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—'ঠাকুর! আর তুমি আমার প্রতি এইভাবে তাকাইও না। তোমার এই দৃষ্টি আমার প্রতি কেন? আমি ঐ দৃষ্টি ভোগ করার, ঐ স্নেহ-মমতা ধারন করার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যদি তোমাতে যথার্থ বিশ্বাস ও একান্ত ভক্তি না দেও তবে আর এ জীবনে আমার পানে তুমি চাহিও না, এবং আমিও যেন আর তোমাকে না দেখি। আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাউক!' এই প্রকার প্রার্থনার সহিত নাম করিতে করিতে দিনটী বড়ই সুখে অতিবাহিত হইল।

যোগ কি ? যোগের অবশ্য পালনীয় উপদেশ।

আহারের পরে সন্ধ্যার সময়ে আসনে যাইয়া দেখি ঘর-ভরা লোক। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন হইতেছে, ঠাকুর তাহার উত্তর দিতেছেন। একজন প্রশ্ন করিলেন—'যোগ কাহাকে বলে? যোগ ও ভক্তিযোগ—সব যোগই কি এক?'

ঠাকুর—যদ্দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়,—সমস্তই যোগ। 'সংযোগঃ যোগমিত্যুক্তঃ জীবাত্মা পরমাত্মনঃ',—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাকেই যোগ বলে। ইহা ভিন্ন যে যোগ, তাহাকে হঠযোগ কহে। কেবল নাম জপ, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ভক্তিযোগের অঙ্গ। কেবল শ্রীহরি নাম জপ, ইহাও যোগ। প্রণায়াম প্রভৃতি যোগের বহিরঙ্গ। ইহা করিলেও হয়, না করিলেও হয়। বৈষ্ণব স্মৃতি—'হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থে গোস্বামিগণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, দেখিবেন। গুরুদেবের নিকট শ্রীহরি নাম দীক্ষা গ্রহণ করিবে; তবে তাহা ফলদায়ক হইবে,—ইহাই শাস্ত্রের শাসন। শাস্ত্র ও সদাচার না মানিলে ঋষিদের পথের অনুসরণ হয় না।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যাঁহারা যোগসাধন করেন—কি কি অনিষ্টকর ভাব তাঁহাদের সাধন বিষয়ে অন্তরায়?

ঠাকুর বলিলেন—১। লজ্জা, ২। ঘৃণা, ৩। ভয়, ৪। শোক, ৫। জুগুপ্সা, ৬। কুল, ৭। শীল, ৮। জাতি—এই অষ্টপাশ যোগের বিশেষ অন্তরায়। আমাদের সাধনে যে সকল বিষয় বিশেষ অনিষ্টকর ঠাকুর তাহা বিস্তৃতভাবে বলিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন—যাহা বলিলেন কিছু বুঝিলাম না। লজ্জাও কি অন্তরায় ?

ঠাকুর লিখিলেন—লজ্জা অতিক্রম করিতেই হইবে। লজ্জা থাকিলে কাহারও কিছু হইবে না। লজ্জার মাথা একেবারে খাইয়াই আমার মনুষ্যত্ব লোপ হইয়াছে। আমার পাপ-পুণ্য কিছুই নাই। আমার ছেলে,—আমার অমুক,—এইরূপ সংস্কার চলিয়া গিয়াছে।

পর-সেবাই ধর্ম্ম। একস্থানে যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিবেন। একজনের দ্বারা কার্য্য আদায় করিলে অপরাধ হইবে। অভিমান কি সহজে যায় ? কাম ছাড়িব, ক্রোধ ছাড়িব, লোকে সাধু বলিবে,—এই অভিমান সকলের অপেক্ষা শত্রু। অভিমানকে কেবল পর-সেবা ও পরোপকার দ্বারা জয় করিতে হইবে। সংসারে তোমাদের চেয়ে যাহাদিগকে ছোট মনে কর, তাহাদের সেবা করিতে হইবে। আমার সেবা করিয়া কোন ফল নাই—কেবল ভস্মে ঘৃত দিতেছ। সেবায় বিরক্ত হইলে, সে সেবায় কোন ফল হইবে না।

কাহারও প্রতি দ্বেষ-হিংসা করিবে না। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।' হিংসা অর্থ, হনন করিবার ইচ্ছা। হন্ শব্দে আঘাত বুঝায়। কোন ব্যক্তির প্রাণে আঘাত না লাগে এরূপভাবে বলিতে হইবে। মারিলেই যে হিংসা হয় তাহা নহে। হিংসা যদি অন্তরে থাকে এবং ক্রোধপূর্ব্বক অথবা স্বীয় তৃপ্তির জন্য বধ করিলে হিংসা হয়। অন্তরে হিংসা থাকিলে লীলা দর্শন হয় না। যদি কিছু সময়ের জন্য হৃদয় হিংসাশূন্য হয়, তখনও লীলা দর্শন হইতে পারে। বাহিরে অনেক পূজা-অর্চ্চনা, তপ-জপ করিয়াও যদি হিংসা থাকে,—তাহা ধর্ম্ম নহে। অহিংসা না হইলে ধর্ম্ম হয় না। কাম, ক্রোধেও এত অপকার করে না। কখনও অন্যের দোষ দেখিবে না, কেবল নিজের দোষ দেখিতে হয়। আত্মীয় স্বজনের দোষ, সংশোধনার্থে দেখান যায়,—কিন্তু ঘৃণা করিবে না। নিজকে সর্ব্বদাই অতি নীচ বলিয়া দেখিতে হইবে। কখনও যেন অহঙ্কার ভাব মনে না আসে। অন্য স্ত্রীকে দেখিয়া নমস্কার করিতে হয়। পথে চলিতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে দৃষ্টি করিয়া চলিবে। প্রত্যেক

শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা দুইবার শ্বাস-প্রশ্বাসে একবার নাম সাধন করিতে হয়। সত্য কথা বলিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বদাই বিবেচনার সহিত কথোপকথন করিতে হইবে। না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলিতে নাই।

নাম করিয়া ফল পাই না কেন ?

শুষ্কতায় কর্ত্তব্য।

জনৈক গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রতিদিনে আপনার মুখে নামের কত মাহাত্ম্য শুনিতেছি। শাস্ত্রকারেরাও নামের অসংখ্য মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু নাম করিয়া তাহার একটি ফলও তো পাইতেছি না ? আমাদের এই দুর্দ্দশা কেন ?

ঠাকুর লিখিলেন—শাস্ত্রকার মুনি ঋষিরা ভগবানের নামের যেমন অসংখ্য মাহাত্ম্য বলিয়া গিয়াছেন,—নাম করিয়া যাহারা পাপ করে তাহাদিগকেও ভয়ানক অপরাধী বলিয়াছেন। নাম—অপরাধ, এমন পাপ আর নাই। তৃণের মত নীচ হ'য়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হ'য়ে, মান্য ব্যক্তিকে মান্য ক'রে, নিজে অভিমান ত্যাগ ক'রে নাম কর্‌লে, নামের ফল তখনই পাওয়া যায়। তবে ঐ সকল অবস্থা সৎসঙ্গ, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গুরু আজ্ঞা পালন, পিতা মাতা গুরুজনদিগের এবং ভগবৎ ভক্তদিগের সেবা দ্বারা লাভ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'নাম করিতে শুষ্কতা বোধ হইলে এবং বিরক্তি আসিলে নাম করিব, না ছাড়িয়া দিব ?'

ঠাকুর বলিলেন—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগ্‌লেও, ঔষধ গেলার মত কর্‌লে ক্রমে রুচি জন্মে। নামে অরুচি হইলে, তাহার ঔষধ নামই। যেমন পিত্তরোগে মুখ তিক্ত হয়, তখন মিশ্রিও তিক্ত লাগে;—ঐ রোগের ঔষধ মিশ্রি,—খাইতে খাইতে মিশ্রি মিষ্টি লাগিতে থাকে। আনন্দ না পাইলে নাম করিব না,—যখন ভাল লাগিবে তখনই নাম করিব,—এই ভাব ব্যবসাদারী। ভাল আমার লাগুক আর নাই লাগুক, আদেশমত নাম করিতেই হইবে। নাম দ্বারা ক্রশ বিদ্ধ হইতে হইবে। এই ক্রশ বিদ্ধ হইলেই পরে পুনরুত্থান হয়।

গুণাতীত হইলেও তাপ থাকে।

প্রশ্ন করা হইল—'যতদিন গুণ আছে, ততদিনই কি তাপ থাকে?'

ঠাকুর—ত্রিগুণ নষ্ট হইয়া গেলেও তাপ থাকে। ভগবৎ দর্শনের অভাবই তাপ।

প্রশ্ন—ত্রিতাপ কখন যায়?

ঠাকুর—কর্ত্তৃত্ব যতদিন আছে ততদিন তাপ যায় না। ত্রিতাপ না গেলে মানুষ মুক্ত হয় না। মুক্ত ব্যক্তিরা কর্ম্মত্যাগ করেন না, অনাসক্ত হইয়া বালকের ক্রীড়াবৎ, উন্মাদবৎ তাঁহারা সকল কার্য্যই করিয়া যান। কেন যে করেন তাহা তাঁহারাও জানেন না। ভিতরে অকর্ত্তা ও বাহিরে কার্য্য,—মহাপুরুষদের লক্ষণ। কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকিলে কোন তাপই স্পর্শ করে না। যুক্ত-ভক্ত হইলে তাপ থাকে না।

এখন কুলগুরু প্রদত্ত সাধন করিব কি না?

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ সামন্ত বংশের বহু গণ্যমান্য লোক এই বাড়ীতে ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমাদের কুলগুরু আছেন, তাঁহার নিকট আমরা দীক্ষা নিয়াছি। এখনও আমরা সেই দীক্ষানুযায়ী সাধন করিতে পারিব কি না?'

ঠাকুর বলিলেন—"না, তা হবে না। হয় এই সাধন কর, না হয় সেই কুলগুরু প্রদত্ত সাধনই কর। দু'টা এক সময়ে চল্‌বে না। একটা ধর।" গুরুভ্রাতা কয়টি বলিলেন—'তিনিও আমাদের কুলগুরু, তাঁর দীক্ষামত কি প্রকারে না চলিয়া পারি?' ঠাকুর বলিলেন—"ওরূপ হ'লে তোমরা এখানে দীক্ষা নিলে কেন? দীক্ষা নেওয়া তাহ'লে তোমাদের অন্যায় হয়েছে। কুলগুরুর সাধন নিয়েই তোমাদের থাকা উচিত ছিল। যাক্, কুলগুরু প্রদত্ত সাধন কর্‌লে এই সাধন আর ক'র না।" এই সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা বলিলেন।

সামন্ত কুলতিলক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতা, একদিন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—"আরো কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌লে ভাল হয়।" তিনি অতিশয় বিচক্ষণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন—"বেশ, তাই হ'বে। তবে আমাকে আপনি অভয় দিন,—আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে আমার মৃত্যু না হয়।" ঠাকুর অমনি তাঁহাকে সেই দিন (২৮শে ভাদ্র) রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়ে দীক্ষা দিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার কতকগুলি লোক ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের নিকট বিদায় হইয়া যাওয়ার সময় ঠাকুর বলিলেন—"বর্দ্ধমানে আমার একটি বন্ধু আছেন—দেবেন্দ্র সামন্ত। আপনারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন,—উপকার পাবেন। দেবেন্দ্র দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ—অমনটি বড় দেখা যায় না।"

আজ রান্না করিতে যাইতে একটু বিলম্ব হইল। ভিতর বাড়ীতে যাইয়া দেখি, কুতু ও হরিনারায়ণ বাবুর স্ত্রী আমার উনন ধরাইয়া রান্নার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন। তাড়াতাড়ি খিচুড়ি রান্না করিয়া শালগ্রামকে ভোগ দিয়া হোমান্তে প্রসাদ পাইলাম এবং যথাসময়ে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যার পর আর আর দিনের মত শালগ্রামের আরতি করিয়া আমি বারান্দায় শয়ন করিলাম। গুরুভ্রাতারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

প্রর্থনায় ঠাকুরের সহানুভূতি।

সকাল বেলা স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণান্তে ফুল সংগ্রহ করিয়া বাসায় আসিলাম। শালগ্রামটিকে নমস্কার করিয়া আসনে বসামাত্রই, ঠাকুর আমাকে সুস্নিগ্ধ স্নেহপূর্ণদৃষ্টিতে দয়া করিলেন। খুব ভাবের সহিত ন্যাসাদি করিয়া পূজা আরম্ভ করিলাম। আজ গুরুদেবের দয়ায় অশ্রুজলের আর বিরাম নাই। খুব নাম করিতে লাগিলাম। নামের সঙ্গে প্রার্থনা অবিশ্রান্ত চলিল। মনে মনে ঠাকুরকে জানাইতে লাগিলাম—ঠাকুর! আর এই ক্লেশ দিও না। তুমি তো দয়াল, দয়াল হ'য়ে এরূপ নির্দ্দয় কিরূপে হ'লে? আমাকে বিশ্বাস-ভক্তি দিয়ে, যে কষ্ট ইচ্ছা দেও; আপত্তি কর্‌ব না। তোমাতে বিশ্বাস ও ভালবাসা না জন্মান পর্য্যন্ত তোমার দয়াই ধর্‌তে পার্‌ছি না। প্রতি রাত্রিতে আমাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াইয়া ভুলাও কেন? রসগোল্লা দিতে পার, বিশ্বাস-ভক্তি দিতে এত কৃপণতা কেন? তোমার ভাণ্ডারে তো কোন বস্তুরই অভাব নাই! যে বস্তুর অভাব থাকে তাহা দিতে আপত্তি হ'তে পারে। তোমার অভাব কিসের? আর রসগোল্লা ও বিশ্বাস, এ দু'টির মধ্যে তারতম্য আমার নিকটে। কিন্তু তোমার নিকট তো এ দু'টিই অতি তুচ্ছ বা সমান, তবে দিতে এত কষাকষি কেন?

বহুক্ষণ এ প্রকার প্রার্থনার সহিত নাম চলিল। ঠাকুর এই সময় মধ্যে মধ্যে আমার দিকে আড়চোখে তাকাইতে লাগিলেন। আজ এমন সুন্দর সুন্দর সব প্রার্থনা আসিয়া পড়িল যে, এখন আর তাহা লিখিবার সাধ্য নাই। সেই প্রার্থনা আমার বিফলে গেল না। ৪টার সময়ে ঠাকুর আমার পানে তাকাইয়া চক্ষু টিপিয়া ও ঘাড় নাড়িয়া আমার ভাবে সহানুভূতি জানাইলেন। আমিও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে রান্না করিতে ভিতরবাড়ী চলিয়া গেলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই ভাতে সিদ্ধ ভাত রান্না করিলাম এবং শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইয়া অবিলম্বে ঠাকুরের নিকট চলিয়া আসিলাম।

ব্রহ্মসমাজ ত্যাগের হেতুঃ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আধুনিক কি পুরাতন ?

বহু গুরুভ্রাতা ও বাহিরের ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকট উপস্থিত দেখিলাম। তাঁহারা ঠাকুরের সহিত নানা প্রশ্নালাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদের ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন—"শাস্ত্র ও সদাচার ধরিয়া থাকিলে ঠকিতে হয় না। পুরাতন লইয়া বসিয়া থাকিলে লাভ আছে। আমি যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিলাম, নিজের বুদ্ধিতে নয়। একদিন সীতানাথ মহাপ্রভুকে লইয়া গেলেন; গিয়া বলিলেন,—'ওরে ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইয়াছে,—এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হ'।' এখন দেখিতেছি নির্ভরই একমাত্র শান্তি! কিন্তু এমনই মানুষের দুর্ভাগ্য, কিছুতেই নির্ভর হয় না। ঘুরে ফিরে নানা কষ্ট পেয়ে কিছুই কর্‌তে পারে না। চারদিকে লোকে নির্ভর হ'তে দেয় না। নিজের চেষ্টায় কিছুই হয় না; এটি বিশ্বাস হ'লেই যথার্থ উপকার।"

একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম নূতন না শাস্ত্রে ইহা আছে?' ঠাকুর লিখিলেন—"শ্রীচৈতন্য যে ভাবে প্রচার করিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। অতি পূর্ব্বে সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার এই চারিজন ব্রহ্মার মানসপুত্র, সর্ব্বদা একত্র নাম গান করিতেন। অহিংসাই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে প্রীতি, তৃণের মত নীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ, সর্ব্বদা হরিনাম স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন ইত্যাদি ভাব এই চারিজন প্রচার করিয়া যান। এজন্য তাঁহাদিগকে আদি বৈষ্ণব বলে। 'সনৎকুমার-সংহিতা' অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব উপাসনা অদ্যাপি প্রচলিত। কালের গতিতে এই বৈষ্ণব ভাব ম্লান হইয়া যাগ যজ্ঞ, ক্রিয়া কাণ্ড প্রচারিত হয়। ক্রমে এতদূর মলিন হইয়াছিল যে, মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করেন, মনসা পূজা, বিষহরির গান এবং দুই একটি স্তোত্রমন্ত্রই ধর্ম্ম ছিল। এ সময়ে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লোকের নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে জনসমাজে অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মহাপ্রভু যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ বৈষ্ণব মধ্যে তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ৫।৭ জন যাঁহারা আছেন দেখা যায়, তাঁহারা অধিক সময় নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন। সময়ে সময়ে একত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াও কৃতার্থ হন।"

ঠাকুর আবার লিখিলেন—প্রথমে বটতলায় যে চৈতন্য ভাগবত ছাপান হইত, তাহাতে

আছে যে, একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।' তিনি বলিলেন—'তুমি দেশে দেশে এইরূপ ঘুরিবে, আর আমি বিবাহ করিয়া ঘরকন্না করিব?' মহাপ্রভু বলিলেন—ইহার কারণ আছে। তুমি যতই প্রেমভক্তি বিলাও না কেন, আমাদের অন্তর্ধানের পর, ইহার আর মাহাত্ম্য থাকিবে না। যদি আমাদের বংশধর থাকে, তবে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া ইহার বিশেষ আদর করিবে; তাহা হইলেই সব ঠিক থাকিবে। আমি সন্ন্যাস লইয়াছি, গৃহী হইতে পারিব না। তোমাকে ও অদ্বৈত প্রভুকে সন্তান জন্মাইতে হইবে। এজন্য নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন। ইহা আজকালকার চৈতন্য ভাগবতে নাই। সংক্ষেপ করিবার জন্য অনেক বৃত্তান্ত বাদ দিয়া বর্ত্তমান বহি ছাপান হয়। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস নিয়াছিলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

গৈরিক গ্রহণ করাতে কোন গুরুভগ্নীকে নিষেধ উপদেশ।

ভরত মিলন, কুরুক্ষেত্র মিলনাদি যাত্রার প্রণেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বিধবা কন্যাটিকে লইয়া ঠাকুর দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মেয়েটি খুব অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন—আমাদেরই গুরুভগিনী। বিশুদ্ধভাবে সদাচারসম্মত জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া চলিতেছেন। পরিধানে গৈরিক বসন। সন্ধ্যা কীর্ত্তনের সময়ে দিদিমা ও শান্তি প্রভৃতির সহিত তিনি হলঘরে চিকের আড়ালে থাকিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছিলেন। ঠাকুর কীর্ত্তনান্তে ঘর হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া, মেয়েটিকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মেয়েটির পিতার নিকটে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন—"দেখ মা, গেরুয়া বস্ত্র যোগ বস্ত্র। উহা গৃহীদের পর্‌তে নাই। তুমি ঐ গেরুয়া বস্ত্র প'র না। আর কোন সাধু মহাত্মার নিকট কিছু শিক্ষা লইতে যেও না। নিজে গীতা পাঠ ক'রো না,—গীতা অন্যের মুখে শ্রবণ কর্‌তে হয়। বহু শাস্ত্র পাঠ ক'রো না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুনঃপুনঃ পাঠ ক'রো। আমি ৩২ বার প'ড়েছি। চৈতন্যচরিতামৃতই তোমার একমাত্র সঙ্গী জেনো। সাধন ভজন সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। কোন বিষয় জান্‌বার জন্য বেশী উদ্বেগ হ'লে, আপনিই জান্‌তে পার্‌বে।" মেয়েটি বলিলেন—আমি যেখানে থাকি, সাধনের লোক কেহ আমার সঙ্গী নাই।

ঠাকুর বলিলেন—মা, তোমার চৈতন্যচরিতামৃতই সঙ্গী, আর কোন সঙ্গীর দরকার নাই। ভাল করে নাম কর,—সকলই জান্‌তে পার্‌বে।

বীর্য্যধারণ ব্যতীত যোগসাধন হয় না ঃ ঊর্দ্ধরেতাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

সংকীর্ত্তনান্তে আজ ঠাকুর নিজ হইতে গুরুভ্রাতাদের কতকগুলি উপদেশ দিলেন। সংক্ষেপে লিখিতেছি। ঠাকুর বলিলেন—"আজকাল যোগ করা কঠিন হ'য়ে পড়েছে। যোগ কর্‌তে হলে বীর্য্যধারণ তাঁর কর্‌তেই হবে। বীর্য্যধারণ না কর্‌লে যোগ সহজসাধ্য হয় না। এজন্য পূর্ব্বকালে যোগাভ্যাস কর্‌বার জন্য মুনি ঋষিরা নির্জ্জন বনে ও পাহাড় পর্ব্বতে, যথায় স্ত্রীলোকের কোন প্রকার উৎপাত নাই, তথায় গিয়া বীর্য্যধারণটি প্রথমেই অভ্যাস করে নিতেন। যোগ কর্‌তে হলে বীর্য্যধারণ কর্‌তেই হবে; না হ'লে হবে না। বীর্য্যস্থির হ'লে চিত্তটি স্থির হয়। বীর্য্য চঞ্চল হ'লে, মন কিরূপে স্থির হবে? মন স্থির হ'লেই, ক্রমে সব হয়ে আসে। প্রেম ভক্তি বীর্য্যধারণের উপর নির্ভর করে না বটে, কিন্তু বীর্য্যধারণে যোগের বিশেষ সাহায্য হয়। প্রেম ভক্তি স্বতন্ত্র বস্তু, উহা ভগবানের কৃপায়ই লাভ হয়ে থাকে। বীর্য্যধারণ করা সহজ নয়। ইহা একবার হয়ে গেলে দেহের আর কোন অসুখ থাকে না। তবে পূর্ব্ব হ'তে যে সকল রোগ থাকে তা' অবশ্য একেবারে যায় না।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—গৈরিক বসন ও জটা যাঁহারা ধারণ কর্‌বেন তাঁদের বীর্য্যধারণ করা চাই। বীর্য্যধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল ধারণ কর্‌লে অপরাধ হয়। ঐ সকল গ্রহণ ক'রে যদি বীর্য্যপাত হয় তবে চৌদ্দপুরুষ নরকে যায়,—ঋষিরা এরূপ অভিশাপ দিয়ে গেছেন। কেবল ইহা নয়,—যে ব্যক্তি উহা ধারণ করে সেও পশুপক্ষী ইত্যাদি যোনীতে গিয়া জন্ম নিতে বাধ্য হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম যাহারা উর্দ্ধরেতা হয়, তাদের সকলেরই কি একই প্রকার অবস্থা? ঠাকুর বলিলেন—"যাঁরা বীর্য্যধারণ করেন তাঁদের সকলের এক অবস্থা হয় না। যাঁরা ভক্তি পথে চলে উর্দ্ধরেতা হন তাঁদের এক প্রকার অবস্থা, আবার জ্ঞানপথে চলে যাঁরা উর্দ্ধরেতা হন তাঁহাদের অন্য অবস্থা। হঠযোগ করেও উর্দ্ধরেতা হয়; তাঁদের আবার অন্য প্রকার অবস্থা।" আজ সংকীর্ত্তনের পর একটু অধিক রাত্রে শয়ন করিলাম। গুরুভ্রাতারা বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিলেন।

ঠাকুরের গেণ্ডারিয়া ত্যাগের পূর্ব্বাভায় রহস্যপূর্ণ আসন ত্যাগ ঃ মহাশঙ্খমালা।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আর যাইবেন কি না, গেণ্ডারিয়া যাইয়া আর থাকিবেন কি না, এই বিষয় লইয়া গুরুভ্রাতাদের মধ্যে নানাপ্রকার আলোচনা চলিয়াছে। আমারও ধারণা ঠাকুর গেণ্ডারিয়া গেলেও তথায় বেশীদিন আর বাস করিবেন না। গেণ্ডারিয়া বাসের বাধ্যবাধকতা ঠাকুরের শেষ হইয়াছে। ঠাকুরের পরম মনোরম ভজন কুটীরের গোফাঘরে রহস্যময় যে অদ্ভূত আসনটি ছিল অকস্মাৎ একটি বিস্ময়কর কারণে ঠাকুর তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর যখন ঐ আসনে আর বসিবেন না, তখন গেণ্ডারিয়ায় থাকার প্রয়োজনই বা কি আছে তাই আমার সন্দেহ হয়। ঠাকুরের এই আসন ত্যাগের ঘটনার সহিত আমার ছিটা ফোঁটা সম্বন্ধ আছে অনুমানে সেই সময়ের ঘটনাটি আজ এই স্থানে ডায়েরীতে লিখিতেছি—

চণ্ডীপাহাড়ে রওয়ানা হওয়ার দু'চার দিন পূর্ব্বে ঠাকুর আমাকে মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণদর্শন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। দুই তিন দিন বাড়ীতে থাকিয়া মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর যখন আমি গেণ্ডারিয়া রওয়ানা হইলাম, চলন মুখে মা আমাকে সরকারী বাড়ী শালগ্রাম নমস্কার করাইতে লইয়া গেলেন। শালগ্রাম প্রণামের পর ঐ বাড়ীর ভিতর একখানা কোঠাঘরে মা আমাকে লইয়া গিয়া আমাদের একটি সিন্ধুক খুলিলেন এবং একগাছা মালা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'তোর ঠাকুরকে কর্ত্তার এই জপের মালাছড়াটি দিস্। তিনি এই মালাটি প্রত্যহ আহ্নিককালে জপ কর্‌তেন। এতকাল এটি আমি গোপনে রেখেছি—কেহ ইহার খবর জানে না। কয়দিন যাবৎ তোর ঠাকুরকে দিব ভেবে রেখেছি।' আমি বলিলাম—মা! এ যে হাড়ের মালা—ঠাকুর ইহা নিয়া কি কর্‌বেন? মা বল্লেন—'তুই তা বুঝ্‌বি না। এটি সাধারণ হাড় নয়, মহাশঙ্খের মালা। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যায় চণ্ডাল মর্‌লে তার অস্থি দিয়া এই মালা হয়। এ বড় দুর্লভ বস্তু। এ জিনিস কি তা তোর ঠাকুর বুঝ্‌বেন।' আমি মালাছড়া লইয়া গেণ্ডারিয়া পঁহুছিলাম। নির্জ্জনে ঠাকুরকে পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—এই মালাছড়া আমার বাবার জপের ছিল—মা আপনাকে দিতে দিয়েছেন। ঠাকুর হাত পাতিয়া উহা নিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"কিছুদিন যাবৎ এরূপ একছড়া মালার ইচ্ছে হয়েছিল। আশ্চর্য্য, দেখ ভগবান জুটায়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট মহাশঙ্খের মালা।" ঠাকুর মালাছড়া হাতে রাখিলেন। সময় সময় তাগা সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ বাহুতে উহা ধারণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর প্রত্যহই গোফাঘরের আসনে কিছু সময়ের জন্য বসিয়া থাকেন—এই মালা ছড়া লইয়া তৃতীয় দিনে বসার পর মালাগাছটি আসনে রাখিয়া আসিলেন। পরদিন সকালে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় আর দিনের মত ঐ আসনের সম্মুখে ধুনি

জ্বালিতে এবং আসনের ভয়ঙ্কর কালসর্পকে দুধকলা খাবার দিতে গোফাঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন—আসনের উপরে প্রায় ২ ফুট উচ্চ উইঢিপি (উইমাটির স্তূপ) উঠিয়া রহিয়াছে। মহাশঙ্খের মালাটিও তাহারই মধ্যে পড়িয়াছে। কুঞ্জবাবু তখনই ঠাকুরকে গিয়া জানাইলেন। ঠাকুর কহিলেন—"ভালই হয়েছে, উহা আর পরিষ্কার ক'রে দরকার নাই। যেমন তেমনই থাক।" সেই দিন হইতে ঠাকুরের গোফাসনে বসা বন্ধ হইয়াছে।

ঠাকুরকে মালাটি দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—মহাশঙ্খের মালা কখন ধারণের অধিকার জন্মে? ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হ'লে এ মালা ধারণের অধিকার হয়।" আজ শুনিলাম উইস্তূপটি প্রথম দিনে যতটা হইয়াছিল—তাহা অপেক্ষা আর এক ইঞ্চিও বৃদ্ধি পায় নাই—পাথরের মত শক্ত হইয়া রহিয়াছে। জানি না এতকালের আসন মহাশঙ্খের মালা রাখার দরুণই এইরূপ হইল কি না। আমার কিন্তু এই মালাই ঠাকুরের আসন ত্যাগের হেতু বলিয়া মনে হয়।

তান্ত্রিক সাধনের উপকারিতা।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বেদমতে বহু বৎসর সাধন ক'রে যে বস্তু লাভ হয়, তন্ত্রমতে কিছুকাল সাধনেই কি সেই ফল লাভ হয়ে থাকে?'

ঠাকুর বলিলেন—"শিববাক্য কি কখনও মিথ্যা হ'তে পারে?—নিশ্চয়ই লাভ হয়। জীবের প্রতি দয়া ক'রে মহাদেব তাদেরই কল্যাণের জন্য এই তন্ত্র সঙ্কলন ক'রে গেছেন।"

আমি বলিলাম—তন্ত্রে তো কেবল মারামারি, কাটাকাটি ও ব্যভিচার লইয়াই সাধন ভজন? সংযত ও গুণাতীত হওয়া বিষয়ে তন্ত্রে কি কোন উপদেশ নাই? তন্ত্র কি সমস্তই শাক্তমতে?

ঠাকুর—তন্ত্র কেবল শক্তি বিষয়ে হ'বে কেন? পঞ্চদেবতারই তন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন আছে। বৈষ্ণব তন্ত্র, শৈব তন্ত্র, এই প্রকার সকল উপাসনারই তন্ত্র আছে। সংযমাদ বিষয়ে তন্ত্র মধ্যে খুব আছে। 'জ্ঞান-সঙ্কলনী' তন্ত্রখানা একবার পড়ে দে'খো। তন্ত্রের উদ্দেশ্য ও অর্থ কেহ বোঝে না। তাই না বু'ঝে সাধন কর্‌তে গিয়ে মারা পড়ে।

শাস্ত্র বুঝা সুকঠিন।

কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'শাস্ত্র ছাড়া আমাদের তো আর উপায় নাই? কিন্তু শাস্ত্রও তো কিছুই বুঝি না, কোন বিষয়েই তো পরিষ্কার মীমাংসা কোন শাস্ত্রে পুরাণে পাই না?'

ঠাকুর লিখিয়া দিলেন—বেদ ও উপনিষদে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে পারা সুকঠিন। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে, ধর্ম্মের জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে পারে না। আদি পর্ব্বে একটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা শান্তি পর্ব্বে রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার সমগ্র অংশ মার্কণ্ডেয় পুরাণে। মনু-সংহিতায় এক বিষয়, তাহার ব্যবস্থা 'বৃদ্ধ গৌতম সংহিতায়'। নির্ব্বাণ তন্ত্রে এক বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সমগ্র ভাগ রুদ্রযামলে। যজুর্ব্বেদ সংহিতায়, সামবেদ সংহিতায় একটি আখ্যায়িকা তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে ইত্যাদি। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্র না পড়িলে, শাস্ত্রের মত বলা বিড়ম্বনা ও অজ্ঞানতা মাত্র।

ভজনানন্দ সম্ভোগে অভিমানের বিষম আক্রমণ ঃ অবিশ্বাসের আগুনে সমস্ত ছারখার ঃ ঠাকুরের অযাচিত প্রসাদলাভে শান্তি।

রাত্রি ১২টার সময়ে হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসিলাম। ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ঠাকুর একই ভাবে সমাধিস্থ অবস্থায় বসিয়া থাকেন। দেবদেবী, ঋষিমুনি, মহাত্মা ও প্রেতাত্মা সকল এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা আসিয়া কি করেন—ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন—তাহা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি না। ঠাকুর কখনও স্তব-স্তুতি করেন, কখনও ধমক দিয়া শাসন করেন—কিন্তু কাহার প্রতি কি ব্যবহার করেন তাহাও জানি না। সুতরাং এ সব ভাবাবেশের কথা লিখা বড়ই কঠিন দেখিতেছি। ভাবাবেশের কথা যখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি না, তখন উহা আর লিখিব না সংকল্প করিলাম।

রাত্রি সাড়ে চা'রটার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপনান্তে পুষ্প চয়ন করিয়া বাসায় আসিলাম। চা পানের পর বেলা ১০টা পর্য্যন্ত ন্যাসাদি কার্য্যে অতিবাহিত হইল। এগারটার সময় ৮ই আশ্বিন। ঠাকুর ভোজনার্থে ভিতরে গেলেন—আমি শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিলাম। আজ শালগ্রাম পূজার সময়ে নানাপ্রকার ভাব অন্তরে উদয় হওয়ায়, খুব প্রহৃষ্টমনে ঠাকুরকে গঙ্গাজল তুলসীপত্র অর্পণ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ১২টার সময়ে নিজ আসনে আসিয়া বসিলেন। আমি তখন ভাবিতেছিলাম—বহুজন্মের সাধন ভজন সত্ত্বেও যে দুর্লভ বস্তু যোগীজনেরও অগোচর রহিয়াছে—তেত্রিশ কোটী দেবতা যাঁহারা নরলীলা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া করযোড়ে অনুমতি ভিক্ষা করিতেছেন, অনায়াসে তাঁর কৃপায় তাঁর সঙ্গ অহরহ করিতেছি!—আমা হইতে আর ভাগ্যবান কে? এই সব ভাব মনে করিয়া, যখন গদ্‌গদভাবে ঠাকুরের পানে

তাকাইতেছিলাম, সেই সময়ে ঠাকুর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া নিজ হইতেই আলাপ আরম্ভ করিলেন। আমি তখন ভাবে অতিশয় অভিভূত ছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—এ আবার কি? আমি মহা অপরাধী তথাপি মৌনাবস্থায়ও ঠাকুর আমার পানে তাকাইয়া মুখ নাড়িয়া কত কথাই বলিতেছেন। আমি কিন্তু কোন কথাই বুঝিলাম না। কানেও সকল কথা পহুঁছিল না। কেবল ঠাকুরের মুখপানে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাঁহার হাতমুখ নাড়ার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম এবং তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। ঐ সময়ে আমার ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। চক্ষু হইতে অবিরাম ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। স্বেদ, কম্প, অশ্রুপুলকাদি ভাবে শরীরটিকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। ঠাকুর ৪।৫ মিনিট আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি আর ঠাকুরের দিকে চাহিতে না পারিয়া চোখ বুজিলাম। ঐ সময়ে ঠাকুরের অনুপম রূপের ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিল। কতক্ষণ এইভাবে ঠাকুর আমাকে রাখিলেন, জানি না। ঠাকুরের স্মৃতি-পূত, তরঙ্গ-শূন্য, নির্ম্মল অন্তরে কতক্ষণ নিবিষ্টভাবে নামে মগ্ন ছিলাম, ঠাকুরই জানেন। এই সময়ে আমার অজ্ঞাতসারে অভিমান-অসুর, কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র ধরিয়া শারীরিক বিকারের দিকে দৃষ্টি করিল, বুঝিলাম না। আমি ভাবিতে লাগিলাম—অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভাব বহুভাগ্যে ভগবৎ কৃপায় মনুষ্যের ভিতরে সঞ্চারিত হয়। আজ আমার তাহা হইয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা খুব উন্নতির লক্ষণ। নিশ্চয়ই আমার এই সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই ভাব যাহাতে আরো বৃদ্ধি পায়, চেষ্টা করিয়া দেখি। এই মনে করিয়া খুব তেজের সহিত নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই আর মনটি ঠাকুরের দিকে নিতে পারিলাম না। অতলজলে প্রবল স্রোতে পড়িলে যে দশা ঘটে, আমার তাহাই হইল। স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে আর ঠাঁই পাইলাম না। ক্ষীণ অভিমান শরীরের সাত্ত্বিক বিকারের দিকে নজর করিয়া, 'রক্তশোষার' মত পুষ্ট হইয়া পড়িল,—ইহাতে পূর্ব্বের সরস ভাবটি চলিয়া গেল। যতই সময় যাইতে লাগিল ততই শুষ্কতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে অকস্মাৎ একটি ঘটনাকে হেতু করিয়া ঠাকুরের উপর আমার অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিয়া পড়িল। পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে শ্রীধর 'সটক্' জ্বরের যন্ত্রণায় 'ছট্‌ফট্' করিতেছেন। সময় সময় মূর্চ্ছা হইতেছে। ঠাকুরের নাম লইয়া চীৎকার করিতেছেন। ঠাকুর পরম দয়াল, সামর্থী হইলে তাঁর একান্ত ভক্ত শ্রীধরের এ অবস্থায় উদাসীন রহিয়াছেন কি প্রকারে? এই বিষয়টি আপনা আপনি ভিতরে উঠিয়া অন্তরটিকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। ঠাকুরের উপরে অবিশ্বাস-সন্দেহের ভাব আসিয়া পড়িল; পরে একটির সহিত আর একটি ধরিয়া ঠাকুরের উপরে সংশয়ের কত কারণই কল্পনা করিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে নেশাখোর মানুষের মত নিজের ঝুঁকিতে চলিতে চলিতে দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। অবিশ্বাস ও সন্দেহের ঘর্ষণে ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এ সময়ে বুঝিলাম, কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। ভিতরে দৃষ্টি করিয়া দেখি অবিশ্বাসের বিষম জ্বালা উঠিয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে 'হুহু' করিয়া সেই অনিবার্য্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি পাইতেছে।

তাহাতে ঠাকুরের স্মৃতি ও ধ্যান ভস্ম করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে,—নামটি সময় সময় চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে অনুভব নাই,—অসার শুষ্ক বায়ুর 'ফোঁস ফোঁসানি' মাত্র হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই জ্বালা এত বাড়িয়া গেল যে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া নাম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল। অসহ যাতনায় স্থির থাকিতে না পারিয়া নিজের চুল, দাড়ি টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিলাম, হাত কামড়াইতে লাগিলাম, শরীরের নানাস্থানে আঘাত করিতে লাগিলাম—ঠিক যেন পাগলের মত। কোন কোন গুরুভ্রাতা আমার ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমা হইতে তিন চার হাত অন্তরে সমাধি অবস্থায় উপবিষ্ট; কিন্তু ভিতরের অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহাও ভুলিয়া গেলাম। এই সময়ে শালগ্রামের উপরে ক্রোধ জন্মিল। শালগ্রাম পূজা তো বন্ধ করিয়াছিলাম। আর উহা পূজা করিব না স্থির করিয়া, পূজোপকরণ, ফুল-তুলসী প্রভৃতি কুড়াইয়া লইয়া শালগ্রামের উপরে সজোরে ছুঁড়িতে লাগিলাম। এই সময়ে ৫।৭ মিনিটের জন্য নামও বন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় তখনই আবার উহা আপনা-আপনি অত্যন্ত দ্রুতভাবে চলিল। আমার জ্বালা যখন নিবারণ হইল না,—অবিশ্বাস সন্দেহও দূর হইল না দেখিলাম, তখন ঠাকুরের উপর ক্রোধ জন্মিল। ঐ সময় আমি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত আসনে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরের পানে তাকাইয়া ভিতরের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, অশান্তি-উদ্বেগ, নাম দ্বারা ঠাকুরের উপরে চালাইতে লাগিলাম। ভিতরের আবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া অতিশয় উত্তেজিতভাবে কট্‌মট্ দৃষ্টি দ্বারা এক-একবার ঠাকুরকে টলাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ঠাকুর নিজভাবে স্থির আছেন দেখিয়া আমার আসুরিক তেজ আরও বৃদ্ধি পাইল। ক্রোধ ও অভিমানে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। অবিশ্বাসের জ্বালা কত ভয়ানক,—আমিই বুঝিলাম। এরূপ যন্ত্রণা আর পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কেবল জ্বালাতেই দগ্ধ হইলাম তাহা নহে, উহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একপ্রকার উত্তাপ উঠিল,—তাহা ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ে গিয়া ধাক্কা দিয়া দু'তিন সেকেণ্ড অন্তর অন্তর ঝিলিক্ মারিতে আরম্ভ করিল। এই ঝিলিকে আমার হৃদয় যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তারপর ঠাকুরের উপর তীব্র দৃষ্টি করিয়া আরও বিপদে পড়িলাম। ভাবিয়াছিলাম ঠাকুরকে আজ আমার সকল জ্বালা-পোড়া দিয়া জ্বালাইয়া মারিব; কিন্তু দয়াল ঠাকুর আমাকে সুন্দররূপে সেই বেয়াদবির শাস্তি দিলেন। ৫।৬ মিনিট ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকাতে আমার চক্ষে একপ্রকার বেদনার অনুভব হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই বেদনা এত বৃদ্ধি পাইল যে, আর ঐ দিকে চাহিতে পারিলাম না;—চক্ষু 'টন্‌টন্' করিয়া ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমার বোধ হইল, চক্ষে অতিরিক্ত রক্ত একস্রোতে আসিয়া পড়াতে, চোখের ভিতরের পর্দ্দা বুঝি ফাটিয়া যাইতেছে। তখন চক্ষের যন্ত্রণা বুকের ঝিলিক্ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশদায়ক বোধ হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চোখ বুজিলাম এবং নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে লাগিলাম। এই সময় ঠাকুর 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিলেন। অতি স্নেহভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি ব্রহ্মচারী, ক্ষুধা পেয়েছে? এই

নেও—এই সন্দেশ শালগ্রামকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পাও। পরে রান্না কর্‌তে যাও।”

ঠাকুরের অসাধারণ স্নেহদৃষ্টি ও স্বহস্তে প্রদত্ত সন্দেশ পাইয়া, আমার ভিতর ঠাণ্ডা হইয়া গেল। আমি সন্দেশ খাইয়া রান্না করিতে চলিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না, হোম, আহার, কোন প্রকারে সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম।

প্রেতের আক্রোশে শুভকার্য্যে বিঘ্ন ঃ পিণ্ডদানে ব্যবস্থা।

৯ই আশ্বিন।

অদ্য মধ্যাহ্নে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহঠাকুরতার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঠাকুরের নিকট আসিয়া বলিলেন—'অনেক দিন যাবৎ অশ্বিনী কাজকর্ম্মের চেষ্টায় আছে, কিন্তু কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না। অনেক বড় বড় লোক উহার চাকরীর চেষ্টা করিতেছেন। কাজ হ'য়ে হ'য়েও সামান্য কারণে বাধা পড়িতেছে। এরূপ হইতেছে কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—“প্রেতের আক্রোশ আছে বলিয়াই উহার কাজকর্ম্ম হইতেছে না। প্রেতের শান্তি না হ'লে, কাজের সুবিধা হ'বেও না।”

অশ্বিনীর দাদা বলিলেন—'কেন আমার মাতার তো গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হ'য়েছে। তাঁর আর আক্রোশ থাক্‌বে কেন? আর অশ্বিনীর উপরই বা আক্রোশ কেন?'

ঠাকুর—“যে পিণ্ড দেওয়া হ'য়েছিল, তাহা সে পায় নাই। এ বিষয়ে স্বপ্নে অশ্বিনীকে বলা হ'য়েছিল,—অশ্বিনী তাহা স্মরণ রাখিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করে নাই। এজন্যই অশ্বিনীর উপর আক্রোশ।”

অশ্বিনীবাবুর দাদা বলিলেন—'না, অশ্বিনী কোন স্বপ্ন দেখে নাই তো?'

ঠাকুর—“আচ্ছা, তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করুন।”

অশ্বিনীবাবুর দাদা অশ্বিনীবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অশ্বিনীবাবু বলিলেন—'এক দিন রাত্রে স্বপ্নে মাতার ক্লেশসূচক চীৎকার শুনিয়াছিলাম। কি যে বলিয়াছিলেন—বুঝিতে পারি নাই, পরে ভুলিয়া গিয়াছি।' ঠাকুর প্রেতের ক্লেশ শান্তির জন্য পুনরায় পিণ্ড দিতে বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'গয়াতে পিণ্ড দিলেই প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়, ইহাই তো জানিতাম। পিণ্ড দিলেও পিণ্ড পায় না এমনও হয় নাকি?'

ঠাকুর—“একজনার পিণ্ড পুত্র গিয়া দিলেও, পৌত্র, পৌত্রাদিরও আবার পিণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যদি কারো পিণ্ডদান প্রেতাত্মা না পায়, এজন্য বংশের

যে কেহ গয়ায় যাবে তারই পূর্ব্বপুরুষগণের ও জ্ঞাতি-স্বজনের পিণ্ড দেওয়ার নিয়ম।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—পিণ্ড দিব, অথচ প্রেতাত্মা তাহা পাইবে কি না, নিশ্চয় নাই,—এরূপ সন্দেহ লইয়া পিণ্ড দিতে উৎসাহ হইবে কেন?

ঠাকুর লিখিলেন—যথাবিধি পিণ্ড দিলে নিশ্চয়ই তাহাতে প্রেতাত্মা উদ্ধার হয়; কিন্তু সে মত তো দেওয়া হয় না! যিনি পিণ্ড দিবেন তিনি যান আরোহণ করিবেন না, পদব্রজে গয়া পঁহুছিবেন। পরে, একাহার হবিষ্য করিয়া শুচিশুদ্ধভাবে, সংযত হইয়া ভজন-সাধনে এক মাস কাল গয়া বাস করিবেন। মৃত্তিকায় বাহু-উপাধানে শয়ন করিবেন। তৎপরে শাস্ত্র ব্যবস্থামত পিণ্ডদান করিবেন।—এইভাবে পিণ্ডদান হ'লে নিশ্চয়ই তাহা প্রেতাত্মা পায় ও উদ্ধার হয়। ইহার অন্যথা হইতে পারে না,—ঋষিবাক্য। কিন্তু সেভাবে তো পিণ্ড দেওয়া হয় না। তবে গদাধর বড়ই দয়াল; তাই যিনি যেভাবে দিন না কেন, তিনি গ্রহণ করেন। তাই, প্রেতাত্মা উদ্ধার হয়। বিশেষ কোন অনিয়ম-অনাচার হইলে—গদাধর যদি তাহা গ্রহণ না করেন;—এজন্যই বারংবার দিতে হয়; দিতে দিতে যদি কোন বার কারো দেওয়া লেগে যায়।”

আজ আমার একটি বিষম সংশয় দূর হইল। নিতান্ত দুরাচারী ব্যক্তি, হেলায়-শ্রদ্ধায়, যেন-তেন প্রকারে, একবার গয়াতে গিয়া পিণ্ডদান করিলেই যদি পূর্ব্বপুরুষগণ অনায়াসে উদ্ধার হয়, তাহ'লে তো মুক্তিলাভ বড়ই সহজ হইয়া যায়। মুক্তি সদাব্রত ভারতবর্ষের যেখানে-সেখানে, কিন্তু অসংখ্য কণ্টকাবরণ ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ ও বাসাধিকার তেমনই ঋষিরা দুরূহ করিয়া গিয়াছেন।

নরক আছে কি না? পরলোকে পিতৃপুরুষের কার্য্য: বাসনারূপ জন্ম।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—‘শাস্ত্রপুরাণাদিতে যে নরকের বর্ণনা রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহা আছে কি না? যমদূত কি?’

ঠাকুর লিখিলেন—“শাস্ত্রে যেরূপ নরকের বর্ণনা আছে, নরক প্রকৃতই তদ্রূপ। যমদূত, বিষ্ণুদূত সকলই সত্য। মৃত্যুর পরে ইহাদের সহিত বিচার হয়। পিতৃপুরুষও মৃত্যু সময়ে উপস্থিত থাকেন। যাঁহার আত্মা নরকে যাইবে, পিতৃপুরুষগণ

তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন। পিতৃপুরুষগণও একেবারে মায়ার অতীত নহেন। তাঁহারাও ত্রিগুণের অধীন।”

একটু থামিয়া আবার লিখিলেন—“পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা মুক্ত, কেবল তাঁহারা উপস্থিত হইয়া, মৃত আত্মাকে পিতৃলোকে লইয়া যান। যাহাদের অল্প কর্ম্ম থাকে, তাহারা শৈশবে দেহত্যাগ করে। যাহারা নরহত্যাকারী, মনুষ্যদ্রোহী, এইরূপ পাতকী, তাহারা জন্মে আর মরে—পুনঃপুনঃ গর্ভ-যাতনা শাস্তি। যেমন এই পৃথিবী, সেইরূপ এমন গ্রহ উপগ্রহ আছে,—যেখানে স্বর্গ, নরক ভোগ হয়।”

প্রশ্ন—মৃত্যুর পরে আবার কখন জন্ম হয়?

উত্তর—মৃত্যুর পরে সমস্ত লোকই পিতৃলোকে গমন করে। তথায় ক্রমে ক্রমে তাহার বাসনা বৃদ্ধি হয়। পিতৃলোকে প্রত্যেক বংশেরই একজন পিতৃপুরুষ থাকেন। লোকের মৃত্যুর পরে, তিনি তাহার যে অবস্থা, তাহা তাহাকে বলিয়া দেন। বাসনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে জন্মের ইচ্ছা হয়। জন্ম যে কেবল এই পৃথিবীতে হইবে, এমত নহে। সৌরজগৎ বলিয়া আমরা যাহাকে জানি, ঐরূপ অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। বিষ্ণুলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থান আছে। তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বাসনা অনুসারে জন্মের অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে, পিতৃপুরুষ কোন্ স্থানে তাহার জন্ম হইবে, বলিয়া দেন। সে তদনুযায়ী প্রার্থনা করে। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, অবস্থা অনুসারে নানা গ্রহে তাহার জন্ম হয়। এই পৃথিবীতে জন্ম না হইলে যে একজন মুক্ত হইল তাহা নহে। অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহে থাকিবার বাসস্থান আছে। স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক এরূপ নহে। কিন্তু তাহারাও মোহের অধীন; সেখানেও বাসনা আছে। এইরূপ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জন্মগ্রহণ করে। অবস্থানুসারে জন্ম হইলেও সকলের বাসনা এক রকম নহে। সেই বাসনার তারতম্যে নানাবিধ গ্রহে জন্ম হয়। সকলের ত এক গ্রহে হয় না।

স্ত্রী-পুরুষের মেশামেশিতে শাসন।

পূজার ছুটী আরম্ভ হইয়াছে। নানাস্থান হইতে গুরুভ্রাতারা ঠাকুর-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত, পাগ্‌লা সতীশ, বিধু মজুমদার, ললিত গুপ্ত, ছোড়দাদা ও কুঞ্জ ঠাকুরতা প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা অনেক সময় ঠাকুরের সঙ্গে সুকিয়া ষ্ট্রীটেই থাকেন।

ইহাদের মধ্যে অনেকে এখানেই আহারাদি করেন। আবার যাঁহাদের কলিকাতায় বার মাস থাকা হয়, তাঁহারা আহারের জন্ত একবার মাত্র বাসায় যান। সকাল বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ঘর লোকে পরিপূর্ণ থাকে। মেয়েরা ঠাকুরকে দর্শন করিতে, দলে দলে মধ্যাহ্নে আসিয়া পড়েন। বেলা ১২টার পর ঠাকুর আহারান্তে আসনে আসিয়া বসিলে মেয়েরা ধীরে ধীরে হলঘরে প্রবেশ করেন। হলঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ঠাকুরের আসন। এই ঘরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে দরজা দিয়া ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। মেয়েমহলের সংলগ্ন, হলরুমের উত্তরাংশে ৬।৭ ফুট স্থান লইয়া চিকের আড়ালে মেয়েদের বসিবার স্থান। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের নিকট তিনটা পর্য্যন্ত পুরুষেরা কেহ বড় থাকেন না। তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাখালবাবুর বৈঠকখানা-ঘরে বিশ্রাম করেন। পুরুষেরা ঠাকুরের ঘরে না থাকায় মেয়েদের সংখ্যাধিক হইলে, কখন কখন চিকের আবরণ খুলিয়া দেওয়া হয়; তখন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া থাকেন। কোন কোন স্ত্রীলোক ঠাকুরের নিকট আসিয়া পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক, ঠাকুরের আসনের পাশেই বসিয়া পড়েন। ঠাকুর ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাহাদিগকে দূর হইতেই নমস্কার করিয়া চিকের আড়ালে বসিতে বলেন। ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, আমার সঙ্গে তাহার ঝগ্‌ড়া হয়। আমার ভাষা অতিশয় কর্কশ ও অপমানজনক মনে করিয়া, অনেকে দিদিমা'র নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিস করিয়া থাকেন। তাহা ঠাকুরের কানেও আসে। বাবুরা আসিয়া পড়িলে, মেয়েরা অগত্যা চিকের আড়ালেই থাকেন, অথবা ভিতর-বাড়ী চলিয়া যান। সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইলে, সংকীর্ত্তনের সময়ে ঘর লোকে পরিপূর্ণ হয়। মেয়েরাও চিকের ভিতরে অতি কষ্টে স্থান লইয়া থাকেন। সংকীর্ত্তন বেশ জমাট হইলে, ঠাকুর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। তখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে মেয়েরা কখন কখন চিক তুলিয়া দেন। ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্যে অনেক সময় গুরুভ্রাতারা বেহুঁস অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে মেয়েদের দিকে গিয়া পড়েন। কখন কখন স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ না থাকার মত হয়। ঠাকুর কিছুদিন যাবৎ এই বিষয়ে সাবধান হইতে গুরুভ্রাতাদের পুনঃপুনঃ বলিতেছেন। কিন্তু কেহই তাহা মানিয়া চলিতে পারিতেছে না। অন্ত ঠাকুর এ বিষয়ে বহুলোকের মধ্যে সকলকে শাসন করিয়া বলিলেন,—

১২ই আশ্বিন।

"স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদাই খুব সাবধানে না থাক্‌লে চল্‌বে না। যে ভাবে বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী পুরুষে মেশামেশি দেখা যাচ্ছে তা' কিছুকাল চল্‌লে শেষে বাউলদের মত ক্রমে নানাপ্রকার ব্যভিচার আমাদের ভিতরেও আরম্ভ হ'বে। এখন হ'তে সকলেরই খুব সাবধান হ'য়ে চলা আবশ্যক। এসব বিষয়ে শিথিল হ'লে, বিষম অনর্থ ঘট্‌বে। স্ত্রী পুরুষ কখনও একাসনে বস্‌বে না। এমন কি ভগিনী ও কন্তার সঙ্গেও বস্‌তে সাবধান হ'বে। বয়স্থা কন্তার সঙ্গেও পিতার ব্যভিচার হ'তে পারে। এরূপ অনেক ঘটনা হ'য়েছে। তোমাদের চরিত্র ভাল হ'লেই যে এরূপ ব্যভিচার তোমাদের

দ্বারা অসম্ভব তা' মনে ক'রো না। সহস্র ভাল হ'লেও এ বিষয়ে বড়াই চলে না। স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত তাঁর কন্যার পিছনে কামোন্মত্ত হ'য়ে ধাবিত হ'য়েছিলেন। যোগীশ্বর মহাদেবও এই পাকে ঘুরেছেন। ইহা কেবল একটা কল্পনা নয়। সত্য সত্যই এ বিষয়ে কেহ অভিমান কর্‌তে পারে না। চুম্বক ও লোহার যেমন পরস্পর সন্নিকর্ষে মিলন হয়, ঠিক সেইরূপ সহস্র ভাল হ'লেও স্ত্রী পুরুষ একত্র হওয়া মাত্র একের দেহ অন্যের দেহকে আকর্ষণ কর্‌বে। তোমরা ইচ্ছা না কর্‌লেও দেহের ধর্ম্মে, দেহের স্বভাবে, দেহের গুণে অন্য দেহকে যে আকর্ষণ কর্‌বে তা' তোমরা কি প্রকারে বাধা দিবে? স্ত্রী ও পুরুষের শরীরে এমন উপাদান আছে যে, তা'তে উভয় দেহ নিকটবর্ত্তী হ'লেই একে অন্যকে চা'বে—টান্‌বে। কোন স্ত্রীলোকের নিকট কোন পুরুষের থাকা উচিত নয়। স্ত্রীলোকদেরও কখনও পুরুষদের সঙ্গে মেশা ঠিক নয়। আমি এখানে বস্‌লে অনেক সময়েই স্ত্রীলোকেরা এসে আমাকে স্পর্শ ক'রে নমস্কার করে। কতদিন নিষেধ করেছি,—কেহই কথা গ্রাহ্য করে না। আমি কি জিতকাম হ'য়েছি? আমার কি কাম হ'তে পারে না? আমাকে বিশ্বাস কি? দূরে থেকে, যার ইচ্ছা হয় নমস্কার কর্‌বে, আর পর্‌দার আড়ালে স্ত্রীলোক বস্‌বে। সর্ব্বদা এখানে বস্‌বারই বা প্রয়োজন কি? সংকীর্ত্তনের সময় ভাবে স্থির থাক্‌তে না পে'রে স্ত্রী-পুরুষ একত্র হ'য়ে যায়। যাঁরা সংকীর্ত্তনে যোগ দেন তাঁরা সকলেই যে সাধু তা' তো নয়,—বাহিরের অনেক খারাপ লোকও এসে থাকে। সুতরাং এসব বিষয়ে পূর্ব্ব হ'তে সতর্ক হয়ে না চল্‌লে, একটা গোলমাল ঘট্‌তে কতক্ষণ? বহুস্থানে দেখা গিয়েছে, প্রথম প্রথম ভাবের সময় স্ত্রী-পুরুষের ভেদ না থাকায়, পরস্পর পরস্পরকে ধর্‌তে থাকে; পরে সেই ভাব চলে যায়,—নকল ভাব দেখায়ে ব্যভিচার আরম্ভ করে। খুব সাবধান হও, সকলেই খুব সতর্ক হও। না হ'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যাবে, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও বদমায়েসী আরম্ভ হবে। এ সম্বন্ধে খুব কড়াক্কড়ি হ'য়ে চলা আবশ্যক। যদিও পাপভাবে নয়, তাহ'লেও স্ত্রী-পুরুষে মিশ্‌তে দিতে সাহস হয় না। অনেকস্থলে সামাজিক সম্ভ্রম নষ্টের ভয়, নিজের সুনাম নষ্টের ভয়, এ সকল না থাক্‌লে সহজেই ব্যভিচার কর্‌তে পারে। যেখানে ধর্ম্মভয় সেখানে আশঙ্কা অল্প। আজকাল ধর্ম্মভয় নাই বল্‌লেই হয়।

পাপ---পরিত্রাণের উপায়।

কেহ বলিলেন—'পাপ কি ? এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার সংস্কারও তো আমাদের নাই। কি উপায়ে পাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ?' ঠাকুর কহিলেন—"স্বভাবের বিপরীত কার্য্যই পাপ। আধ্যাত্মিক পাপ, শারীরিক পাপ, মানসিক পাপ, সামাজিক পাপ, অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা, নীচতা ইত্যাদি। সামাজিক—চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক, এই তিন প্রকার পাপ লোকে দেখে না। সামাজিক পাপ, ইহা নিবারণ জন্য রাজশাসন, সমাজশাসন। পরমেশ্বর এই সমস্ত হইতে রক্ষা কর্‌বার জন্য লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, নিন্দা, প্রশংসা এই সমস্ত মনুষ্যের আত্মায় দিয়াছেন। ডাকাত, লম্পট, এমন লোকও যদি কাহাকে অন্যায় কর্‌তে দেখে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার শাসন করে। এই অবস্থা আছে ব'লেই রক্ষা পাওয়া যায়।

ভোগে ভোগক্ষয় ঃ দৈহিক ও আত্মিক সম্বন্ধ ঃ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান।

কোন একটি শিক্ষিত পদস্থ গুরুভ্রাতা, স্ত্রী-বিয়োগে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, ঠাকুরের নিকটে আসিলেন এবং নিজের দুরবস্থা, জ্ঞাতি-বন্ধু বান্ধবদিগের দুর্ব্ব্যবহার প্রভৃতি বলিয়া, বিবাহ করা সঙ্গত কি না এবং বিবাহ করিলে সাধনের বিঘ্ন ঘটিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। পরলোকগত স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা আছে কি না জানিতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি করিয়া বলিলেন—"এখন হঠাৎ স্থির হওয়া কঠিন! বিবাহ কর্‌লেই যে সাধনের অনিষ্ট তা নয়; বরং অবস্থানুসারে বিবাহ কর্‌লে উপকার হয়। নিজের যে বিষয় ভোগ, তা না হ'লে বিষয়ে পুনঃপুনঃ টানে। এখন শোক আছে, তা' যখন থাক্‌বে না—তখন বার্দ্ধক্যে নিজের প্রবৃত্তির সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করা দুঃসাধ্য। এজন্য অনেক সন্ন্যাসী বহু বৎসর বনে, গুহায় অনাহারে তপস্যা করেও, পুনরায় সংসারী হ'তে বাধ্য হয়েছেন। তবে নিজের চিত্ত বুঝা কঠিন। এজন্য শাস্ত্রকাররা ব'লেছেন যে, গৃহস্থাশ্রম সাধকের দুর্গ। স্ত্রী-পুরুষে সংসার করা পাপ নয়। সংসার ক্ষয় কর্‌বার জন্য সংসার কর্‌লে উপকার হয়। লাভ কিছুই নাই, কিন্তু প্রয়োজন আছে,—নিজের নিজের ভোগ কাটাবার জন্য। ভোগ ক'রে ভোগ ক্ষয় সহজ। কৃপার পথে একটু আসক্তি থাক্‌লে, তা যদি একটু ছিঁড়ে, তখন বড় বেশী লাগে।"

একজন প্রার্থনা কর্‌ল, 'প্রভো! তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার বল্‌তে আমার আর কিছু যেন না থাকে,—সমস্তই তোমার।' পরমেশ্বর উত্তর কর্‌লেন, 'হে মানব, এমন কথা ব'লো না, আমাকে যৎকিঞ্চিৎ দেও,—অবশিষ্ট সমস্ত তোমার থাক্‌। তুমি জান না যে, তুমি কি কথা বল্‌ছ।' মানুষটি কাতর হ'য়ে বল্‌ল, 'প্রভো! তা' হ'বে না, আমার আর যেন কিছুই না থাকে—সব তোমার হো'ক। তখন পরমেশ্বর সেই মানুষটির বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-বন্ধু একে একে সমস্ত নষ্ট ক'রে পুত্রটিকেও যখন নিয়া যান, তখন সে কেঁদে বল্‌ল, 'প্রভো, কি কর্‌ছ? আমি যে আর সহ্য কর্‌তে পারি না।' তখন ভগবান তার সমস্ত প্রত্যর্পণ করে বল্‌লেন—'এই নেও!—আগেই বলেছিলাম, এ তোমার কর্ম্ম নয়। এজন্য কৃপার প্রার্থী হওয়া বড়ই পরীক্ষার পথ। যদি আসক্তিবদ্ধ না থাকে তবে কষ্ট হয় না। তোমার বয়স অল্প, এখনও অনেক দিন সংগ্রাম কর্‌তে হ'বে।'

এখন আমাদের দেশে ঠিক নিয়ম মত চল্‌ছে না। বৈদ্যশাস্ত্রে আছে—নারী ১৪ হইতে ১৬ ও পুরুষ ২৫ হইতে ৩০, এই বয়সে বিবাহ মঙ্গলের কারণ। একটু সময় যাক্‌,—বিবাহ কর্‌লে কি মঙ্গল, পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন শোকের সময়,—শোক-মোহ দৈহিক সম্বন্ধ-জনিত। সম্বন্ধ দুই প্রকার,—দৈহিক ও আত্মিক। আত্মিক সম্বন্ধ সহজে হয় না। একবার হ'লে আর সে সম্বন্ধ কখনও নষ্ট হয় না। আত্মিক সম্বন্ধ অতি বিরল। যে উভয় আত্মার একমাত্র লক্ষ্য তা'দেরই আত্মিক সম্বন্ধ হয়। দৈহিক সম্বন্ধ-জনিত শোক-মোহ অস্থায়ী, অনিত্য,—এজন্য অশৌচ বলে। অশৌচ-কালগত না হ'লে উভয় দিকে স্থির হয় না। অশৌচ-কাল-গত হ'লে ক্রমে সম্বন্ধ অনুভব হ'য়ে থাকে। আত্মিক সম্বন্ধে শোক নাই,—বিরহ। সে বিরহ আশা-জনক এবং নিত্যকাল স্থায়ী। এরূপ আত্মিক সম্বন্ধ হ'লে মিলন হয়। দূরে থাক্‌লেও উভয়ের মধ্যে একটি সূত্রে বন্ধন থাকে,—তাতে সর্ব্বদা মিলিত মনে হয়। এসব দেখ্‌লে বিশেষ উপকার হয়। সংসার বাস্তবিক অসার। সহোদর ভাই-ভগিনী, এ যদি আপনার না হয় তবে সংসারের আকর্ষণ কি? বনের পশুতে ও মানুষে প্রভেদ কি? পশু প্রতিবাসীকে সেবা কর্‌তে জানে না, মানুষ প্রতিবাসীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী। যে নিরাশ্রয়কে সেবা না ক'রে সে মনুষ্য নামের অযোগ্য।"

একটু পরে ঠাকুর আবার বলিলেন—"স্ত্রী-জাতিকে যত সম্মান কর্‌বে তত নিজে পবিত্র

থাক্‌তে পার্‌বে। যাঁকে সম্মান করি তাঁকে কুৎসিত, দূষিতভাবে দৃষ্টি করা যায় না। বঙ্গদেশে স্ত্রী-জাতিকে সম্মান করা যেন একটা উপহাসের বিষয়। উত্তর-পশ্চিমে স্ত্রী-জাতির প্রতি সম্মান আছে। বোম্বাই, মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে নারী জাতির সম্মান অধিক, তাতেই সব বীর জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজ জাতি কেবল নারী জাতিকে সম্মান ক'রে জগতের মধ্যে প্রধান জাতি হয়ে উঠ্‌ল। পুরাণে আছে যেখানে নারী জাতির সম্ভ্রম সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্ত্তমান। ইংরাজ জাতির মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ কর্‌ছেন। যদি এখন বাবুদের বল যে, নারী জাতিকে সম্মান কর, তখনই তাঁরা 'হো, হো' ক'রে হেসে উঠ্‌বেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, জনকের সভায় গার্গী উপস্থিত হ'লে সমস্ত ঋষিগণ উঠে সম্ভ্রমে তাঁহাকে নমস্কার কর্‌লেন। গার্গীর পূর্ণ-ব্রহ্মজ্ঞান, পরিধানে বস্ত্র নাই, উলঙ্গিনী। শাণ্ডিল্যা-তপস্বিনী, গরুড় তাঁর প্রভাব দেখে মনে কর্‌লেন,—রাত্রি প্রভাত হ'লে এঁকে পিঠে ক'রে বৈকুণ্ঠে নিয়া যাব। শাণ্ডিল্যা তাঁর অন্তর জান্‌লেন। অমনি গরুড়ের দু'টি পক্ষ খ'সে পড়্‌ল। গরুড় স্তব কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই উপলক্ষে নারীকে সম্মান কর্‌বার উপদেশ দিয়েছেন। স্কুল-কলেজে, এখন শিক্ষা হচ্ছে কেবল চাকরির জন্য, চরিত্র গঠন কর্‌বার জন্য কে শিক্ষা করে ?"

কল্পনাতীত সহানুভূতি—এ কি মানুষে পারে ?

ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম,—"মায়াতীত না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ ও শান্তি স্থায়ী হয় না ; লক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা।" ঠাকুরের নিকটে আসিয়া মনে করিয়াছিলাম যতদিন ঠাকুরের কাছে থাকিব ততদিন আর কোনপ্রকার উৎপাতগ্রস্ত হইতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর আমার শান্তির অবস্থা অধিক দিন রাখিলেন না। হায়! আজ আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! পাহাড় হইতে যখন ঠাকুর-দর্শনে আসিলাম, ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার বাম দিকে ৩।৪ হাত অন্তরে আসন করিতে বলিলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত দিন রাত প্রায় অবিচ্ছেদে ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়া আসিতেছি। পরম পবিত্র আনন্দময় গুরুদেবের সম্মুখে থাকিয়া, তাঁর পূজা অর্চ্চনায় কি যে আনন্দ, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। নিত্য নূতন ভাব ও অনুভূতিতে মুগ্ধ হইয়া দিনরাত যেন নেশাখোরের মত অভিভূত ছিলাম। আজ কয়দিন হয় কর্ম্মদোষে সে অবস্থা আমি হারাইয়াছি। হৃদয় আমার শ্মশান হইয়াছে ;—অহর্নিশি চিতানলে দগ্ধ হইয়া হা-হুতাশে সময় কাটাইতেছি। ভোরবেলা দেড় ঘণ্টাকাল ঠাকুরের কাছ-ছাড়া থাকিতে হয় ; কিন্তু তখনও আমি গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ ও

ঠাকুর পূজার পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত থাকি। মধ্যাহ্নে ঠাকুর যখন ঘণ্টা দেড়ঘণ্টার জন্য স্নান ভোজনার্থে ভিতর-বাড়ী চলিয়া যান তখনও আমি শালগ্রাম-পূজায় নিযুক্ত থাকি। তৎপরে অপরাহ্নে দেড়ঘণ্টা সময় ঠাকুর আমাকে আহারের জন্য ছুটী দেন। ঐ সময়ের মধ্যে উনন ধরাইয়া রান্না, হোম, আহার, বাসন মাজা ও ঘর 'মুক্ত' করিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইতে হয়। সুতরাং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন সময়েই আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে অবসর নাই। অবসরের মধ্যে রান্না করিতে যে সময়টুকু লাগে তাহাই মাত্র। কিন্তু তখনও ঠাকুর দর্শনাকাঙ্ক্ষী গুরুভগিনীদের সমাগমে মেয়েমহল পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং রান্না করিতে বসিয়াও অনেক সময়েই হেঁটমস্তকে শালগ্রামের দিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকিতে হয়। এতটা সত্ত্বেও একটি দিন মাত্র ২।৩ মিনিটের জন্য কুতুর দিকে দৃষ্টি করিয়া অস্থিপঞ্জর আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন উহার ছবি আর এ অন্তর হইতে কিছুতেই সরাইতে পারিতেছি না। নিয়মিত সাধন-ভজন সবই করিতেছি,—জলন্ত পাবক-স্বরূপ গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের প্রভাবও নিয়ত সম্ভোগ করিতেছি, ইহা সত্ত্বেও আমার এই দশা! অন্তরের উত্তেজনা কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। আজ ১২টার পর শালগ্রাম-পূজায় মন লাগিল না, কোনপ্রকারে নিয়মরক্ষা করিলাম। বিষম উত্তেজনা দেখিয়া আমি খুব নাম করিতে লাগিলাম। প্রাণায়াম কুম্ভকও খুব তেজের সহিত চালাইলাম; কিন্তু কিছুতেই স্থির হইতে পারিলাম না। উত্তেজনার প্রবল স্রোত যখন আসিতে লাগিল তখন নাম-ধ্যান, সাধন-ভজন সমস্তই ভাসাইয়া নিয়া চলিল। তুফানের ঝাপ্‌টা যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে উত্তেজনাও আমার তদ্রূপ বাড়িয়াই চলিল। ক্রমে ক্রমে উহা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, ঠাকুরের নিকটেও আর আমি বসিতে পারিলাম না,—একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম,—'কয়দিন যাবৎ কুতুর উপরে আমার ভয়ানক আকর্ষণ আসিয়া পড়িয়াছে। এখন আর বহু চেষ্টাতেও আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। কখন কি করিয়া ফেলি বলিতে পারি না। আপনাকে জানাইয়া রাখিলাম।' আমার কথা শুনিয়া ঠাকুর আমার দিকে একদৃষ্টে স্নেহভাবে চাহিয়া বলিলেন,—"যে বয়েস, তা'তে এতো হ'তেই পারে। এ'তো কিছু অস্বাভাবিক নয়।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন—"একটু দূরে দূরে থাক্‌তে পার না?"

আমি বলিলাম—'না, এখন আর পারি না। আমার চেষ্টা এখন নিয়ত কাছে কাছে যাওয়া, দূরে থাক্‌ব কিরূপে? আমি সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজ্‌ছি। সাম্‌লা'তে না পার্‌লে, আমি সজন-নির্জ্জনতার কোন অপেক্ষা কর্‌ব না, পরে যা' হয় হবে।'

ঠাকুর বলিলেন—"কর্ত্তা ভগবান। তাঁরই ইচ্ছায় সব! দেখ, কি হয়।" এই বলিয়া ঠাকুর চোখ বুজিলেন। একটু পরে বলিলেন—

"কামের উৎপাত তোমা অপেক্ষাও আমি অধিক ভুগেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে

একবার আমি পাঞ্জাবে গিয়াছিলাম। তখন একদিন আমি ধর্ম্মোপদেশ কর্‌ছি,—জনতায় স্থান পরিপূর্ণ,—একটি ৮।৯ বৎসরের বালিকা নিকটে উপবিষ্ট ছিল। ঐ সময় আমি তাকে দেখে এতদূর মোহিত হ'য়েছিলাম যে, বহুলোকের মধ্যেও আমি ঐ বালিকাটিকে আক্রমণ কর্‌তে অস্থির হয়ে পড়্‌লাম,—কোন চেষ্টাতেই চিত্ত সংযম কর্‌তে পার্‌লাম না। সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ কর্‌লাম। বক্তৃতার পরে মেয়েটি যখন বাড়ী চল্‌ল আমি তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গেলাম। তারপর এ বিষয় মনে করে এত অনুতাপ হ'ল যে, আমি আত্মহত্যা কর্‌তে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে 'রাভী' নদীর ধারে উপস্থিত হ'লাম। সদ্‌গুরু লাভ হ'ল না,—বৃথা জীবনে এসব উৎপাত ভোগের প্রয়োজন কি মনে ক'রে, দেড়মণ দু'মণ একখানা পাথর কোমরে বাঁধলাম। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে যেমন উদ্যত হ'লাম,—পিছন দিক্ থেকে একটি বৃদ্ধ ফকির অকস্মাৎ এসে আমাকে জড়ায়ে ধর্‌লেন এবং বল্‌লেন, 'বাচ্চা ঘাব্‌ড়াও মৎ,—গুরু তোমারা হ্যায়,—ব্যখৎমে মিল্ যায়েগা। এইছা মৎ কর।'—এই বলিয়া ফকির সাহেব অন্তর্দ্ধান কর্‌লেন,—আমি আর তাঁকে দেখ্‌তে পেলাম না। এ ঘটনার পরই আমি একটি গান লিখ্‌লাম—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত পাবক যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনিতোমার নামের গুণে, তরে মহাপাপীজনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয় ?
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল ক'রে কেশে ধ'রে দেও চরণে আশ্রয়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। ভাবিলাম—নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদিগকে ঠাণ্ডা করিতেই বুঝি ঠাকুর এসব পাকচক্রে ঘুরিয়াছিলেন। আমি ভিতরের আরও অনেক দুরবস্থার

কথা জানাইয়া খুব আক্ষেপ করিয়া ঠাকুরকে বলিলাম—'আমার যেরূপ কু-অভ্যাস ও ভিতরের দুরবস্থা, তাতে এ জীবনে যে কিছু হবে, এমন আশা কর্‌তে পারি না। আর এতদিন সাধন-ভজন করে কিছু যে আমার হ'য়েছে তা'ও মনে হয় না।' ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং আমাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"কি ? কি বল্‌লে ? এতদূর অকৃতজ্ঞ ? বল্‌ছ কিছু হয় নাই ? ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, ইন্দ্রলোকের সমস্ত সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য পেলে তা' নিয়ে কয়দিন থাক্‌তে পার একবার ভেবেছ ? যে দুর্লভ বস্তু পেয়েছ তা' যখন প্রত্যক্ষ কর্‌বে তখনই বুঝ্‌বে কি হয়েছে। অভাব আর কিছুই নাই ; তবে ইহা নিজে প্রত্যক্ষ না করা পর্য্যন্ত বলা ঠিক নয়। একেবারে নির্ভয় হ'য়েছ। শুধু তুমি কেন, যাঁরা সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছেন তাঁরা সকলেই নির্ভয় হয়েছেন। তারপর এটি নিশ্চয় জেন—নরকেও যদি যাও সেখানেও বুকে ক'রে রাখ্‌বার একজন আছেন। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের চেপে রেখেছি, যদি একটু আলগা দিই তাহ'লে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মুহূর্ত্ত মধ্যে 'জয় রাম, জয় রাম' বলে রাস্তায় বের্ হ'য়ে পড়্‌বে।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলাম। সর্ব্বদা ঠাকুরের কথাই মনে হইতে লাগিল। আহারান্তে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। ঠাকুরের অলোকসামান্য সহানুভূতির বিষয় ভাবিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। এই প্রকার সহানুভূতি কোথাও দেখি নাই, শুনি নাই বা শাস্ত্র পুরাণাদিতে পড়ি নাই। ঠাকুরের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া যুবতী কুমারী কন্যা, নানাস্থানে তাঁহার বিবাহের পাত্র অনুসন্ধান হইতেছে। এই সময়ে এই পরিবারের মধ্যে থাকিয়া আমি তাঁহার প্রতি যে জঘন্য পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট—ইহা পরিষ্কার জানিয়াও ঠাকুর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না বা উদ্বেগ বোধ করিলেন না। আমাকে ত অনায়াসে সরাইয়া দিতে পারিতেন অথবা দিদিমাকেও একবার বলিতে পারিতেন যে, ব্রহ্মচারীর চাল-চলনের একটু দৃষ্টি রাখিবেন—তাহাও করিলেন না। এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ কাহাকেও জানিতে দিলেন না, বরং আমার ক্লেশ প্রাণে এতই অনুভব করিলেন যে, সাধারণ আচার ভুলিয়া গিয়া, নিজ জীবনের ঘটনা সকল বলিয়া আমাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন। একি কোন ঋষি মুনি বা দেবদেবী এ পর্য্যন্ত পারিয়াছেন ? সারারাত্রি আমি এ বিষয় ভাবিয়া কাটাইলাম। কামভাব বা সাধন-ভজনের দুরবস্থা আমি একেবারে ভুলিয়া গেলাম। কেবল মনে হইতে লাগিল—'ঠাকুর এ কি করিলেন ? যাহা কোনকালে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, ঠাকুর এবার তাহাই যে দেখাইলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর! তোমার এই অসীম দয়া, দরদ ও সহানুভূতি যেন আমি কোনকালে কোন অবস্থায় বিস্মৃত না হই,—এই আশীর্ব্বাদ কর।' সেই দিন হইতে কুতুর উপরে কুভাব আমার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গেল।

ঠাকুরের প্রার্থনা—তুমিই সব।

আজ মধ্যাহ্নে ঠাকুরের হাতের লেখা খাতাতে একটি সুন্দর প্রার্থনা ও দু' একটি উপদেশ লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ঠাকুর লিখিয়াছেন—"হে প্রভো! কত যে তোমার করুণা ভুলিব না এ জীবনে! হে ঠাকুর, তুমিই সব! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার রচনা, তোমার দয়ার পরিচয়! তুমি পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি, প্রভু তুমি, দাস তুমি, রাজা প্রজা, স্বামী স্ত্রী সকলই তুমি! চোর ডাকাত, সাধু লম্পট, সকলই তুমি। সমস্ত প্রশংসা, স্তব-স্তুতি ভালবাসা, সকলই তোমার! তুমি বাজীকর কেবলই ভেল্কি খেল! সার তুমি, বস্তু তুমি, প্রয়োজন তুমি! ইহলোক, পরলোক, স্বর্গলোক, যমলোক, সত্যলোক, জনলোক, তপলোক, ব্রহ্মলোক, পিতৃলোক, মাতৃলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক সকলই তুমি! আমি কিছু না! কিছু না, ছাই-ভস্ম; কিছুই না! তুমি আমার ঘরবাড়ী, তুমিই আমার দর্পণ। মধুর তুমি, মধুর তুমি, মধুর তুমি! মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং !!"

ইহার পরই ঠাকুর লিখিয়াছেন—ভগবান আমাকে বলিলেন,—"আমার জিনিস যেখানে ইচ্ছা রাখ্‌বো—হয় নরকে না হয় স্বর্গে—তাতে তুই কিছু বল্‌তে পার্‌বি না।"

"নিজে কিছুই স্থির কর্‌তে নাই। ভগবৎ ইচ্ছায় নির্ভর করে থাক্‌তে হবে। নিজের হাতে ভার নিলেই কষ্ট। যে ঘটনা ভগবৎ ইচ্ছায় হয়, সে ঘটনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"একটি মনুষ্যকে বিশেষরূপে ভালবাসা, ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। যতদিন ভিতরে রোগ আছে তাহা নিবারণের যত্ন করিতে হইবে। কিন্তু যদি নিজের ক্ষমতায় নিবারিত না হয় তাহাতে আমি দায়ী নহি। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, জগদীশ্বর নিজে সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র খেলুড়ে। পঞ্চভূত, গ্রহ-উপগ্রহ, সাগর-নদী-পর্ব্বত, বন-উপবন, মরুভূমি, বৃক্ষলতা, কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী, নিজে হইয়া আমোদ করিতেছেন। পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, স্ত্রী-পুত্র, স্বামী-কন্যা, বেশ্যা-লম্পট, চোর-ডাকাত, পণ্ডিত-সাধু, রাজা-প্রজা, উপাস্য-উপাসক, মুক্তিদাতা,—সমস্তই তিনি !!"

সাধনের ক্রম ও তাহার উপকারিতা।

আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্রহ্মচর্য্যাদিতে প্রতি বৎসর যে সকল নূতন ব্রত নিয়ম দেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের নিয়মগুলিও কি প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইবে ? সাধনের ক্রম কি ?"

ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন,—ক, খ অভ্যাস করিয়া পড়িতে শিখিলাম,—পরে যে পুস্তক পড়ি, প্রত্যেকের মধ্যে ক, খ আছে। ক, খ ত্যাগ করিয়া পড়িতে পারি না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। এক একটি প্রণালী ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রথমে এই দেহই আমি, এই জ্ঞান ভেদ করিয়া শরীর-তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা, এ সমস্ত করিতে হয়। যিনি না করেন তিনি দেহ ও আত্মা যে কি তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। পরে, সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে হইলে দেবতা সকলের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে,—তজ্জন্য দেবোপাসনা। সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে,—আর সমস্ত কিছু নহে,—এরূপ বোধ হয়। আমি এবং ব্রহ্ম—এক কি ভিন্ন, ইহার জন্য যোগ। এই যোগ,—প্রাণায়াম প্রভৃতি নহে, আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন। যথার্থ যোগ সাধিত হইলে, ভগবান কিরূপে জগতে বিরাজ করেন তাহা প্রত্যক্ষ হয়,—তখন ইহলোক, পরলোক এক হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ অনেক পরিশ্রম করিয়া, এইরূপ ক্রম, সাধন-প্রণালী লাভ করিয়াছেন। ক্রম অনুসারে না হইলে, যেটুকু সাধন করিবে তাহারই ফল পাইবে। পরের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। এখন সমস্ত বিশৃঙ্খল। কিছুই প্রকৃতরূপে হয় না। মৃত্তিকায় বীজ রোপণ করিলে অঙ্কুর হয়—ইহা কৃষকের গুণ নহে, সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মের গুণ। সাধন ক্রমও তদ্রূপ। মনুষ্যের প্রকৃতির মধ্যে যত ধর্ম্মভাব আছে, সমস্ত ভাবের পোষণ এই সাধনে হয়। সুতরাং ঈশ্বরোপাসনা, পরাধর্ম্ম, সমস্তই ইহার অন্তর্গত,—ইহারই মধ্যে সমস্ত।

রাখালবাবুর হোম করিতে আগ্রহ : 'দেবতার ছাঁচ দর্শন'।

আজ আমাদের বাড়ীর মালিক লাখুটিয়ার জমিদার, ঠাকুরের পুরাতন বন্ধু ও ভক্তশিষ্য শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারী যে হোম করে, বড় সুন্দর; আমারও ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। করিতে পারি কি ?

ঠাকুর—"খুব পারেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার উপবীত গ্রহণ করতে হ'বে।

এমনি নেওয়ায় হবে না। ত্রিসন্ধ্যা না কর্‌লে, হোম করার অধিকার হয় না।” রাখালবাবু ঠাকুরের কথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। রাখালবাবু এক সময়ে ঠাকুরেরই পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মমতাবলম্বী হইয়াছিলেন, আবার এখন তাঁরই কৃপায় অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ সকালে তিনি ব্রাহ্মণোচিত গায়ত্রীজপ ও পিতৃপুরুষের তর্পণাদি কার্য্য নিয়মিতরূপে পরম শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমার নিত্যক্রিয়া এবং শালগ্রামপূজাদি দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমার প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষরূপে সহানুভূতি করিতেছেন। তাঁহার অসাধারণ স্নেহ-মমতায় এই দুর্দ্দিনেও আমার প্রাণ বড়ই আরামে আছে। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু তাঁহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অন্তরীক্ষে একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার চক্র দর্শন করিয়া ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন,—

“উহা দেবতার ছাঁচ। বিশেষভাবে স্থিরদৃষ্টিতে দেখ্‌লে, ওর মধ্যে সেই দেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। বিশেষ স্থিরতার দরকার।” সাধনকালে রাখালবাবু সময় সময় ধূপধূনা গুগ্‌গুলের গন্ধ পাইয়া থাকেন। ঠাকুরকে বলায়, ঠাকুর কহিলেন—“কোন মহাপুরুষ আস্‌লে ঐরূপ সুগন্ধ পাওয়া যায়। এ মহাত্মাদের পরীক্ষা মাত্র। একথা প্রকাশ করা উচিত নয়। প্রকাশ কর্‌লে কিছুদিনের মত বন্ধ হ’য়ে যায়। পরে আবার সেইরূপ হ’তে থাকে। মহাত্মাদের গাত্রগন্ধে মন প্রফুল্ল হয়। ক্রমে তাঁরা মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন; শেষে উপকার ক’রে থাকেন। যখনকার ঘটনা, তখন প্রকাশ না ক’রে পরে প্রকাশ কর্‌লে কোন অপকার করে না।”

রাখালবাবুর মহত্ত্ব ঃ উদ্বেগে আবার দেবকুমার।

আর আর দিনের মত বেলা ১১টার সময়ে ঠাকুর আজ ভিতর-বাড়ী চলিয়া গেলেন পরে মহেন্দ্রবাবু ঠাকুরের ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আসনের তিনধারে রাশীকৃত ফুল মালা পাতা ছিল, মহেন্দ্রবাবু তাহা কুড়াইয়া ফেলিলেন—পরে বামহস্তে আসনের কতকাংশ উর্দ্ধে তুলিয়া ঝাঁটা দ্বারা আসনের নীচ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে রাখালবাবু উহা দেখিয়া মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—ওকি মশায়—ঝাঁটা যে ঠাকুরের আসনে লাগ্‌বে—কি কচ্ছেন? মহেন্দ্রবাবু রাখালবাবুর কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। রাখালবাবু আবার বলিলেন—মশায়! আসনে যে ঝাঁটা লাগ্‌ছে। তখন মহেন্দ্রবাবু ঝাঁটা লইয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন এবং সজোরে কয়েক ঘা চটাচট্‌ রাখালবাবুকে মারিয়া আবার নিজ কাজে নিযুক্ত হইলেন। রাখালবাবুর খুব লাগিল কিন্তু তিনি একটি কথাও না বলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেলেন।

আহারান্তে ঠাকুর আসনে আসিলেন পরে ঠাকুরের নিকট এই কথা উঠিল। ঠাকুর মহেন্দ্রবাবুর ঐ কার্য্যে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"মহেন্দ্রবাবুর ওরূপ করা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। রাখালবাবু ইচ্ছা করিলে অনায়াসে দ্বারবানকে হুকুম দিলে যথেষ্ট প্রতিশোধ নিতে পার্‌তেন—তাহা করেন নাই। ইহাতে রাখালবাবুর অসাধারণ ধৈর্য্য ও স্বভাবের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।" রাখালবাবুর উপরে এই প্রকার ব্যবহারে গুরুভ্রাতারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবু বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি—যাহার বাড়ীতে থাকা—তাহাকেই ঝাঁটা মারা মহেন্দ্রবাবুর এই বিষম সাহসের হেতু কি কিছুই কিন্তু বুঝিলাম না।

সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়াছি পরে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গ করার অবসর আমার ঘটে না। সমস্ত দিনরাত্রে ঠাকুরের সঙ্গে দু'চারটি কথা যাহা হয়—তাহা ছাড়া মৌনই থাকি। একটি কথা বলিবার লোক পাই না। ভগবান গুরুদেবের কৃপায় কয়েক দিন যাবৎ কথা বলিবার আমার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গী জুটিয়াছে। শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর পুত্র শ্রীমান দেবকুমার নিতান্ত বালক হইলেও তাহার সঙ্গে আমি দিন দিন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি।

বেলা ১১টার সময়ে ঠাকুর যখন স্নানভোজনার্থে ভিতর-বাড়ী চলিয়া যান, দেবকুমার প্রত্যহই আমার নিকট আসিয়া থাকে। শালগ্রাম নমস্কার করিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া এমন মমতার সহিত আমার পানে তাকাইতে থাকে যে, আমি উহাকে টানিয়া আসনের পাশে না বসাইয়া পারি না। কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু বলে না বটে কিন্তু যতক্ষণ কাছে থাকে, পায়ে-গায়ে-মাথায় হাত বুলায়। গা ঘেঁসিয়া বসিতে আরাম পায়, আমারও উহাকে এত ভাল লাগে যে, শালগ্রামের পূজা ছাড়িয়া উহাকে গায়ে জড়াইয়া নিয়া আদর করিতে থাকি। উহার নির্ম্মল কোমল অঙ্গের স্পর্শ এতই আরামপ্রদ যে, তাহাতে আমার শরীর-মন শীতল হইয়া যায়, চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। যেদিন দেবকুমার আমার নিকট আসিতে একটু বিলম্ব করে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। ভাগ্যবান দেবকুমারের জন্ম ১১ই মাঘ শুভ মাঘোৎসবের দিনে হয়। উহার অন্নপ্রাশনের সময় ঠাকুর স্বহস্তে উহার মুখে অন্নপ্রদান করেন এবং আদর করিয়া 'দেবকুমার' নাম রাখেন। দেবকুমারের চেহারা যেমনই সুন্দর, সুশ্রী ও লালিত্যময়, প্রকৃতিও তেমনই অসাধারণ মোলায়েম ও মমতাপূর্ণ। দেবকুমার ছয় সাত বৎসরের বালক হইলেও ইহার সঙ্গলাভে বড়ই আরামে আছি।

হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম।

আজ কয়েকটি গুরুভ্রাতার প্রশ্নে ঠাকুর হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম সম্বন্ধে লিখিলেন—(১) পাপ বোধ (২) পাপ-কর্ম্মে অনুতাপ (৩) পাপে অপ্রবৃত্তি (৪) কুসঙ্গে ঘৃণা (৫) সাধু-সঙ্গে অনুরাগ (৬) নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি (৭) ভাবোদয়

(৮) প্রেম। ঠাকুর এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন। মুখে যাহা বলিলেন, লিখিবার অবসর পাইলাম না—তাঁহার মৌনাবস্থার খাতাতে যাহা পাইলাম,—মাত্র তাহাই নকল করিয়া রাখিলাম।

অদ্বৈতবাদী ফকির ঃ জাতিভেদ কাহাকে বলে ?

১৬ই আশ্বিন।

আজ ঠাকুর গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীধর ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ যে স্থানে সারকুলার রোডে মিশিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে একটি মস্‌জিদের দোতালায় উপস্থিত হইলেন। তথায় এক মুসলমান ফকির নির্জ্জনে আপন ভজনে মগ্ন ছিলেন। ঠাকুর সশিষ্যে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ফকির সাহেবের নিকট বসিয়া রহিলেন। ফকির সাহেব কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—'এই মস্‌জিদে যেমন কথার প্রতিধ্বনি হয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ ভগবানেরই একটি প্রতিধ্বনি।' ঠাকুর ফকির সাহেবের সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে রাস্তায় আসিয়া ঠাকুর ফকির সাহেবের প্রশংসা করিয়া গুরুভ্রাতাদের বলিলেন—"ফকির সাহেব অদ্বৈতবাদী। জগৎ ও ঈশ্বর এক—এই দৃঢ়জ্ঞান হওয়া মুখের কথা নয়। এই সমস্ত উপাসনা কলির মনুষ্যের পক্ষে কঠিন। এজন্য কেবল নাম অবলম্বনপ্রত্যেক উপাসনার ব্যবস্থা।"

বাসায় আসিয়া মহেন্দ্রবাবু বর্ত্তমান জাতিভেদ সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর লিখিলেন—"ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ শূদ্র প্রকৃতি এবং শূদ্রকুলজাত হইয়া কেহ ব্রাহ্মণ প্রকৃতি হইতে পারেন। কিন্তু এ সমস্ত ভেদ বুঝিবার শক্তি সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ ভিন্ন অপরের নাই। এজন্য প্রকৃত জীবের পক্ষে সমাজগত জাতিভেদ মানিয়া চলাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণবংশে শতকরা হয়ত ৩০টি শূদ্র জন্মগ্রহণ করিতে পারে কিন্তু শূদ্রবংশে ব্রাহ্মণ প্রকৃতি জীবের সংখ্যা হয়ত শতকরা ২০ জনও হইবে না। এইজন্য ধর্ম্মরক্ষার্থে এবং বিশুদ্ধি রক্ষার অভিপ্রায়ে জন্মগত প্রকৃতি অধিকারের ভেদ মানিয়া লওয়াই নিরাপদ। সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ্ থাকিতে হইলে স্বপাকে আহারই প্রশস্ত। অধিকাংশ স্থলে দুঃসাধ্য।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার লিখিলেন—"জাতি কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র নহে। স্ত্রী-পুরুষ জাতি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এসকলও জাতি। এই জাতিভেদ যখন যাইবে—তখনই জাতিভেদ গেল। শুকদেবের জাতিভেদ ছিল না, বেদব্যাসের জাতিভেদ ছিল। ব্রাহ্মসমাজে গেলে বা উপবীত ত্যাগ করিলে,

ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া হয় না; যথার্থ ধর্ম্মার্থী হইয়া যাওয়া চাই। যাহার তাহার খাওয়ায় জাতিভেদ নাই, তাহা নহে। জাতিভেদ যাওয়া সমবুদ্ধি।"

বিভিন্ন শাস্ত্রে আহার-বিহার : গঙ্গাস্নানে জীবের গতি।

জনৈক খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'শরীর মন ও আত্মার কল্যাণকর আহার বিহার সম্বন্ধে উপদেশ আমরা কোথায় পাইতে পারি?'

ঠাকুর লিখিলেন—"সাংখ্যযোগে কপিলদেব পঞ্চতত্ত্বকে বিভাগ করিয়া এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদি লইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া, প্রত্যেক তত্ত্বের সহিত শরীর-মনের কি সম্বন্ধ এবং আত্মার সহিত শরীর-মনের কি সম্বন্ধ তাহা ঠিক করিয়া আহার বিহার সকল ঠিক ঠিক রূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব, পাতঞ্জল দর্শন, মৈত্রেয় উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তন্ত্র, রুদ্রযামল ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক লিখিয়াছেন। তাহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আহার-বিহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।"

আজকাল আমরা অনেকগুলি গুরুভ্রাতা একসঙ্গে অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে যাই। জগন্নাথঘাটে একসঙ্গে সকলে পরমানন্দে স্নান করিয়া বাসায় আসি। গঙ্গাস্নানে কি যে আনন্দ হয় বলিতে পারি না। আজ বাসায় আসিয়া গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'গঙ্গাস্নানে যথার্থই কি জীব উদ্ধার হয়?'

ঠাকুর লিখিয়া উত্তর দিলেন—"যদি শাস্ত্র মান্ত কর তবে 'গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ, যোযনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥'—গঙ্গা হইতে চারিশত ক্রোশের মধ্যে 'গঙ্গা, গঙ্গা' বলিয়া যেখানে স্নান করিবে, তাহাতে উদ্ধার হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে, এরূপ যাহার বিশ্বাস সে নিশ্চয়ই তাহা লাভ করে। গঙ্গাজলের অশেষ মহিমা। গঙ্গা হিমালয়ের অতি উচ্চ শিখর হইতে নামিয়াছেন। অনেকানেক ঔষধি ইহার মধ্যে আছে। গঙ্গা মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, পরে গঙ্গাজলে স্নান করা উচিত।"

শিষ্যের অপরাধে ক্ষমা ভিক্ষা : দোষদৃষ্টি দূষণীয়।

একজন গরীব ব্রাহ্মণ আজ আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিলে কোন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে গালি দেন এবং তাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঠাকুর উপরে থাকিয়া তাঁহার দু'এক কথা শুনিতে পাইয়াই

খুব ব্যস্ত হন এবং ব্রাহ্মণকে আনাইয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া গুরুভ্রাতাটির অপরাধ ক্ষমা কর্‌তে প্রার্থনা করেন। পরে সাদরে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দেন।

আমাদের একটি বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা কাহারও প্রতি কোন অপরাধ করায় তাহা ঠাকুরের কর্ণগোচর হয়।

ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন—"এই সকল উৎকট দোষের ভারেই তো তিনি উঠ্‌তে পার্‌ছেন না, কিন্তু তাঁহার ভিতরে কতগুলি অসামান্য গুণও আছে। তোমাদের সকলের ভিতরই কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ আছে। শুধু সে গুণমাত্র থাক্‌লে, তোমরা এতদিনে কোথায় উ'ড়ে যেতে,—জগৎ তোমাদের ধর্‌তে পার্‌ত না। কিন্তু ভগবানের এমনই কৌশল যে, কতকগুলি দোষের বোঝা মাথায় দিয়া তিনি তোমাদের টে'নে রেখেছেন, উড়ে যেতে দিচ্ছেন না। লোকের দোষের দিকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি না রে'খে গুণের দিকে লক্ষ্য রাখাই ভাল।"

জাতিস্মর বালক।

২০শে আশ্বিন।

আমাদের ভবানীপুরের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল. মহাশয় কালীঘাটের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত নামে একটি ৬।৭ বৎসরের ছেলেকে লইয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ছেলেটি বয়স অনুরূপ একটু চঞ্চলস্বভাব হইলেও ঠাকুরের নিকটে আসিয়া ঠাকুরকে স্থিরভাবে দর্শন করিতে লাগিল। ঠাকুর ছেলেটিকে খুব আদর করিয়া সম্মুখে বসাইলেন এবং নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে থিয়োসফিষ্ট্ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সাব্‌জজ এবং ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মুন্সেফ প্রভৃতি কয়েকটি দেশ-বিখ্যাত, সুশিক্ষিত ভদ্রলোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন। এই ছেলেটি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন।" ভদ্রলোকেরা প্রথমে ঠাকুরের কথা শুনিয়া একটু যেন দুঃখিত হইয়াছিলেন; পরে ছেলেটির মুখে দু'চারটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া রহিলেন। ঐ সকল প্রশ্নোত্তর শুনিয়াও কিছু বুঝিলাম না। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান অবতীর্ণ হইলে, এবার কি ভাবে তিনি কার্য্য করিবেন?' সুরেন্দ্রনাথ বলিল—'এবার যিনি অবতার, তিনি শুধু জ্ঞান বা শুধু ভক্তি লইয়া কার্য্য কর্‌লে চল্‌বে না এবার বুদ্ধদেবের জ্ঞান এবং মহাপ্রভুর ভক্তি নিয়ে কাজ কর্‌তে হবে—না হ'লে তাঁর কথা গ্রাহ্য হ'বে না।'

একটি বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা! ভক্ত বড় না ভগবান বড়?'

ছেলেটি বলিল—'বড়, ছোট বল্‌তে হ'লে ভক্তই বড়।'

বৈষ্ণবটি বলিলেন—'ভগবান তো অনন্ত, অসীম। তাঁ হ'তে বড় কি প্রকারে হইবে ?'

ছেলেটি—'যাঁকে অনন্ত অসীম বল্‌ছেন, তাঁকে যিনি সসীম ক'রে নিজ হৃদয়ে বদ্ধ ক'রে রাখেন, তিনি তাঁর চেয়ে ছোট হবেন কিরূপে ?'

ছেলেটি এই প্রকার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন—শুনিয়া সকলেই অবাক্ !

ঠাকুর বলিলেন—"ছেলেটি জাতিস্মর। ভবিষ্যতে দেশে একটি বিখ্যাত লোক হবেন। কিন্তু জাতিস্মরত্ব আর বেশী দিন থাক্‌বে না।"

গুরুবাক্য লঙ্ঘনে সত্যপালন ঃ সমস্যা।

আমাদের গুরুভ্রাতা, পোষ্টাফিসের ডেপুটি কনট্রোলার জেনারেল শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন, 'আপনি এবার আমার বাড়ী একদিন পদার্পণ কর্‌বেন বলেছিলেন। আমার বড় আকাঙ্ক্ষা—একদিন আপনাকে নিয়া যাই। কবে যাবেন ?' ঠাকুর উমাচরণবাবুর কথা শুনিয়া একটু সময় স্থির হইয়া রহিলেন পরে বলিলেন—"আচ্ছা, আপনি যেদিন বল্‌বেন সেইদিনই যাব।" উমাচরণবাবু একটা দিন ঠিক করিয়া ঠাকুরকে জানাইয়া চলিয়া গেলেন এবং বাড়ী যাইয়া দস্তুরমত একটি উৎসবের আয়োজন করিলেন। পরে যথাকালে ঠাকুরকে নিতে আসিলেন। ঠাকুর অপরাহ্ণে বাহির হইয়া প্রথমে কালীঘাটে যাইয়া মা-কালী দর্শন করিলেন। পরে মনোরঞ্জনবাবুর অনুরোধে তার বাসায় গেলেন। মনোরঞ্জনবাবুর একটি ছেলের ৪।৫ ডিগ্রি জ্বর—বিকারের অবস্থা। ঠাকুর তাহার বিছানার ধারে গিয়া বসিলেন। মনোরমা ছেলেটিকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন। ঠাকুর ছেলেটির মাথায়-গায়ে হাত বুলাইয়া চলিয়া আসিলেন এবং উমাচরণবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দদাসের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল কিন্তু ঠাকুর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, হঠাৎ তাঁহার প্রবল জ্বর হইল। ঠাকুর বাসায় আসিতে ব্যস্ত হইলেন। উমাচরণবাবু কিছু জল খাওয়াইতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর অগত্যা একগ্লাস সরবৎ খাইয়া চলিয়া আসিলেন এবং ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে এই জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ঠাকুর তিন দিন তিন রাত্রি প্রায় বেহুঁস অবস্থায় কাটাইলেন। পরে আপনা-আপনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই জ্বরে ঠাকুর এতই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন যে, সাধারণ শরীর হইলে বোধ হয় তাহাতে মৃত্যু হইত। রোগ উপশমের পর ঠাকুর বলিলেন—"কড়াতে ঘৃত চাপাইয়া তা' ফুটা'লে যেমন গরম হয়, শরীরটি সেইরূপ দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল। নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় দেহ থেকে স'রে বস্‌লাম। অম্‌নি মনে হল দেহের ভোগটি ক'রে নিতে হবে,—আল্‌গা থাকা ঠিক নয়। তাই আবার প্রবেশ কর্‌লাম। তিন বার এরকম ক'রে

ভুগ্‌তে হ'ল। পূর্ব্বে শরীরের একটু পীড়া হ'লেই মন খারাপ হ'ত। এখন দেখি, শরীর ও আত্মা, সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটি বস্তু। যেমন হিমালয়ের নিকটে গেলে শরীরে শীত বোধ হয়, সেইরূপ শরীরে কোন ব্যথা কি পীড়া হ'লে জানা যায় মাত্র, ভোগ হয় না,—ভোগ শরীরেই হয়।"

এই প্রকার বিষম ভোগের হেতু কি জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—"ঐ সময়ে পরমহংসজী একটা নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত আসন ত্যাগ ক'র্‌তে নিষেধ করেছিলেন (বোধ হয় এই ভোগটিই কাটিয়ে দিবার জন্য)। কিন্তু উমাচরণবাবু এ'সে আমাকে অনুরোধ করায়, ভাবলাম,—এখন কি করি ? নিজের বাক্য রক্ষা ক'রে সত্যপালন করি, না,—পরমহংসজীর আদেশ পালন ক'রে ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করি। সত্য-পালন কর্‌ব, ইহাই স্থির ক'রে উমাচরণবাবুর বাড়ী গেলাম। গুরুবাক্য লঙ্ঘন ক'রে সত্যপালনও যে অপরাধ এবার তাহাই বুঝাইলেন।"

মহরমে ভিস্তি দ্বারা ঠাকুরের জল দান ঃ অহিংসা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

মুসলমানের মহরম পর্ব্বের ঘটনা বড়ই মর্ম্মভেদী। কোন ব্যক্তি উহা শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ মহম্মদের নাতি হাসেন ও হোসেন সপরিবারে সৈন্যসামন্ত সহিত কারবালা প্রান্তরে বিপক্ষের চক্রান্তে জল অভাবে দারুণ পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ শোকাকুল প্রাণে তাঁহাদের স্মরণ করিয়া দলে দলে রাস্তায় বাহির হন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া 'হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সজোরে বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক রাস্তায় চলিতে থাকেন। হাসেন হোসেনের পিপাসা শান্তির জন্য রাস্তায় জল ঢালিতে ঢালিতে তাঁহারা অগ্রসর হন। ঠাকুর বারান্দায় দাঁড়াইয়া উহা দেখিয়া হাসেন-হোসেনের তৃপ্ত্যর্থে ভিস্তি দ্বারা জল আনাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঢালাইতে লাগিলেন। হাসেন-হোসেনের মৃত্যু বিবরণ শুনিয়া প্রাণের যে কি অবস্থা হয় বলা যায় না। একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ধর্ম্ম কি এক এক জাতির এক এক রকম ?'

ঠাকুর লিখিলেন—"অহিংসাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, যিনি ভগবদ্ভক্ত,—তাঁহার ধর্ম্ম অহিংসা। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, রাজ্যশাসন। মারামারি, কাটাকাটি করিয়া, বহুজন্ম ঘুরিতে ঘুরিতে যদি ব্রাহ্মণ হয় তবেই তাহার ঐ অবস্থা। মনুষ্যত্ব যেমন উন্নত হইবে, তদ্রূপ তাহার কার্য্য সাধারণ মনুষ্য হইতে ভিন্ন হইবে।

"ধর্ম্মসাধন দুইপ্রকার। যাঁহারা প্রবৃত্তির অধীন তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি-ধর্ম্মকে শাক্তধর্ম্ম নাম দিয়াছেন ; নিবৃত্তি ধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে—শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।"

বলির অভিমানে বামন অবতার।

ঠাকুর আজ কথায় কথায় বামনদেবের কথা খাতায় লিখিলেন—"ভগবান প্রথমে বামনাবতার হইয়া, বলি নামে মানবাত্মারূপ অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। মনুষ্য সংসারে ধর্ম্ম করিতে বসিয়া অত্যন্ত অভিমান প্রকাশ করে, আমি দাতা, আমি জ্ঞানী, আমি ভক্ত, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দেবগণের রাজা। মনুষ্যের এই ধর্ম্মাভিমান দেখিয়া পরমেশ্বর বামন হইয়া অর্থাৎ আত্মার আত্মা হইয়া মনুষ্যের নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন। ত্রিপাদ শুনিতে সামান্য, কিন্তু উহাই জীবের সর্ব্বস্ব। সত্ত্বঃ, রজ, তম,—ভগবান এই ত্রিপাদ অধিকার করিলে, তখন বিরাটমূর্ত্তি ধরিয়া জীবের সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বামনদেব বলির দ্বারে দ্বারী হইয়া পাতালে ছিলেন। এইরূপ যে ব্যক্তি ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেন, ভগবান তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীবকে আর ভাবিতে হয় না।

মনোহর দাস বাবাজীর আখ্ড়ায় সংকীর্ত্তন ঃ
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নৃত্য।

২৫শে আশ্বিন।

শ্রীযুক্ত মনোহর দাস বাবাজী আজ ঠাকুরের নিকট আসিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"প্রভু দয়া ক'রে এ কাঙ্গালের জীর্ণ আখ্ড়ায় একবার পদধূলি দিতে হবে।" বাবাজী বড়ই নিষ্কিঞ্চন, মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে খোল-করতাল সংযোগে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন, তখন এই বাবাজীকেই তিনি লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই বাবাজী ঠাকুরের পরিচিত। ঠাকুর বাবাজীর অনুরোধে সম্মত হইলেন এবং যথাসময়ে তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে তথায় গিয়া সমবেত হইলেন। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু তাঁহার ল্যাণ্ডো গাড়ীতে করিয়া ঠাকুরকে নিয়া চলিলেন। আখ্ড়ার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব দশটি মাদল লইয়া সংকীর্ত্তন মানসে রাস্তার উপরে ঠাকুরের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কীর্ত্তনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলিয়া ভাবোন্মত্ত অবস্থায় স্খলিতপদে কীর্ত্তনস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাহার যে কিছু উৎকৃষ্ট গাত্রাবরণ—শাল,

বনাত, মলিদা ইত্যাদি ছিল ঠাকুরের গমনপথে আগ্রহের সঙ্গে সকলে তাহা পাতিয়া দিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব বাবাজীরা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ভাবাবেশে আকুল হইয়া গান ধরিলেন :—

"বুঝি প্রেম-দাতা নিতাই এসেছে,—
নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে!
ঐ আমাদের প্রেমদাতা নিতাই এসেছে!
জেনে আয় জাহ্নবী-তীরে—হরি বলে কে ;
হরি বলে কেরে—জয় রাধে বলে কে ?
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে, নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে ?

গানের দু'একটি পদ গাইতে গাইতে সকলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নৃত্য করিতে করিতে সকলে বাবাজীর আখ্‌ড়ায় প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর বাবাজীর বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া দশ মাদল বাজাইয়া মহাসমারোহের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভাবাবেশে বহুলোক সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ঠাকুর কীর্ত্তনান্তে হরিরলুঠ বাতাসা প্রদান করিয়া সশিষ্যে বাসায় আসিলেন।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—'সংকীর্ত্তনকালে যে ভাবোচ্ছ্বাসে লোক নৃত্য করে—অনেক সময় তাহা বিরক্তিকর বোধ হয়।'

ঠাকুর লিখিলেন—"কীর্ত্তনে ভাব তিন প্রকার হয়। সত্ত্বভাবে উপস্থিত লোক উপকৃত হয়। রজঃভাবে অন্য লোকের কখনও উপকার, কখনও অপকার হয়। এজন্য সংবরণ করিবে। তমভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হয়। কারণ, তমোগুণের নৃত্য অধিকাংশ বেতালা হইয়া লম্ফঝম্ফ হয়। নৃত্যকারীর পা লাগিয়া অনেকে খোঁড়া হয়, ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হয়,—বালকগণ ভয় পাইয়া চীৎকার করে। কেহ কেহ ভক্তিভাব প্রকাশ করিবার জন্য শরীর সঙ্কোচ করে। এই ভাব বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজে অত্যন্ত প্রবল—শরীর সঙ্কোচ করা, নত করা, বাক্য সঙ্কোচ করা ইত্যাদি। ভক্তির স্বভাব হইতে যাহা হয় তাহা সুন্দর। দেখাইবার জন্য হইলে দৃষ্টিকটু হয়। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি ভাব ভিন্ন সংকীর্ত্তনে যে ভাব হয়—তাহা নামোন্মত্ততা। না মাতিয়া নাচিলেই দোষ,—যেমন মদ না খাইয়া মাত্‌লামী।"

পরমেশ্বর সাকার না নিরাকার।

একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক খুব আগ্রহের সহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পরমেশ্বর সাকার না নিরাকার ?

ঠাকুর—শাস্ত্রে আছে, তিনি নিরাকার এবং তিনি সাকার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছু ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তত্তদ্‌যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে, সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—কর্ত্তা নিজে স্বতন্ত্র। কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। এজন্য তিনি নিরাকার, নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্যরূপ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞানচক্ষু—ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন তাঁহাকে সাকার, নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা। চিরকাল ভক্তসাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপমাধুরী যে একবার দেখিয়াছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারে না। বাগানের কর্ত্তা বাগানে আসিলে বাগানের মালি যেমন দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ দীনবন্ধু প্রভু হৃদয় উদ্যানে উপস্থিত হইলে, অহঙ্কার-মালি দূরে গিয়া করযোড়ে অবস্থান করে। “প্রভো! আমি দাস,” মালির মুখে কেবল এই কথা। প্রভুর আগমনে মালি বন্দনা করিলে শরীরের রোমগুলি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর স্তব করে, নয়ন তাঁর চরণ ধৌত করে।

দীক্ষাপ্রার্থী ব্রাহ্মের প্রতি উপদেশ।

একজন ব্রাহ্ম-সমাজের ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকটে আসিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর লিখিলেন—“ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী মত উপাসনা, এতদিন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইলে সেই প্রণালীতে যাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। হঠাৎ অন্য সাধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। মহর্ষি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন। ধর্ম্ম সাধন কোন প্রকার কল কৌশল নহে যে,

তদনুসারে কার্য্য করিয়া হাতে হাতে ফল পাবেন। ধর্ম্ম-সাধন করিবার জন্য জগতে নানাপ্রকার প্রণালী আছে। সেই অসংখ্য প্রণালীর একটিমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ধর্ম্মলাভ করিতে যত্ন করিয়া থাকি। এই প্রণালীতে সাধন করিলে, কেহ শীঘ্র, কেহ বিলম্বে ফললাভ করিয়া থাকেন। অনেক বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ নিরাশ হইয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রণালী মত কার্য্য করেন। ভগবৎ কৃপা ভিন্ন কোন প্রণালী দ্বারা সহজে কিছু হয় না। যখন একটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন হঠাৎ কিছু করা ভাল নহে। আমাদের কার্য্য-কলাপ ভাল করিয়া আলোচনা করুন—পরীক্ষা করুন। লোকের মুখে কিছু শ্রবণ করিয়া হঠাৎ তাহাতে প্রবেশ করা উচিত নহে।”

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন—“আমরা যে সাধন করি তাহা স্বপ্ন নহে,—প্রত্যক্ষ ঘটনা। তবে সময় না হইলে ইহা কেহই পান না। যদি আপনার জমি প্রস্তুত হয় এবং সময় হয়, আপনি যেখানেই থাকুন ঘরে বসিয়াই পাইবেন। কিছু হওয়া, জমি প্রস্তুত নহে। জমি প্রস্তুতের অর্থ ভিন্ন। তাহা সাধন পাইলে বুঝা যায়; নতুবা বুঝা যায় না।”

এই ভদ্রলোকটি দীক্ষার জন্য নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিলে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, ঠাকুর লিখিলেন—“পরে আসিবেন, এখন আমার শরীর সুস্থ নয়। শরীর, মন, আত্মা সুস্থ থাকিলে, শক্তি-সঞ্চার বিশুদ্ধরূপে হয়। প্রদীপ যদি প্রজ্বলিত থাকে, তাহা হইতে সহস্র প্রদীপ জ্বালান যায়। কেবল তৈল, শলিতা, তৈলাধার এ সমস্ত আছে কিন্তু প্রদীপ না জ্বলিলে তাহা হইতে একটি প্রদীপও জ্বলে না। অগ্নি সর্ব্বত্র আছে, ইহা বলিলে দীপ জ্বলে না। যে উপায় দ্বারা অগ্নি জ্বলে, তাহা না করিলে কিছুতেই দীপ জ্বলে না। মানবীয় শক্তিও এইরূপ।”

এ সাধনে ব্রাহ্মসমাজের লোক অধিক কেন? শক্তি-সঞ্চার।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—“আমাদের এই সাধন তো ঋষি-পন্থা—সনাতন ধর্ম্ম। ব্রাহ্মসমাজের লোকদের ইহাতে এত আকর্ষণ হইতেছে কেন? ব্রাহ্মভাবের লোকই বোধ হয় এই সাধনে অধিক?”

ঠাকুর বলিলেন—“যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পাইয়াছিলেন

তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, কতকগুলি ভাল বৃক্ষের বীজ একত্র হইয়াছে। তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব বৃক্ষ আছে। কিন্তু বীজ হইতে বৃক্ষ বাহির করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইতেছে না।”

গুরুভ্রাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—“ছেলে-পিলে যাহারা ধর্ম্ম কিছু বুঝে না, বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই—শিশু, তাহাদিগকে সাধন দেওয়া কিরূপ ?”

ঠাকুর লিখিলেন—“শক্তি সকলের মধ্যেই আছে। সকল সময়েই সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়া দেওয়া যায়। নারদ শুকদেবকে গর্ভাবস্থায় শক্তি দিয়াছিলেন। চক্ষুতে পীড়া হইলে তজ্জন্য ঔষধ সেবন করিলেন। শরীরের অন্য কোন অঙ্গে সে ঔষধের ক্রিয়া হইবে না। কেবল চক্ষুতেই প্রকাশ পাইবে। সেই প্রকার যাহাকে শক্তি-সঞ্চার করিবেন, নাম তাহারই উপর ক্রিয়া করিবে, গুরুকে মনে রাখিতে পারে, এমন অবস্থায়ই দেওয়া উচিত।”

প্রশ্ন—‘শক্তি-সঞ্চার কি ?’

ঠাকুর লিখিলেন—“ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে। একটি মহাপুরুষের শক্তি—তাহা দ্বারা সেই শক্তিকে, যাহাকে পরমাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলে,—জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তি-সঞ্চার বলে। ঐ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিতাবস্থায় আছে। তাহা শক্তি-সঞ্চার দ্বারা জাগরিত করিলেও পুনরায় নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করে। যাহারা অনবরত শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিয়া, উহাকে আর ঘুমাইতে দেয় না, তাহাদের শক্তি বেশ খেলিতে থাকে।”

ঠাকুর কথায় কথায় লিখিলেন—“এবার অনেক লোককে অনেকপ্রকার কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু লোক স্থির হইতেছে না। এবার মহাপুরুষগণ নিজেরা কিছু করিবেন না ;—উপযুক্ত শিষ্যের দ্বারা করাইবেন।” ঠাকুর এ বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। মহাপুরুষেরা নাকি এখন হইতে নানাভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু কি আবার অবতীর্ণ হইবেন ?

মহাপ্রভুর শিষ্যাদি সম্বন্ধে কথা।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই যুগে নাকি আরো দুইবার মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবেন ?'

ঠাকুর লিখিলেন—"চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু আর দুইবার শচীমাতার গর্ভে জন্মাইবেন। সেই সময়ের বৈষ্ণবগণ, তাহার এই অর্থ জানিতেন যে, আর দুই কলিযুগে এই শচীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। এইজন্য যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজ ও নরোত্তম ঠাকুর হরিনামে সমস্ত দেশ প্লাবিত করেন, তখন তাঁহাদিগকে তিন প্রভুর আবেশ অবতার বলিয়াছিলেন। আবেশ, আবির্ভাব, প্রকাশ—এই কলিতেই হইতেছে ও হইবে। শ্রীবৃন্দাবনে একদিন গৌর শিরোমণি মহাশয় আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া লইয়া বলিলেন যে, 'এখন মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া হুজুগ্ উঠিবে। কিছুকাল পূর্ব্বে পাবনা জেলায় একবার উঠিয়াছিল। এ সকল হইতে সাবধান থাকিবেন।' কেহ কেহ বলেন, গীতায় আছে,—'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য' ইত্যাদি। যত অবতার হইয়াছেন, সেই যুগে একবারই হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ প্রভৃতি একবার মাত্র, শ্রীরামচন্দ্র একবার, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবার মাত্র। কলিতেও মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য একবার মাত্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ কলি যতদিন বর্ত্তমান, তিনি ততদিন কলির জীবের উদ্ধার করিবেন। তাঁহার কি মৃত্যু হইয়াছে যে, আবার জন্মাইবেন ? যখন যেখানে কৃপা করিবেন, আবেশ, আবির্ভাব, প্রকাশ, এই তিন ভাবে কার্য্য করিবেন এবং করিতেছেন।"

প্রশ্ন করা হইল—'মহাপ্রভুর কি কোন শিষ্য ছিলেন ?'

ঠাকুর লিখিলেন—"হাঁ, তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ছিলেন। সাড়ে তিনজন বলা হইয়াছে। তাঁহারা শুধু শিষ্য নহেন, তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ সাধন শিক্ষা দিতেন এবং সাধারণ হইতে কিছু অন্যভাবে সাধন প্রণালী শিখাইয়াছিলেন।"

'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বলিয়া স্বীকার করেন নাই; অথচ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে যাহা অবলম্বন করিয়া শিশিরবাবু লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। শিশিরবাবু লিখিয়াছেন—'শ্রীচৈতন্যের ভিতরে সময় সময় ভগবানের আবেশ হইত। এই পুস্তকের নাকি শিক্ষিত সমাজে খুব প্রচার। এই পুস্তক

পাঠের ফলে, সকলেই নাকি এখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং গ্রন্থাদি পাঠ করিতেছেন।' ঠাকুর শুনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—"যাঁহারা মহাপ্রভুর উপাসনা করেন, তাঁহারা উহা স্পর্শও করিবেন না। জগতের সকলে একবাক্যে আবেশ আবির্ভাব বলিলেও মহাপ্রভুর উপাসক ভক্তেরা তাহা গ্রাহ্য করিবেন না—শুনিবেন না। যাঁহারা চৈতন্য-মন্ত্রে সাধন করেন, সেই সকল বৈষ্ণবের ধ্যান করিতে করিতে একটি ভাব-মূর্ত্তি মুদ্রিত হয়। যেমন ভাবময় মূর্ত্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, সেইরূপ বাহিরের কতকগুলি উদ্দীপনের অবস্থা আছে,—যেমন নবদ্বীপ ধাম। এখন যদি মূর্ত্তির সঙ্গে না মিলে এবং ধাম নবদ্বীপ না হয়, তবে সেই সকল বৈষ্ণব নূতন কিছু কখনই গ্রহণ করিবেন না। যাহারা হুজুগ্ করিতেছে, তাহারা যথার্থ শ্রীচৈতন্য উপাসক নহে।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার লিখিলেন—"কোন কোন ব্যক্তি, মহাপ্রভু সম্বন্ধে দুই একখান পুস্তক লিখিয়া বলিতেছেন যে, 'আমরাই শ্রীগৌরাঙ্গকে উদ্ধার করিয়া জগতে প্রচার করিলাম।'—ইহার ন্যায় ধৃষ্টতার কথা আর কি আছে? সূর্য্য অন্ধকারে পড়িয়াছিল, শিশিরবিন্দু সূর্য্যকে জগতে প্রকাশ করিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিন্দা করিতেন। মহাপ্রভুর একজন সঙ্গী বলিলেন—'ভট্টাচার্য্য, আমি যাহা মহাপ্রভুর বিষয়ে বলিতেছি, কিছুদিন পরে তুমিও তাহাই বলিবে। বাস্তবিক তাহাই হইল।"

আজ মহাপ্রভু সম্বন্ধে এবং তাঁহার ভক্তদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতে লাগিল। মুকুন্দ ও দামোদরকে মহাপ্রভুর শাসন করা বিষয়ে, ঠাকুর লিখিলেন—"মুকুন্দকে বাস্তবিক দণ্ড করা হয় নাই। অন্য লোক মুকুন্দকে না বুঝিয়া নিন্দা করিত যে, মুকুন্দের কিছুতে দৃঢ়তা নাই। সেইটি লোকের ভ্রম। তাহা দেখাইবার জন্যই মহাপ্রভু মুকুন্দকে বলিলেন যে, লক্ষ জন্মের পরে পাইবে। মুকুন্দ ঐ কথা শুনে, 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিল। তখন মহাপ্রভু সকলকে বুঝাইলেন যে, মুকুন্দের মত কাহারও দৃঢ়তা নাই। অনেক সময় দামোদর, বৈষ্ণবদের অপমান করিতেন। দামোদর না বুঝিয়া অনেক সময় রসভঙ্গ করিতেন,—এই জন্যই নবদ্বীপে পাঠাইলেন। যখন শ্রীনিবাস পুরুষোত্তমে গেলেন—মহাপ্রভুর অন্তর্ধানে স্বরূপ দামোদর প্রভৃতিকে মৃতপ্রায় দেখিলেন।"

শালগ্রাম পূজায় উপাধির সৃষ্টি—লোকের বিষদৃষ্টি।

১লা-৭ই কার্ত্তিক।

পূজার ছুটী প্রায় ফুরাইয়া আসিল। ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুরের যে সকল গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের সঙ্গ মানসে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শীঘ্রই সকলে আপন আপন স্থানে চলিয়া যাইবেন। এতদিন ইহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। আমারও বোধ হয়, আর অধিক দিন এস্থানে থাকা হইবে না। শালগ্রাম পূজা করিয়া এতকাল বড়ই আনন্দে ছিলাম, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে ধীরে ধীরে উৎপাত আসিয়া আমার সেই শান্তি দূর করিয়া দিতেছে। বহুলোকের বিষদৃষ্টিতে, আমাকে বড়ই উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। শালগ্রাম পূজা করি বলিয়া, ব্রাহ্মবন্ধুগণ আমাকে আর পূর্ব্বের মত দেখেন না। কুসংস্কারী হইয়াছি ভাবিয়া নিকটেও ঘেঁসেন না, অথচ আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া একে অন্যের নিকটে আমার সংস্কারের জন্য আক্ষেপ করেন। যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা আরও ভয়ানক। ঠাকুরের নিকট শালগ্রামের আরতি করি, সুতরাং শালগ্রামকে ঠাকুর অপেক্ষা বড় মনে করি, এইরূপ ভাবিয়া আমার প্রতি বক্রদৃষ্টি করেন। ঠাকুর এসব দেখিয়া-শুনিয়া দু'তিন দিন আমাকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মচারী, তুমি কাশীতে অথবা গয়াতে কিম্বা অযোধ্যাতে গিয়া নির্জ্জনে সাধন কর। তাহ'লে ঠিকমত কাজ চল্‌বে,—উপকারও খুব পা'বে। এসব স্থানে হট্টগোলের মধ্যে লোকের চোখের উপর তোমার সাধনে তেমন সুবিধা পা'বে না।"

এই সময় আমার সাধনের অবস্থা খুব সুন্দর চলিতেছিল। ঠাকুরের দয়ায় সর্ব্বদাই সরস ভাব থাকিত। তা'ই ঠাকুরের এই কথা শুনিয়াও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে, মনে করিলাম না। ঠাকুরকে বলিলাম—"যতদিন আপনার কাছে থাকিয়া সাধন-ভজন ঠিকমত চালাইতে পারি, ততদিন আর অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হয় না। তেমন বিঘ্ন-ঘটিলে অন্য কোন দিকে চলিয়া যাইব।'

ঠাকুর আমাকে বারংবার সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"যেভাবে পূজা কর কারো নিকটে তাহা প্রকাশ ক'রো না। ভজনের বিষয় গোপন রাখ্‌তে হয়। প্রকাশ কর্‌লে ক্ষতি হ'য়ে থাকে।" অর্থাৎ, শালগ্রামে যে ইষ্টদেবের পূজা করি, তাহা যেন কেহ জানিতে না পারে। 'আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথাতথা'—এই কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে।

এখন শুনিতেছি, শালগ্রাম-পূজা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট তাঁহারই একটি শিষ্য করে, অথচ তিনি তাহাতে কোন বাধা না দিয়া বরং ঐ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন,—এইরূপ কথা তুলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মদের নাকি একটি কমিটি বসিয়াছে। যে সকল গুরুভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, তাঁহারা এই কমিটিতে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং ঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা কথা শুনিয়াও কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহারা সচক্ষে প্রত্যহ দেখিতেছেন যে, ঠাকুর শালগ্রামের আরতির

সময়ে স্বহস্তে কাঁশর বাজাইয়া থাকেন। এজন্য ব্রাহ্মগুরুভ্রাতাগণ ভারি ক্লেশ পাইতেছেন। তাঁদের এই অশান্তির মূল, আমি বলিয়া, দিন দিন তাঁহারা আমার উপর বিরক্ত হইতেছেন। যখন তাঁহারা আমার নিষ্ঠা ভঙ্গ করিবার জন্য নানাকথা বলিয়া থাকেন, তখন এক কথায়ই তাঁদের মুখ বন্ধ করিয়া দেই। বলি, তোমাদের গুরুজীর হুকুম মতই আমি শালগ্রাম পূজা করিতেছি,—ইহা আমি নিজের ইচ্ছামত করিতেছি না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা মর্ম্মান্তিক যাতনা পান, অথচ আমাকে কিছু বলিতে পারেন না। ব্রাহ্মদের এবং গোঁড়া হিন্দুদের যতই আমার উপর তীব্র দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, ঠাকুরও ততই শালগ্রাম পূজার সহানুভূতি করিয়া ও শালগ্রামের নানা মাহাত্ম্য বলিয়া, আমাকে নিষ্ঠা পূর্ব্বক পূজা করিতে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এক একদিন তিনি নির্জ্জনে বলিতেন—"কারো কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য ক'রো না। কারো কথায় জবাব না দিয়া নিজমনে নিষ্ঠাপূর্ব্বক শালগ্রাম পূজা ক'রে যাও। লোকের কথা গণ্য ক'রোনা।" সাধারণের বিরক্তিজনক দৃষ্টিতে আমাকে যেটুকু গরম করিত, ঠাকুরের এক মুহূর্ত্তের স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহা একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া দিত। ঠাকুরের সস্নেহদৃষ্টি স্মরণ করিয়া পরমানন্দে, অশ্রুপাতে সারাদিন কাটাইতাম।

যোগ-সঙ্কট।

এই সময় ঠাকুরের কৃপায় নানাপ্রকার অবস্থা আমার অনুভবে আসিতে লাগিল। কোন দিন নাম করিতে করিতে নাভিস্থলে উত্তাপ বোধ হইত। পরে ক্রমে ক্রমে তাহা এত বৃদ্ধি হইত যে, নাভির ভিতরে জ্বালা বোধ হইত। কখনও বা ঐ জ্বালার উত্তাপ নাভির বরাবর মেরুদণ্ডে গিয়া লাগিত। তখন তথায় একরূপ দাহ অনুভূত হইত, যাহা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। যেদিন মেরুদণ্ডে ঐ প্রকার উত্তাপ লাগিত, সেইদিন সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিতে থাকিত, তখন কিছুই আমার স্থির থাকিত না,—শরীর, মন সমস্তই অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িত। ভিতরের বিষম জ্বালায় অস্থির হইয়া হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা হইত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাত করিতাম। কখন কখন জ্বালা নিবারণের জন্য বাহিরে যাইয়া বাতাস করিতাম, কিন্তু কোন উপায়েই এই যন্ত্রণা নিবারণে সমর্থ হইতাম না। শারীরিক জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। বড়ই ক্লেশের অবস্থা। কোন দিন নাম খুব দ্রুত চলিলে, কাঁধ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দু'পাশের দু'টা শিরায় টান ধরিত এবং নাম চলার সঙ্গে উহা আরো বৃদ্ধি পাইত। নাকটিও শিরার টানে ধরিয়া যাইত। কোন দিন মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া পড়িত; চক্ষু বেদনা হইত।

আজ্ঞাচক্রে ধ্যান রাখিয়া গায়ত্রী জপের সময়ে সেইস্থানে একপ্রকার সুড়্‌সুড়্‌ অনুভব হইতে থাকিত। পরে ঐ স্থানে জ্বালা আরম্ভ হইত। এই জ্বালা এতই বৃদ্ধি হইত যে, যেন আগুন লাগাইয়া

দিয়াছে ; এই প্রকার সময় সময় অনুভব হইত। কিন্তু জপ না করিলে এই জ্বালা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিত। ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন—"নাম কর্‌তে কর্‌তে একটা সময় আসে যখন শরীরে ও মনে নানাপ্রকার জ্বালা হ'তে থাকে। উহা সাধনেরই একটা অবস্থা। এই সময় কখন কখন শরীর আগুনে পুড়্‌লে যেমন জ্বালা হয় তেমনই জ্বালা হ'তে থাকে। সময় সময় হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান ও নাড়ি-ভুড়ি টান্‌তে থাকে। এই ক্লেশ বড় সহজ ক্লেশ নয়।—অনেকে এই যন্ত্রণায় সাধন-ভজন ছেড়ে দেয়। ইহাকে যোগ-সঙ্কট বলে। খুব সাবধানতার সহিত এই সময়টা ভালমতে কাটায়ে দিতে পার্‌লেই হয়। এই সময় মিশ্রির সরবৎ, ডাব ও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জিনিস খেতে হয়। শরীর ঠাণ্ডা ও অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌লে, গরম ঘি সৈন্ধব দিয়া পান কর্‌তে হয়। এরূপ কর্‌লেই ঐ সকল যন্ত্রণার শান্তি। যোগ-সঙ্কট অবস্থা একবার কাটায়ে যেতে পার্‌লে আর কোন উৎপাতই থাকে না। সাধন কর্‌লে উহা সকলেরই একবার ভুগ্‌তে হ'বে। পূর্ব্বে মুনি-ঋষিরা শিষ্যদের দেহ মন শুদ্ধ কর্‌তে তুষানল কর্‌তেন। এখন আর তাহা চলে না। নামানলেই দগ্ধ ক'রে এখন সেই কাজ করায়ে নেন।"

আমার যখন এই সকল জ্বালা আরম্ভ হইল, তখন ঠাকুর এক একদিন ঘৃত গরম করিয়া খাইতে বলিতেন। কোন দিন সরবৎও খাওয়াইতেন। নাম ছাড়িয়া শুইয়া থাকিতেও কোন কোন সময় বাধ্য করিতেন। এ সমস্ত উপাধি উপস্থিত হইলে, ঠাকুর যখন যাহা করিতে আদেশ করিতেন, তাহা করিলেই ঐ যন্ত্রণার উপশম হইত। এই সকল জ্বালা-যন্ত্রণা, যখন আমার আরম্ভ হইল, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিমানের ভাবও আসিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—বুঝি আমার যোগসঙ্কটের অবস্থা হইয়াছে। যোগ-সঙ্কট অবস্থা সাধকদের যোগ আরম্ভের পরেরই একটা অবস্থা,—তবে আমি বুঝি যোগী হইলাম। এই প্রকার অভিমান ভিতরে ভিতরে চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ, শালগ্রাম পূজা দেখিয়া গুরুভ্রাতারা অনেকে মনে করিতেছেন, দিন দিন আমার অবনতি হইতেছে। তাঁহারা বলেন, তোমার রাগমার্গ ধরিবার অবস্থা আসিতে এখনও বহুকাল দেরী। বিধিমত শালগ্রাম পূজা করিতে করিতে রাগ জন্মিলে তখন আপনা আপনি এ সকল পূজা ছুটিয়া যাইবে। আমরা বিধিকার্য্য গতবারই শেষ করিয়া আসিয়াছি। তাই এবার আর বাহ্ পূজার ধার ধারি না। এ সকল কথা বলিয়া, কেহ কেহ আমাকে খুব নির্য্যাতন করিতেন। তাই, যখন শালগ্রাম পূজা করিতে করিতে আমার অশ্রুপাত হইত তখন সময়ে সময়ে মনে হইত,—আমার এই অশ্রুপাত ও ভাবের অবস্থা, শালগ্রামপূজাদ্বেষীরা একবার দেখিলে বুঝিত যে, শুধু শুষ্ক কাষ্ঠ

চিবাই না, তাতে রস পাই? ঐ সকল বিদ্বেষীরা নিকটে আসিলে, জোর করিয়া ভাব আনিয়া অধিক পরিমাণে অশ্রুপাত যাহাতে হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতাম। ভগবানের চক্ষু সর্ব্বত্র। তিনি আমার প্রতিষ্ঠার উপরে মুষলাঘাত করিলেন। এইরূপ চেষ্টায়, আমার কোন ভাবই বৃদ্ধি পাইত না; বরং যেটুকু ভাব পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিত, তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইত,—চিহ্নও থাকিত না। মুখমণ্ডলে গদগদভাবের আভা যাহা থাকিত, তাহাতে বিরক্তির ছায়া পড়িত। ঠাকুর আমাকে এই সময়ে একদিন বলিলেন—"প্রশংসার ভাবে তোমার ভিতরের রস শুকায়ে যাচ্ছে,—সতর্ক থেকো।" আমার বর্ত্তমান দুরবস্থার ইহাও একটি কারণ।

তৃতীয়তঃ, ঠাকুর শালগ্রাম পূজার প্রকৃত রহস্য বা গুরুপূজার তত্ত্ব গোপন রাখিয়া যথাবিধি পূজা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমি পারিলাম না। যখন নানাজনে নানা কথায় আমাকে জব্দ করিতে লাগিল এবং পূজার উপরে নানা কুৎসিত কথা বলিয়া আমাকে মর্ম্মান্তিক যাতনা দিতে লাগিল, তখন তাহাদিগকে জব্দ করিতে, পূজার রহস্য বলিতে লাগিলাম। একদিন একটি গুরুভাই বলিলেন, 'তুমি যে শালগ্রামে পূজা কর, আমি তাহার উপরে প্রস্রাব করি।' আমি বলিলাম—'তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি প্রস্রাব কর; আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি পূজা করি। কিন্তু আমার ঠাকুরকে চিনিতে না পারিয়া এসব কথা বলায়, তোমার অপরাধ হইতেছে। তুমি যাঁহার পূজা কর, যাঁহাকে গুরু বল, তাঁরই হুকুম মত এই শিলাতে তাঁরই পূজা করি।' আর একজনে বলিল, 'তুমি যাহা পূজা কর, তাহা আমরা একটি রাস্তার পদদলিত নুড়ি হইতে বেশী কিছুই মনে করি না। এসব পূজা, আমরা অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া জানি। নিতান্ত অজ্ঞের জন্যই এসব বহিরঙ্গ সাধন।' আমি বলিলাম,—'পাথরটিকে আমিও পাথর বিনা আর কিছুই মনে করি না, কিন্তু ঐ পাথরের অণু-পরমাণুতে ওতোপ্রত ভাবে যে চৈতন্যশক্তি—গুরুদেব পূর্ণ অবয়বে রহিয়াছেন, যাঁহাকে তুমি পূজা কর,—আমিও তাঁহারই পূজা করি। বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ বুঝিতে তোমার এখনও বহু দেরী। নাম সাধনও বহিরঙ্গ সাধন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একদিন গেণ্ডারিয়া আমতলায় বলিয়াছিলেন—"এমন অবস্থা আসে, যখন নামটিও ছু'টে যায়।" অন্তরঙ্গ একমাত্র ভগবান। সাধন-ভজনাদি ভগবানকে লাভের উপায়—সমস্তই বহিরঙ্গ। যাহার যাহাতে কল্যাণ হয়, গুরুদেব তাহাই তাহাকে করিতে আদেশ করেন। গুরুর আদেশে ইতর-বিশেষ নাই।

কোন কোন গুরুভাই বিরক্তির সহিত উত্তেজিত হইয়া বলেন, "গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাং, স যাতি নরকে ঘোরে সা পূজা বিফলা ভবেৎ।' আপনার এসব কুবুদ্ধি কেন? গুরুর নিকটে পাথর পূজা কেন? এতে আপনার অপরাধ হইতেছে। ইহা দেখাতেও আমরা অপরাধী হইতেছি। শেষ রাত্রিতে ঘণ্টা কাঁশরের ধ্বনিতে গোঁসাইয়ের উদ্বেগ করেন, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না। আপনি সাবধান হইবেন আমরা গুরু ছাড়া অন্য কিছু জানি না।' আমি বাধ্য

হইয়া বলিলাম—কাঁশর, ঘণ্টা ইচ্ছা করিয়া নাড়ি না, ঠাকুর আমাকে ঐরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। শালগ্রামকে আমি গুরু ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। শালগ্রামে আমি গুরুদেবেরই পূজা-আরতি করি।' ঠাকুর আমাকে পরিষ্কার বলিয়াছেন—"শেষ রাত্রে ৪টার সময় আরতি কর্‌তে হবে। যদি কখনও আমার অসুস্থাবস্থায় ঐ সময়ে শুয়ে পড়ি—আরতি বন্ধ রাখ্‌বে না। কাঁশর ঘণ্টার শব্দে আমার কোন উদ্বেগ হয় না।" ঠাকুরের এসব কথা শুনিয়াই আমি নিয়ম মত আরতি করিতেছি। আপনারা বিরক্ত হইলেও আমার প্রতি ঠাকুরের যাহা আদেশ, লঙ্ঘন করিতে পারি না।

এই প্রকার প্রত্যহই গুরুভ্রাতারা, নানাপ্রকার অপ্রীতিকর কটুবাক্যে আমার প্রতি বিরক্তি ও রোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহারা শুনিতেন যে শালগ্রামে আমি গুরুদেবেরই পূজা করি, লজ্জিতভাবে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতেন। এটি যে আমি মহা অপরাধ করিয়াছি, তখন বুঝিতে পারি নাই। ঠাকুর সর্ব্বদাই পূজার ভাব ও রহস্য গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন। এই প্রকার শালগ্রাম পূজা লইয়া, গুরুস্থানে বহু অপরাধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সকল অপরাধের আগুন একেবারে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সাধন-ভজন নিয়মিত চলিলেও, এই আগুনের জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইলাম না। গুরুভ্রাতাদের প্রায় সকলেরই তীব্র বিষদৃষ্টিতে আমার জ্বালা-যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। সাধন-ভজনের সময় আরো বাড়াইয়া লইলাম। কিন্তু কিছুতেই আর মানাইল না। যে আগুনে ধরিল, তাহা শিখা বিস্তার করিয়া আমাকে অহরহঃ দগ্ধ করিতে লাগিল। যতদিন আশা ছিল, ততদিন ধৈর্য্যও রহিল। যখন ভিতরের অবস্থা বুঝিয়া, একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম, ভিতরে বিষম হাহাকার উঠিল,—অসহ্য যাতনায় পীড়িত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ হইলাম। এই সময়ে ৫।৭ মিনিটের জন্য প্রাণে শান্তি আসিত না; সুতরাং, কোন প্রকারে নিত্যকর্ম্মগুলি সমাপন করা হইত মাত্র। ভিতরের আরাম নষ্ট হইয়া, যতই বিরক্তি ও জ্বালা জন্মিতে লাগিল, ততই নিত্যকর্ম্মও সংক্ষেপ হইতে লাগিল। আসনে বসিতে ইচ্ছা হইত না, নীরসপ্রাণে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়াও আরাম পাইতাম না, বরং বিরক্তি বোধ হইত। একদিন রাত্রি ৩টার সময় ঠাকুরকে বলিলাম—'ভিতরের যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করিতে পারি না। নাম, ধ্যান, সাধন-ভজন সমস্ত আমার ছুটিয়া গিয়াছে। দিনরাত আমি জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছি। এবার বোধ হয় নাস্তিক হইলাম। এখন কি করিব ?' ঠাকুর বলিলেন—"নাস্তিক হ'বে না, তবে এ সময়ে স্থানান্তরে যাওয়া ভাল। এখানে লোকের দৃষ্টিতে তোমাকে শুষ্ক ক'রে দিতেছে। যতই এখানে থাক্‌বে ততই এই শুষ্কতা বৃদ্ধি পাবে। লোকের দৃষ্টি বড় বিষম। জীয়ন্ত গাছ লোকের দৃষ্টিতে শুকায়ে যায়—দেখ নাই ?

আমি বলিলাম—'একথা আমি বুঝি না। সহস্র লোকের রুক্ষদৃষ্টিতে আমাকে শুষ্ক কর্‌বে

কিরূপে ? আমি যে আপনার দৃষ্টিতে সর্ব্বদা রহিয়াছি! গুরুভ্রাতারা আমাকে যে শালগ্রাম পূজার জন্য নানাপ্রকার বলিত—এখন আর তেমন বলে না। তাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ইষ্টদেবের পূজা শালগ্রামে করি শুনিয়া তাহারা এখন নির্ব্বাক হইয়াছে; কিন্তু পূজায় আমার পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি আসিতেছে না। নামে বিষম শুষ্কতা। ধ্যানও ছুটিয়া গিয়াছে!

ঠাকুর—"শালগ্রামে চতুর্ভুর্জ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান ক'রো। শালগ্রামের ধ্যান শাস্ত্রে যেমন আছে, তুমি তেমন কর না ?"

আমি—"না, আমি তো অন্য কিছুরই ধ্যান করি না। নিজের ইষ্টদেবেরই ধ্যান করি। অন্য কিছুতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না।"

ঠাকুর—"তবে তুমি মানুষের পূজা কর ? শালগ্রামে মানুষের পূজা অপরাধ। শালগ্রামে চতুর্ভুর্জ বিষ্ণুর ধ্যান যথাশাস্ত্র কর্‌তে হয়। তোমাকে পূর্ব্বেই স্থানান্তরে যেতে বলেছিলাম তখন সে কথা গ্রাহ্য কর্‌লে না। এখন এখানে যতই বেশী কাল থাক্‌বে ততই ক্ষতি হবে। কাল থেকে যথাশাস্ত্র শালগ্রামের পূজা ও ধ্যান ক'রো।"

পূজার ভেদ প্রকাশে গুরুতর শাসন ঃ শালগ্রাম ত্যাগ।

ঠাকুরের কথায় আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। ভাবিলাম—এ কি হইল ? ঠাকুর যে পলকে যুগ-প্রলয় করিলেন! কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, যেখানে-সেখানে শালগ্রামে গুরুদেবের পূজা করি বলাতে ঠাকুর ঐ পূজা ছাড়াইয়া দিলেন। হায়! আমি ঠাকুর পূজার বিশেষ অধিকার পাইয়াছিলাম। লোকের নিন্দা হইতে নিজেকে বাঁচাইতে, ঠাকুরের উপর সাধারণের অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি আনিতেছিলাম এবং ঐ প্রকার ভেদ প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যতে বিষম অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিলাম। তাই, ঠাকুর সহজে চারদিক্ রক্ষা করিলেন! আমি কিন্তু মারা পড়িলাম, ইহা পরিষ্কার বোধ হইতেছে। ঠাকুর আজ আমাকে খুব তেজের সহিত অন্যত্র যাইতে বলিলেন। আমি ঠাকুরের কথা শুনিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম এবং কল্যই এখান হইতে চলিয়া যাইব স্থির করিলাম। হায়! যদি দু'চার দিন পূর্ব্বে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতাম, তবে আর এসব সঙ্কটে পড়িয়া, ধাক্কা খাইয়া, মরিতে হইত না।

যে রাত্রিতে ঠাকুর আমাকে এই প্রকার শাসন করিলেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে কোন প্রকারে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইলাম; এবং শ্রীযুক্ত রাখালবাবুকে আমার অভিপ্রায়

জানাইলাম। তিনি আমার অগোচরে ঠাকুরকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারী বড় ক্লেশ পাইতেছে। বোধ হয়, সে আর এখানে থাকিবে না। আপনি যদি বলেন তাহা হইলে উহাকে আমি নির্জ্জনে থাকার বন্দোবস্ত তেতালায় করিয়া দিতে পারি—আপনি কি বলেন ?'

ঠাকুর কহিলেন—"উহার নির্জ্জনে থাকাই ভাল। মানুষের চক্ষু ভাল নয়। ছেলেটিকে দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে এমন শুষ্ক ক'রে দিয়েছে যে এই অবস্থা কিছুদিন থাক্‌লে অনায়াসে আত্মহত্যা ক'রে ফেল্‌বে। সর্ব্বদা একজনের উপরে ওরূপ বহুলোকের তীব্র দৃষ্টি পড়্‌লে সাধ্য কি যে সে ঠিক থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে বৃক্ষলতাকে পর্য্যন্ত শুকায়ে ফেলে এমনই ভয়ানক। মানুষ আর কি ? আমি এজন্য পূর্ব্ব হ'তেই উহাকে স্থানান্তরে যেতে বলেছিলাম। ছেলেমানুষ তখন বুঝে নাই—এখন ভয়ানক বিপদে পড়েছে। তেতালায় উহার ইচ্ছা হ'লে থাক্‌তে পারে—আমার আপত্তি নাই।"

ঠাকুর যখন এ সকল কথা, রাখালবাবুকে বলিতেছিলেন তখন আমি বারান্দায় থাকিয়া সমস্ত শুনিলাম। শালগ্রাম পূজা করিতে হইলে উহাতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে—ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া অবধি, আমার প্রাণে যেন 'হু হু' করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সজন-নির্জ্জনে আমার কি হইবে ? ঠাকুরের নিকটে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ধ্যান, আমি করিতে পারিব না। যদিও মনুষ্য—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, স্থাবর-জঙ্গম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ, ষড়ভুজ সমস্তই আমার ভগবান গুরুদেবের একমাত্র চৈতন্যময় শক্তির আলোড়নে বিচিত্রভাবে তাঁহারই স্থূলত্বে বিকাশ,—আকার বিভিন্ন হইলেও মূলে সকলেই এক,—তথাপি ঠাকুরের যে রূপের সহিত, আমার চিত্তের আরাম, আনন্দ ও শান্তির বিশেষ সম্বন্ধ তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যটি ধরা দারুণ ক্লেশকর। নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্য মনে করিলাম, যে কোন বস্তুর পূজাতে মূলে একমাত্র ভগবান গুরুদেবেরই উপাসনা হয়,—এইজন্যই বুঝি, ঠাকুর আমাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলায়, ঠাকুরের উপাসনা হইতে যে আমাকে ছাড়াইয়া দিলেন, তাহা মনে হয় না। কোনও শাস্তি যে দিলেন—তাহাও মনে করি না। কিন্তু, কি করিব !—উহা যে আমার সাধ্যাতীত ও রুচিবিরুদ্ধ।

বেলা ১১টার সময় আর আর দিনের মত ঠাকুর স্নানে যাওয়ার পর, আমি আমার আসন তুলিয়া, জিনিস-পত্র লইয়া ঝামাপুকুর ভাগিনেয়দের বাসায় গেলাম। সুকিয়া ষ্ট্রীট ত্যাগ করিয়া আসার সময়ে পূজনীয় রাখালবাবু আমাকে তাঁহার তেতালায় নিয়া রাখিতে খুব চেষ্টা-যত্ন করিলেন ; কিন্তু ঐ বাড়ীটি আমার নিকট আগুনের মত বোধ হইতে লাগিল। ঠাকুরের উপর অত্যন্ত অভিমান জন্মিল। সুতরাং কারো কোন কথা না শুনিয়া একেবারে ঝামাপুকুরে পঁহুছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মেছুয়া-

বাজার ষ্ট্রীটে, অভয়বাবুর বাসায় গেলাম। তথায় মহেন্দ্রবাবুকে দেখিলাম। তিনি আমাকে গোঁসাইয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া আসার হেতু কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি মহেন্দ্রবাবুকে, সুযোগ পাইয়া সমস্ত কথা বলিলাম। শাস্ত্রীয় প্রণালীমত, ঠাকুর শালগ্রামে বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলিয়াছেন,—তাহা আমি পারিব না। তাই শালগ্রাম কাহাকেও দিয়া দিব স্থির করিয়া আসিয়াছি। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন,—তোমার শালগ্রাম পূজা সম্বন্ধে গোঁসাইকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"যেভাবে পূজা কর্‌ছে ওরূপ নির্ব্বিঘ্নে ক'রে যেতে পার্‌লে বিশেষ উপকার হ'বে"—ঐ পূজা তুমি ছাড়িবে কেন?"

আমি—'শালগ্রামে, মানুষের পূজা করা না কি অপরাধ? কিন্তু আমি তো মানুষের পূজা করি না। আমার তো মনে হয় আমি শাস্ত্রসম্মত পূজাই করিতেছি। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরঃ। গুরুদেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'—ইহা তো শিববাক্য,—মিথ্যা হইবে কিরূপে? চতুর্ভুজ বিষ্ণুই হউন, আর দ্বিভুজ মুরলীধরই হউন, সকলেইতো গুরুর অঙ্গীভূত বা তাঁর সহিত অভিন্ন। একমাত্র গুরুর পূজাতেই তো তেত্রিশ কোটী দেবতা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সাক্ষাৎ ভগবানের পূজা হয়। সুতরাং শালগ্রামে গুরুর পূজাতে, বিষ্ণু বাদ পড়িলেন, কিরূপে? অশাস্ত্রীয়ই বা হইল কিরূপে?' ঠাকুর বলিলেন—"শালগ্রামে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ধ্যান পূজা কর।—না হ'লে শালগ্রাম পূজা ছেড়ে দেও।" আমি এখন উহা ছাড়িতে পারিতেছি না, রাখিতেও পারিতেছি না,—বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। মহেন্দ্রবাবু আমার সমস্ত কথা ঠাকুরকে বলিবার জন্য সুকিয়া ষ্ট্রীটে রওনা হইলেন। আমি অভয়বাবুর বাসায়ই ভিক্ষা করিয়া যথাসময়ে রান্না ও আহার করিয়া ঝামাপুকুর আসিলাম।

পরদিন সকাল বেলা, নিত্যক্রিয়া কোনমতে সম্পন্ন করিলাম। বেলা ৯টা হইতে না হইতেই, ঠাকুরের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিলাম, ঠাকুরের নিকট আর যাইব না, কিন্তু তাহা পারিলাম না। ৯টার সময়েই সুকিয়া ষ্ট্রীটে, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সকলেই আমার জন্য অত্যন্ত আক্ষেপ করিতেছিল। ঠাকুরও আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া, গুরুভ্রাতাদের নিকট আমার প্রতি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি ওখানে পঁহুছিবামাত্র, ঠাকুর একমুখ হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আসন কোথায় নিয়েছ?" আমি বলিলাম—'ঝামাপুকুরে'। ঠাকুর আমাকে কি যেন বলিতেছিলেন, কিন্তু আমি অভিমানে ফুলিয়া ঠাকুরের দিকে একবার তাকাইলামও না। ঠাকুরও চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শৌচাদিতে গেলেন। ঐ সময়ে আমার নিকট অনেক গুরুভ্রাতা আসিয়া আমার ক্লেশে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অদ্যই আমি শালগ্রামের একদিক করিব শুনিয়া, তাঁহারা কেহ কেহ খুব আগ্রহের সহিত চক্রটি চাহিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। কারণ তাঁহারাই শালগ্রামের প্রধান বিরোধী ছিলেন।

আহারান্তে ঠাকুর আসনে আসিলেন। তখন ঘর নির্জ্জন হইল। সকলেই আহার করিতে গেলেন। আমিও ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলাম—'কয়েকটি কথা আমি বলিতে চাই।'

ঠাকুর কহিলেন—হাঁ, খুব বল। আমি বলিতে লাগিলাম—'শালগ্রাম পূজা আমি নিজ ইচ্ছায় ধরি নাই। আপনি গেণ্ডারিয়াতে ন্যাসের যখন ব্যবস্থা করেন, তখনই'—এইমাত্র বলার পরেই ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা জানি। তারপর মোট কথা কি বল।" আমি বলিলাম—'দেবদেবী আমি কিছু বুঝি না। এতদিন যেভাবে শালগ্রাম পূজা করিয়া আসিয়াছি সেরূপ পূজা করিতে যদি নিষেধ করেন, তবে উহা আমি পূজা করিতে চাই না। শালগ্রামটিকে যাহা করিতে বলেন—করিব।'

ঠাকুর বলিলেন—"তবে তুমি শালগ্রাম পূজা ছেড়ে দেও। পূর্ব্বে যাহা কর্‌তে তাহাই কর। শালগ্রামটি কারোকে দিয়ে ফেল। যাকে দিলে শালগ্রামের সেবা-পূজা হবে তাকেই দেও। আমাদের এই পথে এক নামেই সব হয়। শালগ্রাম পূজার যাহা প্রয়োজন তাহা তোমার হ'য়েছে। এখন উহা না কর্‌লে কোন ক্ষতিই নাই। পূজা কর্‌তে যদি ইচ্ছা হয় শাস্ত্রমত ক'রো।"

সন্ধ্যা, গায়ত্রী, হোমাদির আবশ্যকতার উপদেশ।

আমি—'তবে শালগ্রাম পূজা ছাড়িয়া দেই? আর অন্যান্য বিষয়েও সাধারণ হইতে কিছু বিশেষত্ব রাখিতে চাই না। আর দশজনকে যেমন রাখিয়াছেন, আমাকে সেই ভাবে রাখুন। সন্ধ্যা, পূজা ইত্যাদি কিছুরই আমার ইচ্ছা নাই। দশজনার মত মাত্র নাম করিব, আর আপনার নিকটে পড়িয়া থাকিব।'

ঠাকুর বলিলেন—"ভাল, দশজনার মতই চল। তবে গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যাটি ছেড়ো না। সন্ধ্যা করায় কেহ তোমাকে ধাক্কা দিবে না। সহস্র লোকের মধ্যেও অনায়াসে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে যেখানে-সেখানে শুধু মন্ত্র প'ড়ে সন্ধ্যা কর্‌তে পার্‌বে। ইহাতে কারো মনে বাজ্‌বে না। সন্ধ্যা তর্পণ ও গায়ত্রী-জপ ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম। এসব ঠিকমত ক'রো; বিশেষ উপকার পাবে।"

ঠাকুর আবার বলিলেন—"একদিন পরমহংসজীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—নানাপ্রকার যথেচ্ছাচারে আমি এতকাল চলেছি, সমস্তই তো উড়ায়ে দিয়েছিলাম, তবে এমন কি করেছিলাম সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হ'ল? পরমহংসজী বল্‌লেন—এক

গায়ত্রী তুমি ত্যাগ কর নাই, তাতেই এই শক্তি লাভ কর্‌লে। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেও আমি একদিনের জন্যও গায়ত্রী-জপ ছাড়ি নাই।"

আমি—আচ্ছা, সন্ধ্যা, তর্পণ, গায়ত্রী-জপ করিতে বলিতেছেন, করিব। হোমটি না করিয়া পারি কি না? হোম কর্‌তে নট্‌খট্‌ অনেক?

ঠাকুর বলিলেন—"হোমটিও ক'রো। ওটি তোমার পক্ষে আবশ্যক। বেশী কিছু না ক'রে, একখানা কাঠ জ্বালায়ে একটু ঘৃত দিয়ে কয়েকবার আহুতি দিতে মুস্কিল কি? হোম ছেড়ো না।"

আমি—ভিক্ষা করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়, আর উদ্বেগও হয়। আহারের নিয়মও ঠিক থাকে না। ভিক্ষা না করিয়া পারি কি না?

ঠাকুর—"ভিক্ষার প্রয়োজন কি? যখন যেখানে থাক্‌বে তখন সেখানে আহারাদি কর্‌বে। ভিক্ষায় দরকার নাই।"

আমি—আহার অন্যান্যের সঙ্গে করিতে পারি কি না?

ঠাকুর—"আহারটি স্বপাকেই ক'রো ইহাতে সুস্থ থাক্‌বে আরো অনেক উপকার পাবে। অন্যের রান্না খেও না। আহারের পরিমাণ ও সময় ঠিক রেখে স্বহস্তে রান্না করে খেও। ভিক্ষা নাই কর্‌লে।"

আমি বলিলাম—শালগ্রাম-পূজা যখন করিব না, তখন আপনার সঙ্গে থাকিতে পারিব কি না?

ঠাকুর—"তা পার্‌বে না কেন? শালগ্রাম পূজা নিয়া সঙ্গে থাকা অসম্ভব। গেণ্ডারিয়া হ'লে পারতে। এসব স্থানে নানাভাবের লোক। তাই তাদের দৃষ্টিতে নিজেকে রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার্‌বে না।" এসব কথা বলিয়া ঠাকুর আমাকে পুনরায় ওখানে আসন আনিতে বলিলেন। ঠাকুরের কথামত অমনি আমি ঝামাপুকুরে উপস্থিত হইয়া, ঝোলাঝুলি জিনিসপত্রসহ আসন লইয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে পঁহুছিলাম। সুকিয়া ষ্ট্রীটে পঁহুছিবার পূর্ব্বে ভাইপো শ্রীসজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে শালগ্রাম পূজার বাধা-বিঘ্নের সমস্ত বিবরণ জানাইয়া, শালগ্রামটি তাহাকে দিয়া আসিলাম। সজনী, উহা পূজা করিবে বলিয়া খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল। আমি গত কল্য সুকিয়া ষ্ট্রীট ত্যাগ করামাত্রই জনৈক গুরুভ্রাতা, আমার স্থানে আসন পাতিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্রই ঠাকুর বলিলেন—"ঐ আসন তুলে রাখ,—তুমি ওখানে আসন কর।"

শালগ্রাম পূজায় ইষ্টানিষ্ট বিচার।

আমি ঠাকুরের কথামত তাহাই করিলাম। আমার অবশিষ্ট নিত্যকর্ম্মও ঠাকুরের পূজা শালগ্রামে যেমন করিতাম, এখনও সেইপ্রকারই মনে মনে করিতে লাগিলাম। শিলাচক্রটি এতকাল সম্মুখে ছিল, এখন তাহারই অভাব হইল মাত্র। এই অভাবে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। শিলাচক্র থাকাতে সর্ব্বদা শিলাতেই দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইত; কখন কখন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতাম। এখন উহা না থাকাতে সর্ব্বদা ঠাকুরের উপর দৃষ্টি রাখিবার সুযোগ হইল। শালগ্রাম পূজা ছাড়াইয়া ঠাকুর আমার কল্যাণই করিলেন। শালগ্রাম-পূজা ছাড়াইয়া দিয়া ঠাকুর আমার কি কি কল্যাণ করিলেন, এবং উহা ধরিয়া থাকিলে কি কি অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল, তাহা মনে আসিতে লাগিল—শালগ্রাম পূজার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে একটা অভিমান জন্মিয়াছিল। আমি ভাবিতেছিলাম—ঠাকুর তো দীক্ষা বহুলোককে দিয়াছেন। অবস্থাও তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আমা অপেক্ষা উত্তম সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও শালগ্রামে স্বয়ং ঠাকুরের পূজা করিতে অধিকার দেন নাই। আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা না থাকিলে, এই প্রকার পূজার ব্যবস্থা, আমার উপরেই বা হইল কেন? দু'দিন পরে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর মত যে ঠাকুর আমার ঘরে ঘরে পূজিত হইবেন, ঠাকুর বর্ত্তমানে, আমি তাঁকে শালগ্রামে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক সময়ে যেমন গোপালভট্ট গোস্বামী শালগ্রাম পূজা করিয়া ইচ্ছামত শালগ্রাম হইতে বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঠাকুর বর্ত্তমান থাকিতে আমিও সেইপ্রকার, এই শালগ্রামে ঠাকুরের আকৃতি ফুটাইয়া তুলিব। শালগ্রামে এই অল্পকাল, ঠাকুরের ধ্যান-ধারণার ফলে পরিণামের সূত্র যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইত না, মনে হয়। গুরুদেবের দয়ায়, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ শালগ্রামের কলেবরে আমার ঠাকুরের তাম্রবর্ণ আভা বিকাশিত হইয়াছে, দেখিয়াছি। ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইয়া নিশ্চয়ই ঠাকুরের আকারে পরিণত হইত। ভাবিলে বড় দুঃখ হয় যে, আমা দ্বারা তাহা আর হইল না। শালগ্রাম পূজা করিতে গিয়া, কতকগুলি কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুরকে দু'তিনবার যাহা ভোগ দেই, তাহা প্রসাদ পাইতে পাইতে আমার আহারের পরিমাণ ছুটিয়া গিয়াছে। ঠাকুর আমাকে যে সকল দ্রব্য পান ও ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত ঠাকুরেরই সাক্ষাতে প্রসাদ বলিয়া পাইতেছি। এই প্রকার আহারের অনিয়মে আমার শরীর খারাপ হইয়াছে। মনটিও শরীরের গুণে বাধ্য হইয়া বিক্ষিপ্ত, উত্তেজিত ও আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তারপরে ঠাকুর-পূজা করিতে গিয়া বহু রাজসিক ভাব আনিতে বাধ্য হইয়াছি। ঠাকুরকে খুব সাজাইব, খুব ধূমধাম করিয়া পূজা-আরতি করিব, সকলে যাহাতে এই ঠাকুরকে ভক্তি করে এমন সব বাহ্য আড়ম্বর করিব,—ভাবিয়া রজোগুণে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলাম। নানাপ্রকার রাজসিক ভাব, যাহা আমার মনে পূর্ব্বে কখনও উদয় হয় নাই,—শালগ্রাম পূজার দরুণ

তাহা আসিয়া দিন দিন অন্তরে আবদ্ধ হইতেছিল, শালগ্রাম আমায় পূজা করিতে হইলে, কতকগুলি রাজসিক কাণ্ডে যে জড়িত হইয়া পড়িতাম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঠাকুর শালগ্রামের জন্য আমাদ্বারা কয়দিনের মধ্যেই কাঁশর, ঘণ্টা, চামরাদি পূজার সরঞ্জাম খরিদ করাইয়া আনিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন, তাঁবুর মত একটি ছোট খাট আবরণ হইলে ভাল হয়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন আমার ভয়ও হইতেছিল। ঠাকুরের মুখে ঠাকুর পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা শুনিয়া, আপত্তি করিতে পারিতাম না। কিন্তু ভয় হইতেছিল পাছে পরিণামে পূজার উপকরণ হেতু বিষম বিপাকে পড়িতে হয়। গুরুদেব বাহ্যপূজা বন্ধ করিয়া এ সকল আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিলেন। জয় গুরুদেব! তোমারই জয়!

কলিতে ধার্ম্মিকের দুঃখ, অধার্ম্মিকের সুখ ঃ দুর্ভিক্ষাদি অনর্থের হেতু ঃ কলিতে ব্রহ্মনাম।

১২ই কার্ত্তিক।

আজ সকালে বহুলোক ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পাঠের পর ঠাকুরকে তাঁহারা বলিলেন—'যাহারা সাধন-ভজন করে, ভগবানের নাম লয়, সত্যপথে চলে, ধার্ম্মিক ও সদাশয়, সংসারে তাঁহাদেরই যত কষ্ট। যাহারা জাল, জুয়াচুরি করে, অন্যের সর্ব্বনাশ করে, ক্রূরপ্রকৃতি, ধর্ম্মের নামগন্ধও জানে না, তাহারা তো বেশ সুখেই আছে দেখিতেছি। ইহার কারণ কি?

ঠাকুর লিখিলেন—"এখন রাজা কলি। ধর্ম্ম কর্‌লে পুরস্কার নাই। রাজাকে যদি তুমি অমান্য কর, সাজা পাইবে। যদি অধর্ম্ম কর, তাঁর আজ্ঞা পালন করা হইবে। তুমি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের আনুগত্য করিতেছ, তবে কলিকে আশ্রয় করিলে কই? যে কলির মতে চলিবে, তার পুরস্কার। কলি রাজা;—এখন সত্যপথে চলিলে মানাবে কেন? যে দিনকে রাত ও রাতকে দিন করিতে পারে, এ যুগে তারই পক্ষে লাভ। এমন কতই দেখা যাইতেছে। তাই বলিয়া কি ভগবানের রাজ্য উঠিয়া গিয়াছে? মহাভারতের একটি আখ্যায়িকায় আছে যে, কলির রাজত্ব আরম্ভ হইলে ধার্ম্মিকগণ ক্লেশ পাইতে লাগিলেন; অধার্ম্মিক সুখে আছেন। কলিকে যে মান্য করিবে—সে সুখে থাকিবে; কিন্তু সময় সময় যখন কলির প্রজাগণ অত্যন্ত পাপাচরণ করিবে—তখন ভগবান প্রথমে সাবধান করিয়া দিবেন। তাহাতে ক্ষান্ত না হইলে নানাপ্রকার শাস্তি,—দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি আনাইবেন; তাহাতেও যদি নিবৃত্তি না হয়, তবে দুষ্টদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য

অবতীর্ণ হইবেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প হইয়া কলির প্রজাগণ নষ্ট হইবে। যাহারা ইংরাজী পড়ে, তাহারা এসব শুনিয়া হাসিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অধ্যাপক—তাঁহারাও কলির পক্ষ হইয়া শাস্ত্রবাক্যে উপহাস করিবে।"

একটু থামিয়া ঠাকুর লিখিলেন—"এদেশে পূর্ব্বে বড় কখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই। দুর্ভিক্ষের চেহারা ঠিক পিশাচের মত,—দেখিলে মনে হয় যেন ভূত, প্রেত, পিশাচে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতে আছে,—'একবার দুর্ভিক্ষ হয়, ঋষিগণ জলের সেওলা খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া চণ্ডালের পচা মাংস চুরি করিয়া খাইতে বসিয়া নিবেদন করিবেন, তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া, নিষেধ করিলেন এবং বারি বর্ষণ করিলেন। তখন মাংসাহার প্রচলিত ছিল। গোধূম, ধান্য এবং ফলমূলও অনেক প্রকার খাদ্য ছিল। এক প্রকার খাদ্য অভ্যস্ত হইলেই, শীঘ্র শীঘ্র দুর্ভিক্ষ হয়। তাহা কলিতে হইবে। কারণ মনুষ্যের পাপে অন্যান্য খাদ্য হ্রাস হইবে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও কমিবে, গাভীর দুগ্ধ হ্রাস হইবে। এজন্য পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষ হইবে; তাহাতে কাতর হইয়া যদি ভগবানকে ডাকে তবেই মঙ্গল।"

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষের হেতু কি?

উত্তর—"এখন সহজে দুর্ভিক্ষ হয়। কারণ পূর্ব্বের ন্যায় দ্রব্যের বিনিময় হয় না। পূর্ব্বে ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন তাহা নাই। অধিকাংশ লোক কোন শিল্পকার্য্য না করিয়া চাকুরী করিতেছে। কলিকাতার দিকে অনেক কল-কারখানা হওয়াতে, কেহ কৃষি প্রভৃতি কার্য্য না করিয়া টাকা দিয়া চাউল ক্রয় করে। রেলওয়ে, কয়লার খনি প্রভৃতি অনেক স্থলে টাকা উপার্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বকার কৃষকেরা কৃষিকার্য্য ভুলিতেছে। মনে করে, টাকা দিয়া চাউল ক্রয় করিব। কেবল বর্দ্ধমান, বীরভুম, নোয়াখালি, বরিশাল, রংপুর, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এইরূপ কতকগুলি স্থানে কৃষিকার্য্য হইতেছে। তাহা সমস্ত বঙ্গদেশ ভাগ করিয়া লইতেছে। সুতরাং চাউলের মূল্য কিরূপে কমিবে? ইহার উপর আবার বিলাতে চাউল যায়।"

প্রশ্ন—কলির জীবের উদ্ধারের জন্য কি প্রকার দীক্ষামন্ত্রের ব্যবস্থা আছে?

ঠাকুর—"কলিতে ব্রহ্মনামের দীক্ষা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন কলিজীবের গতি

নাই ;—ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ মত দীক্ষিত হইতে হইলে হৃদয় প্রস্তুত কিনা দেখিতে হইবে। এইজন্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্র যাঁহাদের দেববাক্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, কেবল তাঁহারাই সেই উপদেশের অনুসরণ করিতে পারিবেন।"

'ভূমৈব সুখম্' ঃ সত্যই আদর্শ।

একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'সংসারে সুখ কিসে পাওয়া যায়?'

ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' ভূমা, অর্থাৎ—যাহার জন্ম-মৃত্যু নাই,—তাহাতেই সুখ। অন্ত-বিশিষ্ট বস্তুতে সুখ নাই। যাহার অন্ত আছে, একদিন তাহা থাকিবে না; সুতরাং তাহাতে আসক্ত হইলে, নিশ্চয়ই দুঃখ পাইবে। ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র সত্য-নিষ্ঠার আদর্শ। পিতৃ-সত্য পালন জন্য ১৪ বৎসর বনে বাস করিলেন। রাজধর্ম্ম প্রজারঞ্জন জন্য সীতাত্যাগ করিলেন। সত্যরক্ষার জন্য লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিলেন। একি মনুষ্যের সাধ্য? সীতাতে সম্পূর্ণ অনুরাগ; তখনকার রাজারা হাজার হাজার বিবাহ করিতেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এক-পত্নীক, যজ্ঞস্থানে স্বর্ণ-সীতা! সীতা যে সতী, তাহাতে রামের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সমস্ত দেবতা তাহার সাক্ষী দিয়াছিলেন। এই সত্য যখন জাতীয় ধর্ম্ম হয় তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করে।

চিত্রে চন্দন প্রদান ঃ অদ্ভুত রহস্য।

প্রত্যুষে শৌচান্তে ঠাকুর যখন আসনে আসিয়া বসিলেন, গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ উৎকৃষ্ট ফুল, তুলসী, চন্দনাদি আনিয়া ঠাকুরের নিকট ধরিলেন। ঠাকুর সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া নিত্যপাঠ্য গ্রন্থাদির উপরে ছড়াইয়া দিলেন। পরে চন্দনের বাটিতে অঙ্গুলি ডুবাইয়া ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, হরগৌরী, কালীদুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর ছবিতে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম—রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত ছবির চরণেই ঐ চন্দন গিয়া পড়িয়াছে। ১৫।২০ ফুট অন্তরে ৮।৯ ফুট উর্দ্ধে ঐ সকল ছবি রহিয়াছে। ঠাকুর আসনে বসিয়া তাঁহাদের চরণোদ্দেশে চন্দন ছিটান মাত্র এতদূরে কি প্রকারে তাঁহাদের ঠিক চরণেই গিয়া তাহা পড়িল, বুঝিলাম না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লক্ষ্মণের

১০ই কার্ত্তিক।

গায়ে বা পায়ে এক ফোঁটাও চন্দনও পড়ে নাই। ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন,—"লক্ষ্মণের গায়ে পায়ে চন্দন পড়্‌বে কেন? লক্ষ্মণ যে ব্রহ্মচারী।" এই বিষয়টি ভাবিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম।

ঠাকুরের উপদেশ ঃ জীবনের কথা—
সংসারে কেহ সুখী নয়।

কথায় কথায় ঠাকুর লিখিলেন—"যাঁহারা সাধুর নিকট উপদেশ শুনেন,—কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য করেন না,—তাঁহারা চক্‌মকি পাথরের মত। চক্‌মকি পাথর জলের মধ্যে ফেলিয়া রাখ, অথবা প্রতিদিন সহস্র কলস জল তাহাতে ঢাল, তথাপি যখন ঠুকিবে, তখনই আগুন বাহির হইবে। যতদিন মনের কার্য্য থাকে, ততদিন স্ত্রী-পুরুষে, অথবা বিষয়-বিষয়ীতে আকর্ষণ থাকে। মন লয় হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে; কিন্তু কার্য্য স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আকর্ষণ থাকে না। এ সম্বন্ধে আমি শাস্ত্রের কথা বলি না। নিজে আমি অত্যন্ত কামুক, ক্রোধী ছিলাম। এই দুই রিপু আমার খুব প্রবল ছিল। ব্রাহ্মসমাজে কত চেষ্টা করিলাম,—গেল না; পরে সাধন লইয়াও অনেক কষ্ট পাইলাম। সেবার যখন সমস্ত রাত্রি জাগিতে লাগিলাম, কেন জাগি তাহা জানি না, শুইতে ইচ্ছা হয় না,—একদিন বৃন্দাবনে ভোরে শুইয়া আছি,—আমার সমস্ত শরীরে ছারপোকা ধরিয়াছে,—হাজার হাজার ছারপোকা! মনে হইল, একি? আমার বোধ নাই কেন? তারপর হইতে দেখি কাম ক্রোধ বোধ নাই। বেড়া একটি,—একপাশে আমি অপর পাশে শ্রীধর। শ্রীধরের দিকে একটি ছারপোকাও নাই। ঐ সময়ে শরীরের সমস্ত পরমাণু পরিবর্ত্তন হইতেছিল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, উর্দ্ধরেতা হইলে বড় লাভ। চেষ্টা করিতে গিয়া যখন তাহার কার্য্য আরম্ভ হইল, তখন দেখি মহাকষ্ট। কারণ মেরুদণ্ডের অস্থি যেন করাত্‌ দিয়া কাটিতে থাকে—যতদিন পথ প্রস্তুত না হয়।

মায়া—বাস্তবিক মায়া কি? যদি বল, সংসারে পরম সুখে আছি, ইহা ছাড়িয়া কোথায় যাইব? সংসারে কে তোমাকে ভালবাসে?—একটু বিচার করিয়া দেখ! অধিকাংশ স্থানে ভয়ানক প্রতারণা! কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে কৃত্রিম প্রণয় দেখাইয়া অন্যকে ভালবাসিতেছে; কোন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা করিয়া

অন্য স্ত্রীতে আসক্ত। কোন স্থানে পুত্র পিতাকে বধ করিয়া বিষয় লইতেছে, কোন স্থানে পিতা পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সুখী হইতেছে। তবে সংসারে মধ্যবিত্ত লোকদিগের ভিতর কৃষকদিগের মধ্যে কিছু কিছু ভালবাসা ও ভক্তি দেখা যায়। যেখানে অর্থের সম্বন্ধ সেখানে যথার্থ ভালবাসা দুর্লভ। বস্তুতঃ ধনীদিগের ন্যায়, যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল! সকলেই টাকার জন্য ভালবাসিতেছে, হাসিতেছে, মুখপানে চাহিয়া আছে;—রোগে শুশ্রূষা অর্থের জন্য!—এইরূপ সংসারে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে সংসারে যথার্থ সুখী কে, ইহা বাহির করা সুকঠিন। তবে সে-ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই,—এরূপ লোক যদি সংসারে থাকে তাহারাই সুখী। ইহাদের সংসার, সংসার নহে—স্বর্গ। আর সকলই অসার! অসার! অসার! এক হরিনাম ভিন্ন সহজ সুখের বস্তু আর কিছুই নাই। যথার্থ ভালবাসা হইলে মায়া হয়। সে ভালবাসা কোথায়? বরং বিচার করিয়া সংসার দেখিলে, অসারই বোধ হইবে। প্রকৃত মায়া হরিনামে, সংসারে কোন্ সুখের জন্য মায়া হইবে?”

গুরুপরিবারের দীক্ষার কথা!

১৮ই কার্ত্তিক। আজ অপরাহ্নে রান্না করিতে করিতে দিদিমাকে তাঁহার ও মা-ঠাকুরুণের দীক্ষা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। দিদিমা বলিলেন—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে প্রচারক নিবাসে থাকার সময়ে একদিন মাঠাকুরুণ ঠাকুরকে বলিলেন—“মেয়েরাও তো সাধন নিচ্ছে—আমি কি পেতে পারি না?”

ঠাকুর—“পাবে না কেন? চাইলেই পাও!”

দিদিমা—গুরু কর্‌লে তাঁকে তো নমস্কার করতে হয়? প্রসাদ পাইতে হয়?

ঠাকুর—“তা কেন? পঞ্চ রসের একটি ফুটে উঠ্‌লে আর সকল ভাবেরও স্বাদ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবও তো এরূপ দিয়াছিলেন।” সাধন মাঘোৎসবের পরে কোন সময়ে হয়। উপদেশ দেন—“মাংস উচ্ছিষ্ট মাদক খাইতে নিষেধ। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যে নামে সিদ্ধিলাভ ক’রেছিলেন তাই আপনারা গ্রহণ করুন। সদাসর্ব্বদা নাম কর্‌বেন।” মাঠাকুরুণ নাম শ্রবণ মাত্র—দর্শনলাভ করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। প্রাণায়াম দেখিবারও অবসর হইল না। সন্ধ্যার সময় প্রাণায়াম দেখাইতে ঠাকুর মাঠাকুরুণ ও দিদিমাকে উপরে লইয়া গিয়া বসিলেন তখন মাঠাকুরুণ ঠাকুরকে বলিলেন—“শান্তিপুরে সিড়িতে, আমি যাঁকে দে’খে ভয় পেয়েছিলাম, পাকাদাড়ি লালমুখ,—আজ তাঁকেই তো দেখ্‌লাম।”

ঠাকুর লিখিলেন—"তুমি ভাগ্যবতী। এই যে পাকাদাড়ি লালমুখ, তিনি অদ্বৈত প্রভু! সেই সময়েই তোমাকে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। আমি তো তখন ওসব বিশ্বাস কর্‌তাম না—পাষণ্ড ছিলাম।" কিছুদিন পরে শান্তি, কুতু, ফণী, সুরো প্রভৃতির দীক্ষা হয়। শুনিলাম, শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামীর দীক্ষা বর্দ্ধমানে রাজার নন্দনকাননের শিবমন্দিরে ফাল্গুন মাসে হইয়াছিল। ঠাকুর তথায় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবোপলক্ষে গিয়াছিলেন। দীক্ষাকালে যোগজীবনের অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছিল।

সত্য, মিথ্যা, পাপ-পুণ্য সকলের পক্ষে এক নয়।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—সত্য-মিথ্যা কি, পাপ-পুণ্য কি অনেক স্থলে বুঝিতে পারা যায় না।

ঠাকুর লিখিয়া দিলেন—"মিথ্যা—যাহার লক্ষ্য অসৎ। সত্য—যাহার লক্ষ্য সৎ। কর্ম্ম ছাড়িয়া অনেক সময় নাম করিতে পারা যায় না। নাম না করিয়া বসিয়া থাকিলে হয় পরনিন্দা, না হয় পরচিন্তা, কিম্বা বৃথা চিন্তা, অথবা বিবাদে দিন কাটিবে। শেষে তাস, পাশা, দাবা, পরনিন্দা হইতেই সময় যায়। সন্ন্যাসীদের আশ্রমে যাইয়া দেখিয়াছি—কোন স্থানে তাস, কোন স্থানে বিবাদ, কোন স্থানে গল্প, কোন স্থানে দু'একজন ধ্যানে মগ্ন, জপে মগ্ন। 'পাপ পাপ' কথা—শেখা কথা। পাপ বোধ হইয়াছে কি না?—একটু পাপ-চিন্তা হইলে অনুতাপে ছট্‌ফট্ করিতে হয়। এ কার্য্য পাপ, এ কার্য্য পুণ্য—ইহা সকলের পক্ষে এককথা নয়। যে কার্য্যে আমার ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়—তাহাই পাপ; যাহাতে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই পুণ্য। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া শুনিয়া এবং গ্রন্থাদি পড়িয়া,—ইহা পাপ, ইহা পুণ্য—এই সংস্কার হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পাপ কি, পুণ্য কি? নরহত্যা করিলে পাপ হয়। চট্টগ্রামে সেদিন একটি মেয়ে নরহত্যা করিল। সকলে বলে, 'খুব ক'রেছে, উত্তম কার্য্য হ'য়েছে।' এখানে নরহত্যা গণ্য হইতেছে না। চুরি পাপ,—কোন স্থানে পুণ্যও হয়। বাহিরের কার্য্য মানুষে দেখে। ভগবান অন্তরের উদ্দেশ্য দেখেন। চুরি লোকে পাপ বলিতেছে—কোন স্থানে ভগবানের চক্ষে চুরি পুণ্যও হইতেছে। যদি চুরি, ডাকাতি, লম্পটতা এ সকল মন্দ জানিয়াও করে, তবে তাহাকে লোকে নিন্দা করিবে। কারণ তাহা ভগবানের ব্যবস্থা। ঐ নিন্দাতে তাহার উপযুক্ত সময়ে আত্মদৃষ্টি আসিবে।"

স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ঃ শীতল-ষষ্ঠীর কথা ঃ স্বামীর অমর্য্যাদায় উৎকট রোগ।

আজ গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপাদি করিতে করিতে সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়া স্ত্রীলোকদের স্বামীর প্রতি দুর্ব্বিনীত ভাব সম্বন্ধে বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একটি গুরুভ্রাতা নিজের স্ত্রীর উৎকট রোগ কিসে আরোগ্য হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া একটি গল্প বলিলেন (শীতল ষষ্ঠীর গল্প)—"ব্রহ্মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সরস্বতী পলাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা খুঁজে খুঁজে এক মাঠে এলেন। সেখানে আমের বাগান, তাতে মুকুল হয়েছে। সম্মুখে যবের আবাদ—তাতে শিস্ ধরেছে। সেখানে ষষ্ঠীদেবী বসে আছেন। 'ও ষষ্ঠী! আমাদের তাকে দেখেছ?' 'কেন ঠাকুর, তিনি কি পালায়েছেন?' 'হাঁ গো, সে দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব।' 'বলি, দেখেছ?' 'তাকে দেখালে কি দিবেন?' 'তুমি আমাকে শীতল কর্‌বে, তোমাকে 'শীতলষষ্ঠী' ব'লে পূজা চালাবো।' 'ঐ দেখ ঠাকুর, আমগাছে। আগেই আমরা বলেছিলাম—'মেয়েমানুষকে লেখাপড়া শিখাইও না। এই শীতল-ষষ্ঠী। অল্প লেখাপড়া শিখে 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' হয়।"

পরে লিখিলেন—"পতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে, পতিকে সর্ব্বদা কটুবাক্য বলিলে নারীর যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ভোগ করিতে হয়;—ইহা শাস্ত্রকর্ত্তারা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। এ রোগের একমাত্র ঔষধ পতির পদানত হওয়া এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া। পতি দেবতা, পতি অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যতায় পতিত হইলেও নারীর পূজনীয়। পতিও নারীকে ভগবৎ শক্তি জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিবেন। এজন্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগে প্রায়শ্চিত্ত কারয়া থাকেন। কিন্তু এখনকার কবিরাজেরা তাহা জানেন না। সুশ্রুত, চরক, বাগভট্টে ব্যবস্থা আছে।

স্ত্রী-পুরুষের ভগবৎ লক্ষ্য হইলে, তাঁহারা সতী ও সৎ। যথার্থ সতী অতি দুর্লভ। —সতী হইলে তবে পতিব্রতা। স্ত্রী যদি স্বামীকে নিঃস্বার্থ ভালবাসে তবে স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার শরীর আপনা হইতে মৃত হইবে; সাধু সাধুতে—শান্ত, সেবক-সেব্যে—দাস্য; বন্ধু বন্ধুতে—সখ্য; পিতামাতার—বাৎসল্য এবং স্ত্রী-পুরুষে—মধুর। নিজের কর্ম্ম সকলেই করিতেছে, সম্বন্ধ বোধ,—আমার আমার,—এই মোহ।"

শ্রীধরের কীর্ত্তি।

১। আজ শ্রীধর দ্বিপ্রহরের সময় আহার না করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। মাথার কিছু ঠিক নাই। পথে-বিপথে ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা দু'টার সময়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ভবানীপুর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য মহাশয় শ্রীধরকে দেখিয়া ত্র্যস্ত হইয়া দরজার নিকট আসিলেন। শ্রীধর অমনি শাস্ত্রী মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়? আপনার কাম গেছে? শিবনাথবাবু বলিলেন—প্রায়। এত ব্যস্ত কেন? এসো, বিশ্রাম কর। এ সময়ে এই দারুণ রৌদ্রে এসেছ কেন? শ্রীধর কহিলেন—এই কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌তে। এখন আমি চল্‌লাম। আমার অনেক কাজ আছে—এই বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া তিলার্দ্ধ না দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিলেন। শিবনাথবাবু অবাক?

২। ঠাকুর যখন অভয়বাবুর বাসায় ছিলেন, শ্রীধর একদিন অভয়বাবুর ঘরে গিয়া বসিলেন। অভয়বাবু কোন প্রয়োজনে তাঁহার একটি বাক্স খুলিলেন শ্রীধর অমনি তাঁহার নিকটে গিয়া হাত পাতিয়া বলিলেন—'দেও টাকা দেও'। অভয়বাবু কিছু না বলিয়া অমনি ৫টি টাকা শ্রীধরের হাতে দিলেন। শ্রীধর উহা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় তিনটার সময়ে শ্রীধর বাসায় আসিয়া একেবারে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রবাবু শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি শ্রীধর? টাকা নিয়ে কি কর্‌লে? ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের টাকা। মহেন্দ্রবাবু তখন অভয়বাবুর টাকা দেওয়ার কথা বলিলেন। ঠাকুর কহিলেন—"কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে চাওয়া মাত্র শ্রীধরকে টাকা দেওয়া ঠিক হয় নাই। সকলেরই একটা মর্য্যাদা আছে, প্রয়োজনেই টাকা ব্যয় করিতে হয়। না হ'লে উহার মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়। অভয়বাবু এভাবে টাকা অপব্যয় কর্‌লে, টাকার অভাব ভোগ কর্‌বেন।" শ্রীধর ঠাকুরের কথা শুনিয়া খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং টাকা পাঁচটি ট্যাঁক হইতে খুলিয়া লইয়া অভয়বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—নেন মশায়, টাকা নেন। অভয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে নিয়েছিলে কেন? শ্রীধর বলিলেন—টাকা সঙ্গে থাক্‌লে কি প্রকার তড়িৎ খেলে, তাতে শরীর মনের কিরূপ অবস্থা হয়—দেখ্‌বার জন্য টাকা নিয়েছিলাম। এখন আপনার টাকা আপনি নিন্‌—আমিও বাঁচলাম।

৩। একদিন শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট কাঁটাল পাইয়া তাহা খাওয়ার জন্য একখানা পাথরের থালায় ছাড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন। শ্রীধর তখন অন্যত্র ছিলেন। হঠাৎ আসিয়া দূর হইতে উহা দেখিয়া পণ্ডিতের ঘরের দ্বারে পঁহুছিয়া ত্রস্ত হইয়া বলিলেন—হায় পণ্ডিত? তুমি যে ঠ'কে গেলে উৎকৃষ্ট পাতক্ষীর ঠাকুর হাতে ধ'রে সকলকে দিচ্ছেন, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন পণ্ডিত

মশায় কোথায়? আর তুমি এখানে কাঁটাল ছাড়াচ্ছ? পণ্ডিত মহাশয় শুনিয়া অমনি লাফাইয়া উঠিলেন এবং ছুটিয়া ঠাকুরের নিকট চলিলেন—ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরের ঘরের দ্বারে পঁহুছিবামাত্র ঠাকুর মাথা তুলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া আবার চোখ বুঝিলেন। পণ্ডিত তখন লজ্জিত হইয়া নিজ কুটিরের দিকে আসিতে লাগিলেন—দূর হইতে দেখিলেন শ্রীধর ছাড়ান কাঁটালগুলি গপ্ গপ্ করিয়া মুখে ফেলিতেছেন আর চঞ্চলদৃষ্টিতে পণ্ডিতের পানে তাকাইতেছেন। পণ্ডিত শ্রীধরের কীর্ত্তি দেখিয়া দরজায় থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—একি? তুমি একি কর্‌ছ? কাঁটালগুলি সব মেরে দিলে। শ্রীধর অবশিষ্ট ৩।৪ কোয়া কাঁটাল পণ্ডিতের দিকে ছুড়িয়া দিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন—'নেও আর খাব না—খাওয়ার জিনিসে নজর দিলে।' এই বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—উঃ! তুমি এমন বিষম লোক? মিথ্যা কথা বল্‌তে একটু ভাব্‌লে না। শ্রীধর বলিলেন—'কি বল্‌লে পণ্ডিত? মিথ্যা কথা! আরে কথা আবার সত্য হয় কিরূপে? কথা তো মায়ার কার্য্য—মায়া নিজেই মিথ্যা, কথা কিরূপে সত্য হবে? গুরুর নামই সত্য, আর সব মিথ্যা, যাও এখন ব'সে নাম কর—আর কাঁটাল খাও।'

স্ত্রী-বিয়োগে শোকার্ত্তকে জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে উপদেশ ঃ নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না--ঠাকুরের আত্মজীবনের কথা।

আজ একটি গুরুভ্রাতা স্ত্রী-বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়া ঠাকুরের নিকটে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর লিখিলেন—"বিপদে অধৈর্য্য হইলে, ততই বিপদ চাপিয়া ধরে। অধীর হইলে কিছু লাভ নাই; বরং উপায় গ্রহণে ব্যাঘাত হয়। বিবাহের ইচ্ছা হইলেই যে করিতে হইবে তাহা নহে। যখন আপনাকে কিছুতে সংবরণ করা যায় না তখন বিবাহ করা উচিত। লোকের পরামর্শে বিবাহ করা উচিত নহে। কিছুদিন আপনাকে পরীক্ষা করিয়া পরে স্থির করিতে হয়। স্ত্রী যুবতী হয়—পুরুষের বয়স অধিক হয়—স্ত্রী কখনই সন্তুষ্ট থাকে না। প্রায় স্থলেই ব্যভিচার দেখা যায়—কোন ঘটনা ভালও দেখিয়াছি।"

ঠাকুর একটু থামিয়া আবার লিখিলেন—"জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই হইবে। রাজা পৃথু, জনক, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ, দুর্য্যোধন, রাবণ, কংশ,—ইঁহারা কত দিগ্‌বিজয় করেছেন, কিন্তু তাঁহারাও শ্মশানে ভস্মীভূত। যাঁরা অবতার—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, বলরাম,—ইঁহারাও দেহত্যাগ করিয়াছেন। জন্ম-মৃত্যুর যে কি রহস্য জানিয়াও নিস্তার নাই। এই মৃত্যু কত মঙ্গলের জন্য তাহা অনেকে চিন্তা করেন না। একজন

চিররোগী, অসহ্য যন্ত্রণা—যদি মৃত্যু না হয়, তাহার উপায় কি? কত জীব-জন্তু মরিতেছে, কে তাহার খবর লয়? কতস্থানে কত নরনারীর মৃত্যু হইতেছে, তাহা কে জানে? আমার বাটীর ঘটনা হইলেই আমার চিন্তা। রোজ এক লক্ষ লোক জন্মায়, এক লক্ষ মরে। প্রদীপের তৈল ফুরাইলে নিবিয়া যায়,—মৃতুও সেইরূপ। সংসারে যাদের আসক্তি, তাদেরই মৃত্যু ভয়।

এই পাখা যদি যত্নপূর্ব্বক রাখ, শত বর্ষ থাকিবে, কিন্তু মানুষ থাকিবে না,—ইহা কখনই মনে হয় না। আমার যখন ১২ বৎসর বয়স, সেই সময়ে, আমাদের একজন খেলিবার সঙ্গী মরিয়া যায়। আমাদের একটি মেটে-দেল্‌কো ছিল, তাহাতে প্রদীপ রাখিয়া রাত্রিতে পড়িতাম ও খেলা করিতাম। ঐ সঙ্গীটি মরিলে, একদিন ঐ দেল্‌কো দেখিয়া মনে হইল যে, এই মাটির বস্তুটি আছে,—সে নাই, ইহা হইতে পারে না। তাহার পর যে কাঁটালতলায় খেলা করিতাম, সেই গাছটি দেখিয়াও মনে হইল,—কাঁটাল গাছ আছে, সে কোথায়? অবশ্যই আছে। ঐ সকল ভাব মনুষ্যের স্বভাবে আছে—ইহার পরের অবস্থা যাহা, তাহা প্রত্যক্ষ না হ'লে হয় না।

মৃত্যু দিন-রাত্রির মত স্বাভাবিক কার্য্য। জন্ম-মৃত্যু—একই মোহ। যখন জন্ম-মৃত্যু, বৃক্ষের পত্র পতিত হওয়া ও গজান-বৎ বোধ হইবে, তখনই আমি কি, যথার্থ বুঝিতে পারিবে। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা দেখে এমন মনে হয়—উহা কিছুই নহে। মনে যদি শুভ ইচ্ছা আসে তখন ভগবানের সেবা উদ্দেশ্যে করিলে, বন্ধন কাটিয়া যায়। যখন যাহা প্রয়োজন; ভগবৎ ইচ্ছাতে সম্পন্ন হয়। যথার্থ যদি শিশুর মত থাকিতে পারি, তাহা হইলে মাতা সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন।"

নিজের ইচ্ছা-চেষ্টায় কিছুই হয় না, ভগবৎ ইচ্ছায়ই সব,—ইহা বুঝাইতে ঠাকুর নিজ জীবনের কথা লিখিয়া দিলেন—"যখন চিকিৎসা করিতাম, এই ঔষধটি দিলেই ঐ রোগ আরাম হইবে। ক্রমে দেখি তাহা হয় না। ঐরূপ দেখিতে দেখিতে তখন বুঝিলাম যে, ঔষধ কিছুই নহে। ভগবানের কৃপা চাই। প্রচার করিতে গেলাম, প্রথম যেখানে যাই,—সমস্ত লোক একমনে শোনে, সাহায্য করে। ক্রমে দেখি, লোকের সে ভাব, আমার কথায় কিছু হয় না। তখন বুঝিলাম,—আমার শাস্ত্রজ্ঞান, বক্তৃতার

ক্ষমতা কিছুই নহে,—ভগবৎকৃপাই সমস্ত। এইরূপে পুরুষকারে আঘাত খাইয়া খাইয়া এখন বুঝিতেছি,—আমি কিছুই নই; অসারের অসার! ভগবানই সর্ব্বকর্ত্তা,—ঐহিক পারত্রিক বিধাতা। আমার নিজের জীবন চিন্তা করিয়া দেখি, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই করি নাই। টোলে পড়িতাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম। অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হইলাম। পরে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। প্রচার করিলাম, চিকিৎসা করিলাম। আবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের ইচ্ছা কিছুই নহে। যাহার যখন সময় হয়, মরিয়া যায়। মৃত্যুর পর জন্ম হইলে তখন পূর্ব্বের কিছুই মনে থাকে না। তাহাতে আর দুঃখ কি? যতক্ষণ না জন্ম হয়, ততক্ষণ পূর্ব্বের কথা মনে থাকে। সমস্ত ঘটনাই মঙ্গলের জন্য—ইহাতে সন্দেহ নাই।”

একটু পরে ঠাকুর নিজ হইতে লিখিলেন—“এখন যে ‘আমি’ এই ‘আমি’ পড়িয়া থাকিবে; ভগবৎ ভাব বা স্বরূপ যথার্থ ‘আমি’ গুরুশক্তি লইয়া উঠিয়া যাইবে। স্বরূপের তাৎপর্য্য শান্ত, দাস্য। শাস্ত্রেই আছে যে, যেরূপ চিন্তা, কার্য্য সমস্ত জীবনে করে, মৃত্যুকালে তাহারই চিন্তা আসে। দৃষ্টান্ত ভরত। মৃত্যুকালে হরিস্মৃতি সকলের ভাগ্যে হয় না। জীবনে যেমন চিন্তা, স্বপ্নেও সেইরূপ—মৃত্যুকালেও ঐরূপ। গুরুতর পাপ করিলে অথবা কোন বস্তুতে কি জন্তুতে অত্যন্ত আসক্তি হইলে, অধোগতি হয়। ভরত হরিণ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জড়ের মত রহিলেন। এইবারই মুক্ত হইলেন। আত্মা নির্ম্মল হইলেও সেই মুহূর্ত্তে জন্ম হইতে পারে,—নির্ম্মল কিন্তু বাসনা আছে।”

সকল বাসনাই কি অনিষ্টকর ?

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—বাসনা কাকে বলে? সকল বাসনাই কি আত্মার উন্নতির পথে অনিষ্টকর?

ঠাকুর লিখিলেন—“আমার খুব ধর্ম্ম হউক—লোকে মান্য করিবে; স্বর্গভোগ হউক, আমি ধর্ম্মপ্রচার করিয়া জগৎ উদ্ধার করি, ধন দেও, যশ দেও, পুত্র-কন্যা দেও ইত্যাদি বাসনা। তোমার দাস কর, সখা কর, ভক্ত কর, সমস্ত বাসনা হইতে মুক্ত কর। নিজের সুখের ইচ্ছা ভোগ। যতক্ষণ নিজের সুখ-ইচ্ছা আছে—সে

দাস কি সখা হইতে পারে না। আমিত্ব নাশ একেবারে হয় না। উহা বাসনা। নিজের জন্য তাই বাসনা। আমাকে মুক্ত কর, ইহাও বাসনা,—কিন্তু এ বাসনা ভাল।”

অসামান্য শক্তিলাভের উপায় ঃ

মহাপুরুষের বত্রিশ লক্ষণ।

আমি ভাবিয়াছিলাম, শালগ্রাম পূজা ছাড়িয়া দেওয়াতে সাধন-ভজনে আমার অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় দেখিতেছি, আমার কোন অনিষ্টই হয় নাই ; বরং ঐ পূজা ছাড়িয়া দেওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ভাল আছি। পূর্ব্ববৎ নিয়মিত সন্ধ্যা তর্পণ ন্যাসাদি কার্য্য প্রতিদিন করিতেছি। শালগ্রাম নাই বটে কিন্তু মনে মনে ফুল, চন্দন, তুলসী প্রভৃতি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া রীতিমত ঠাকুরপূজা করিয়া থাকি। বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানসপূজায় অধিক আনন্দ পাইতেছি। গুরুভ্রাতারাও এখন আর কেহ আমার বিরুদ্ধ নন্। বেশ আরামে আছি। সাধন-ভজন, নামধ্যান ছুটিয়া যাওয়ায় যে বিষমঅবস্থায় পড়িয়াছিলাম,রিপুর উত্তেজনা ও অত্যাচারে উত্তপ্ত হইয়াছিলাম, ঠাকুরের কৃপায় বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনি তাহা প্রশমিত হইয়াছে। কতদিন ঠাকুর এ অবস্থায় রাখিবেন জানি না।

অন্যান্য দিনের মত অপরাহ্নে গুরুভ্রাতারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যোগ-সাধন করিলে নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তিলাভ হয়,—শুনি। আমরা এতদিন সাধন পাইয়াছি,—কিছুই তো বুঝিলাম না ? যাহা বলিয়াছেন, যতটা পারি করিতেছি, কিন্তু ব্রহ্ম কি, ভগবান কি,—কিছুই তো বুঝিলাম না।”

ঠাকুর লিখিয়া উত্তর দিলেন—“পূর্ব্বে আচার্য্যগণ সাধকদিগকে শেষ যে লক্ষ্য তাহা বলিতেন না। কেবল পথের উপদেশ দিতেন। এজন্য তাঁহারা গোলে পড়িতেন না। এখন আমরা অনেক বিষয় জানিয়াছি, অথচ প্রকৃত জানা হয় নাই। পথে চলিলে, ক্রমে দেখা যায় যে, গম্যস্থানের নিকট যাইতেছি। প্রথমে সে বিশ্বাস হয় না। মুখে বলিলে ফল নাই। ঠিক সময় মত যাহা, তাহা না হইয়া, অসময়ে কিছু হইলেই বিশৃঙ্খল। কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে আর উপার্জ্জন করা কঠিন। ভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত ; প্রারব্ধ কেবল কথা।”

ঠাকুর আবার লিখিলেন—“উপনিষদে আছে, বরুণের নিকট তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল—‘ব্রহ্ম কি ?’ উত্তর—‘তপস্যা কর।’ তপস্যা করিয়া যাহা জানিল,—বলিল

যে, 'ব্রহ্ম অন্ন।' উত্তর—'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া বলিল—'ব্রহ্ম প্রাণ।' 'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া বলিল—'ব্রহ্ম মন।' 'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া বলিল—'বিজ্ঞান।' 'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া বলিল—'আনন্দ।' ইহার পরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হইল। তখন উপদেশ।

লোকে কোন কাজ করিবে না,—কেবল শক্তি চায়। তোমরা এক বৎসর বীর্য্যরক্ষা কর এবং মিথ্যাকথা বলিও না,—মিথ্যা কল্পনাও করিও না; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের বাক্‌সিদ্ধি হইবে। লোকে শক্তি শক্তি করে, শক্তিলাভ অতি তুচ্ছ পদার্থ। যাঁহারা ঈশ্বরকে চান এবং সেইদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন—তাঁহাদের পিছে পিছে শক্তি সকল আসিতে থাকে,—কিন্তু তাঁহারা ঘৃণা করিয়া তাঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিও করেন না। যেদিন ২৪ ঘণ্টায় একটি শ্বাস-প্রশ্বাস বৃথা না হইয়া, নাম চলিবে, সেইদিনই সিদ্ধিলাভ হইবে। আমার বলা উচিত নয়, কিন্তু তথাপি বলিতেছি—আমি সাধন পাইয়াছি পর ৩ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম ঠিক হইয়াছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঠিক হইয়া যায়। আমাদিগের সাধনপথ—সত্যযুগের ঋষিপথ। এই পথে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের সহিতই আমরা মিশিতে পারি। কিন্তু গৃহীদিগের সামাজিক রীতি-নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আত্ম-প্রসংসা না করা, কাহারও স্থায়ী বিশ্বাস নষ্ট না করা, ধর্ম্মের বুজ্‌রুগী না করা,—সাধুর সামান্য লক্ষণ। সাধু-বেশীর ঐগুলি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে, হৃদয় নিহিত ধর্ম্মভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয়, আপনা হইতে ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারিত হয় এবং পাপ সকল লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে,—তিনিই সাধু।"

একজন জিজ্ঞাসা কারলেন—বাহিরে, শরীরের কোন লক্ষণ দ্বারা কি মহাপুরুষদের ধরা যায় না ?

ঠাকুর—"শাস্ত্রে মহাপুরুষের ৩২টি লক্ষণ দিয়াছেন :—

পঞ্চ দীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তং ষড়ূন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণোমহান্॥

নেত্র, পাদ, করতল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা, নখ,—এই সাত অঙ্গ রক্তিম। বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কোটি ও মুখ,—এই ছয় অঙ্গের তুঙ্গতা (উচ্চতা)। কোটি, ললাট, বক্ষ,—এই তিন অঙ্গ বিস্তার। গ্রীবা, জঙ্ঘা, শিশ্ন,—এই তিন অঙ্গের খর্ব্বতা। নাভি, স্বর, বুদ্ধি,—এই তিনের গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু (গণ্ডদেশের

উপরিভাগ—চোয়াল) ও জানু,—এই পাঁচ অঙ্গের দীর্ঘতা। ত্বক্, কেশ, লোম, দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব,—এই পাঁচ অঙ্গের সূক্ষ্মতা। এ সমস্ত মহাপুরুষের লক্ষণ।

পালনীয় উপদেশ।

প্রশ্ন—'উপদেশ তো অনেক শুনিলাম, আমাদের বিশেষ পালনীয় কি, বুঝিতেছি না?'

ঠাকুর—"(১) শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম চাই। (২) বল বৃদ্ধি চাই। (৩) রেতঃরক্ষা চাই।"

প্রশ্ন—শারিরীক পরিশ্রম কি?

উত্তর—"প্রাণায়াম—দু'বেলা।"

প্রশ্ন—'মানসিক পরিশ্রম কি?' উত্তর—"এক নাম জপ, কীর্ত্তন সদালাপ।" প্রশ্ন—'বলবৃদ্ধি কিরূপ?' উত্তর—"শারীরিক বল ও মানসিক বল।" প্রশ্ন—'রেতঃ-রক্ষা কিরূপ?' উত্তর—"আসন করা, মুদ্রা করা, স্ত্রীলোক দর্শন না করা, স্পার্শ ও আলাপ না করা। (৪) সকল গুরুভ্রাতাদের ভালবাসা, সাধনের প্রধান অঙ্গ। (৫) গুণ দেখাই ভাল। দোষ দেখিলে, নিজে দোষী সাব্যস্ত হইবে। (৬) ধৈর্য্য চায়। (৭) গুরু-ত্যাগে ভবেৎ মৃত্যুঃ। (৮) সংসার বৃক্ষ ছেদন না করিলে কৃষ্ণ পাওয়া কঠিন। (৯) খৃষ্টানের ন্যায় বিশ্বাসী, বৈষ্ণবের ন্যায় ভক্ত এবং মুসলমানের ন্যায় নিষ্ঠাবান হইতে হইবে।"

অপবিত্র হাতে ঠাকুরকে খাবার দিতে উদ্যোগ : বিনিময়ে ঠাকুরের বরদান।

কয়েকদিন হয় কি ভয়ানক অপরাধজনক কার্য্য হইতে দয়াল ঠাকুর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ভাবিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। একদিন রাত্রি প্রায় তিনটার সময়ে অকস্মাৎ ঘুমাইয়া পড়িলাম। অমনি স্বপ্নদোষ হইল। তখনই জাগিয়া উঠিলাম। মনটি বিরক্তিপূর্ণ হইল, মাথা গরম হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম—এতকাল সাধন, ভজন, তপস্যাদি করিয়া আমার আর কি হইল! এক বীর্য্যধারণের জন্য যে এত করিলাম তাতো কিছুই হইল না। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এক পরিমাণে আহার করায় পেট ভরিয়া একদিনের জন্যও খাই নাই। বহুকাল যাবত এক-চতুর্থাংশ জল দ্বারা পূর্ণক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছি। সারাদিন সাধন-ভজনে কাটাই। বাজে আলাপ, বাজেকাজে সময় নষ্ট করি না। ২৪ ঘণ্টা নতশিরে থাকিয়া ঠাকুরের সঙ্গ করিতেছি, তাঁর শরীরের আঁচ সর্ব্বদা পাইতেছি। এত করিয়াও আমার এ দশা! মনের বিকার গেল না, দেহ শুদ্ধ হইল না! আমার সমস্ত চেষ্টাই তো ব্যর্থ হইল

দেখিতেছি। ঠাকুরের দয়ার উপরে নির্ভর করিয়াই বা কি হইতেছে। তিনি তো আমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। না হ'লে তাঁর ৩।৪ হাত অন্তরে নিদ্রিত অবস্থায় আমার বীর্য্যপাত হয়, আর তিনি মজা দেখেন। ইচ্ছা করিলে কি এ আপদে তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন না ?. ইচ্ছা করা ব্যতীত তাঁর কি এতে কোন পরিশ্রম করিতে হয় ? এ সকল ভাবিয়া ঠাকুরের উপরে অতিশয় অভিমান জন্মিল। তিনিই আমাকে ভোগাইতেছেন মনে করিয়া তাঁহার উপর ক্রোধ হইল। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচারী দু'খণ্ড মিশ্রি দেও, আমি জল খাব"। আমি বিরক্তিপূর্ণ মনে অপবিত্র হস্ত স্বত্বেও উহা থাক্‌গিয়ে মনে করিয়া ঠাকুরকে মিশ্রি দিতে আলমারীর নিকট গেলাম। ঠাকুর তখন আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! খাবার দেবার পূর্ব্বে হাত ধু'য়ে নিতে হয়; এই জল নেও।" এই বলিয়া কমণ্ডলুর জল দিতে হাত বাড়াইলেন। আমি সামান্যমাত্র জল হাতে লইয়া উহা মেজেতে ছড়াইয়া ফেলিলাম এবং মিশ্রি দিতে উদ্যত হইলাম। হাত কিছুই পরিষ্কার হইল না। ঠাকুর তখন আবার বলিলেন—"হাত একটু ভাল ক'রে ধু'য়ে নিলে হয় না।" আমি তখন লজ্জিত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম এবং হাত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া আসিয়া ঠাকুরকে মিশ্রি দিলাম। ঠাকুর মিশ্রি মুখে দিয়া জলপান করিলেন। তিন চারদিন যাবৎ নিয়ত এই বিষয় মনে হওয়ায় আমি জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইতেছি। কথায় কথায় আজ আমি মহেন্দ্রবাবু, মোহিনীবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের নিকট এই বিষয় বলিলাম। তাঁহারা শুনিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন এবং অত্যন্ত গালাগালি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন—'তুমি এইভাবে ঠাকুরের সেবা কর বলিয়াই ঠাকুরের যত অসুখ। ঠাকুরের নিকটে যাহাতে আর তুমি থাকিতে না পার আজই আমরা তা করিব।' এই বলিয়া উহারা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমার দুষ্কার্য্যের কথা ঠাকুরকে বলিয়া কহিলেন—'ব্রহ্মচারী যখন এত নোংরা তখন তার হাতে আপনি কোন সেবা গ্রহণ না করেন আমাদের ইচ্ছা। আপনার যত রোগ সমস্ত ব্রহ্মচারীর সেবার দরুণ। বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শুক্র যে অনায়াসে গুরুকে খাওয়াইতে পারে, গুরুর নিকটে তাকে এক মিনিটও থাকিতে দেওয়া যায় না।' মহেন্দ্রবাবু যখন এ সকল কথা ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। উঁহার কথা শেষ হইতেই আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! মহেন্দ্রবাবু যা বল্লেন তা কি ঠিক? তুমি যথার্থই কি ওরূপ করেছিলে?" আমি বলিলাম—'মহেন্দ্রবাবু যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই সত্য, যথার্থই আমি নোংরা হাতে আপনাকে মিশ্রি দিতে গিয়াছিলাম।' ঠাকুর আমার সত্য কথা শুনিয়া খুব আনন্দলাভ করিলেন, ছলছলচক্ষে সস্নেহদৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন—"এখন থেকে তোমার ঐ হাতে যা' আমাকে দিবে পরম পবিত্র মনে ক'রে আমি তা' গ্রহণ কর্‌বো। একটি কাজ ক'রো—যা' নিজে খেতে পার না তা' আমাকে দিও না।"

হায়! হায়!! আজ আমি কি করিব? মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। দেখিতেছি এমন কোন পাপকার্য্য দুর্ব্ব্যবহার করিতে পারি না যাহাতে ঠাকুরের স্নেহ-মমতা-দয়াকে অতিক্রম করিতে পারি। ধন্য ঠাকুর! এই ঘৃণিত পাষণ্ডকেও তুমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ! তোমার এ দয়া যে আমার অসহ্য হইল! এখন আমি কি করি! বহুজন্মের ভজন, সাধন, তীব্র তপস্যায় যে অবস্থা মানুষের লাভ হয় না, আমার জঘন্য কার্য্যের প্রতিফলে তাহা তুমি অনায়াসে আমাকে দিলে! তোমার প্রতি অত্যাচারের দণ্ড, অত্যাচারীর প্রতি তোমার সস্নেহ দয়া ব্যবহার—একি অদ্ভুত কাণ্ড!

প্রকৃত স্বভাব দুর্ব্বোধ্য।

ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক অবস্থায় হিজ্‌লি-কাঁথি, এক দস্যুর বাড়ী বিপন্নাবস্থায় গিয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন। কথায় কথায় তাহা লিখিলেন—"আমি এবং আরো দুইজন হিজ্‌লি-কাঁথি গিয়াছিলাম। যখন কাঁথিতে পঁহুছিলাম তখন রাত্রি, ঘোর অন্ধকার, মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টি। আমরা পথ না পাইয়া এক ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। পায়ে একটি মানুষ ঠেকিল; সেটি স্ত্রীলোক। হঠাৎ উঠিয়া আলো জ্বালিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময়ে পুরুষটি আসিল। ভীমের মত। জিজ্ঞাসা করিল—'তোমরা কে?' আমি বলিলাম—আমরা পথিক, পথ হারাইয়াছি। মাষ্টারের বাসায় যাইব। সে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া দিয়া আসিল। যতদিন ছিলাম;—আলাপ করিত। তাহাকে দেখিয়া স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বলিলেন—'ইহাকে কোথায় পাইলেন?' এ দিনের বেলায় ডাকাতি করে! পথে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা ইহার স্বভাব।"

একজন বলিলেন—'মানুষের সাধারণ কার্য্য দেখিয়া ভিতরের অবস্থা বুঝা যায় না। স্বভাব মানুষের এই এক রকম, পরেই আর এক রকম দেখা যায়। যথার্থ স্বভাব যে কি;—কার্য্য দেখিয়া ধরা যায় না।'

ঠাকুর—"যতক্ষণ শরীর, মন, আত্মার ঐক্য না হয়, ততক্ষণ আমার পক্ষে তাহা স্বাভাবিক নহে। স্বভাবই ধর্ম্ম। সমস্ত মনুষ্য-স্বভাবে, একতাও আছে, স্বতন্ত্রতাও আছে। কেবল মনুষ্য বলিয়া কেন, সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকেরই স্বভাবে একতা ও বিচিত্রতা আছে। আমি যেমন সকলের সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে এক—তেমনই আবার ভিন্ন। এজন্য, মনুষ্য রুচি বিভিন্ন। আমার শরীর, মন, আত্মার যখন ঐক্য হইবে তাহাই স্বভাব, তাহাতেই আমার মঙ্গল। সমস্ত জগতের যে সকল বস্তু স্বভাবে আছে তাদেরই আনন্দ। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ-লতা, ফল-মূল,

পশু-পক্ষী সমস্ত আনন্দময়। মনুষ্যও যতটুকু স্বভাবে থাকে ততটুকু আনন্দ পায়। মনুষ্যের স্বভাব যত বিকশিত হয়, আনন্দও তত প্রকাশ হয়। যাহারা পাপ চিন্তা, পাপ কার্য্য দ্বারা স্বভাবকে বিকৃত করিয়াছে, তাহারা নিরানন্দ ভোগ করে। পাপে শরীর রুগ্ন হয়;—মন অপবিত্র হয়; পুণ্যলাভ করিয়া, স্বভাব লাভ না হইলে আনন্দ পায় না। রোগ ও পাপ যন্ত্রণায় জীবন গত হয়।

ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া, ইহাও একপ্রকার উন্মত্ততা;—বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিয়াছেন। মস্তিষ্কের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য অংশ সকল আছে। তাহার যে অংশে পীড়া হয়—তাহারই বিকৃত অবস্থা। যেমন অন্ধ দেখে না; কিন্তু আত্মার দেখিবার শক্তি আছে।

পরে ঠাকুর আবার লিখিলেন—"দেবতা ও অসুর উভয়ে একই পিতার সন্তান। দেবতা যিনি, তিনিও অসুর হইতে পারেন,—অসুরও দেবতা হইতে পারেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'দেবাসুরা প্রজাপত্যাঃ'। যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন তাঁরা দেবতা। যাঁরা নিজের বুদ্ধিতে চলেন—তাঁরা অসুর।"

২৩শে কার্ত্তিক।

আজ দীপান্বিতা—সমস্ত সহর আলোকময়। যাহার যেমন সাধ্য নানা প্রকার দীপমালায় আপন আপন বাড়ীঘর সুসজ্জিত করিয়া, মা কালীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। আজ সকলেরই মনে আনন্দ-উৎসাহ। কলিকাতা সহর আজ সকলকে লইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। আমাদের বাড়ীতেও আজ খুব সংকার্ত্তনোৎসব। সন্ধ্যার পরই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীধর, বিধু ঘোষ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ সকলেই মাতিয়া গেলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। সংকীর্ত্তনের পর হরিলুট বিতরণ করিয়া ঠাকুর আসনে বসিলেন।

'নেদং যদিদমুপাসতে।' ভগবৎলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

একজন প্রশ্ন করিলেন—'দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা কি মুক্তি লাভ হয় না? ভগবানে কি উপায়ে ভালবাসা জন্মাবে?—ভগবানের উপাসনা কখন করিতে পারিব?'

ঠাকুর—চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—এ সমস্ত দেবতার যাহারা পূজা করে তাহারা সকাম পূজা করে। তাহারা এই সকল দেবতা ভিন্ন আর কিছু পাইবে না। ব্রহ্মাকেও দেবতা বলিয়া পূজা করিলে দেবতাই লাভ করিবে। 'যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যে আমাকে যেরূপে

ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে প্রাপ্ত হই। উপনিষদে—'নেদং যদিদমুপাসতে'।—ইহার তাৎপর্য্য যে—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন দ্বারা লোকে যে সকল বস্তুর উপাসনা করে, অর্থাৎ—ইন্দ্রিয় ও মনের যত বিষয়, তাহা আমি নহি। আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মনগ্রাহ্য বস্তু হইতে অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন। বাক্য, মন, চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, এই সমস্ত দ্বারা যাহা উপাসনা করে, তাহাও আমি নহি। অর্থাৎ—আমি সৃষ্ট বস্তু নহি। উপনিষদে যে বলিয়াছেন 'নেদং যদিদমুপাসতে' এটি উপদেশ মাত্র বোধ হয়। যত দিন চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়গণ বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, ততদিন শরীর ছাড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ভিতরে প্রবেশের দুটি পথ; উপায় এক। কোনও উপায়ে একবার ভগবানকে দর্শন করিলে, তখন শরীরে দৃষ্টি থাকে না। সহজেই শরীর মনে থাকে না। কিন্তু এ অবস্থা সকলের ঘটে না। এজন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিতে হইবে। এ ভালবাসা লাভ করিবার জন্য অহিংসা অভ্যাস করিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও কষ্ট দিব না; কেহ আমাকে প্রহার করিলে, গালি দিলে, এমন কি সর্ব্বনাশ করিলেও তাহার অমঙ্গল কমনা করিব না। এইরূপে দ্বেষ-হিংসা নষ্ট হইলে প্রাণে ভালবাসা আসে। সেই ভালবাসা কোন স্থানে অর্পণ করিয়া, তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। এই অবস্থা হইলে সহজে ভগবানকে লাভ করা যায়।

মগ্নাবস্থার কথা।

শেষ রাত্রে মা কালীর আবির্ভাবের পর মগ্নাবস্থায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—বিধু মজুমদার ও কুঞ্জ ঠাকুরতা লিখিলেন—

নূতন নূতন ঘট স্থাপন করা হ'ল, জীবের আর ভয় নাই, মৃদু মন্দ বাতাসে পতাকা দুল্‌ছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পদধূলি গ্রহণ কর।

উজল নিশান উড়্‌ছে, ডঙ্কা পড়েছে। শিশুদের কাঁচা ঘুম ভেঙ্গো না, তাহলে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়্‌তে পারে।

যাহারা প্রথমে এসেছে, তাহারা পাছে যাবে, যাহারা পাছে এসেছে তাহারা প্রথমে যাবে।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হউক আনন্দময়ীর ঘট স্থাপন কর, ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা

কর। দেহে ঘট স্থাপন কর, পূজা কর, মর্য্যাদা কর, সেবা কর, মর্য্যাদা না কর্‌লে মা চলিয়া যান, পূজা না কর্‌লে থাকেন না।

স্ত্রীলোক সকল মায়ের মত দেখ্‌তে হবে, মা জননী, সেই বিশ্বজননী মা, গর্ভধারিণীর সমান। স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকে দেখে প্রণাম কর। মা আনন্দময়ী যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি একটি নারীকে যদি সেই ভাবে ভালবাস্‌তে পার, সে দেবী! দেবী! দেবী! তাঁহাকে প্রণাম কর্‌লে পাপ দূর হয়। এরূপ যদি পার, এক দিনে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পার। চণ্ডীদাস যেমন রজকিনীর দ্বারা করেছিল। লোকে দোষ দেয়, ও কিছু নয়, মিথ্যা কথা, নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে, তার মরণ ভাল।

ধূলি হতে হবে. মাটি হতে হবে, জ্যান্তে মরা হতে হবে, যতদিন ভিতরে অহং ভাব আছে, তত দিন মাথার উপর পাহাড় পর্ব্বত, ভগবান দর্পহারী, কোন রকমে একটু অহংকার হলেই এগালে এক চড় ওগালে এক চড়, নাকমলা, কানমলা, মারে বাপ্‌রেও বল্‌তে দেবে না, এতে যদি হ'লো তো হ'লো, নতুবা ঘাড় ধরে একেবারে কোথায় ফেল্‌বে তার ঠিক্ নাই।

সাধন ভজন করে আমার এই অবস্থা লাভ হয়েছে, আমার এত উন্নতি হয়েছে এই ভাব যদি মনে হয়, তাহা হলেও রক্ষা নাই, ভগবানের বিচার নিক্তির কাঁটার মত। লক্ষ্মণ, সীতার পায়ের দিকে মাত্র তাকাইতেন, তিনি কি আর কিছুই দেখিতেন না? তাহা নহে, তিনি সমস্তেরই পায়ের দিকে তাকাইতেন, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সকলেরই নিকটে অবনত হবে। এই প্রকার হতে পার্‌লেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়, ইহা হ'লে আকাশে অল্প সাদা মেঘ থাক্‌লে যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায়, সেইরূপ দেখা যায়। তখন ধনুকধারী রামচন্দ্র সঙ্গে থাকেন।

অজ্ঞাত অপরাধে লীলা দর্শন বন্ধ,—রূপ গোস্বামী ও খোঁড়া বৈষ্ণবের কথা।

যথার্থ ধর্ম্মলাভের পথ ক্ষুরধারের ন্যায় কত সূক্ষ্ম, ভগবৎ সঙ্গ লাভ হইলেও তাহা দীর্ঘকাল ভোগ করা কত কঠিন ঠাকুর তাহা বুঝাইতে অনেক কথা বলিলেন। হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দার প্রবৃত্তি অন্তরে থাকিতে ধর্ম্মলাভ কখনও হয় না। অজ্ঞাতসারেও যদি একনিষ্ঠ ভগবৎভক্তের কোন প্রকার কার্য্য ব্যবহার কাহারও অপ্রীতিকর বা উদ্বেগকর হয় তন্মুহূর্ত্তে তিনি ভগবৎ সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হন। এ

বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর শ্রীরূপ গোস্বামীর একদিনের একটি ঘটনা বলিলেন—শ্রীরূপ গোস্বামী যখন রাধাকুণ্ডে ভগবৎ ভজনে অহর্নিশি মগ্ন থাকিতেন তখন তাঁহার অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মথুরাবাসী একটি বৈষ্ণব তাঁহাকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব বাবাজী বৃদ্ধ এবং খোঁড়া ছিলেন। প্রাণের একান্ত অনুরাগে তিনি যষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মথুরা হইতে প্রায় ১৪।১৫ মাইল চলিয়া রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রূপ গোস্বামী রাধাকুণ্ড তীরে উপবিষ্ট থাকিয়া রাধাকৃষ্ণের জলকেলী দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীমতী গোপীগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক জল ছিটাইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদের চক্র ভেদ করিয়া পালাইবার ফাঁক পাইলেন না দেখিয়া রূপ গোস্বামী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব বাবাজী তখন কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকিয়া উহা দেখিয়া ভাবিলেন—'আমি খোঁড়া চলিতে আমার আঁকা বাঁকা অঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া রূপ গোস্বামী বিদ্রূপ করিয়া হাসিলেন। সুতরাং ইহার নিকট যাইয়া আর কি হইবে!' বাবাজী দূর হইতে রূপ গোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মনদুঃখে মথুরায় চলিয়া গেলেন। এদিকে রূপ গোস্বামীরও লীলা দর্শন বন্ধ হইয়া গেল। রূপ গোস্বামী লীলা দর্শন অকস্মাৎ বন্ধ হইল দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং কোন কারণ স্থির করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদর সনাতন গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বলিয়া, এখন উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন গোস্বামী শুনিয়া কহিলেন,—'নিশ্চয়ই কোন বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইয়াছে, না হ'লে এমন হয় না।' রূপ গোস্বামী বলিলেন—'নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া লীলা দর্শন করিতেছিলাম। সেখানে কেহই তো ছিল না।' সনাতন গোস্বামী বলিলেন—'অনুসন্ধান কর'। রূপ গোস্বামী আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন—বৃদ্ধ একটি বাবাজী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রূপ গোস্বামীকে দর্শন করিতে মথুরা হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দর্শন না করিয়া আবার স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। রূপ গোস্বামী তখনই মথুরায় যাত্রা করিলেন, এবং অনুসন্ধানে বাবাজীর খোঁজ পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার ওভাবে দেখা না করিয়া ফিরিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবাজী তখন সমস্ত বলিলেন। রূপ গোস্বামী তখন তাঁহার হাসির কারণ প্রকাশ করিয়া বলাতে বাবাজী লজ্জিত হইলেন। রূপ গোস্বামী তাঁহার অজ্ঞাত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলেন। পরে তাঁহার আবার লীলা দর্শন আরম্ভ হইল। ঠাকুরের কথায় গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে "লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ—স চ মে প্রিয়ঃ" কথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম।

শাস্ত্র-সদাচারের অনুসরণই একমাত্র নিরাপদ্।

একজন গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাঁহারা শাস্ত্র সদাচার মানেন না, অথচ মহাত্মা মহাপুরুষ, তাঁদের ব্যবস্থা অনুসারে চলিলে কি আত্মার উন্নতি হয় না?"

ঠাকুর—"শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্যপথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় তাহাও যাইবে না। কারণ দৈবাৎ দুই এক ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে অন্যপথে সদ্‌গতি পাইতে পারেন। কিন্তু যাদের প্রথম আরম্ভ, তারা মহাঘোর অন্ধতামসে ঘুরিয়া বেড়ায়। শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্র বিশ্বাস করিলে আর ভয় থাকে না। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র এবং ঋষিগণ যেরূপ সদাচার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই উপকার হয়। শাস্ত্র পাঠে প্রতারণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শাস্ত্র না জানিলে সমস্তই অবিশ্বাস হয়। যদি জানা থাকে তবে সত্য-অসত্য প্রভেদ করা যায়। একব্যক্তি জ্বরে কুইনাইনে উপকার পাইয়াছে, আমার জ্বর নাই,—আমি, কেবল বড়লোকের কথা বলিয়া, কুইনাইন খাইব কেন? এজন্য যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যেক বিষয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, তাঁহাদেরও যুক্তি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে।—ইহা শাস্ত্রেরই উপদেশ। আমরা ঋষিবাক্য ও সদাচারের দাসানুদাস।

বন্ধুহীন জীবনের দুর্গতি।

ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের প্রশ্নের উত্তরে বন্ধুহীন ব্যক্তির কত দুর্দ্দশা লিখিলেন—"পুত্র অপেক্ষাও বন্ধু শ্রেষ্ঠ। 'পুত্রং পিণ্ড প্রয়োজনাৎ,'—বন্ধু চিরদিনই বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই,—প্রয়োজন নাই। বন্ধুর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তৃপ্তিতে তৃপ্তি। এমন বন্ধু যাহার নাই সেই বন্ধুহীন। পূর্ব্বকালে বন্ধু সকলেরই দুই একজন অবশ্যই থাকিত। এমন বন্ধু পাওয়া এখন অতি অসম্ভব। মতে মতে মিলনে বন্ধুতা নহে; এক উদ্দেশ্য, এক প্রয়োজন, এক বাণিজ্য,—ইহা বন্ধুতা নহে। বাস্তবিক বন্ধুলাভ অসম্ভব হইয়াছে। বন্ধু পাওয়া দূরের কথা,—মনের কথা বলিয়া প্রাণ খোলসা করা যায়,—এরূপ বিশ্বাসী লোকই দুর্লভ। বিশ্বাস করিয়া অতি গোপনে যাহা বলিয়াছ,—তাহা বাজারে শুনিতে পাইবে; তাহা লইয়া উপহাস করিতেছে। ইহা কালের অবস্থা। নিজের মনের সুখ দুঃখ লোকে যদি ব্যক্ত করিতে না পারে, হৃদয় ক্রমে কুটিল হইতে থাকে। কুটিলতা মহাপাপ। লোকে যদি কোন প্রকার সাধন ভজন না করে, কেবল সরলতার প্রভাবেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। সরল হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট

হৃদয় সহস্র যাগ-যজ্ঞ, সাধন ভজন করিলেও নরকগামী হয়। কপটহৃদয় সর্ব্বদাই অসত্য চর্ব্বণ করে ; অসত্য রোমন্থন করে। এক বন্ধুহীনতায় এত দুর্গতি।

সঙ্কোচ এই জন্যই জনসমাজে প্রবেশ ক'রেছে যে পরিচিত কি অপরিচিত,—যদি তিনি সমদুঃখী না হন ;—তবে এক ঘটনাকে অন্যরূপে বুঝিয়া দেশে দেশে নিন্দা প্রচার করে।

মতান্তরে বিশেষ হৃদয়বন্ধুর সহিত বিরোধ হয়ঃ—বন্ধু শত্রু হ'ন। বিরোধী মতকে ঘৃণিত করিবার জন্য সেই মতের লোকদিগকে মিথ্যা মিথ্যা দোষারোপ করে,—চরিত্রে কলঙ্ক দেয়। এজন্য খৃষ্ট সমাজে কত নরহত্যা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজেও অনেক হইয়াছে, হইতেছে। সকল দেশে, সকল সম্প্রদায়ে, ধর্ম্মের বহির্ভাগ অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ড লইয়া দলাদলি। এই অবস্থা ভেদ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম,—যাহা জীবনে মরণে সহায়,—তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, ধর্ম্মের মতামত লইয়া বিবাদ অনেক পরিমাণে চলিয়া যাইবে। এই মতধর্ম্ম বিদায় না হইলে, সত্যধর্ম্মের শোভা বিস্তার হইবে না।

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার লিখিলেন—"যে বস্তু ভালবাসি, তাহার সম্বন্ধে যত ভাল কথা শুনিয়াছি, বলিতে ইচ্ছা স্বাভাবিক। নিজের অবস্থা বলিয়া, বলিলে দোষ হয়—প্রশংসা প্রচারে দোষ নাই। যাহার প্রতি যে আদর কর্ত্তব্য তাহা না হইলে সংসারে সে বস্তু থাকে না। বৃক্ষ রোপণ কর, পশু পালন কর,—যদি আদর না হয় তাহাও থাকে না।

কীর্ত্তনে ভাবাবিষ্ট মুসলমানের সমাদর।

ঠাকুর শান্তিপুরের একটি ঘটনা লিখিলেন—"নীলকণ্ঠের গানে অনেক উপকার হইয়াছে। নাস্তিক বিশ্বাসী হইয়াছে। শান্তিপুরে আমি স্নানে যাইতেছি, শুনিলাম গান হইতেছে। একটু গান শুনে যাই। বেলা ৪টার সময় শান্তিপুরে এক ঠাকুরবাড়ীর নাট মন্দিরে গান হইতেছে। একটি মুসলমান মগ্ন হইয়া শুনিতেছে, চক্ষে জল পড়িতেছে। একজন গোস্বামী গিয়া—'ওঠ বেটা, তুই এখানে কেন? একি হাট বাজার?' নীলকণ্ঠ হাত যোড় করিয়া বলিল, 'প্রভু, একি! কৃষ্ণনামে আবার জাতি বিচার! হরিদাস যবন হইয়াও হরিনামে জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। এই

ব্যক্তি—যাঁহাকে আপনি 'ওঠ বেটা' বলিতেছেন, এখন দেবতারা উঁহার চরণধূলি প্রার্থনা করিতেছেন।' এক গান রচনা করিয়া গাহিলেন।"

সমাজের উন্নতি পথে ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

আজ ঠাকুর সমাজের উন্নতি পথে ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে লিখিলেন—"ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজত্ব নাই। ইংরাজ রাজত্ব দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে ও হইতেছে। তবে সময়ে সময়ে যে অত্যাচার দেখা যায়, তাহা রাজত্বের দোষ নহে, রাজ-কর্ম্মচারীর দোষ। যখন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার হয় নাই, তখন টোলের ছাত্রদের যেরূপ ভয়ানক অবস্থা দেখিয়াছি তাহা মনে করিতেও ভয় হয়। সাধারণে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতেন। জমিদারের অথবা রেসমের বা নীলের কুঠিতে চাকুরী করিতেন। তাহাদের অধিকাংশ ঘুষ লওয়া, ব্যভিচার, প্রজা উৎপীড়ন, মিথ্যা সাক্ষ্য,—এ সমস্ত কার্য্যকে গৌরব মনে করিতেন। মামা বাড়ীতে বেশ্যা আনিয়াছেন; আমাকে মামী ঠাকুরাণী ডাকিয়া বলিলেন। আমরা ৫।৬ ভাই, মাসতুতো ভাই একত্র হইয়া লাঠী লইয়া 'মার মার' করিয়া উপস্থিত। তাহাতে লজ্জা নাই, বরং ভয় প্রদর্শন করিলেন। এখন সেই লোক কেবল বয়সের পরিবর্ত্তনে ভাল, তাহা নহে। সময়ের একটা শাসন আছে;—তাহাতে অনেকের সংশোধন হয়। এই পরিবর্ত্তনের কারণ, ইংরাজী শিক্ষা এবং ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা। অনেক ইংরাজীওয়ালা বাবু লোকও শাস্ত্র ও মহাত্মাদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন। শাস্ত্র-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। যখন তাহারা ক্রিয়াশীল হইবে, তখন অপূর্ব্ব ঘটনা হইবে। এখন ইংরাজের কথা বাবুরা শুনেন—এজন্য ইংরাজ দ্বারা কার্য্য করান হইতেছে।"

প্রশ্ন। 'রামমোহন রায় কি নূতন একটা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন?'

ঠাকুর লিখিলেন—"যাহার যাহা শাস্ত্র, তাহা অবলম্বন করিয়া রামমোহন রায় মহাশয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। রামমোহন রায় ধর্ম্ম দুই ভাগ করিয়া বিচার করিতেন। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম,—খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের সামাজিক ধর্ম্ম। রামমোহন রায় মহাশয় ঋষি-দিগের পন্থা অনুসরণ করেন। এখন সেই পথ-হারা হওয়াতেই নানা দিকে গতি।"

ঠাকুরের মুখে শুনিলাম তিনি প্রচারক অবস্থায় একদিন চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময়, এমন

একটা স্থানে গিয়া পড়িলেন যেখানে ধারে-কাছে কোন লোকালয় নাই। সম্মুখে প্রকাণ্ড মাঠ। অন্ধকার রাত্রি রাস্তা দেখা যায় না। আকাশে মেঘ উঠিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বহুদূরে একটি আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া ঠাকুর পথে বিপথে চলিয়া এক জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর যখন জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইলেন জমিদার তখন প্রচুর পরিমাণে মদ খাইয়া বৈঠকখানার ঘরে মাত্‌লামি করিতেছিলেন। বাড়ীতে অতিথি আসিয়াছে শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন এবং নেশার ঝোঁকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন জমিদারের নিকটে উপস্থিত হইলেন, ঠাকুরের কম্বল জড়ান প্রকাণ্ড চেহারা, হাতে লাঠি, মাথায় পাগ দেখিয়া জমিদার বলিলেন—'কে হে তুমি এখানে কেন ?' ঠাকুর বলিলেন,—দেখ্‌ছ না ? আমি যমদূত।' মাতাল তখন ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'আমাকে নিও না বাবা ক্ষমা কর, আমি আর মদ খাব না, ঠাকুর অবশিষ্ট রাত্রি বিশ্রাম করিয়া পরদিন গ্রামের দশটি লোক জমিদারের বাড়ীতে একত্র করিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলেই শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। জমিদার ৩।৪ দিন ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে খুব আগ্রহের সহিত আদর যত্ন করিয়া রাখিলেন এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলেন। ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া তিনি এত মুগ্ধ হইলেন যে জীবনে আর কখনও মদ খাইবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর দীক্ষা দিয়া চলিয়া আসিলেন। এক বৎসর পর ঠাকুরের হঠাৎ একদিন তার কথা স্মরণ হইল। ভাবিলেন—"জমিদারটি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিয়াছেন, কি অবস্থায় আছেন একবার দেখে আসি।" ঠাকুর অনেক কষ্টে জমিদারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া শুনিলেন জমিদার মদ খাইয়া নেশায় বিভোর। ঠাকুর তাঁহার নিকটে পঁহুছিয়া দেখিলেন তিনি নেশার ঘোরে মত্ত হইয়া উলঙ্গাবস্থায় বসিয়া আছেন, আর আপন মনে কি বলিতেছেন। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন,—"কি, এ অবস্থা কেন ? আমাকে চিন্‌তে পারেন ?" জমিদার বলিলেন—'আপনাকে আবার চিন্‌তে পার্‌বো না ? আপনার কথায় তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তাড়ায়ে দিয়ে একটা নিয়েছিলাম। এবার দেখুন সেই একটাকেও তাড়ায়ে দিয়ে পরমহংস হ'য়ে বসে আছি।'

ঠাকুর কয়েকদিন জমিদারের নিকটে থাকিয়া তাহার কুঅভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিয়া চলিয়া আসিলেন। জীবনের অবশিষ্ট দিন জমিদারটি সদ্‌ভাবে কাটাইয়াছিলেন।

শুনিলাম ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় শান্তিপুরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। আফিং, গাঁজা, চণ্ডু, গুলি এবং মদ্যপানাদি ভদ্রলোক ছোটলোক কেহই দোষণীয় মনে করিত না। বেশ্যা রাখাও একটা গৌরবের কার্য্য মনে করিত। ব্রাহ্মেরা দেখিলেন এই অবস্থার অচিরে পরিবর্ত্তন না হইলে দেশ উজাড় হইয়া যাইবে। ভগবানের নাম কেহ নেয় না, ধর্ম্মের কথা কেহ শুনে না। সংশোধন হইবেই বা কি প্রকারে ? সকলে যুক্তি করিয়া ঠিক করিলেন মাতাল নেশাখোরদের

দু'আনা, একআনা, তিন আনা করিয়া দিয়া উপাসনালয়ে নিবে। তাহারা অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল স্থির হইয়া বসিয়া উদ্বোধন প্রার্থনাদি শুনিবে এই প্রকার যুক্তি করা হইবে। নেশাখোরেরা অনেকে পয়সার লোভে উপাসনায় যোগ দিতে সম্মত হইল। উপাসনা-ঘর লোকে পরিপূর্ণ দেখিয়া ব্রাহ্মদের খুব আনন্দ। সকলেই মনে করিলেন তাহাদের উপদেশ শুনিয়া বিশেষ উপকার হইবে। দু' পাঁচদিন সকলেই খুব স্থির হইয়া উপাসনায় যোগ দিলেন। পরে একদিন উদ্বোধন শেষ হইতেই একটি বৃদ্ধ নেশাখোর হাই তুলিতে তুলিতে আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আঃ কি অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ কর্‌লাম!' একটু তফাৎ থাকিয়া আঙ্গুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে আর একজন বলিলেন—যা' বল্‌লি ভাই; আমারও ঐ কথা।' অপর একটি লোক মিট্‌ মিট্‌ করিয়া উহাদের পানে তাকাইয়া বলিল 'উপাসনা তো হ'য়ে গেল, আর কেন? চল্‌না এখন আনন্দ করি গিয়ে?' তখন নেশাখোরেরা সকলে বাহির হইয়া পড়িল। ২।৪ দিন ব্রাহ্মেরা এই প্রকার কাণ্ড দেখিয়া পয়সা দিয়া উহাদের আনিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। পরে বহুচেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য লইয়া সমাজের দুর্নীতি নিবারণে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ বেদ বিভিন্ন নয়ঃ পরা ও অপরাবিদ্যা।

একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গুরুভ্রাতা—ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিরা লিখিয়াছেন,—'বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

বাস্তবিক কি এক বেদের সঙ্গে অন্য বেদের সংস্রব নাই? তাঁরা পরব্রহ্মকে কি উপায়ে লাভ করিতেন? পরাবিদ্যা কাহাকে বলে?

ঠাকুর লিখিয়া দিলেন,—"ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ এক। তাহার শিক্ষার জন্য তাহাকে চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত চারি বেদ শিখিতে হইলে ৩৬ বৎসর সময় আবশ্যক। সুতরাং সকলে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে না। এক ভাগ কি দুই ভাগ অধ্যয়ন করে। সুতরাং যিনি যে অংশ অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই আচার্য্য হন। এজন্য 'বেদা বিভিন্নাঃ'। বেদ যে ভিন্ন তাহা নহে,—যেমন হাতের সঙ্গে পা ভিন্ন, বস্তুতঃ এক শরীর মাত্র। যিনি সাম বেদের আচার্য্য, তিনি যজুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন না; অথবা যজুর্ব্বেদের মধ্যে সামবেদের বিষয় নাই। যর্জুর্ব্বেদ শিক্ষা কর,—যজুর্ব্বেদীর নিকট যাইতে হইবে। যদি সম্পূর্ণ বেদ-বেত্তা পাওয়া যায়, সেখানে 'বেদা বিভিন্নাঃ' নহে। ব্যাস—বকরূপী ধর্ম্মে লিখেছেন,—ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত।—গুহা শব্দের অর্থ, মনুষ্যের হৃদয়। এই শ্লোক উপনিষদের

একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা। ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এ সমস্ত অপরাবিদ্যা। যাহা দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাই পরাবিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। তাহা মনুষ্যের অন্তরে নিহিত আছে। এক এক ঋষি এক এক বেদ বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিক্ষা করিতে হইবে। মানবাত্মার ভিতরে যদি প্রবেশ করিতে পার তবে সমস্ত লাভ হইবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা আত্মামধ্যে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। বেদ শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম।”

একটু থামিয়া আবার লিখিলেন—“জীব সমষ্টির মধ্যে যে ঈশ্বর, তাহাকেই হিরণ্যগর্ভ বলে। জড় উপাসনা,—পঞ্চভূত। হিরণ্যগর্ভ উপাসনা,—জীব সমষ্টি, বাসুদেব। ঈশ্বরোপাসনা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। পরব্রহ্ম উপাসনা—নির্গুণ। এই চারি ভিন্ন আরো আছে,—সে অবস্থা মুক্তির পর। জড়, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, নির্গুণ,—এ সমস্ত উপাসনা জন্ম-জন্মান্তর করিতে করিতে পরাধর্ম্মে অধিকার হয়। কিন্তু পরাধর্ম্ম লাভ হইলেও পূর্ব্বের ঐ উপাসনা চতুষ্টয় নষ্ট হইবে না। প্রত্যেক উপাসনাতে সে পরাধর্ম্ম দেখিতে পায়। মুক্তির পরে যে অবস্থা হয় তাহাকে পরাধর্ম্ম বলে। কেবল ঋষিদের মধ্যে ছিল। এজন্য উপনিষদে, ঋক্‌বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, ধর্ম্ম সংহিতায় পরাধর্ম্মের উল্লেখ আছে। তাহার অধিকারী সকলে নহে; এজন্য সাধারণ ভাবে উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ ভাবে থাকিলে তবে পরাধর্ম্ম কি তাহা বুঝা যায়।”

একজন প্রশ্ন করিলেন—তান্ত্রিক সাধনে তুলসী ব্যবহার নিষেধ কেন?

ঠাকুর লিখিলেন—“বামাচার মতে যাহারা মহাশঙ্খের মালায় কারণ ব্যবহার করেন, তুলসী ও গঙ্গাজলে তাহার প্রেত শক্তি নষ্ট হয়। তাহাতে তাদের সাধন হয় না। ক্রমে বীরভাব হইতে যখন দিব্যভাবে যায়, তখন কোন প্রভেদ থাকে না।”

১৬ই অশ্বিনের ঝড় : ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা।

বিখ্যাত ১৬ই আশ্বিনের ঝড়ে যে যুগপ্রলয় ঘটিয়াছিল ঠাকুর সে সম্বন্ধে লিখিলেন—‘১৬ই আশ্বিনের ঝড় বুধবার। তখন আদি সমাজ ঝড়ে উলট্‌-পালট্‌ হইতেছে।

সন্ধ্যাকালে ছাদের উপরে গিয়া মনে হইল, অদ্য বুধবার। কোমর বেঁধে বাহির হইলাম। হ্যালিডে ষ্ট্রীটে গিয়া একগলা জল,—ক্রমে সাঁতার। পথের দুই ধারে মৃতদেহ অগণ্য ভাসিতেছে। সমাজে গিয়ে দেখি, সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে গিয়াছে! পরদিন মেডিকেল কলেজে মৃতদেহ রাশীকৃত করিয়াছে। ইংরাজ, ইহুদী, কাফ্রী, মগ, উড়ে, বাঙ্গালী, স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। গঙ্গাতীরে গিয়া দেখি, নৌকা নাই। নৌকার কাঠ ও পেরেক পড়িয়া আছে। জাহাজ রাস্তার উপরে রহিয়াছে। পরদিন নৌকা করিয়া শান্তিপুর গেলাম। পথে অসংখ্য নৌকা ডুবিয়াছে। মৃতদেহ ভাসিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, স্ত্রীলোক; কোট পেণ্টালুন, ঘড়ীর চেন, সঙ্গে নোট, একটি বাবু পড়িয়া আছেন। গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, শৃগাল জলে ভাসিতেছে, রাস্তায় পড়িয়া আছে।—ভয়ঙ্কর দৃশ্য!"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—ঘরে মানুষ স্থির থাকিতে পারেনা, এমন দুর্য্যোগে ঝড়, বৃষ্টি তুফান মাথায় লইয়া, গঙ্গাজলে সাঁতরাইয়া আপনি ব্রাহ্মসমাজে গেলেন কেন?

ঠাকুর—"আমরা যে কয়টি ব্রাহ্ম ছিলাম—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম—সপ্তাহে বুধবার ও রবিবার—উপাসনায় সমাজে গিয়া যোগ দিব।"

প্রশ্ন—ঐ দিনে অন্য সব ব্রাহ্মেরাও কি গিয়াছিলেন?

ঠাকুর—"না আর কেহ যাইতে পারেন নাই। যখন ফিরিয়া আসি, দেখি কেশব বাবু পাল্কীতে যাচ্ছেন। তখন দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে আবার উপাসনা কর্‌লাম।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। আকস্মিক জীবন মরণ সঙ্কটে মৃত্যু স্বীকার করিয়াও বাক্য রক্ষণার্থে বিপদ সাগরে ঝাঁপ দেওয়া বড়ই অদ্ভুত মনে হইল।

বিবেক সংস্কার-গত ঃ ভগবৎ আদেশ—অতি দুর্লভ।

অপরাহ্নে সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক ঠাকুরের নিকট আসিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের পর একটি নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিবেক কি ঈশ্বরের আদেশ নয়?'

উত্তরে ঠাকুর লিখিলেন—"বিবেক ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্রাহ্মণ যদি কোন চণ্ডালের ছায়া মাড়ায় তাহা হইলে সে পাপ মনে করে; বিবেকে বলে, ছায়া মাড়াইও না। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যদি পরে ব্রাহ্ম হয়, তবে তাহার বিবেকে উল্টা বলিবে। তাহাতেই দেখা গেল, যে বিবেক পূর্ব্বে তাহাকে নিষেধ করিত, এখন আবার সেই বিবেকই তাহাকে প্রবৃত্ত করিতেছে।"

ব্রাহ্মটি আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজকাল অনেকেই আদেশ, প্রত্যাদেশের দোহাই দেন। পরমেশ্বরের আদেশ কি প্রকারে বুঝা যায় ?'

ঠাকুর লিখিলেন—প্রত্যাদেশ নানাপ্রকার হয়। পরলোকের আত্মা উপদেশ করিলে এবং কোন মহাত্মা সূক্ষ্ম দেহে থাকিয়া উপদেশ করিলে, তাহাকেও প্রত্যাদেশ বলে। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যাদেশ ভগবৎ-আদেশ। বিশেষ চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে ভগবৎ আদেশ শুনা যায় না। ভগবৎ আদেশ বিবেক নহে, মনের ভাব নহে ভগবৎ আদেশ আত্মাতে শ্রবণ করা যায়। প্রকৃত প্রত্যাদেশ জীবনে তুই একটির অধিক হয় না। একটি হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তি থাকে। 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম'—ইহা বুদ্ধদেব শুনিয়া জগৎকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য, 'জীবে দয়া, নামে রুচি'—ইহা শুনিয়া, জগৎকে মত্ত করিয়াছিলেন। খৃষ্ট 'ভগবৎ সেবাতে জীব উদ্ধার হয়—একজন তুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না।'—এইরূপ যিনি যে প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, তাহা গৃহের কোণে লুক্কাইত থাকে না; তাহা জগৎময় ব্যাপ্ত হয়। ঋষিগণ যে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছিলেন, তাহাই উপনিষদ্‌রূপে বর্ত্তমান। প্রত্যাদেশ সত্য, পতিতপাবন, জ্বলন্ত, উৎসাহপূর্ণ, মধুর। তাহার সহিত কাহারও অনৈক্য হয় না।

বাল্যকালে একজনের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। সেই ব্যক্তির সহিত ঘটনাক্রমে ২০ বৎসর দেখা হয় নাই। একদিন সেই বন্ধু নাম ধরিয়া ডাকিলে, তাহার স্বর কিরূপে চিনিতে পারি—ইহা যেমন প্রকাশ করিতে পারি না—তদ্রূপ ঈশ্বরাদেশ কিরূপে জানা যায় তাহাও কেহ বুঝাইতে পারে না।

ঠাকুরের লেখা খাতা দেখিতে দেখিতে একস্থানে একটি সুন্দর কবিতা দেখিলাম। ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া কোন্ গুরুভ্রাতা বা ভগ্নির এলেখা জানি না। ভাল লাগিল তাই ডায়েরীতে তুলিয়া রাখিলাম।—

ডুবুক তোমার প্রেমে জগৎ-সংসার,
মাতুক তোমার প্রেমে জীবন সবার।
প্রেমময়! প্রেমময় কর এ ভুবন
আলোকিত কর নাথ আমার জীবন।
সকল জীবের প্রভু, করিবারে পার
নিজে হ'লে তুমি নাথ মানুষাবতার।
আঁধারে আলোক তুমি, অসারের সার।
তোমায় ভুলিয়া মোর কিসের সংসার।

ঠাকুরের বন্য মহিষ ও ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা ঃ মনঃ সংযমে অহিংসা ।

প্রচারক অবস্থায় ঠাকুর একবার বাঘ ও বন্য মহিষের সম্মুখে পড়িয়া, যে ভাবে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে অদ্ভুত ঘটনা বলিলেন।—শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঐ বিষয় লিখিয়া রাখিলেন—যথা—'ঠাকুর ময়মনসিংহ হইতে সেরপুর, বগুড়া অঞ্চলে যাইতেছিলেন। সঙ্গে একজন পথ-প্রদর্শক ছিল। কিছুদূর যাইয়া পথ ভুলিয়া কেশেবনের মধ্যে পড়িলেন। দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক বন্য মহিষ লম্ফপ্রদান করিতে করিতে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। তখন কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ বাতাসে কেশেবন ফাঁক হওয়াতে, এক গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। সঙ্গের লোকটিকে বলিলেন,—"চল শীঘ্র ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করি।" সে বলিল—ঐ গর্ত্তে হয়ত কোন হিংস্র জন্তু আছে, উহার মধ্যে যাইয়া কি মারা যাইব? তখন ঠাকুর বলিলেন—"উপরে থাকিলেও তো মারা যাইব? উহার ভিতরে গেলে সুস্থিরভাবে ভগবানের নাম দুই একবারও তো করিতে পারিব!"—এই বলিয়া সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে মহিষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং উহাদিগকে না পাইয়া ক্রোধে শিং ও ক্ষুর দ্বারা সেই স্থানের ভূমি একেবারে চষিয়া চলিয়া গেল। পরে তাঁহারা আস্তে আস্তে গর্ত্ত হইতে উঁকি মারিয়া বন্যমহিষ না দেখিয়া, বাহির হইলেন এবং রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন, দৌড়াইয়া এক হরিণ আসিতেছে। তখন সঙ্গের লোকটি বলিল,—'এই হরিণের পেছনে বাঘ আছে। এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম, আর এক বিপদ উপস্থিত!' এই কথা শুনিয়া, ঠাকুর নিরুপায় দেখিয়া, হাততালি দির্তে লাগিলেন। হরিণ তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল,—তালি শুনিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। কিছু পরেই বাঘ দেখা যাইতে লাগিল। সেও তাহাদের দিকে না আসিয়া হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। এই ভাবে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। পুনরায় সেই সঙ্গীসহ চলিতে চলিতে এক বাগানে আসিয়া সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইলেন। বাগানের লোক উঁহাদিগকে জলযোগ করাইয়া, এখানে স্থান নাই, আমরা টঙ্গে থাকি—বিশেষতঃ এই স্থান অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল বলিয়া, তাঁহাদিগকে এক নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিলেন। এই ঘটনাতে ভগবানের বিশেষ কৃপা উপলব্ধি করিয়া, ঠাকুর ইহা প্রতিদিন স্মরণ করিয়া থাকেন, এইরূপ বলিলেন।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'চেষ্টা তো যতটা পারি করিতেছি, কিন্তু মনঃ সংযম হয় না কেন?'

ঠাকুর—"যাহাকে অপকারী, শত্রু বলিয়া মনে কর, যাহার অনিষ্টচিন্তা কর;—অকপটে তাহার সেবা কর। যাহাতে তাহার হিত হয়, এরূপ আচরণ কর। হৃদয়ের

অভ্যন্তরে শত্রুতা থাকিলেই কিছুতেই মনঃ স্থির হইবে না। ভিতরে পচা ঘা রাখিয়া উপরে মলম দিলে, সমস্ত শরীর পচিয়া যায়।”

অর্থ বুঝিয়া নাম করার ফল ঃ কর্ম্ম ও নির্ভরতা।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—অন্য সাধন-ভজন না করিয়া শুধু যদি ভগবানের নাম করা যায়—তাহাতে কি কল্যাণ হয় না? ভগবানের নাম করার অধিকার তো সকলেরই আছে?

ঠাকুর লিখিয়া উত্তর দিলেন,—“পাঁচ বৎসরের শিশু, তাহাকে ক্ষেত্র-তত্ত্ব কিংবা জ্যোতিষ শিক্ষা দিলে ফল হইবে না। অথচ সাধারণ সত্যে সকলেরই অধিকার আছে। জগৎকে একমাত্র নাম উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু কাহার নাম,—ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হয়। এক নামে অনেক বস্তু বুঝায়। যেমন হরি শব্দে সূর্য্য, চন্দ্র, অশ্ব, সিংহ, বানর, এ সমস্ত বুঝায়, এবং পাপহারী ভগবানকেও বুঝায়। এজন্য নামের সঙ্গে সেই নামের বাচ্যকে, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইতে হয়। ব্রাহ্মনামে—জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে, আত্মা, জ্ঞান, বেদ এরূপ অনেক অর্থ আছে। এজন্য প্রথমেই বস্তুজ্ঞানের প্রয়োজন। এই জগতের একজন কর্ত্তা আছেন,—এই বিশ্বাস যাহার আছে তাহাকে কেবল নাম উপদেশ দিলেই হয়; অন্য উপদেশের প্রয়োজন হয় না। সকলেই মুখে বলে, একজন কর্ত্তা আছেন;—ইহা বিশ্বাস নহে। কারণ, একটু বিপদ্ আপদ্ হইলেই আর কর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস রাখিতে পারে না। শিশু যেমন মাতার প্রতি নির্ভর করে, সেইরূপ স্বাভাবিক নির্ভর হইলে, তখন যুক্তি-তর্ক অন্তর্হিত হয়। যে আর কিছু জানে না—কেবল শিশুর ন্যায় রোদন করে,—সেই শিশুর ন্যায় অন্তরের অবস্থা হইলেই,—এক নামেই নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।”

একটু অপেক্ষা করিয়া ঠাকুর নিজ হইতেই আবার লিখিলেন—“লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম করিলে, তাহাতে ক্ষতি হয় না, উপকার হয়। তবে নিজের বিবেক মত না চলিয়া যদি মনুষ্যের মতে ও আজ্ঞানুসারে ধর্ম্ম করি, তাহাতে হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া নিজের বিবেক মত চলিলে বিশেষ উপকার হয়। ধর্ম্মের জন্য যাহা ভাল লাগিবে তখনই তাহা করিবে।—মানুষের দিকে চাহিবে না। মানুষ যখন অধর্ম্ম করে, প্রথমে নারায়ণ তাহাকে নিবারণ

করেন।—যখন কিছুতেই শুনেন না, তখন নারায়ণ পলায়ন করেন। নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও ধীরে ধীরে চলিয়া যান। থাকে কেবল পূর্ব্ব গৌরব। পুরাতন গৌরব বহন করিতে করিতে মস্তকে ক্ষত হয়—ক্ষতের তুর্গন্ধে লোকে নিকটে যাইতে দেয় না, তাহাতে হয় বিবাদ। লোকেরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়; ঘরে এসে গৃহিণীকে প্রহার করে। নল-রাজা পর্য্যন্ত ঘোল খাইয়াছেন। সুরাপান, জুয়া-খেলা, ব্যভিচার তুঃখের মূল। নাম যত করিবে ততই উপকার পাইবে। মনুষ্যের নিজের ক্ষমতা যতক্ষণ আছে, তাহাকে পরিশ্রম করিতেই হইবে। এখন 'নির্ভর'—ও সব কথা কিছু নয়।

দাবানল হইতে মহাপুরুষের কৃপায় রক্ষা।

আজ ঠাকুর কথায় কথায় তাঁর জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিলেন। আমরা সকলেই শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। ঘটনাটি এই :—'দীক্ষালাভের পূর্ব্বে সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতে ঠাকুর একবার চন্দ্রনাথের দিকে গিয়াছিলেন। লোকের মুখে শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে, সময় সময় প্রাচীন মহাপুরুষদের দেখা যায়। নানাপ্রকার বাঘ, ভল্লুক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পাহাড় পরিপূর্ণ। বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া ঐ পাহাড়ে কাহারও যাওয়া সম্ভব নয়। ঠাকুর মহাপুরুষদের দর্শন করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। অদৃষ্টে যাহা হয় হবে স্থির করিয়া, তিনি একাকী এ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠিলেন। চারিদিক তাকাইয়া দেখিলেন, অসংখ্য পাহাড়শ্রেণী, একদিকে একটি নদী। নদীর উপরে পর্ব্বত সোজাভাবে উঠিয়াছে। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম দেখিয়া ঠাকুর স্থির হইয়া বসিলেন এবং ধ্যানস্থ হইলেন। এই সময়ে হঠাৎ পাহাড়ে আগুন লাগিল। আগুন দেখিতে দেখিতে বিস্তারলাভ করিয়া, পাহাড়ের তিনদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ঠাকুর এই বিপদ দেখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অগ্নি বায়ু সংযোগে উর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল। ঠাকুর রাস্তার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, দাবানলে সমস্ত পাহাড় অগ্নিময় হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য বন্য জন্তু রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে অগ্নির দিকে চাহিয়া আছে। অগ্নি ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে উর্দ্ধদিকে 'হুহু' শব্দে উঠিয়া পড়িতেছে। বাঘ, ভল্লুক, হাতী, গরু প্রভৃতি বন্য জন্তু সকল একটু পরেই পর্ব্বতের উপরে চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঠাকুর তখন পর্ব্বতের ধারে নদীর উপরে বসিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। অগ্নির উত্তাপ পর্ব্বতের উপরে অসহ হইয়া উঠিল। এই সময়ে অকস্মাৎ কে যেন দৌড়িয়া আসিয়া, ঠাকুরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং সহস্রাধিক ফুট উচ্চ পর্ব্বত হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন। শূন্যপথে ঠাকুর সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। মহাপুরুষ ঠাকুরকে নদীর পাড়ে রাখিয়া

অদৃশ্য হইলেন। সংজ্ঞালাভের পর ঠাকুর নদীর ধারে ধারে চলিয়া লোকালয়ে আসিয়া পঁহুছিলেন। ঠাকুর এই মহাপুরুষটিকেও প্রতিদিন স্মরণ করিয়া থাকেন।

নানক ও কবীরের ধর্ম্ম।

প্রশ্ন—'কবীর ও নানকের ধর্ম্মে কি কোন পার্থক্য আছে? যত সাধারণ লোক কবীর পন্থী, নানক-সাহীরা সব ভদ্রলোক।—এ কেন?

ঠাকুর লিখিয়া উত্তর করিলেন—"কবীর ও গুরু নানকের ধর্ম্মে প্রভেদ নাই। কবীর জোলা ছিলেন,—এজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তাঁহার মত গৃহীত হয় নাই। উত্তর-পশ্চিমে মেথর, ডোম, চামার এ সমস্ত জাতি কবীর পন্থী। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে, তাহাদের পদধূলি না লইয়া থাকা যায় না। গুরু নানক ক্ষত্রিয় ছিলেন; এজন্য সকলের মধ্যে তাঁহার মত অবাধে গৃহীত হইয়াছে। গুরু নানক কথায় কথায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এ সকল মান্য করিয়া তদনুসারে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি পুনঃপুনঃ 'মনমুখ' অর্থাৎ শাস্ত্রহীন পথ,—ইহার অপকারিতা দেখাইয়াছেন।"

প্রশ্ন—'শুনিতে পাই অমৃতসরের মন্দিরে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা অবাধে ভজন চলিতেছে।—ইহা কি প্রথম হইতেই?'

ঠাকুর—"গুরু নানকের পর যিনি চতুর্থ গুরু হ'ন—তাঁহার নাম গুরু রামদাস। তিনি অমৃতসরে গুরুদরবার মন্দির ও সরোবর স্থাপন করিয়া, সমস্ত দিন রাত ভজন প্রচলিত করেন। চার দণ্ডমাত্র অবকাশ থাকে। তখনও মন্দিরে কেহ কেহ ধ্যানস্থ থাকেন। সমস্ত দিন রাত্রি সঙ্গীত, পাঠ, স্তব, আরতি, একসঙ্গে মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তন,—এই চার শত বৎসর সমান উৎসাহে চলিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিকমাস শেষ হইতে চলিল। মফঃস্বল হইতে যে সকল গুরুভ্রাতারা পূজার ছুটিতে ঠাকুর দর্শনে আসিয়াছিলেন, ছুটি শেষ হওয়াতে, একে একে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। শুনিতেছি ঠাকুর এখন আর গেণ্ডারিয়া যাইবেন না। গেণ্ডারিয়া আশ্রম এখন প্রায় শূন্য। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় আশ্রম দেখাশুনা করেন। ঠাকুর যখন গেণ্ডারিয়া হইতে অসুস্থাবস্থায় কলিকাতা আসেন, তখন শান্তি, জগবন্ধুবাবু, কুতু, দিদিমা, যোগজীবন, শ্রীধর, বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস ও শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে থাকা অসুবিধা বোধ করিয়া পূর্ব্ব হইতে কলিকাতা আসিয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর কলিকাতা আসার পর তাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গেই ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ বিশ্বাস মহাশয় অভয়বাবুর

বাসায় অবস্থান করিতেছেন। সামান্য বেতনে একটি চাকরী জুটাইয়া নিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয় আহারাদির ব্যবস্থা অন্যত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সময় এখানেই থাকেন। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ঠাকুর অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার সেবা করিতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর সুস্থ বলিয়া তাহার কোন সেবারই এখন প্রয়োজন হয় না। প্রত্যহ সকালে যথাসময়ে চা প্রস্তুত করিয়া দেওয়াই, বিধু বাবুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। শুনিতেছি, পরিবারাদি গেণ্ডারিয়ায় রাখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শীঘ্রই তিনি একবার তথায় যাইবেন। আমারও একবার বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইতেছে মাতাঠাকুরাণী আমাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমারও সময় সময় মাতাঠাকুরাণীর কথা মনে হইলে দেখিবার জন্য প্রাণ অস্থির হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে এই মাসের শেষাশেষি একবার বাড়ী যাইব মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলাম।

শঙ্করাচার্য্যের পরিবর্ত্তন।

আজ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরকে বলিলেন—'শঙ্করাচার্য্য তো অদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাঁহার স্তোত্রের ন্যায় সরস মধুর ও সুললিত স্তোত্র তো খুঁজিয়া পাই না?'

ঠাকুর লিখিলেন—"তিনি প্রথমে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া, তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। পরে হালে পানি না পাইয়া যখন দ্বৈতভাব আশ্রয় করিলেন, তখনই তাঁহার প্রাণ সরস হইল। আমাকেই কেন দেখ না। কালাপাহাড় তো হইয়াছিলাম। কেবল বলিতাম 'ভাঙ্গ্ রে ভাঙ্গ্ রে! ঠাকুর-দেবতা কিছু নয়, কোন অবতার কিছু নয়—কোন তীর্থ কিছু নয়। এখন দেখ কি অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিতে পাইয়াছি, ইহা সমস্তই সত্য। শুষ্ক মতের উপর মানুষ কতদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?"

সাধন ভজনের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ।

সাধন, ভজন, তপস্যার উপযোগী স্থান কোথায়—জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর লিখিলেন—সাধন-ভজনের স্থান, যথার্থ উপযুক্ত হিমালয়। তারপর নর্ম্মদা, গোদাবরী, গঙ্গা, যমুনা এই সকল নদীতীরে প্রস্তরময় স্থান ভাল। পাঞ্জাবে রাভী নদীর তীরে স্থান ভাল। বঙ্গদেশ নানা কারণে উপযুক্ত নহে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা—সমস্তই বিরোধী। প্রথমতঃ বঙ্গদেশে কেবল অনার্য্য লোকের বাস ছিল। এদেশে যে সকল আর্য্য আসিলেন, তাঁহারা শাপগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদের বাসস্থান গঙ্গা

যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে বরিশাল যাইতে যে খাল ছিল, তাহা এখন কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা পদ্মার শাখা। নদীর নাম 'হাউলিয়া'।

ত্রিপুরার অস্থি প্রস্তর হইয়াছে। কতক অস্থি, কতক প্রস্তর এরূপও আছে। ত্রিপুর অসুর ছিল। তিনটা পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল;—লৌহপুরী, রৌপ্যপুরী, সুবর্ণপুরী। এই জন্য তাহার নাম ত্রিপুর হইয়াছিল। মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতার সঙ্গে মিলিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন; এ কারণ মহাদেবের নাম ত্রিপুরারি।

প্রতিগ্রাম ৪ শত বৎসর পরে পরিবর্ত্তন হয়—ইহার মধ্যে জঙ্গল সহর হয়, সহর জঙ্গল হয়। যেখানে পাহাড় ছিল সেখানে নদী। দারজিলিঙ্গে বসিয়া পর্ব্বত দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বোধ হইল যেন সমুদ্রের ঢেউ চলিয়া যাইতেছে—এক শৃঙ্গ, শৃঙ্গ, শৃঙ্গ। দারজিলিঙ্গে গিয়া যত নীচে ছিলাম, সমস্ত বৃক্ষলতা ঘর-বাড়ী, নদী প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ দেখিলাম। ক্রমে উঠিতে উঠিতে যখন উচ্চ শিখরে উঠিলাম তখন সমস্ত একাকার বোধ হইল। একটি আকাশে যেন সমস্ত আবৃত হইয়াছে। এইরূপ ধর্ম্মের সোপানে সোপানে বাস্তবিক সেই অনন্ত, ভূমা পুরুষের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাঁহার সত্ত্বাতে সমস্ত ঢাকা, নিশ্চয়ই বোধ হইবে। তখন পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করাও অসাধ্য।

ঠাকুর আজ হিমালয়ে নীলপদ্ম বিষয়ে লিখিলেন—"হিমালয়ে বরফের উপর বিস্তর নীলপদ্মের বন। পদ্ম ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা হইতেছে। হিমালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে তাহাতে পদ্মবন। বরফ পড়িলে পদ্ম বরফ ভেদ করিয়া প্রকাশ পায়। হিমালয়ে একপ্রকার ঝিঁ ঝিঁ পোকা আছে, তাহাকে দেবঘণ্টি বলে। দূর হইতে মনে হয়, কোন দেবালয়ে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে,—এই তিনবার শব্দ করে। ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে এক প্রকার ঝিঁ ঝিঁ পোকা আছে—তাহারা যখন শব্দ করে, মনে হয় যেন তানপুরা বাজিতেছে।

নরোত্তম দাস ঠাকুরের কথা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমৎ নরোত্তম দাস ঠাকুরকে মহাপ্রভুর আবেশাবতার বলিয়া থাকেন। তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ প্রার্থনাবলী অতুলনীয় মহারত্ন। তিনি সারাজীবন ওরূপ ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া গেলেন

কেন, জানিবার জন্য কেহ কেহ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর নরোত্তম দাস ঠাকুরের অনেক কথা বলিলেন। তন্মধ্যে যাহা আমার প্রাণে বিশেষভাবে স্পর্শ করিল মাত্র তাহাই লিখিতেছি।

শুনিলাম, নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর যখন পরিচয় পাইলেন এবং সগণে তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন জানিলেন, তখন 'হায় কি হইল' তাঁর সঙ্গ অথবা তাঁর সঙ্গীর সঙ্গ আমি পাইলাম না, এখন এ জীবনে আর কি কাজ! এই প্রকার আক্ষেপ করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে মহাপ্রভুগণের ভিতরে একমাত্র শ্রীমৎ লোকনাথ গোস্বামী জীবিত ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকনাথ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে একখানা কুটিরে নির্জ্জন ভজনে অহর্নিশি মগ্ন থাকিতেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর রাজপুত্র ছিলেন। সেই সময়ে ১৪ লক্ষ টাকা তাঁর সম্পত্তির আয় ছিল। তিনি সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিরাগী হইয়া সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে পঁহুছিয়া জানিলেন অতি বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী জীবনে কাহাকেও দীক্ষাদান করেন নাই আর করিবেনও না। নরোত্তম ঠাকুর অনেক কান্নাকাটি করিয়াও তাঁহার আশ্রয় পাইলেন না। পরে স্থির করিলেন—তাঁর আশ্রম সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। আশ্রমে যত জলের প্রয়োজন হইত; নরোত্তম দূর যমুনা হইতে তাহা কলসী ভরিয়া নিয়া আসিতেন। উদয়াস্তে নরোত্তম দাসের মস্তকের ভিজা বীড়া খুলিবার অবসর হইত না। একদিন লোকনাথ প্রভু ধ্যানাবস্থায় দেখিলেন নরোত্তমের মস্তকে নিয়ত ভিজা বীড়া থাকার ফলে ভয়ানক ঘা হইয়াছে এবং তাহাতে পোকা পড়িয়াছে। কিন্তু নরোত্তমের তাহাতে খেয়াল নাই, তিনি তাহা জানিতেও পারেন নাই। দয়ালু লোকনাথ প্রভুর প্রাণ তখন কাঁদিয়া উঠিল। তিনি নরোত্তমকে ডাকিয়া আনিয়া দীক্ষা দিলেন। এবং একনিষ্ঠ হইয়া একান্ত প্রাণে ভগবানের সেবাপূজা ধ্যান ধারণায় দিন অতিবাহিত করিতে আদেশ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর তাহাই করিতে লাগিলেন। একদিন একটি পিপাসার্ত্ত লোক জলপান করিতে কুঞ্জে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাহা শুনিয়া পূজা ছাড়িয়া উঠিলেন; এবং সুশীতল জল পিপাসার্ত্তকে পান করাইয়া ঠাণ্ডা করিলেন। লোকনাথ প্রভু নরোত্তমের ঐ কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া কহিলেন,—বাবা নরোত্তম! তুমি বাড়ী চলিয়া যাও। সেখানে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ক'রে সেবা পূজা কর। আর অতিথিশালা ক'রে অতিথি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গাল, দুঃখী, দরিদ্রদের পরিপাটী ক'রে সেবা কর। তাহাতেই তোমার যথার্থ কল্যাণ হবে। একনিষ্ঠ হ'য়ে একান্তভাবে ভগবানের সেবার অধিকার অনেক পরে। সেই অধিকার জন্মালে তার আর অন্য কর্ত্তব্য থাকে না। ভগবানের সেবা ছাড়িয়া যাহাদের লোক-সেবার প্রবৃত্তি হয়, লোক-সেবাই তাহাদের কর্ত্তব্য। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালিলে শাখা প্রশাখা ফুল ফল সকলেরই তাহাতে পুষ্টি হয়। এই জ্ঞান জন্মালে সে আর অন্য পূজা করিতে পারে না। নরোত্তম দাস ঠাকুর গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে আসিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন গুরুর আদেশমত কাটাইলেন। তাঁর প্রার্থনা সকল পড়িয়া কান্না সংবরণ করা যায় না।

বিধিহীন ভক্তি উৎপাতের কারণ।

প্রশ্ন—'সাধারণ বাউল বৈষ্ণব ও সাধারণ লোকদের মধ্যেও খুব ভাব-ভক্তি দেখা যায়—অথচ আমাদের তাহা হয় না কেন ?'

ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন—"শ্বাস প্রশ্বাসে নাম জপ করাই পরম সাধন। গোস্বামী পাদগণ লিখিয়াছেন যে, স্মৃতি-শ্রুতি, পঞ্চরাত্র বিধি বিনা ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের কারণ হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (বৈষ্ণবদের ভক্তি-দর্শন শাস্ত্র) লিখিয়াছেন যে, বাহিরের নৃত্যাদি দেখিয়া ভাব অনুমান হয় না। ভাবের লক্ষণ,—কর্ম্ম করিতে করিতে যে বিবেক বৈরাগ্য সময় সময় প্রকাশ হয়, সেই সব ? নিষ্কাম-ভাবে করিতে ইচ্ছা হইতে থাকে।—নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম শেষ হয়—তখন বিশ্বাসের রাজ্য।"

একটু থামিয়া ঠাকুর বৈষ্ণবদের ভজন সাধন ও বেশ সম্বন্ধে লিখিলেন—"হরিভক্তি-বিলাসে যে প্রণালীতে ভজন-সাধন ব্যবস্থা দেখা যায়, সে প্রণালী এখন প্রচলিত নাই—বিরল। পূর্ব্বে পণ্ডিতদের মস্তকের মধ্যে শিখা থাকিত,—চারিদিকে ক্ষৌর করা হইত। ইহাই মহাপ্রভুর সময়ে সকলেই ভদ্রপণ্ডিত বেশ বলিয়া ধারণ করিতেন। এখন বৈষ্ণবদিগের বেশের মধ্যে গণ্য।"

বৌদ্ধসাধন প্রণালী শাস্ত্রানুমোদিত কি না ?

একজন গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৌদ্ধসাধন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কি না ?' কোন বেদে বা পুরাণে কি তাহার বিষয়ে উল্লেখ আছে ?'

ঠাকুর—"হিমালয়ের বৌদ্ধ লামাদিগের মঠ আছে। আমি সেখানে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। তাহাদের সাধনপ্রণালী দেখিয়া আনন্দ হইল। শাক্যসিংহ প্রথম সাধনে ঐ জোয়ার-ভাটা ভোগ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি পূর্ব্ব শিক্ষা, যাহা আত্মার অঙ্গ হয় নাই,—তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন এক একটি সত্য লাভ হইতে লাগিল, এবং তাহাই আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া, বুদ্ধত্ব আলিঙ্গন করিল। এখনও বৌদ্ধ লামাগণ ঐ প্রণালীর অনুসরণ করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ যদি দেখিতে চান তবে পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া হিমালয়ে

বৌদ্ধ মঠে গিয়া, অধ্যয়ন করুন। অনুবাদে অনেক ভুল। লামা গুরুদিগের আচার ব্যবহার, তাদের সাধন প্রণালী না দেখিলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না।

বৌদ্ধশাস্ত্র সমস্ত যোগমূলক। অথর্ব্ববেদে যোগের উপদেশ অধিক। যত তন্ত্র সে সব তাপনী শ্রুতির অনুগত। বৌদ্ধদিগের উপাসনা এ তন্ত্রমূলক। যখন বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ হয়, তখন ঐরূপ বচন পুরাণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হয়। শাস্ত্র নিজে পড়িলে বুঝা যায় না। অধ্যাপকের নিকট পড়িলে শাস্ত্রের সামঞ্জস্য বুঝা যায়।”

অন্য জীব অপেক্ষা মানুষ বড় কিসে ?

আজ ঠাকুর পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গাদির কৃতজ্ঞতা ও অদ্ভুত কার্য্যাদি বিষয়ে গেণ্ডারিয়ার নানা ঘটনা তুলিয়া জানাইলেন ;—“পশু-পক্ষী,—ইহাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা মনুষ্য অপেক্ষা অধিক। এজন্য নিকটে যে মনুষ্য দ্বারা একটি অন্নও পাইয়াছে, তাহাকে তাহারা স্মরণ করে। মৃতব্যক্তির জন্য যতক্ষণ দুঃখ থাকে, ততক্ষণ তাহারা নীরব থাকে—ইহাই স্বাভাবিক অশৌচ। ইহারা অশৌচান্তে স্নান করে। বড় ইন্দুর, বাচ্চা ইন্দুরকে আহার আনিয়া দিতেছে। মাকড়সা তাহার জাল পাতিয়াছে—খাবার পড়িবার জন্য। জালের এক অংশ বাচ্চা মাকড়সাদের খেলিবার জন্য, খাবার সংগ্রহের জন্য অপর অংশ। ঢাকার কুটীরের মধ্যে ইন্দুর পিপীলিকা মাকড়সা এবং অন্যান্য কীট কিছু খাবার আমার জন্য কুটীরে আনিলে, ইন্দুর বাহিরে আসিয়া কিচ্‌কিচ্‌ করে —একখানা রুটী দিলে তবে যাইবে—নতুবা কিচ্‌কিচ্‌ করিয়া কাঁদিতে থাকিবে। পিঁপড়া সকল খাবার না পাইলে আসনে, শরীরে উঠিয়া বিরক্ত করে। মাকড়সা জালে দুলিতে থাকে। অল্প কিছু পাইলে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। মানুষ ও ইহাদের মধ্যে সদ্ভাব আছে। সেইরূপ সর্প, ব্যাঘ্র ইহাদের সঙ্গেও মানুষের সদ্ভাব আছে। সমস্ত জীব জন্তু, নিজের নিজের কার্য্যে তাহারা শ্রেষ্ঠ। আমি মাকড়সার মত জাল বুনিতে পারি না ; বাবুই পক্ষীর মত বাসা করিতে পারি না। চিনি ও ধুলা মিশাইয়া পৃথক করিতে আমার ক্ষমতা নাই, কিন্তু পিপীলিকার আছে।”

ঠাকুর মাকড়সা সম্বন্ধে গেণ্ডারিয়ায় একদিন লিখিয়াছিলেন,—“আমগাছ তলায় তুলসীগাছে একটি মাকড়সা বহুদিন পর্য্যন্ত আছে। দুই দিবস হইতে বাসা পরিবর্ত্তন

করিয়া আমগাছের আড়ালে আসিয়াছে। কেন বাসা সরাইল বুঝিতে পারি নাই। কল্য রাত্রিতে যখন ঝড় হইল তখন বুঝিলাম যে, ঝড় হইবে পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, এমন স্থানে বাসা করিয়াছে যেখানে ঝড় না লাগে। তুই তিন দিন পূর্ব্বে ঝড় হইবে জানিয়াছে। কোন্ দিক হইতে ঝড় বহিবে তাহাও জানিয়াছে। এখন দেখ, মাকড়সা মনুষ্য হইতে কিসে ক্ষুদ্র। ভগবানের অনন্তরাজ্যে কেহ ছোট বড় নহে। সকলে এক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। প্রত্যেক জীবজন্তুর স্বীয় স্বীয় জীবন যাপনে উপযোগিতা প্রত্যেককে প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য বৃথা অহঙ্কার করে।”

রেবতী বাবুর কীর্ত্তন ঃ অসাধারণ কণ্ঠধ্বনি।

ঠাকুর যখন ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজে প্রচারক নিবাসে ছিলেন সেই সময় হইতেই দেখিয়া আসিতেছি,—একটি দিনের জন্যও ঠাকুরের সন্ধ্যা কীর্ত্তন বাধা যায় নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে ধূপধুনা গুগ্‌গুল চন্দনাদি জ্বালাইয়া, ধুনচি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হয়। ঠাকুর উহা নমস্কার করিয়া নিজে-নিজে করতাল বাজাইয়া গাহিয়া থাকেন—“হরি সে লাগি রহরে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই”; “প্রভুজি য়্যায়সা নাম তোঁহার, পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার।” ঠাকুরের নিয়মিত সন্ধ্যাকীর্ত্তন হইয়া গেলে সম্মিলিত গুরুভ্রাতৃগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এই কীর্ত্তনে এক একদিন এক এক প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস ও আনন্দ দেখা গিয়াছে। ঠাকুরের একান্ত প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয় যখন খোলে তালি দিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন—গৃহস্থিত বিক্ষিপ্ত, চঞ্চলচিত্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর ক্ষণকালের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়ে; তখন তাহারা উৎকণ্ঠার সহিত অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের পানে তাকাইতে থাকেন। রেবতীবাবুর কণ্ঠনাদের সহিত ঠাকুরের অন্তরের কি যোগাযোগ আছে জানি না। তাঁহার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলেই ঠাকুরের স্থির কলেবর চঞ্চল হইয়া পড়ে; এবং উহা দক্ষিণে বামে হেলিতে দুলিতে থাকে। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং দেহস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মাংসপেশী থর্ থর কম্পিত হওয়ায়, ঠাকুরকে অস্থির করিয়া তোলে। তিনি আর আসনে বসিয়া থাকিতে পারেন না।—একেবারে লাফাইয়া উঠেন এবং নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। তাড়িত যন্ত্রের সহিত সূক্ষ্ম তার সংযোগে বিবিধাকার পুতুল যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে নৃত্য করিতে থাকে, রেবতীবাবুর ভাবোদ্দীপক অসাধারণ কণ্ঠধ্বনি ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দনায় পরিপুষ্ট হইয়া, অলক্ষিত সূত্রে ভক্তবৃন্দের চিত্ত ঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট করিয়া ভাবাবেগে প্রমত্ত করিয়া তোলে। তখন গুরুভ্রাতারা ভাবাবেশে মত্ত হইয়া, নানা প্রকার নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। ঠাকুর হরিধ্বনি করিয়া দক্ষিণ হস্ত যখন পুনঃপুনঃ সম্মুখের দিকে সঞ্চালন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন, তখন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির

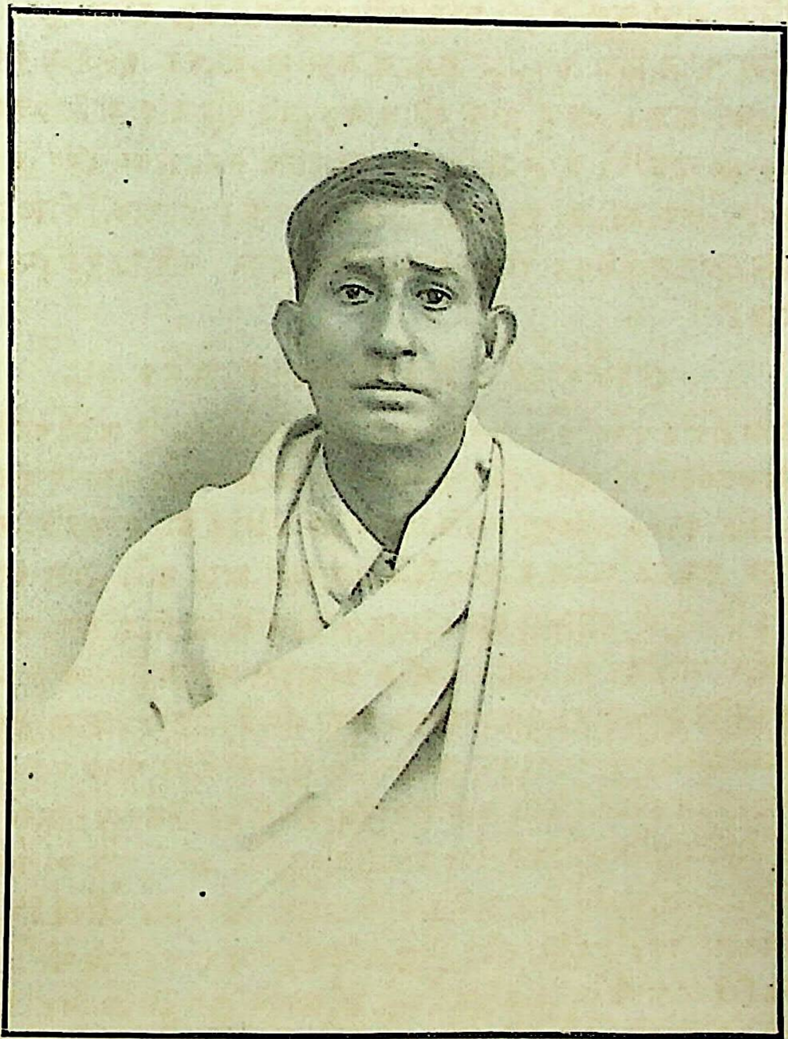

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন

পৃষ্ঠা ২২২

আনন্দপ্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলে। গুরুভ্রাতারা নানা প্রকার হুঙ্কার গর্জ্জন এবং অদ্ভুত আস্ফালন করিতে করিতে ভাবোন্মত্ত অবস্থায়, ঠাকুরকে পরিক্রমণ পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন। নানাভাবের সমাবেশে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে। তিনি ক্ষণকাল কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় পড়িয়া যান। সংকীর্ত্তনের আনন্দ কোলাহলও ক্রমশঃ নীরব হয়। গুরুভ্রাতারাও ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হন।

আজ ছুটীর দিন। সকালেই আজ বহু স্ত্রীলোক পুরুষ ঠাকুর দর্শনার্থে সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড হলরুমটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বারান্দায়ও দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। রেবতীবাবু গান করিবেন শুনিয়া, সকলেই অতিশয় আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের চা সেবার পর মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর দুই একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। রেবতীবাবু গাহিলেন :—

তব শুভ সম্মিলনে, প্রাণ জুড়াব হৃদয় স্বামী।
কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি॥
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে,　　গোপীজনগণ সনে,
তোমার নৃত্যপদ সেবি প্রভু, কৃতার্থ হইব আমি॥
হৃদয়ে ধরি' শ্রীপদ,　　বিপদ ঘুচাব হে,
আমার পাপ-পরিতাপ যাবে, জুড়াব তাপিত প্রাণী॥
অখিল লীলারসে,　　ডুবাব মানস হে,
আমি সকল ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি॥
(আমার আঁধার ঘরের মাণিক হ'য়ে।)
পিরীতির সেজ,　　হৃদয়ে বিছাব হে
রসে মিশামিশি হ'য়ে, হব আমি তুমি, তুমি আমি।

গানের দুই এক পদ গাইতেই ঠাকুরের চেহারা অন্যপ্রকার হইয়া গেল। তাঁহার প্রেম-বিহ্বল মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইল; ওষ্ঠধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ শরীরটি গৌরবর্ণ হইল, হর্ষপুলকে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিতে লাগিল। ঠাকুর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দক্ষিণ হস্ত ললাট প্রান্তে সংস্থাপন পূর্ব্বক, নেত্রাবরণ করিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বামহস্ত কটিদেশে বিন্যাস করিয়া মধুরভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে স্ত্রীলোক পুরুষের কান্নার রোল উঠিল। ঠাকুর তখন আচম্বিতে বহির্ব্বাস মস্তকোপরি তুলিয়া দিয়া, ঘোমটা টানিতে লাগিলেন; এবং বিবিধ প্রকারে অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরের দীর্ঘাকৃতি প্রকাণ্ড শরীরটি, দেখিতে দেখিতে খর্ব্ব হইয়া পড়িল, একটু পরেই ঠাকুর উপুড় হইয়া বামহস্তে বহির্ব্বাসের আঁচল ধরিয়া দক্ষিণ

হস্তে টোপর হইতে মুড়ি মুড় কি বাতাসা ছড়ানোর মত সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে কি যেন ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে কি যে কাণ্ড উপস্থিত হইল প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

আজ হুঙ্কার, গর্জ্জন নাই—উদ্দণ্ড লম্ফ ঝম্ফ নাই। নূতন ভাবে, বিচিত্র প্রকারে ঠাকুরের নৃত্য দেখিয়া, অনেকে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও ভাবাবেশে ধরাশায়ী হইলেন—এমনটি আর কখনও দেখি নাই। ধন্য রেবতীবাবু! ধন্য রেবতীবাবু! উঁহার কীর্ত্তনে ঠাকুরের যে আনন্দ তাহার একদিনের চিত্রও যেন স্মৃতিতে রাখিয়া জীবন শেষ করিতে পারি!—ঠাকুর! এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শুনিলাম রেবতীবাবুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া একটি সাধু আকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি, বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী রাস্তায় সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দরজার পাশে থাকিয়া তিনি কিছুক্ষণ রেবতীবাবুর গান শুনিলেন। পরে যাওয়ার সময়, সেখানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে বলিলেন—‘যিনি গান করিতেছেন, সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার তেমন দক্ষতা না থাকিলেও,—স্বরটি কিন্তু অসাধারণ!—শুধু ভগবৎ ভজনের জন্যই ভগবানের বিশেষ কৃপায় কোন কোন ভাগ্যবান এই প্রকার কণ্ঠনাদ লাভ করেন। এই নাদে ভগবান আকৃষ্ট হন,—সঙ্গীত শাস্ত্রে আছে।’

ঠাকুর আজ কথা প্রসঙ্গে লিখিলেন—“ভগবানের কার্য্য দেখিয়া লোক এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, ভগবানের প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয় না। রবিঠাকুর গান করিলেন, লোকে কত প্রশংসা করে। ভগবান কি আশ্চর্য্য কৌশলে বাক্‌যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার মনের যেমন ভাব হইবে—সেইরূপ বাক্‌যন্ত্রে শব্দ হইবে। রাগ-রাগিণীর কোন রূপ নাই,—মানুষ মনের ভাব মাত্র। সেই ভাব মনে আসিবামাত্র—নানা রাগ-রাগিণী কণ্ঠার শিরাতে বাজিতে থাকিবে। নিরাকার ভাব সাকার হইয়া রাগ-রাগিণীরূপে পরিণত হইতেছে। ইহার প্রশংসা কেহ করে না। কণ্ঠার শিরা কয়েকটিমাত্র—তাহাতে সমস্ত সুর প্রকাশ হয়। উচ্চ, নীচ, হ্রস্ব, প্লুত-বিবিধ শব্দ—ঐ শিরাগুলিতে বাজিতেছে।”

আমার ডায়েরী—ঠাকুরের স্পর্শ।

অদ্য আহারান্তে মধ্যাহ্নে ঠাকুর আসনে বসিয়া আছেন, ঘন ঘন আমার বাঁধান সুন্দর ডায়েরীখানার উপর নজর করিতে লাগিলেন। পরে আমাকে বলিলেন—‘ওখানা কি গ্রন্থ?’ আমি বলিলাম, আমার ডায়েরী। ঠাকুর তখন হাত পাতিয়া বলিলেন—‘দেখি’। আমি ঠাকুরের হাতে ডায়েরীখানা দিলাম। ঠাকুর উহার গোড়ার দিকে একবার খুলিয়া অমনি কতকগুলি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দিলেন। সেখানেও ২।৪ সেকেণ্ড নজর করিয়া একেবারে শেষ দিকে খুলিলেন। তখনই আবার উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—‘বেশ! রেখে দেও।’

ঠাকুর পড়িলেন না, অথচ ত্থ' তিনবার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দিলেন কেন বুঝিলাম না। ঠাকুরের অযাচিত স্পর্শে ডায়েরী যে আমার পরম পবিত্র হইয়া গেল, সন্দেহ নাই। আমাকে উৎসাহ দিতেই বুঝি ঠাকুর এরূপ করিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর একবার বলিয়াছিলেন—'ব্রহ্মচারী যা লিখ্‌ছেন একশত বৎসর পরে তা দেশের শাস্ত্র হ'বে।' ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, বারদীর ব্রহ্মচারী বোধ হয় কোন গ্রন্থ লিখিতেছেন। ঠাকুর তাঁহারই কথা বলিলেন। এখন পর্য্যন্ত কিন্তু ওরূপ গ্রন্থের কোন খবর পাই নাই। পরিহাসচ্ছলেও যিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেন নাই, একসময়ে শাস্ত্র-পুরাণের মত তাঁর বাক্য যে লোকে সমাদরে গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

ঠাকুরের কুম্ভে গমনের হেতু ঃ গোঁসাই-শূন্য গেণ্ডারিয়া।

প্রয়াগে এবার পূর্ণকুম্ভ। শুনিতেছি ঠাকুর কুম্ভমেলায় যাইবেন। ঠাকুর কুম্ভমেলায় কেন যাইবেন, জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"অতি প্রাচীন ৩।৪টি মহাপুরুষ এবার কুম্ভমেলায় আস্‌বেন। লোকালয়ে কখনও উঁহারা আসেন নাই। বদরিকাশ্রম হইতে শত শত ক্রোশ উত্তরে হিমালয়ের দুর্গম স্থলে উঁহারা থাকেন। আমাকে দয়া ক'রে কুম্ভমেলায় যে'তে আদেশ ক'রেছেন,—তাই তাঁদের দর্শন কর্‌তে যা'ব।"

আমি—মহাপুরুষেরা আস্‌বেন কেন ? তাঁরা কি কুম্ভে স্নান কর্‌তে আস্‌বেন ?

ঠাকুর—স্নান কর্‌তে তাঁরা আসবেন না, তাঁদের আসার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। দেশে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের অবস্থা অতিশয় ম্লান হ'য়ে প'ড়েছে। এক একটি মহাত্মার উপর এক এক দেশের ভার অর্পণ ক'রে তাঁরা চ'লে যাবেন। চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার এবার কাটিয়া বাবার উপরে দিবেন স্থির হ'য়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বাঙ্গালা দেশের ভার কার উপরে দিবেন ? ঠাকুর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য-মুখে আমার দিকে একটু চাহিয়া রহিলেন পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"তা কি এখন বলা যায় ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—কুম্ভযোগে স্নানের যদি অসাধারণ বিশেষত্ব না থাকে, তাহ'লে মাস-ব্যাপী এই মেলা কেন ? ইহা কি আধুনিক ? রামায়ণ মহাভারতে কোথাও তো এই কুম্ভমেলার কথা নাই ?

ঠাকুর—আধুনিক নয়—বহু প্রাচীন। রামায়ণে ইহার উল্লেখ আছে। মুনি ঋষিরা মাঘ মাসে প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে সকলে সমবেত হইতেন। একমাস কাল তাঁহারা প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে বাস ক'রে কুম্ভযোগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান ক'রে আপন আপন আশ্রমে চ'লে যেতেন। কুম্ভমেলা সাধুদের কংগ্রেস্। কুম্ভ-

যোগ সাধুদের সম্মিলনের সঙ্কেতকাল। এই সময়ে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সাধুরা একটি স্থানে মিলিত হ'য়ে সাধন-ভজনে তপস্যা সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ জন্মিলে, পরস্পরের আলাপ আলোচনায় তাহা মীমাংসা ক'রে নিতেন। এই সম্মিলনের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য—এখন সে সব নাই। এখন স্নান লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি এই দেখা যায়।

কুম্ভমেলা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা বলিলেন। শুনিয়া বুঝিলাম, খুব শীঘ্রই তিনি কুম্ভমেলায় যাইবেন। প্রয়াগে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গোবিন্দবাবুকে লিখিয়া একখানা বাড়ী ভাড়া করিতে গুরুভ্রাতাদের বলিলেন। এ বিষয়ে চেষ্টা চলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী আমাকে দেখিতে বড়ই অস্থির হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া আসিলে ঠাকুরের নিকট স্থির হইয়া থাকিতে পারিব না। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ী যাত্রা করি। এই স্থির করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে যাইব বলিয়া ঠাকুরের অনুমতি চাহিলাম। ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন। কার্ত্তিকের শেষ সপ্তাহে আমি ঢাকা রওয়ানা হইলাম। শ্রীমান সজনীর নিকটে শালগ্রামটি রহিয়াছেন। বাড়ীতে উহা নিয়া রাখিলে মাতাঠাকুরাণীর গোপালের সহিত উঁহার সেবা পূজা যথামত চলিবে বুঝিয়া শালগ্রামটি সঙ্গে লইয়া চলিলাম। ছোট দাদার বন্ধু শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা মহাশয় আর কিছুদিন পরেই বাড়ী যাইবেন। তিনি আমাকে একবার তাঁহার বাড়ী বানরিপাড়া যাইতে বিশেষভাবে অনুরোধ ও জেদ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম।

বেলা অবসানে দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পঁহুছিলাম। আশ্রম জনমানব শূন্য দেখিয়া আমি ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী দক্ষিণের ঘরের উত্তর বারান্দায় একাকী গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মু'টের ঘাড়ে জিনিষ পত্র দেখিয়া আমাকে বলিলেন—'এই ঘরে ছেলে পিলে নিয়ে আমি থাকি—আপনার আসন পূবের ঘরে নিন।' আমি পূবের ঘরে ঠাকুরের আসনের স্থান বাদ দিয়া আসন করিলাম। তৎপরে বারান্দায় বসিলাম। আমার খবর পাইয়া পাড়ার সমস্ত মেয়েরা ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিলেন,—কেহ কেহ অবসাঙ্গ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, আবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'গোঁসাই কি আর গেণ্ডারিয়া আসিবেন না? আপনি আসিলেন গোঁসাই কই?' কেহ বলিলেন—'গোঁসাই সুস্থ আছেন তো? আমাদের কি মনে করেন?' আমি তাঁহাদের মলিন বেশ, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা ও নিস্তেজ ভাব দেখিয়া বড়ই দুঃখ পাইলাম। গোঁসাই ছাড়া হইয়া এই কয়মাসে তাঁহারা কি হইয়াছেন, দেখিয়া অবাক্ হইলাম। কোনপ্রকারে তাঁহাদের কথার দু'একটি উত্তর দিয়া শৌচে চলিয়া গেলাম। স্নান করিয়া আসিয়া

দেখি, আমার রান্নার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। যথা সময়ে আমি রান্না আহার সমাপন করিলাম। পরে আমতলায় কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আসনে আসিয়া শয়ন করিলাম।

ঠাকুর শূন্য আশ্রমে কোন প্রকারে ৪।৫ দিন কাটাইলাম। এই সময়ে আশ্রমে থাকা যে কি কষ্টকর বলা যায় না। কয়েকমাস পূর্ব্বেও যে আশ্রম ভজনানন্দী গুরুভ্রাতাদের সংকীর্ত্তন মহোৎসবে, শাস্ত্র পাঠ ও সদালোচনায় অহর্নিশি গম্‌গম্ করিত, আজ তাহা জনমানব শূন্য, নীরব নিস্তব্ধ। শ্রীযুক্ত কুঞ্জঘোষ মহাশয় সকালে একবার ঠাকুরের ভজন কুটিরে ধুপ ধূনা দেখাইয়া থাকেন এবং এক অধ্যায় চৈতন্য চরিতামৃত এবং গ্রন্থসাহেব পাঠ করিয়া চলিয়া যান। সারাদিনে আর তিনি আশ্রমে আসেন না। শ্রীমান ফণিভূষণ প্রত্যহ সকালে মা-ঠাকুরুণের নিয়মিত পুজা করেন এবং সন্ধ্যার সময়ে আরতি করিয়া থাকেন। আরতির সময়ে কাহাকেও মন্দিরের সম্মুখে দেখা যায় না। বিকালবেলা কোন কোন দিন গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আসিলে আমতলায় মন্দিরের রোয়াকে অথবা পুকুরপাড়ে ঘাসের উপরে কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া যান। এবাড়ীর ওবাড়ীর মেয়েরা সকালে মধ্যাহ্নে ও বিকালে ক্ষণে ক্ষণে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন, পুতুলের মত কিছুক্ষণ আমগাছের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, কেহ বা আসিয়া যেখানে সেখানে ঘাসের উপরে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়েন; পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যান। কিছুকাল পূর্ব্বেও গেণ্ডারিয়ার যে সকল মেয়েকে ব্রজমায়ীদের মত হর্ষোৎফুল্ল মনে সম্মুখে পশ্চাতে হাত দোলাইয়া মহাস্ফুর্ত্তিতে নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করিতে দেখিয়াছি, আজ তাহাদের শুষ্কতাপূর্ণ বিষাদ মাখা মলিন মুখশ্রী দেখিয়া এবং ক্লেশসূচক কাতরস্বরে ক্ষণে ক্ষণে হা হুতাশ শুনিয়া অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইলাম। ঠাকুর প্রত্যহ প্রত্যূষে আসন হইতে উঠিয়া উঠানে দূর্ব্বাঘাসের উপরে পাখীদের চাউল দিতেন। কত প্রকারের পাখী আসিয়া আনন্দ করিয়া উহা খাইত। এখন সে সব স্থানে চাউল দিলেও পাখীরা আসে না, চাউল খায় না। উদয়াস্ত নানা শ্রেণীর পাখীর কলরব যে আমগাছে বিরাম ছিল না, আজ সেই গাছে একটি পাখীও নাই—পাখীরা গাছ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন ঠাকুর যে সকল বৃক্ষলতার নিকটে যাইয়া দাঁড়াতেন এবং কান পাতিয়া তাহাদের কথা শুনিতেন ও ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন, কত আদর করিতেন—দেখিতেছি, সেই সকল বৃক্ষলতা পত্রশূন্য হইয়াছে—শুকাইয়া যাইতেছে। ঠাকুরের স্মৃতি চিতানলের মত জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত বাসনা কামনা দগ্ধ করিতেছে, প্রাণে শূন্য উদাসভাব আসিয়া পড়িতেছে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—বাড়ী চলিলাম।

অপরাহ্ন ৪টার সময়ে বাড়ী পঁহুছিলাম। মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় লইলাম। মা আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মায়ের স্নেহপূর্ণ করস্পর্শে আমার শরীর শীতল হইল—প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। অন্তরে তরঙ্গশূন্য বিমল আনন্দের ধারা বহিল; আমি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। স্নানান্তে রান্না করিয়া আহার করিলাম। পরে পাহাড়-বাসের গল্প করিয়া অনেক রাত্রি কাটাইলাম। মা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। মায়ের স্নেহ মমতার পার-কিনারা নাই।

বাড়ীতে অবস্থান ঃ মায়ের নিত্যকর্ম্ম ঃ পাড়াগাঁয়ের ধর্ম্ম ।

বাড়ীতে মাঠাকুরুণের নিকটে বড়ই আরামে দিন অতিবাহিত হইতেছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে স্নান তর্পণাদি করিয়া আসনে আসিয়া বসি। সন্ধ্যা হোম সমাপন করিয়া ন্যাসাদি কার্য্যে বেলা ৯টা হয়। পরে প্রায় ২ঘণ্টা সময় মাকে গীতা চণ্ডী প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনাই। এগারটার সময় আবার স্নান করি। পরে স্থির ভাবে আসনে বসিয়া নাম করি। মা বারমাস প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন। এক হাঁড়ি জলে গোবর গুলিয়া ভিতর বাড়ী, বাহির বাড়ী, রাস্তাঘাট পায়খানার পথ সর্ব্বত্র গোবড় ছড়া দেন। পরে ঐ সকল স্থানে ঝাড়ু দিয়া বাড়ীটী পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। তৎপরে গোবরজলে সকল ঘরের বারান্দা, পইটা সুন্দররূপে লেপিয়া থাকেন। তখন পর্য্যন্ত নিদ্রা হইতে কেহ উঠে না। সূর্য্য উদয় হইতে না হইতেই মা স্নান করেন। ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা করিয়া বাড়ীতে আসেন এবং এক ঘটি জলে তুলসীকে স্নান করান, মন্ত্র পড়েন—'তুলসী তুলসী বৃন্দাবন, তুমি তুলসী নারায়ণ, তোমার শিরে ঢালি জল অন্তঃকালে দিও ফল।' মা তুলসীকে নমস্কার করিয়া ফুল দুর্ব্বাদি চয়নান্তে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করেন। ঠাকুর পূজার সমস্ত আয়োজন রাখিয়া গৃহকার্য্যে রত হন। কখন চাউল ডাল ঝাড়া বাছা, কখন খৈ মুড়ি ভাজা, কখন বা ধানসিদ্ধ করা, ধান রৌদ্রে দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন—পরে নিজের রান্নার জন্য রসুই ঘরে প্রবেশ করেন। হবিষ্যান্নের সমস্ত মা নিজেই আয়োজন করেন; অন্যের সাহায্য নেন না। রান্নার সময়ে মা কচি কচি মেয়েগুলিকে ডাকিয়া খেলার উননে রান্না করিতে বলেন। খুকিরা উৎসাহের সহিত শাক পাতা, লতা, ডাঁটা, যাহার যাহা ইচ্ছা সংগ্রহ করিয়া নিয়া আসে। মা ঐ সকল কুটিয়া শুক্তা, ঝালের ঝোল, অম্বলাদি প্রস্তুত করিতে বলেন। কোন ঝোল রাঁধিতে কি তরকারী দিতে হয়, কোন তরকারীতে কি বাটনা প্রয়োজন, মা তাহা উহাদিগকে শিক্ষা দেন। উহাদের পুতুল ছেলেমেয়েদের কি প্রকারে কোলে নিবে, দুধ খাওয়াইবে, দুধ খাওয়াইতে কিরূপে ঝিনুক ধরিবে; ছেলেকে ঘুম পাড়াবে, শয়ন করাইবে, সমস্ত মা উহাদিগকে খেলার ছলে শিক্ষা দেন। গৃহকার্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কোন কোন দিন আমি মা'র রান্না করি। আমার পছন্দ মত সামগ্রী মা আমাকে রান্না করিতে বলেন এবং সম্মুখে বসিয়া জপ করিতে করিতে কি প্রকারে উহা রান্না করিতে হইবে বলিয়া দেন। রান্না হইয়া গেলে মা শালগ্রাম নমস্কার করিতে দু'মিনিট অন্তরে সরকারী বাড়ী যান। শালগ্রাম নমস্কার করিয়া আসিতে মার প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগে। ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যায় বলিয়া আমি প্রায় রাগ করি। মা আমাকে একদিন বলিলেন—"ঠাকুর নমস্কার করিতে যাই, তুই রোজ এত রাগ করিস্ কেন?" আমি বলিলাম—"ঠাকুর নমস্কার করিতে তুমি এতক্ষণ কাটাও কেন?—আমরা কি ঠাকুর নমস্কার করি না?" মা—"তোদের এক ঠাকুর, ঝুপ ক'রে পড়িস্ আর নমস্কার ক'রে উঠিস্।

আমার তো সেরূপ নয়। অমি আজ পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে যত ঠাকুর দেখেছি প্রত্যেকটীকে স্মরণ ক'রে একবার ক'রে নমস্কার করি—তাতেই এত বিলম্ব হয়—এক ঘণ্টার কমে হয় না।"

আমি—"অযোধ্যা, কাশী, হরিদ্বার, বৃন্দাবনাদি স্থানে যত ঠাকুর দেখেছি সকলকেই তুমি প্রতিদিন নমস্কার কর?—ভুল হয় না?"

মা—ভুল যদি হয়, সেই ঠাকুরই আমাকে মনে করাইয়া দেন।

আমি—প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম মুখে উপুড় হ'য়ে দাঁড়ায়ে ক'ড়েআঙ্গুল পুনঃপুনঃ মাটিতে ঠেকাও, আর ঐ হাত কপালে ছোঁয়াও; ওর মানে কি?

মা—গাজী পীর এদের একুশবার করিয়া সেলাম দেই।

আমি—তুমি এত ঠাকুর দেবতাকে নমস্কার কর—মুসলমানদের গাজী পীরকে কর, আমার গোঁসাইকে একবার মনে কর না?

মা—আরে গোঁসাইকে যে আমি ঘুম থেকে উঠার সময়ই সকলের আগে নমস্কার ক'রে উঠি।

আমি—কেন আমার গোঁসাইকে তুমি নমস্কার কর কেন?

মা—'তোরা যে গোঁসাইকে ভগবান বলিস্। যদি তাই হয়—আমি ঠকে যাব, তাই করি।'

মার কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আহার করিতে করিতে যাহা ভাল লাগে, মা আমার হাতে তুলিয়া দেন। এইপ্রকার ৪।৫ গ্রাস প্রসাদ মা'র হাত হইতে পাইয়া থাকি। আহারান্তে মা ছেলেদের ডাকিয়া এক এক গ্রাস অন্ন দিয়া থাকেন। আহারের পরে মা নিদ্রা যান; দু' তিন বাড়ী ঘুরিয়া তাহাদের খবর নেন। তিনটার সময়ে মহাভারত পাঠ করি। মা পাড়া-পড়শীদের লইয়া তাহা শ্রবণ করেন। অপরাহ্নে আমি রান্না করি—মা সমস্ত যোগাড় করিয়া দেন।

গ্রামে নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভিতরে উপধর্ম্মের অনুষ্ঠান অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলেও, সনাতন ধর্ম্মের প্রভাব সাধারণ গৃহস্থদের মধ্যে কম নয়। সারাদিন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ও পরিশ্রান্ত চাষারা সন্ধ্যার পর কোন গৃহস্থের বাড়ীতে বা বাউল বৈষ্ণবদের আখ্ড়ায় সমবেত হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করে। একটি দিনও তাহাদের এ কার্য্যে বাধা হয় না। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর, অন্ততঃ ৪।৫ বাড়ীতে শনি পূজা হয়। নারায়ণ সেবাও সপ্তাহে ২।৪ বাড়ী হইয়া থাকে। উঠানের মধ্যস্থলে শালগ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে যখন গ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা বসিয়া যান, এবং উচ্চকণ্ঠে মধুর স্বরে সকলে একসঙ্গে পুঁথি পাঠ করেন তখন মনে হয় যেন ঠাকুর আবির্ভূত হইলেন। পুঁথি পাঠের পর ব্রাহ্মণেরা চাউলের গুঁড়ি, কলা ও গুড় দুধের সঙ্গে মিলাইয়া সিন্নি প্রস্তুত করেন এবং ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া পরম পরিতোষে সকলে প্রসাদ পান।

আমি বাড়ি আসিয়াছি পর প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় গ্রামের বাউল, বৈষ্ণব, যুগী, কাপালিক, নমশূদ্রেরা, খোল করতাল লইয়া আমাদের বাড়ী আসিয়া থাকে এবং পরমোৎসাহে গৌর-কীর্ত্তন,

হরিসংকীর্ত্তন গান করে। আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সংকীর্ত্তন করিয়াও উহারা তৃপ্তি লাভ করে না। নামের আনন্দে ভাবোচ্ছ্বাস উহাদের কাহারও কাহারও ভিতরে দেখা যায়। নামে ভক্তি উহাদের স্বাভাবিক। ইহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি।

ছোট লোক বাউল বৈরাগীদের ভিতরে একটি নূতন দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। দেবতার নাম 'ত্রিনাথ'। সন্ধ্যার সময়ে ইতর শ্রেণীর লোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়া কোন কোন গৃহস্থদের বাড়ী উপস্থিত হয় এবং ত্রিনাথের গান করে—

দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও।
আরে দমে দমে লইওরে নাম কামাই নাহি দিও।
সারাদিন ক'রো রে ভাই গৃহবাসের কাম, সন্ধ্যা হ'লে লইও রে ভাই ত্রিনাথের নাম।
আমার ঠাকুর ত্রিনাথে যে করিবে হেলা, দুটি চক্ষু উপাড়িয়ে নেকালিবে ঢেলা।
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ যা'র বাড়ী যায়, একপয়সার গাঁজা দিয়া তিন কলকি সাজায়।

এই গান করিতে করিতে তাহারা গাঁজায় দম দিতে থাকে; আর খুব মাতামাতি করে। পরে মুড়ি মুড়কি নারিকেল বাতাসা ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ পায়। গ্রামে প্রত্যেকটি গৃহস্থের বাড়ীতেই প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট দেবতাদের পূজা হইয়া থাকে। দুর্গাপূজা সকলে করিতে পারে না, তাহা ব্যতীত লক্ষ্মী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি ছোট বড় সকলেরই ঘরে যথামত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ী প্রতিমাসে মেয়েরা ২।৩টি করিয়া ব্রত করে। ব্রত-পূজাদির আয়োজন কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই করিতে হয় বলিয়া বারমাস ইহাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। মেয়েদের কোন কোন ব্রত বিষম তপস্যা। এই তপস্যা আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব মনে করি না।

মা যখন সূর্য্য-পূজা করেন দেখিয়া অবাক হই। শেষ রাত্রে উঠানের মধ্যস্থল গোময় দ্বারা লেপিয়া স্নান করিয়া আসেন। পরে সূর্য্য নারায়ণের মূর্ত্তি নানা রঙ্গের চালের গুঁড়ি দ্বারা অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করেন। তৎপরে সূর্য্য পূজার যাবতীয় সামগ্রী সূর্য্যের সম্মুখে সাজাইয়া, সূর্য্য উদয়ের অপেক্ষা করিতে থাকেন। সূর্য্য যেমন উদয় হইতে থাকেন, সূর্য্যকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান হন এবং সূর্য্যের পানে দৃষ্টি রাখিয়া জপ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর প্রকাণ্ড ধুনুচিতে ধূপ-ধুনা চন্দন গুগ্‌গুলাদি নিক্ষেপ করেন। সূর্য্য যেমন উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকেন মার দৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে থাকে। এইপ্রকার সূর্য্য অস্তগামী হইলে মা'ও পশ্চিম মুখ হ'ন। একভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন কাটান। সূর্য্য অস্ত হইতে থাকিলে মা আবার সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তখন পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া থাকেন। সারাদিন অনাহারে একভাবে প্রচণ্ড রৌদ্রে সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও মা অবসন্ন হন না, ইহাই আশ্চর্য্য।

এইপ্রকার আর ২।৪টি ব্রত আছে, যাহার অনুষ্ঠানের কঠোরতা সহজ নয়। গ্রামে অধিকাংশ গৃহস্থ বাড়ীতেই মেয়েদের ব্রতপূজা উপবাসাদি দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম।

রাত্রি প্রায় ১০টায় সময়ে মার শয়ন ঘরের বারান্দায় আমি শয়ন করি। শয়নকালে কচি-খোকাটিকে লইয়া গর্ভধারিণী যেমন করে, মাও আমাকে লইয়া তেমন করিয়া থাকেন। আমার নিদ্রা না হওয়া পর্য্যন্ত বিছানার ধারে বসিয়া মা আমার গায়ে হাত বুলান—মাথা চুল্‌কান। সময় সময় অস্পষ্ট মন্ত্র পড়িয়া পেটে আঙ্গুলের টোকা দেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! এ কি কর্‌ছ?

মা বলিলেন—'রক্ষা বেঁধে দি।' আমি—'কেন এতে কি হয়?' মা—"জানিস্ না? ঘুমের সময় কোন আপদ বিপদ ঘট্‌বে না, ভূত প্রেত অপদেবতায় কোন ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না। ডেয়ে পিপড়া, ইন্দুর বিড়ালও কামড়াবে না। এখন আর কথা বলিস্ না চোখ বুজ্‌—ঘুমো।" মার অসাধারণ স্নেহের কথা ভাবিয়া চোখের জলে আমার বালিস ভিজিয়া যায়। আহা! এমন মা'র গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়াই ঠাকুর আমাকে তাঁর দেবদুর্লভ শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছেন।

বরিশালে অবস্থান ঃ আত্মার উন্নতির লক্ষণ সম্বন্ধে অশ্বিনী বাবুর প্রশ্নের উত্তর।

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা আমাকে তাঁহাদের বাড়ী বানরিপাড়া যাইতে পুনঃপুনঃ চিঠি লিখিতেছেন। পরশু একটি স্বপ্ন দেখিলাম—'বেলা অবসানে ভিক্ষা করিতে কুঞ্জবাবুদের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের অসাধারণ কৃপায় কুঞ্জবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী অনেক অলৌকিক অবস্থা লাভ করিয়াছে, শুনিয়াছি। তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার হাতে অন্নগ্রহণই আমার তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য। কুসুম আমার সংবাদ পাইয়া ভিক্ষা লইয়া দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন দেখিলাম, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বলমূর্ত্তি একটি মহাপুরুষ আচম্বিতে প্রকাশিত হইয়া কুসুমকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার শরীরে লীন হইয়া গেলেন। কুসুমের কাঁধে মহাপুরুষের হাত দুখানা মিলিয়া গেল; কুসুম চতুর্ভূজা হইল। কুসুম চারিহাতে ভিক্ষান্ন লইয়া আমাকে প্রদান করিল। ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই জাগিয়া পড়িলাম।' স্বপ্নটি দেখার পর বানরিপাড়া যাইতে আরো আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমি প্রায় ১ মাস কাল মাতাঠাকুরাণীর চরণতলে পরমানন্দে থাকিয়া বানরিপাড়া রওনা হইলাম। অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে বরিশাল পঁহুছিলাম। আমার ওখানে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই কুঞ্জ বরিশালে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ দাস মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। গোরাচাঁদ বাবুর আদর ও যত্ন ভালবাসায় ৫।৬ দিন আমাকে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখিল। গোরাচাঁদ বাবু সহরের সর্ব্বপ্রধান উকীল হইলেও কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। সদাচার সদনুষ্ঠানে

বাড়ীটি যেন দেবালয়। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া বারমাস তিনি গো-সেবা করেন। গোয়াল-ঘর জল তুলিয়া নিয়া নিজ হাতে পরিষ্কার করেন। গরুর খুর ধোয়া, গা হইতে গোবর পরিষ্কার করা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য নিজে করিয়া থাকেন। গরুকে খাবার দেওয়া, জল দেওয়া, কোন কার্য্যই চাকরের উপর নির্ভর করেন না। এইরূপ সুচারুরূপ গো সেবা আমি কোথাও দেখি নাই। দরিদ্র কতকগুলি ছেলেকে বাড়ীতে রাখিয়া সমস্ত খরচ দিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন। সাধন ভজনেও অনুরাগ খুব; ঠাকুরের উপর নিষ্ঠা অসাধারণ।

স্বদেশ প্রেমিক কর্ম্মবীর গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সম্প্রতি তিনি 'ভক্তি-যোগ' নামে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা আমাকে উপহার দিলেন। পুস্তকখানা খোলা মাত্রই চক্ষে পড়িল 'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।' ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—কামীদের কাম ভোগের দ্বারা উপশম হয় না।' পড়িয়া অশ্বিনী বাবুকে বলিলাম,—দাদা! আপনার ব্যাখ্যা মতে শাস্ত্র বিরোধ পড়ে। কারণ বিধিপূর্ব্বক ভোগে কামের নিবৃত্তি হয়; ইহা সকল শাস্ত্রেই আছে।

অশ্বিনী বাবু বলিলেন—ঐ শ্লোক তো শাস্ত্রেরই, ভোগনিবৃত্তি হইলে 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের ভূয়া-এবাভিবর্দ্ধতে' এই কথার তাৎপর্য্য থাকে না। আমি বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট ঐ শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম তাহা বলিলাম,—'ঐ শ্লোকে ভোগের কথা নাই—উপভোগ কথাটি আছে। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে স্বেচ্ছাচারে ভোগ তাহাই উপভোগ। এই উপভোগেই সাম্য হয় না। কিন্তু বিধিপূর্ব্বক ভোগে শাম্য হয়।' অশ্বিনী বাবু শুনিয়া একটু সময় চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, আগামী সংস্করণে ওটি সংশোধন করিয়া দিব—ব্যাখ্যাটি ভুলই করিয়াছি।

অশ্বিনী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা ভাই, আত্মার উন্নতি হইতেছে কিসে বুঝিব?

আমি—আপনি কি বুঝিয়াছেন তাহা জানিতে চাই। অশ্বিনী বাবু বলিলেন—'সত্য, দয়া, বিনয়, সরলতা, পরোপকার, উৎসাহ, উদ্যম, তেজস্বিতা এসব যাহার দেখা যায় তাহারই আত্মার উন্নতি হইতেছে মনে করি।

আমি—আমি তাহা মনে করি না। ভয়ে বা প্রশংসা লাভের লোভে ঐ সকল গুণের অনুষ্ঠান অনেকে করিতে পারে; তাতে তাহাদের প্রকৃতি ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইয়াছে, মনে করা যায় না।

অশ্বিনী বাবু—তুমি তা হ'লে কি লক্ষণে আত্মার উন্নতি বুঝ?

আমি—যাহার চিত্ত গুরুতে আকৃষ্ট তারই আত্মা উন্নত মনে করি।

অশ্বিনী বাবু—তোমার কথা বুঝিলাম না। এ কথার কি কোন যুক্তি আছে?

আমি—যুক্তি এই, গুরুতে সকলেই সকল সদ্‌গুণ আরোপ করে, গুরুকে সর্ব্বগুণময় মনে করে। এই গুরুতে আকর্ষণ হইলে, সদ্‌গুণে তার আকর্ষণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাহিরে অবস্থায় পড়িয়া একজন যাহাই করুক না কেন, তার চিত্ত যদি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্তর

সৎমুখী; চিত্ত সৎমুখী হইলেই তার আত্মা উন্নতিশীল বলিতে হইবে। অশ্বিনীবাবু আমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং 'বাঃ! বেশ বলেছ ভাই, বেশ বলেছ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বিনা আগুনে অন্নপূর্ণার রান্না অন্ন।

আমি অশ্বিনীবাবুর বাড়ী হবিষ্যান্ন করিয়া গৌরাচাঁদ বাবুর বাড়ী আসিলাম। শ্রীযুক্ত হরকান্ত বাবু, শিববাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে ৫,৬ দিন বরিশালে আনন্দে কাটাইলাম। শ্রীযুক্ত ঠাকুরতার সহিত বহু গুরুভ্রাতার জন্মস্থান পুণ্যভূমি বানরিপাড়ায় উপস্থিত হইলাম। গুরুভ্রাতারা অনেকে ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে খুব আদর করিয়া কুঞ্জদের বাড়ী লইয়া গেলেন এবং দোতালায় একখানা নির্জ্জন ঘরে আসন পাতিয়া দিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলে চলিয়া যাওয়ার পরে কুঞ্জের স্ত্রী কুসুম আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল। কুসুমকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। উহার সরলতামাখা পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। কুসুমকে বলিলাম—কুসুম! আজ তোমার হাতে আমার ভিক্ষা। এখন চা নিয়ে এস। কুসুম বলিল,—'ঠাকুরের আদেশ মত ভিক্ষায় আপনার জন্য রেখেছি; চাও প্রস্তুত করেছি'—এই বলিয়া চা আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিল এবং শুষ্ক অন্নপ্রসাদ আমার হাতে দিয়া বলিল—'এই নিন ভিক্ষা, ঠাকুর আপনার জন্য রাখ্‌তে বলেছিলেন।' আমি চা পান কর্‌তে কর্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কুসুম এই অন্নপ্রসাদ কোথায় পেলে, আর ঠাকুরই বা কেন ইহা আমায় দিতে বলেছেন?

কুসুম—একদিন ভাতের হাঁড়ি উননে চাপাইয়া আগুন ধরাইতে বস্‌লাম। ভিজা কাষ্ঠ উননে দিয়া খড়ে আগুন ফেলিয়া পুনঃপুনঃ ফুঁ দিতে লাগিলাম। আগুন নিবিয়া যাইতে লাগিল। ধুঁয়াতে চোখ জ্বলিতে লাগিল, মাথা ধরিল। ঐ সময়ে ভগবতী—অন্নপূর্ণা প্রকাশিত হ'য়ে বল্লেন—'মা! কষ্ট হ'চ্ছে; আচ্ছা তুমি একটু স'রে বস, আমি আজ রান্না করে দিচ্ছি। আমি উনন হ'তে একটু স'রে বস্‌লাম। কতক্ষণ পরে চেয়ে দেখি ভাত ফুট্‌ছে, অথচ উননে আগুন নাই। আমি ফেন ঝরাইয়া অন্ন অমনি ঠাকুরকে নিবেদন করে দিলাম। ঠাকুর তখন প্রকাশিত হ'য়ে বল্লেন—'ব্রহ্মচারী আস্‌ছেন, একগ্রাস তার জন্য রেখে দেও।' তাই আপনার জন্য একগ্রাস শুকাইয়া রেখেছিলাম। অন্নপূর্ণার রান্না অন্নই আপনাকে ভিক্ষা দিলাম। কুসুমের কথা শুনিয়া কুঞ্জকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। কুঞ্জ কহিলেন—'ওদিনের কথা আর জীবনে ভুল্‌ব না, অগ্নিশূন্য রান্না—অদ্ভুত ব্যাপার। অনেক গুরুভ্রাত্যরা আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন; উনন ধরাইতে চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু উননে এক বিন্দুও আগুন নাই। দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইলেন। প্রসাদ পাইয়া সকলেই তখন ভাবে অভিভূত। আমার সাক্ষাতেই এই ঘটনা হয়।' এসব শুনিয়া আমি প্রসাদ পাইব স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। ভিতরে একটা ভাবের স্রোত চলিতে লাগিল। কিছু অন্নপূর্ণার রান্না অন্ন কুসুম হইতে চাহিয়া লইয়া ঝোলায় রাখিয়া দিলাম।

মহাপুরুষ সাজালের দর্শন ঃ ঠাকুরের কৃপায় সুস্বাদু খিচুড়ি।

বানরিপাড়া আসিয়া আমার নিত্যকর্ম্ম যথামত চলিতেছে। সকাল বেলা হইতে মধ্যাহ্ন ২টা পর্য্যন্ত সাধন ভজন পাঠ ইত্যাদিতে কাটাইতে লাগিলাম। অপরাহ্ন ৩টা হইতে গুরুভ্রাতারা আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তাহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ঠাকুরতার অনুরোধে একদিন তাহার বাড়ীতে ভিক্ষা করিলাম। ঐ দিন সাজালের দর্শন পাইলাম। সাজাল জাতিতে মুসলমান। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'সাজাল পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষ।' সাজালের বয়স প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর অনুমান হয়। দেখিতে কৃশ হইলেও শরীর বেশ সুস্থ। বাড়ী ঘর কিছুই নাই। কখন বৃক্ষতলে, কখন খালের ধারে, অনাবৃত মাঠে ময়দানে রাত্রিযাপন করেন। সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ান। ধর্ম্মকথা কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে গুরুনিষ্ঠা,—গুরুভক্তি বিষয়ে উপদেশ করেন। দেবদেবীদের দর্শন করিয়া স্তবস্তুতি করেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই সাজালকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করে। সংকীর্ত্তনে সাজালের মহাভাব হয়। ঠাকুরের নামে সাজালের অশ্রুবর্ষণ হয়—হর্ষপুলকাদির উদ্গমে অবসাঙ্গ হইয়া পড়েন। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গলাভে বড়ই আনন্দপ্রকাশ করেন। আমি সাজালকে নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। সাজাল আমার পানে ২।৩ বার তাকাইয়া গুরুভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'উনি কি মাইয়া না পুরুষ? সাজালের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল এবং সাজালকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি দেখ? সাজাল—'বাবে ভো বুজি মাইয়া মানুষ।' কুঞ্জ—তুমি ইহার দাড়ি গোঁপ দেখ না?

সাজাল—'হ্যার লাইগাইত জিগাইলাম।' সাজালের কথাবার্ত্তা অনেক সময় অসংলগ্ন ও অর্থশূন্য, পাগলের প্রলাপের মত বোধ হয়—সাধারণে উহাকে পাগল বলিয়াই মনে করে। সাজালের নিকটে বসিয়া বড়ই আরাম পাইলাম। দেহমন যেন মধুময় হইয়া গেল।

অপরাহ্নে রান্না করিতে যাইব, গুরুভ্রাতারা সকলে আমাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন—'ভাই! আজ তোমার হাতে রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দেও, আমরা প্রসাদ পাইব। আমি গুরুভ্রাতাদের আন্তরিক অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। গুরুভ্রাতারা সাত সের চাউল, পাঁচ সের ডাল এবং প্রচুর পরিমাণে তরীতরকারী যোগাড় করিয়া খিচুড়ী রান্না করিতে দিলেন। আমি উহা দেখিয়া অবাক্। এত অধিক পরিমাণে রান্না জীবনে কখনও করি নাই। কি আর করিব, ঠাকুরের নাম লইয়া রান্না চাপাইলাম। ডাল চাল সুসিদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু খিচুড়ীর উপরে প্রায় ৩।৪ ইঞ্চি জল হাঁড়ির ভিতরে রহিয়াছে দেখিলাম। গুরুভ্রাতারা বলিলেন আজ সরবৎ খাওয়া হইবে। আমি হাঁড়ি নামাইয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভোগ লাগাইয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। ১৫ মিনিট পরে দরজা খুলিয়া দেখি খিচুড়ীতে এক ফোঁটাও জল নাই। সকলে প্রসাদ পাইয়া খুব পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন এবং বলিলেন—"ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'ব্রহ্মচারীর মত সুস্বাদু

অন্ন কেহ খায় না।' আজ ঠাকুরের কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইল।" আমি বুঝিলাম, ঠাকুরের কৃপায়ই আজ খিচুড়ি এত সুস্বাদু ও সকলের তৃপ্তিকর হইয়াছে। প্রসাদ পাইয়া রাত্রে আসনে আসিলাম।

ঠাকুরের কৃপায় কুসুমের আহার ত্যাগ ঃ কুসুমের হাতে ভোজনে অদ্ভুত অবস্থা।

বানরিপাড়া আসার পর প্রতিদিনই কোন না কোন গুরুভ্রাতা আমাকে তাঁহার বাড়ী ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমিও এক এক দিন এক এক বাড়ী ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। এই ভিক্ষা এক উৎসব ব্যাপার। পাড়ার সমস্ত গুরুভ্রাতারা প্রতিদিন আমার রান্না খিচুড়ি প্রসাদ পাইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। একদিন কুসুম আমাকে বলিল—'আপনি তো বেশ কচ্ছেন, প্রতিদিনই গুরুভ্রাতাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাচ্ছেন—আমার নিকট একদিনও আপনি ভিক্ষা কর্‌বেন না, এতে আমার কষ্ট হয় না ?' আমি কুসুমকে বলিলাম—'আজ তোমার হাতে আমার ভিক্ষা কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট বস্তু দিবে, যাহা কখনও আমি খাই নাই।'

কুসুম বলিল—'আচ্ছা তাহাই হবে।' নিত্যকর্ম্ম বেলা ২টা পর্য্যন্ত করিয়া অবশিষ্ট দিন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সদালাপে কাটাইলাম। অপরাহ্নে কুসুম আসিয়া বলিল—"চলুন, এখন আমার হাতে ভিক্ষা নেবেন।" আমি ও কুঞ্জ কুসুমের সঙ্গে নীচে একখানা পরিষ্কার ঘরে গিয়া দেখি, ভোগ রান্নার উপাদেয় সামগ্রী সমস্ত রহিয়াছে, আজ শুধু দুইজনার মত, কিন্তু প্রায় ১ সের চাউলের খিচুড়ি রান্না হইবে। সন্ধ্যার সময়ে খিচুড়ি রান্না চাপাইলাম। কুঞ্জ ও কুসুম তাহাদের প্রতি ঠাকুরের অসাধারণ কৃপার কথা বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। উহাদের কথা শুনিয়া প্রাণ সরস হইয়া উঠিল। আহা! কবে আমি কুঞ্জ কুসুমের মত ঠাকুরের অনুগত হইব।

আমি কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুসুম! আহার ত্যাগ তোমার কি প্রকারে হইল ? সারাদিনরাত্রে এক গণ্ডুষ জল বা একগ্রাস অন্ন গ্রহণ না করিয়া এত বড় শরীরটি কি প্রকারে রক্ষা পাইতেছে ? সমস্ত দিন তোমার বিশ্রাম নাই। সংসারের কুট্‌না, বাট্‌না, বাসনমাজা রান্না প্রভৃতি সমস্তই তো কর্‌তে হয়, অনাহারে থাকিয়া এ সমস্ত তুমি কি প্রকারে কর ? তোমার শ্রান্তি বোধ হয় না ? ক্ষুধা পিপাসা পায় না ? মুনি ঋষিরা আহার ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ সমাধিতে থাকিতেন—পুরাণে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীতে আহার ত্যাগী কেহ আছে এমন শুনি নাই। তীব্র তপস্যা দ্বারা পাহাড়বাসী সাধুরা আহার ত্যাগের চেষ্টা অনেকে করেন, কিন্তু এযুগে কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া আহার ত্যাগে কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে, জানিতে ইচ্ছা হয়।

কুসুম বলিল—পাড়াগাঁয়ে কতপ্রকার অসুবিধা কত সময়ে মেয়েদের ভোগ কর্‌তে হয় জানেন তো ? বর্ষা বাদলে ক্লেশের অবধি থাকে না। একদিন রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইতে অনেক বেলা হ'য়ে

গেল। অনেকগুলি বাসন মাজিতে ঘাটে লইয়া গেলাম। বাসন মাজিতে মাজিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। দয়াল ঠাকুর অমনি আমার সম্মুখে জলের উপর প্রকাশিত হইলেন। আমি কাঁদিয়া বলিলাম—বাবা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে। আমি আর সহ্য কর্‌তে পারি না। ফুল তুলসী আমার কিছুই নাই—আজ আমি তোমাকে কি দিয়ে পূজা কর্ব্বো? আমার এই ক্ষুধাকেই পদ্ম করিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রদান করিলাম। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে সকরুণ দৃষ্টিতে আমার পানে একটু সময় চাহিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার আর ক্ষুধা পিপাসা নাই। শরীরে আমার কোন অসুখ নাই। দিন দিন যেন আরো সুস্থবোধ করিতেছি; সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হই না। কোন সাধন ভজনে আমার এই অবস্থা হয় নাই—শুধু ঠাকুরের কৃপায়। অনেক দিন তো হয়ে গেল, আর কতদিন এই অবস্থায় রাখিবেন তিনিই জানেন।

কুসুমের কথা শুনিতে শুনিতে খিচুড়ি রান্না হইয়া গেল। আমি উহা নামাইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিলাম এবং স্থির ভাবে বসিয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। কুঞ্জ কুসুমও একান্ত মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিল। প্রায় ১৫ মিনিট একভাবে থাকিয়া কুসুমকে বলিলাম—কুঞ্জকে একখানা পাতা করিয়া দেও, আমরা আনন্দ করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাই, আর তুমি বসিয়া দর্শন কর। কুসুম তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে করযোড়ে আমাকে বলিল—'আপনি দয়া করিয়া আমার একটি আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ করুন।'

আমি—আচ্ছা বল; আমার ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয় পূর্ণ করিব।

কুসুম—আপনি যখন বাড়ী ছিলেন, তখন একদিন দেখ্‌লাম—'আপনি আমার নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন—'আমার ক্ষুধা পেয়েছে, আমাকে কিছু খাবার দেও।' আমার নিকট ঠাকুরের প্রসাদ ছিল, আমি তাহা আনিয়া আপনার মুখে দিতে লাগিলাম, আপনি খুব আনন্দের সহিত উহা খাইতে লাগিলেন।'

আমি—আমাকে তো ইতিপূর্ব্বে কখনও তুমি দেখ নাই, ভিক্ষার সময় আমাকে কি ঠিক্ এই রূপই দেখেছিলে?

কুসুম—ঠিক এই রূপই দেখেছিলাম। তবে কপালে এই প্রকার তিলক ছিল না। বিভূতির উর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া লাল সিঁদুরের উর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়াছিলাম।

কুসুমের কথা শুনিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। কারণ বাড়ীতে যতদিন ছিলাম যথার্থই আমি ঠাকুরের চরণ-রুলি দ্বারা লাল উর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়াছিলাম। আমি ঠাকুরেরই ইচ্ছা মনে করিয়া কুসুমের অনুরোধে সম্মত হইলাম এবং বলিলাম—'আমাকে তুমি নিঃসঙ্কোচে হাতে ধরিয়া খাওয়াও, আমার তাতে আনন্দ হবে। তোমার হাতে ঠাকুরের প্রসাদ বহুভাগ্যে লাভ হয়।' কুসুম ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কুঞ্জের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, আমার বামপার্শ্বে যাইয়া পা ছড়াইয়া বসিল। তৎপরে উভয় হস্ত

দ্বারা আমাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া আমার মস্তক উহার বাম বাহু'পরি স্থাপন করিয়া জড়াইয়া ধরিল এবং নিঃসঙ্কোচে স্বাভাবিক ভাবে পুনঃপুনঃ যথেচ্ছ আদর করিতে লাগিল। কুসুম এক একবার ভাবাবেশে ঢুলিতে ঢুলিতে আমার উপরে পড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন কুঞ্জ পুনঃপুনঃ নাম উচ্চারণ করায়, কুসুম কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আমার মুখে প্রসাদ দিতে লাগিল। আমি ভোজন করিতে লাগিলাম। কুসুম যখন আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্রোড়ে বসাইল, আমার তখন পরিষ্কার অনুভব হইল ঠাকুরের কোলে বসিয়াছি। অকস্মাৎ ঠাকুরের দেহের পদ্মগন্ধ পাইয়া মত্ত হইয়া পড়িলাম। কুসুমের কলেবরে পরম সুখদ ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের অনুপম স্পর্শ পাইয়া অভিভূত হইলাম। ঠাকুরের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহারই শ্রীহস্তে তাঁহার প্রসাদ পাইতেছি এই ধ্যানে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। আমার সমস্ত বাহ্যস্মৃতি বিলুপ্ত হইল। অনুভব একমাত্র স্পর্শসুখেই নিবিষ্ট হইল। কি যে এক অব্যক্ত আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই অবস্থা আমার অধিক সময় রহিল না। কুসুমের অসাধারণ ধ্যান প্রভাবে আমাকে দেহ হইতে আল্গা করিয়া দিল। আমি দেখিতে লাগিলাম, কুসুমের ক্রোড়ে ঠাকুর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন, কুসুম তাঁহার মুখে খিচুড়ি তুলিয়া দিতেছে, ঠাকুর আনন্দ করিয়া তাহা ভোজন করিতেছেন। আহারের সময়ে ঠাকুরের শ্রীমুখের শোভা দেখিতে দেখিতে আমি অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলাম। বাহ্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইল। প্রায় ঘণ্টাধিক সময় এইভাবে অতিবাহিত হইল। পরে ভাবাবেশে কুঞ্জের 'জয় গুরু জয় গুরু' চীৎকারে আমার সংজ্ঞালাভ হইল। তখন কুসুমও আমাকে ছাড়িয়া দিল; কিন্তু তখনই আবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িল। আমি উঠিয়া ঘরের মেঝেতে কতক্ষণ পড়িয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম একি হইল, একি দেখিলাম! কুঞ্জ হাপুস হুপুস কাঁদিতেছে—কুসুম সমাধিস্থ। খিচুড়ির দিকে অনুসন্ধান নিয়া দেখি, উহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। দু'এক মুঠো মাত্র অবশিষ্ট আছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার মত ৫।৭ জনার পুরা খোরাক অনায়াসে আমার উদরস্থ হইয়াছে! কিন্তু ৪।৫ গ্রাস খাইয়াছি মাত্র আমার মনে আছে। অবশিষ্ট প্রসাদ যে পাইয়াছি, তাহা আমার একেবারে মনে হইতেছে না। অপরিমিত ভোজনে আমার কোন ক্লেশ নাই—উদ্বেগ নাই। স্বাভাবিক অবস্থায়ই রহিয়াছি। কুসুমের সমাধি রাত্রি প্রায় ৩টার সময়ে ভঙ্গ হইল। জয় দয়াল গুরুদেব! তোমার এই অসাধারণ কৃপার কথা যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত অন্তরে জাগরূক থাকে। এই প্রার্থনা!

গুরুভ্রাতা ব্রজমোহন।

গত কল্য চা পানের পর আসনে বসিয়া আছি, একটি ভদ্রলোক আসিয়া করযোড়ে ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। পরিধানে তাঁহার মলিন জীর্ণ বসন, চেহারা শীর্ণ হইলেও তেজঃপুঞ্জ, মুখশ্রী কাঙ্গালের মত। পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করায়ও তিনি ঘরে আসিয়া বসিলেন না। তখন তাঁহাকে হাতে ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তিনি বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার অশ্রু,

কম্প, পুলকাদি ভাব প্রবলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি নিজকে সংবরণ করিতে না পারায় মেজেতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন এবং 'জয়গুরু জয়গুরু' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। কুঞ্জও তখন ভাবাবেশে বেহুঁস হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে উঁহাদের সংজ্ঞালাভ হইলে ভদ্রলোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। জানিলাম—ইনিই সেই ব্যক্তি। যাঁহাকে ঠাকুর গেণ্ডারিয়া অবস্থান কালে একদিন গভীর রাত্রিতে এই বানরিপাড়ায় প্রকাশিত হইয়া দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। ঘটনাটি পরিষ্কাররূপে জানিতে কৌতূহল হওয়ায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্রলোকটি বলিলেন—আমি বড় গরীব, পুরোহিতের কাজ করি। সব দিন পেটভরা আহারও জোটে না। ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হইল। বানরিপাড়া হইতে গেণ্ডারিয়া যাওয়ার আমার ক্ষমতা নাই, তাই ঠাকুরকে কাতরভাবে জানাইলাম। পরে একদিন রাত্রে ঠাকুর আসিয়া আমাকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমি যেমন পাপী ঠাকুরও তেমনিই দয়াল। তাই তাঁর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। পুরোহিত ঠাকুরের নাম শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী। কুঞ্জের নিকট ইঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে যেমন শুনিয়াছিলাম ইনিও ঠিক সেই প্রকারই বলিলেন।

ঠাকুরের-যোগৈশ্বর্য্য।

এই কথা শুনিয়া গত বৎসরের ঠাকুরের একটি অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের কথা মনে হইল। একদিন গেণ্ডারিয়ায় আমি নিত্যহোম সমাপনান্তে বেলা ৮টার সময়ে আসনে বসিয়া আছি; শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় আসিয়া বলিলেন—ব্রহ্মচারী মশায়! এখন কি আপনার বল্‌বার অবসর হবে? আমি বলিলাম—'কি বল্‌বো বলুন।'

বক্সী মহাশয়—কা'ল যে আপনাকে ঠাকুর বলিলেন?

আমি—ঠাকুর কখন কি বলেছিলেন আমার মনে নাই।

বক্সী—'গত রাত্রে ১০টার সময়ে ঠাকুর যখন আপনাকে লইয়া আমার বাড়ী গিয়াছিলেন, তখন আপনাকে দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, এই ব্রহ্মচারীর নিকটে কাল গিয়ে তুমি সন্ধ্যামন্ত্র প্রণালী এবং গায়ত্রী ন্যাসাদি শিখে নিও, আর প্রত্যহ সন্ধ্যা ক'রো।' বক্সী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম এবং ভিতরের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম—আচ্ছা চলুন, ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উহা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া নেই। এই বলিয়া বক্সী মহাশয়কে লইয়া পূবের ঘরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর চা সেবার পরে নিমীলিত নয়নে স্থির হইয়া আসনে বসিয়াছিলেন, বক্সী মহাশয়কে লইয়া দরজায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই ঠাকুর চোখ মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! বক্সী মহাশয়কে সন্ধ্যা গায়ত্রী—তাহার নিয়ম প্রণালী সমস্ত বলিয়া দেও।"

আমি আর কিছু না বলিয়া বক্সী মহাশয়কে লইয়া আসিলাম এবং সমস্ত সন্ধ্যাদির মন্ত্র পদ্ধতি

বলিয়া দিলাম। অবাক্ কাণ্ড! এই ঘটনাটিতে আমার প্রাণ তোলপাড় করিয়া তুলিল। একই ব্যক্তি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রচার কার্য্য করেন, ইহা সাধু মহাত্মা পুরুষদের যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা কোন কালে সম্ভব হইয়াছে এরূপ প্রমাণ পাই নাই। একমাত্র ভগবানই এই প্রকার লীলা করিয়াছেন। ঠাকুরকে এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। যে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিলে ঠাকুরের ভগবত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহার উত্তরে ঠাকুর সলজ্জভাবে আমতা আমতা করিতে থাকেন, কখন বা নির্ব্বাক—চুপ থাকেন। ঠাকুরের ঐ সময়ের ভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়। তাই এই সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করি নাই। বক্সী মহাশয়ের নিকটে ঠাকুর যখন গিয়াছিলেন তখন রাত্রি ১০টা। ঐ সময়ে কীর্ত্তনান্তে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নিজ আসনে বসিয়া ঠাকুর হাসি গল্প করিতেছিলেন। আর আমি তখন নিদ্রিত। ঠাকুর দেহটিকে সমাধিস্থ রাখিয়া যথায় তথায় বিচরণ করেন, এই প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে বহুস্থলে পাইয়াছি। কিন্তু নিজে স্থূল দেহে প্রকাশিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপ পরিগ্রহ বা প্রকট করিলেন কি প্রকারে তাহা তো কিছুই বুঝিতেছি না। কোন কোন স্থলে ভগবানের লীলা অপেক্ষাও ভক্তের লীলা অধিকতর অদ্ভুত দেখা যায়। কিন্তু এই প্রকার লীলা একমাত্র ভগবানেরই একচেটিয়া শুনিয়াছি। ঠাকুর! তোমার যে সকল লীলা শ্রদ্ধার সহিত শুধু দর্শন করিলেই কৃতার্থ হইয়া যাই, তাহার অনর্থক তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি আমার যেন না হয়।

বানরিপাড়ায় অবস্থান।

বানরিপাড়া আসিয়া গুরুভ্রাতাদের আদর যত্ন ভালবাসায়, সময় বড়ই আনন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুরুভ্রাতা সকলে একত্র হইয়া সঙ্কীর্ত্তনোৎসব করিয়া থাকেন। এই সংকীর্ত্তনে অনেকেরই অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছাস হইয়া থাকে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই একের প্রতি অন্যের সদ্ভাব সহানুভূতি দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। শুনিলাম গ্রামের প্রবল প্রতাপ জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ ঘোষ মহাশয় গুরুভ্রাতাদের অত্যন্ত বিরোধী। যে কোন প্রকারে তিনি গুরুভ্রাতাদের জব্দে রাখিতে চেষ্টা করেন। গোঁসাইয়ের শিষ্যদের প্রতি তিনি অতিশয় বিরক্ত। গুরুভ্রাতাদের মুখে এসকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আমার ইচ্ছা জন্মিল। অপরাহ্নে ভিক্ষা করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখা মাত্র, সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া খুব সমাদরে আহ্বান করিলেন এবং উচ্চ আসনে বসাইয়া পদধূলি নিতে হাত বাড়াইলেন। আমি করযোড়ে নমস্কার করিয়া পা দু'টি গুটাইয়া নিলাম। তিনি একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আপনি চরণধূলি নিতে বাধা দিচ্ছেন কেন? উহা যে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি; বাপ পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ ইহা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, কোন কালে আপনারা বাধা দেন নাই—আজ আমাকে বাধা দিবেন?' এই প্রকার

অনেক বলিয়া তিনি পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আমার আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায় ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ভিক্ষা চান বলুন?' তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন কতকগুলি টাকাকড়ি চাহিব এবং তাহাই তিনি দিবেন। আমি হবিষ্যের জন্য ভিক্ষা চাহিতেছি জানিয়া গৃহের উৎকৃষ্ট তরকারী, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। তাহা হইতে আমার পরিমাণ মত চাউল ও একটি মাত্র আলু, কিঞ্চিৎ ঘৃত, নুন গ্রহণ করিতে দেখিয়া অবাক্ হইলেন—আমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিল। শ্রীনারায়ণ বাবু বলিলেন—'দেখুন এই গ্রামে অনেকগুলি লোক গোঁসাইয়ের শিষ্য হয়েছে, তাহারা বড়ই একগুঁয়ে। সামাজিক আচার কিছু তারা মানে না। যাহা তাহাদের ইচ্ছা দলবদ্ধ হ'য়ে তাহাই করে। জাতি বিচার করে না। কারো শাসন মানে না—আমাকে তো গ্রাহ্যই করে না। এই জন্য উহাদের উপর আমার সদ্ভাব নাই। আমি বলিলাম—'শুনিয়াছি আপনিই এই গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। প্রভাবশালীরা অত্যাচারী হ'লে আশে পাশে লোক বাঁচিতে পারে না। শক্তি যাহার অধিক ধৈর্য্যও তাহার অসাধারণ। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, এদের আচার ব্যবহার দেখে ঠাণ্ডা হবেন। গোঁসাই তো কারোকে সমাজ নীতি, কুলপ্রথা অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে বলেন না!' শ্রীনারায়ণবাবু আমার কথায় খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—'গোঁসাই মহাপুরুষ। তিনি কি কখনও যা তা বলিতে পারেন? দেখুন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা,—তাহাকে উহারা সমাজে তুলিতে চায়। বেশ তো—ভাল কথা, সামাজিক প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তুলুক—কারো কোন আপত্তি হবে না। কিন্তু উহারা প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়াই সমাজে তুলিতে জেদ করিতেছে। গোঁসাই কিন্তু 'তার' করিয়া জানাইয়াছেন—"Do pryaschitta as Samaj asks" (সমাজ যেমন চায় সেইভাবে প্রায়শ্চিত্ত কর)। তিনি মহাপুরুষ, তাঁর কথা কি অন্যায় হ'তে পারে! কিন্তু দেখুন, গোঁসাইয়ের ঐরূপ আদেশ সত্ত্বেও, এ ব্যাটারা প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া সমাজে তুলিবে, জেদ করিতেছে। এ জন্য সমাজের কারো সঙ্গে ওদের সদ্ভাব নাই। বহুলোক এক দলে হ'লেও তারা যদি সামাজিক প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া চলে কে তাহা সহ্য করিবে? শ্রীনারায়ণ বাবুর কথা শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল। আমি আসিবার সময়ে তিনি খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত পদধূলি গ্রহণ করিলেন। গুরুভ্রাতারা ভাবিয়াছিলেন আমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। বাবু খুব সদ্ভাবে মিশিয়াছেন শুনিয়া গুরুভ্রাতারা সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন।

১৪।১৫ দিন হইল বানরিপাড়া আসিয়াছি। কুঞ্জ কুসুমের সঙ্গে বড়ই আনন্দে এই দুই সপ্তাহ কাল কাটাইলাম। কুসুমের অবস্থা অদ্ভুত ও অলৌকিক। উহার একটির ভিতরেও আমার প্রবেশ অধিকার নাই। শুধু দেখিলাম, আর বিস্মিত হইতে লাগিলাম। কত চেষ্টা, যত্ন, নাম, ধ্যান, উপাসনা করিয়া সমাধি অবস্থা লাভ হয়; কুসুমের সেই সব কিছুই করিতে হয় না। ঠাকুরকে স্মরণপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া আসনে বসা মাত্র পলকের মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া পড়ে। স্থানাস্থান কালাকাল কোন

অপেক্ষা নাই। এই প্রকার সহজ সমাধি কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। দুই সপ্তাহকাল দিবারাত্রি কুঞ্জ কুসুমের সঙ্গে নিয়ত বাস করিয়া তাহাদের যে সুন্দর অবস্থা দর্শন করিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই—উহা স্মরণের ও ধ্যানের বিষয়। সুস্পষ্টভাবে কুসুমের অসাধারণ অবস্থা ডায়েরীতে লিখা থাকিলেও তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে আমি সাহস পাইলাম না। 'প্রত্যক্ষ বিষয়ও প্রমাণ করিতে না পারিলে সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না' আমার প্রতি ঠাকুরের এই অনুশাসন। জয় দয়াল ঠাকুর! ভক্ত লইয়া তোমার লীলাখেলা—যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা স্মরণে রাখিয়া যেন এ জীবন শেষ করিতে পারি।

আজ কুঞ্জের মুখে শুনিলাম, ঠাকুর বহু গুরুভ্রাতা ভগ্নীদের লইয়া প্রয়াগ চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ঠাকুরের নিকট যাইব স্থির করিয়া কুঞ্জকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। কলিকাতায় অভয়বাবুর বাড়ী উঠিলাম। সকল গুরুভ্রাতাদের নিকটে আমার কুম্ভমেলায় যাওয়ার ইচ্ছা জানাইলাম। ছোড়দাদাও কুম্ভমেলায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কয়েকটি টাকা ভিক্ষা করিয়া প্রয়াগ যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ছোড়দাদারও ভাড়া সংগ্রহ হইল। আমাদের সঙ্গে কুঞ্জ এবং অশ্বিনী বৈরাগী যাইতে প্রস্তুত হইল। আমরা যথাসময়ে হাওড়া পঁহুছিয়া প্রয়াগ যাত্রা করিলাম।

প্রয়াগে উপস্থিতি ঃ আপদে গোঁসাইয়ের ডাক।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। আপন আপন জিনিষপত্র লইয়া আমরা ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। কুঞ্জ ও অশ্বিনী তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল এবং ছোড়দাদাকে ও আমাকে শীঘ্র গাড়িতে উঠিতে তাড়া দিতে লাগিল। আমি ও ছোড়দাদা উঠিয়া পড়িলাম। কোচ্‌ম্যান জিজ্ঞাসা করিল—'বাবু, গাড়ি কোথায় নিব? ধর্ম্মশালায় না অন্য কোন স্থানে?' কুঞ্জ তখন অশ্বিনীকে বলিল—'বল্ না গাড়ি কোথায় যাবে; গোঁসাই কোথায় আছেন?' অশ্বিনী বলিল—'তুই বল্ না।' কুঞ্জ বলিল—'তুই বল্‌না।' 'তুই বল্‌না—তুই বল্‌না' বলিয়া উহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিল। আমি বেগতিক বুঝিয়া একটি কথাও না বলিয়া ঝোলা ও আসন লইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। উহারা আমাকে বলিল,—নেবে যাচ্ছিস্ যে? গোঁসাই কোথায় আছেন বল্?' আমি ধীরে ধীরে—'গোঁসাই সর্ব্বত্র' বলিয়া সরিয়া পড়িলাম এবং একটি গাছের তলায় আসন করিলাম। গাড়োয়ান খুব বিরক্ত হইয়া উহাদিগকে বলিল—'বাবুরা তো বেশ ভদ্রলোক। এই শীতে আমাকে বসাইয়া রাখিয়া গাড়িতে উঠিয়া ঝগড়া জুড়িলেন! নাবুন মশায়, নাবুন গাড়ি থেকে; নেমে ঝগড়া করুন, না হয় বলুন কোথায় যাব।' তখন উহারা সকলেই গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। অশ্বিনী অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া বলিতে লাগিল—'শালারা সব গণ্ডমুখ্যু—গোঁসাইয়ের কাছে যাবে বলে এসেছে, অথচ তাঁর ঠিকানা জেনে আসে নাই।'

কুঞ্জ—তুইও তো এসেছিস্, তুই জেনে আসিস্ নাই কেন?

অশ্বিনী—আরে আমি যে তোর সঙ্গে এসেছি, তুই যেখানে যাবি আমিও সেখানে যা'ব। ঠিকানায় আমার প্রয়োজন কি ?

কুঞ্জ। থাক্‌, এখন ঝগড়া থাক ; এখন কি করা যাবে তাই বল। সয়তান তো 'গোঁসাই সর্ব্বত্র' ব'লে গাছতলায় গিয়ে আসন করেছে। ও ওতো গোঁসাইয়ের ঠিকানা জানে না। এখন উপায় কি ?

অশ্বিনী—আরে উপায়ের জন্য ভাবনা কি ? যা বলি তাই কর্‌। আপন আপন কম্বল বস্তা সকলে ঘাড়ে নে, আমার পিছনে পিছনে চল্‌। তোদের ঠিক্‌ গোঁসাইয়ের নিকটে নিয়া পঁহুছাব। গোঁসাই একদিন একটা স্থানে থাক্‌লে পরদিন সহরময় রাষ্ট্র হয়, আর এতদিন তিনি এখানে আছেন কেহ তাঁকে জানে না ? সহরে এমন কোন ভদ্রলোক আছে যে গোঁসাইয়ের খবর পায় নাই ? যাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো সেই গোঁসাইয়ের কথা ব'লে দিবে।

কুঞ্জ—তা হ'লে তুই যা। এখন রাত্রি দশটা, এই দারুণ শীতে গোঁসাইয়ের খবর বল্‌তে ভদ্রলোকেরা রাস্তায় ঘুর্‌ছে—তুই কারোকে জিজ্ঞাসা করে আয়, তারপর আমরা যাব।

অশ্বিনী—আমি একা যেতে পার্‌বো না, তুইও চল্‌।

কুঞ্জ—তোর তো বেশী যেতে হবে না। এখান হ'তে বের হ'লেই তোর মত কত ভদ্রলোক রাস্তায় পাবি। সারা রাতই তো তারা রাস্তায় ঘুরে।

অশ্বিনী—চুপ শালা, এবার কিল খেয়ে মর্‌বি।

অশ্বিনী উহার নিকটে না থাকিয়া, আমার নিকটে আসিল, আমি বুঝলাম লক্ষণ ভাল নয়—এবার আমার রাশীতে। আমি ধীরে ধীরে আসন ঝোলা কাঁধে তুলিয়া নিলাম, এবং ছোড়দাদাকে বলিলাম,—চলুন সহরে যাই, ঠাকুরকে বেশী খুঁজ্‌তে হবে না, তিনিও আমাদের খুঁজ্‌ছেন। ছোড়দাদা আমার সঙ্গে চলিলেন দেখিয়া, কুঞ্জ অশ্বিনীও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পৌষের বিষম শীতে অচেনা পথে, ঘাড়ে বোঝা লইয়া চলিতে লাগিলাম। কোথায় যাইব কিছুই ঠিক নাই ; রাস্তাও অন্ধকার। শীতে শরীর অবশ ও পরিশ্রমে শরীর কাতর হইয়া পড়িল। বড় বড় রাস্তায় ও গলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলেই খুব হয়রাণ হইলাম। অশ্বিনী পশ্চাতে পড়িয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল—'আরে, আর কত ঘুরাবি ? আমি যে আর পারি না।' আমি বলিলাম—'আর ঘুরাব না, এখন সোজা আমার পিছনে পিছনে চল্‌। তুই তো আমাদের সকলের চেয়ে মর্দ্দ ! আমাদের মধ্যে আমার মত দুর্ব্বল তো কেহ নাই, আমার বোঝাটা তোর ঘাড়ে নিয়ে আমাকে একটু সাহায্য কর্‌ না।' অশ্বিনী বলিল—দাঁড়া এবার তোকে আস মিটিয়ে সাহায্য কর্‌বো। তোকে যে নাগাল পাই না—তাই তোর রক্ষা। এইভাবে কোন্দল-আলাপে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাস্তবিকই আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে একটি বড় রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি শব্দ কানে আসিল,—"ব্রহ্মচারী, আমি যে এখানে, এসো"। শব্দটি ঠাকুরের শব্দ বুঝিয়া আমরা সকলেই থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের দক্ষিণ পাশের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন বুঝিলাম। ভিতর হ'তে একজন

গুরুভাই দরজা খুলিয়া দিল, দেখিলাম ঘরে গোঁসাই। আমরা রোয়াকে জিনিষপত্র রাখিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরের ঘরে অনেকগুলি গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন দেখিলাম। তাঁহারা আমাদের আসন, ঝোলা প্রভৃতি ঘরে নিয়া গেলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আহারান্তে ঠাকুরের ঘরে সুখে নিদ্রা হইল। জয় গুরুদেব!

চড়ায় কুম্ভমেলার স্থান দর্শন।

শেষ রাত্রে ঠাকুর করতাল বাজাইয়া ভোর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমরা সকলে আসনে উঠিয়া বসিলাম। ঠাকুরের কীর্ত্তন হইয়া গেলে, আমি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম। স্নানের পর বাসায় আসিয়া সকলের সঙ্গে চা পান করিলাম। তৎপরে ঠাকুরের ঘরে যাইতেই ঠাকুর আমাকে আসন করিতে বলিলেন। ঘরের এক কোণে ঠাকুরের আসন। আমি কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অন্য দিকে আসন করিলাম। অন্যান্য স্থানে যেমন ঠাকুর ২৪ ঘণ্টা একটা রুটিং মত চলেন, এখানেও দেখিলাম ঠাকুরের সমস্ত কাজই সেই মত চলিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কয়খানা গ্রন্থ পাঠ হইলে পর ঠাকুর গ্রন্থসাহেব, ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। এগারটার পর ঠাকুর শৌচে গেলেন। গুরুভ্রাতারাও সকলে মিলিত হইয়া স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা হাসিগল্পে আনন্দ করিতে লাগিলেন।

শুনিলাম ঠাকুর ১০।১২ দিন হয়, দিদিমা, শান্তি, কুতুবুড়ী, যোগজীবন, জগবন্ধুবাবু, মহেন্দ্রবাবু, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ও বিধু ঘোষ প্রভৃতিকে লইয়া প্রয়াগধামে আসিয়াছেন। আসিবার সময়ে রাস্তায় শোনপুরে হরিহরছত্রের মেলা দেখিতে বাঁকিপুরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঘোড়া, গরু, উট, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত অসংখ্য পশু বিক্রয়ার্থ এই মেলায় আনীত হয়। নানা সম্প্রদায়ের সাধু সজ্জন ধর্ম্মার্থিগণও এই মেলায় সমবেত হইয়া থাকেন। 'বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যাতে' এই প্রকার বৃহৎ মেলা আর কোথাও হয়, শুনা যায় না। দীর্ঘকালব্যাপী এই মেলায় নানাবিধ বস্তু বিক্রয়ার্থ প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। ঠাকুর এই মেলা দেখিয়া এলাহাবাদে আসিয়া সাগঞ্জে একখানা বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বাড়ীতে ৬।৭ খানা ঘর। বড় রাস্তার উপরে একখানা মাত্র হলরুম, তাহাতে ঠাকুর আসন করিয়াছেন। ভিতরবাড়ী চক্‌মিলান—তাহাতে প্রায় ৩০।৪০ জন গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন। উপরে দু'খানা ঘর আছে, তাহাতে মেয়েরা থাকেন। এ পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে স্থানের কোন প্রকার অসংকুলান হয় নাই। প্রয়াগে আসিয়া ঠাকুর কুম্ভমেলায় আসিতে অনেক গুরুভ্রাতাকে চিঠি দিয়াছেন। ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক গুরুভ্রাতারা আসিয়াছেন।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। কমণ্ডলুটি আমাকে লইতে বলিয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন। আমি কমণ্ডলু হাতে লইয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। গুরুভ্রাতারাও, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায়ই বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা অনেক রাস্তা

হাঁটিয়া ঠাকুরের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী ত্রিবেণী। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—এইস্থানে মিলিত হইয়াছেন। প্রয়াগে গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী এবং যমুনা পূর্ব্ববাহিনী। শুভ্রবর্ণা গঙ্গা ও নীল যমুনার মিলনস্থান একটি পরিষ্কার রেখার মত দেখায়। সরস্বতী অন্তঃসলিলা। স্থানটি বড়ই মনোরম। এই দুই স্রোতস্বতীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ দুর্গ। এই দুর্গের ভিতরে হিন্দুধর্ম্মের অক্ষয়-কীর্ত্তি 'অক্ষয়-বট' আজও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এখানে পুরাকালে ঋষিবর ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রম ছিল। এই আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত বনগমনকালে কিছু সময় অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সমস্ত মুনি ঋষিগণ এই আশ্রমে সমবেত হইয়া কল্পবাস ও ত্রিবেণীতে স্নান করিতেন। এই স্থানের মাহাত্ম্য অসাধারণ বলিয়া ঋষিগণ প্রয়াগধামকে তীর্থরাজ বলিয়া গিয়াছেন।

ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগা।
জিনহি রামপদ অতি অনুরাগী ॥
তাপস শম দম দয়া নিধানা।
পরমারথ পথ পরম সুজানা ॥
মাঘ মকরগত রবি যব হোই।
তীরথ পতিহি আর সব কোই ॥
দেব দনুজ কিন্নর নরশ্রেণী।
সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী ॥
পূজহি মাধব পদ জল জাতা।
পরশি অক্ষয় বট হর্ষিত গাতা ॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন।
পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন ॥
তাঁহা হোয় মুনি ঋষয় সমাজা।
জঁহি জে মজ্জন তীরথ রাজা ॥
মজ্জহি প্রাত সমেত উছাহা।
কহহি পরস্পর হরিগুণ গাহা ॥
ব্রহ্মনিরূপণ ধর্ম্মবিধি বর্ণহি তত্ত্ববিভাগ।
কহহি ভক্তি ভগবন্তকী সংযুক্তজ্ঞানবিরাগ ॥
ইহি প্রকার ভরি মকর নহাহি।
পুনি সব নিজ আশ্রম যাহি ॥
প্রতি সংবত অস হোয় অনন্দা।
মকর মজ্জ গবনহি মুনি বৃন্দা ॥

শ্রীমৎ তুলসীদাস কৃত রামায়ণ,
বালকাণ্ড।

গঙ্গার অপর পারে বহু বিস্তৃত চড়ার উপরে কুম্ভমেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেল্লার অনতিদূরে সরকার বাহাদুর একটি সুদৃঢ় নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়া সাধারণের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমরা ঠাকুরের সঙ্গে সেতু পার হইয়া চড়ায় উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাজল হইতে চড়াটী ৬।৭ ফুট উঁচুতে: সমতল জমাট বালি ৫.৬ মাইল বিস্তৃত, ধুধু করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সাধু সন্নাসী, উদাসী মহান্তেরা আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন মত স্থান লইয়া তাহা বেড়া দ্বারা বেষ্টন করিয়া নিয়াছেন। এক মাইলের অধিক স্থানও কোন কোন সম্প্রদায় নিজেদের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমে সন্ন্যাসীদের, পরে নানকসাহী উদাসী প্রভৃতির, তৎপরে বৈষ্ণবগণের স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনির্দ্দিষ্ট স্থানও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। তাহাতে লক্ষ লক্ষ সাধু সজ্জন ধর্ম্মার্থিগণ ছাতা খাটাইয়া থাকিবেন। কাহারাও বা অনাবৃত আকাশের নীচে ধুনীমাত্র রাখিয়া দারুণ মাঘের শীতে দিনরাত্রি অতিবাহিত করিবেন শুনিতেছি। প্রতি বৎসর প্রয়াগে গঙ্গাতীরে কল্পবাস করিবার জন্য

সহস্র সহস্র হিন্দু গৃহস্থ এইস্থানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত মাঘ মাস গঙ্গার ধারে থাকিয়া, প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান ও দিবসব্যাপী ভজন-সাধন করিয়া থাকেন। এবার মেলার দরুণ সাধুদের সংখ্যাই এত অধিক যে, চড়ায় গৃহস্থদের স্থান সংকুলানের সম্ভাবনা কম। এইজন্য অনেক সাধু প্রয়োগের পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে ও গঙ্গার অপর পারে ঝুঁসিতে কুটীর নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঝুঁসি এবং এলাহাবাদ হইতে মেলার চড়ায় যাতায়াতের জন্য গঙ্গা যমুনার উপর দুইটি বড় পোল প্রস্তুত হইয়াছে।

এই মেলাতে যিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান নেতা, তিনিও সমস্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের থাকিবার জন্য অনেকগুলি স্থান নিয়াছেন। আমরাও তাঁহার নিকট হইতে এক বিঘা জমি লইয়াছি। ঠাকুর সেই স্থানটি দেখিবার জন্য চলিলেন। আমরা প্রায় ১৫।২০ মিনিট চলিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জলের জন্য একটি কূপ খনন করা হইতেছে। ৮।১০ ফিট্ খুঁড়িতেই ২।৩ফিট্ পরিষ্কার জল উঠিয়াছে। ঠাকুর অনেকক্ষণ ঐস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং আমাদেরই জমীর একধারে লোহার কড়া মাথায় দিয়া একটি লোক কাত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন—"আহা কি চমৎকার! মস্তক হ'তে শুভ্র জ্যোতিঃ চারদিকে ছড়ায়ে পড়েছে। অসাধারণ মহাপুরুষ।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া লোকটির দিকে তাকাইয়া দেখি, নেংটী-পরা কালবর্ণ দৃঢ়কায় একটি লোক বালির উপরে পড়িয়া ঠাকুরের দিকে মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিতেছে। ঠাকুরের কথা শুনিয়াও মহাপুরুষের প্রতি আমাদের লক্ষ্য পড়িল না। আমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাসার দিকে রওয়ানা হইলাম। ২।১ মিনিট চলার পরই দেখি মহাপুরুষটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঠাকুরের সম্মুখে আসিলেন এবং ঠাকুরের চলার কোন অসুবিধা না করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ দিকে চলিলেন। নানাপ্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া,দুই হস্ত দ্বারা ঠাকুরকে আরতি করিতে করিতে 'আহা আহা' শব্দে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিকে দৌড়িয়া অদৃশ্য হইলেন। ঠাকুর উঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমরা গঙ্গার তীরে তীরে পোলের নিকটে আসিলাম। ঠাকুর বলিলেন—"কাল যখন চড়ায় বেড়াই, ব্রহ্মচারী ও সারদাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌লাম, তখনই মনে হ'লো, এসে পড়্‌লো।" সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা বাসায় পঁহুছিলাম। সংকীর্ত্তনানন্দে রাত্রি ৯টা কাটিল, তৎপরে সকলের আহার ও বিশ্রাম।

বেণীমাধব ও আর আর বিগ্রহ দর্শন ঃ ঠাকুরের দান।

আজ ঠাকুরের চা সেবার পর গ্রন্থাদি নমস্কার করিয়া বেণীমাধব দর্শন করিতে বাহির হইলেন। কমণ্ডলুটী হাতে লইয়া গুরুভ্রাতা-ভগ্নীদের সঙ্গে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইল। রাস্তার দুই পার্শ্বে কাঙ্গালী ও সাধুরা পয়সা চাহিতে লাগিল। ঠাকুর সকলকেই

২৷৪ পয়সা করিয়া দিতে দিতে তামাসা করিয়া বলিলেন—'আজ তো হাম বড়া দাতা বন্‌ গিয়া। দো পয়সা চার পয়সা দেনে লাগা'। ইহা শুনিয়া যাহার যাহা হাতে ছিল ঠাকুরকে দিতে লাগিল। ঠাকুর তাহা কাঙ্গালীদের বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়া সকলে স্নান করিলাম। ঠাকুর বেণীমাধব দর্শন করিতে চলিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বেণীমাধবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এক টাকার বাতাসা আনাইয়া বেণীমাধবকে ভোগ দিলেন এবং বলিলেন—"এই স্থানে মহাপ্রভু কিছুদিন ছিলেন।" মন্দির হইতে বাহির হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাট দেখাইয়া বলিলেন—"এই স্থানে মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে দশ দিন ধ'রে শিক্ষা দিয়াছিলেন।" কিছু অধিক বেলায় আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাসায় পঁহুছিলাম।

কথায় কথায় ঠাকুর বলিলেন—'অনেক তো ঘুর্‌লাম, কিন্তু তেমন একটি সাধু দেখ্‌তে পেলাম না। সাধু বল্‌তে বেণীমাধবকেই দেখ্‌লাম, তাই তাঁকে কিছু দিয়া আস্‌লাম।"

ঠাকুর এই কথা কেন বলিলেন, জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন—"বেণীমাধব সাধুর বেশে এসে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন।"

ঠাকুরের নানা দেবালয় দর্শন।

আজও ঠাকুর ৩টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতারাও সকলেই ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঠাকুরের পায়ে বেদনা—অধিক দূর চলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয়ের কথামত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ ঠাকুরের জন্য একখানা গাড়ি ভাড়া করিলেন। ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুরের কমণ্ডলু আমার হাতে, তাই আমাকে তাঁহার গাড়িতে উঠিতে বলিলেন। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন। বিধুবাবু কোচ ম্যানের পাশে বসিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। গুরুভ্রাতারা দেখিলেন—বিষম মুস্কিল, হাঁটিয়া চলিলে ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। তখন তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত যিনি যে গাড়ি পাইলেন ভাড়া স্থির না করিয়া তিনি তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতাদের ৫খানা গাড়ি হইল। ঠাকুর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানাস্থানে, গঙ্গাতীরে, দেবালয়ে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিলেন; গুরুভ্রাতাদের গাড়ি কয়খানাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িল। গাড়ি বাড়ীর দরজায় পঁহুছানমাত্র গুরুভ্রাতারা দুপ দাপ নামিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। গাড়োয়ানরা দেড়া ভাড়া হাঁকিয়া ভাড়ার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। বোলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবু ঠাকুরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি চীৎকার শুনিয়া নিজ হইতেই গাড়োয়ানদের ভাড়া মিটাইয়া দিলেন। হরিদাসবাবু মাসব্যাপী মেলায় থাকিতে পারিবেন না,—তাই এই সময় ঠাকুর দর্শনে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের পর গুরুভ্রাতারা আহার সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

ল্যাংগা বাবা ঃ গুরুভ্রাতাদের কাণ্ড।

গত কল্য ঠাকুর কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যতদিন তিনি চড়ায় না যাইবেন, প্রত্যহই গঙ্গাতীরে কখনও বা মেলাস্থানে গিয়া সাধুদের দর্শন করিয়া আসিবেন। আহারান্তে গুরুভ্রাতারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ঠাকুর আর আর দিনের মত তিনটার সময়ে যেমন বাহির হইয়া পড়িলেন, গুরুভ্রাতারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যে সকল গুরুভ্রাতার টাকা পয়সা কিছুই নাই, কোনপ্রকারে মেলা দেখিতে ঠাকুরের নিকট আসিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম খুব বেশী। তাঁহারা ঠাকুরকে পশ্চাতে রাখিয়া গাড়ির আড্ডায় উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের জন্য একখানা গাড়ি রাখিয়া ২।৩ খানা গাড়িতে চাপিয়া বসিলেন। ঠাকুর আজ আর চড়ায় গেলেন না। গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে জীর্ণ কুটীরে একটি সাধু বাস করেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। সাধু ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে যেন মাতিয়া গেলেন। কতপ্রকারে ঠাকুরকে স্তবস্তুতি আদর-যত্ন করিয়া, নিজ কুটীরের সম্মুখে নিয়া বসাইলেন। সাধু অতি বৃদ্ধ, বয়স নব্বই বৎসর সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকেন। লোকে সাধুকে ল্যাংগাবাবা বলে। হরিকথা প্রসঙ্গে তাঁহার অশ্রুকম্প হইতে লাগিল দেখিয়া, গুরুভ্রাতারা সকলেই খুব আনন্দলাভ করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে ঠাকুর বাসায় পঁহুছিলেন। গুরুভ্রাতাদের গাড়িগুলিও আসিয়া উপস্থিত হইল। গত কল্যের মত গুরুভ্রাতারা গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাসবাবু ঠাকুরের ও নিজের গাড়িভাড়া মিটাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সময়ে অন্যান্য গাড়েয়ানরা গাড়িভাড়ার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। তখন গুরুভ্রাতারা একে অন্যকে বলিতে লাগিল—ওরে! গাড়োয়ান ভাড়ার জন্য চীৎকার কর্‌ছে, শুন্‌তে পাচ্ছিস না? সে অমনি উত্তর করিল—'কৈ আমি কিছুই শুন্‌তে পাচ্ছি না। তুই শুনছিস্? তুই গিয়ে যা ব্যবস্থা কর্।' যাহারা ২।৪ টাকা দিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'থাম ভাই, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না বলিয়া ঘটি হাতে লইয়া দৌড় মারিল। কেহ বা প্রস্রাব করিতে চলিল। কেহ কেহ দরজা আড়াল দিয়া ঘরের ভিতরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর অবশিষ্টগুলি তামাক সাজিয়া ঘন ঘন কলকিতে ফুঁ দিতে লাগিল। অর্থশালী গুরুভ্রাতা একমাত্র হরিদাসবাবু, তিনি বুঝিলেন গতিক ভাল নয়। গাড়োয়ানদের চীৎকারে ঠাকুর বিরক্ত হইবেন। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সমস্তগুলি গাড়ির ভাড়া আজও চুকাইয়া দিলেন। হরিদাসবাবু প্রয়াগে আসার পরদিন হইতে ভাণ্ডারের সমস্ত খরচ দিয়া আসিতেছেন। তাহার উপরে আবার গুরুভ্রাতাদের এই কৌশলের চাপ। সুতরাং একটু বিরক্ত হইলেন এবং গুরুভ্রাতাদের কারো কারোকে বলিলেন—কল্য হইতে আর তিনি গাড়িভাড়া দিবেন না এবং ঠাকুরকে বলিয়া গুরুভ্রাতাদের এ সব ব্যবহারের একটি প্রতিবিধান করিবেন।

সন্ধ্যার পরে আর আর দিনের মত ঠাকুরের নিকট সংকীর্ত্তন হইল। সহরের অনেক ভদ্রলোক

এই সংকীর্ত্তনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গুরুভ্রাতাদের ভাবাবেশের অবস্থা দেখিয়া অবাক্। শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগ্‌চি মহাশয় ঠাকুরকে দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন। ঠাকুর প্রয়াগে আসার পর তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সকলের সঙ্গে মিশিতেছেন। বাড়ী তাঁহার নবদ্বীপে, এস্থানে তিনি ডাক্তারি করিয়া থাকেন।

ঠাকুর কথায় কথায় ল্যাংগাবাবার কথা তুলিয়া তাঁহার ভাবভক্তি এবং অশ্রু, কম্প, পুলকাদির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাত্রে জলযোগের পর ঠাকুর মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের বলিলেন—"হরিদাস বাবুর উপরে বড়ই অত্যাচার হচ্ছে, গাড়ি ভাড়া আর তাঁর নিকট হ'তে নিবেন না।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা বিষম উদ্বেগে পড়িলেন। কল্য কাহার নিকট হইতে অত টাকা গাড়িভাড়া আদায় করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। সবল সুস্থ হইলেও ঠাকুর গাড়িতে চলিলে হাঁটিয়া যাইতে যে কারো প্রবৃত্তি হয় না।

আজ সকালে আমাদের পরম আত্মীয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কানপুর হইতে আসিলেন। মন্মথদাদাকে দেখিয়া আমরা সকলেই খুব আনন্দলাভ করিলাম। ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমাদের অদৃষ্টক্রমে মন্মথদাদার দুই দিনের অধিক থাকা হইবে না, উকীল মানুষ—হাতে বড় মামলা, শীঘ্রই আবার কানপুর যাইবেন। মন্মথদাদা যে দু'তিন দিন রহিলেন, ভাণ্ডারের সমস্ত ব্যয় তিনিই বহন করিলেন। গুরুভ্রাতাদের বেড়াইবার গাড়িভাড়াও সন্তুষ্টচিত্তে তিনিই দিলেন। মন্মথবাবু চলিয়া যাওয়ার পর হরিদাসবাবুও বোলপুরে যাইতে ব্যস্ত হইলেন। কি প্রকারে দৈনিক খরচ চলিবে ভাবিয়া সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। গুরুভ্রাতাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তেমন অবস্থাপন্ন কেহ আসিতেছেন না। সকলেই নিঃস্ব, কোন প্রকারে ধার-কর্জ্জ করিয়া মাত্র রেলভাড়াটি লইয়া আসিয়াছেন। ২।৫ জন মাত্র স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গুরুভ্রাতা আছেন, তাঁহারা আর কয়দিন দৈনিক খরচ চালাইতে পারেন?

আশ্রমে কাজের বিভাগ : ঠাকুরের ভিক্ষা ও দান : ঠাকুরের আকাশবৃত্তি।

আজ সকালে কয়েকজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগ্‌চি প্রভৃতি কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোকের সহিত মিলিত হইয়া বৈঠক করিলেন। আলোচনা হইতে লাগিল, কি প্রকারে দৈনিক খরচ চলিবে। তাঁহাদের হাতে যাহা কিছু ছিল তাহাতো নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এখন উপায় কি? ঠাকুর কুম্ভমেলায় এক মাস থাকিবেন এবং সাধু শান্তদের ভাণ্ডারা দিবেন। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন এই মহৎকার্য্যে পাঠাইতে পারেন এই মর্ম্মে গুরুভ্রাতাদের নিকট চিঠিপত্র অনেকদিন হয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেহই তো কিছু পাঠাইতেছেন না। এখন প্রতিদিন মাসাধিক কাল এই বিপুল খরচ কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবে? উঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, ঠাকুর

যদি দিদিমা, শান্তি, কুতুবুড়ী, যোগজীবন, জগবন্ধু এবং সর্ব্বদা যাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে আছেন শুধু তাঁহাদের লইয়া থাকেন তাহা হইলে কোন অভাবই ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু দলে দলে যে সকল গুরুভ্রাতা এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং দিনদিনই আসিতেছেন, তাঁহারা যদি নিজেদের ভার নিজেরা বহন না করেন, তা'হলে অবস্থা বড়ই বিষম হইবে। খাওয়ার অভাবে সকলকে পলাইতে হইবে। এ বিষয়ে পাকাপাকি একটা মীমাংসা করিবার জন্য উঁহারা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরকে বলিলেন—'মশায়! আমরা আপনাকে একটি কাজের কথা বল্‌তে এসেছি।' ঠাকুর—'কি কাজের কথা বলুন?' উঁহারা বলিতে লাগিলেন—'দেখুন এখানে স্ত্রী পুরুষে প্রায় ৪০।৪৫ জন আছেন। এত দিন তো কোন প্রকারে চ'লে গেল, এখন দৈনিক খরচ চল্‌বে কিরূপে ভেবে আমরা বড়ই উদ্বেগ ভোগ কর্‌ছি। আয়ের দিক তো কিছুই নাই। অথচ খরচ প্রতিদিনই আছে। এখানে যাঁরা আছেন, এদিকে তাঁদের কারো লক্ষ্য নাই। খাবার সময়ে পাত পেতে বসেন, পেটভরে খান, আর সারাদিন বাজে গল্পে হুঁকা কলকি তামাক্ লইয়া ঝগড়া ক'রে সময় কাটান। সাধন ভজনও নাই—কিছুই নাই। এ সব ভ্যাগাবণ্ড (Vagabond) ক্লাশ, জোয়ান মর্দ্দ নিষ্কর্মা কুড়ের দল আশ্রমের কোন কাজই কর্‌বে না—বল্‌লে ঝগড়া কর্‌বে। বিষম মুস্কিল। এরা যদি নিজেদের ভার নিজেরা নি'য়ে থাকেন, তা'হলে আর কোন অসুবিধা থাকে না।' ঠাকুর শুনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আহা! এদের ওরূপ বল্‌তে নাই। এরা সকলেই ভদ্রলোক, সকলেরই ঘরে খাবার পরবার আছে—দয়া ক'রে আমার কাছে রয়েছেন। এরাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু।' ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ভিতরের বেগ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ অশ্রু-কম্প পুলকে অভিভূত হইলেন। কেহ কেহ অশ্রুপূর্ণ নয়নে কম্পিত কলেবরে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন। কারো কারো বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। অভিযোগকারী বাবুরা এদের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন—'আশ্রমে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সকলেরই কিছু-না-কিছু আশ্রমসেবার কাজ নিয়ে থাকা উচিত, না হ'লে অপরাধ হয়। আপনারা সকলেই আশ্রমের কাজ বিভাগ ক'রে নিন। তা'হলেই আর কোন অশান্তি থাক্‌বে না। আপনারা আমাকেও একটা কাজ দিন।' ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই লজ্জায় হেঁটমস্তকে নীরব রহিলেন। ঠাকুর তখন বলিলেন—'আচ্ছা, আমি সকলকে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াব, এই ভার আমি গ্রহণ কর্‌লাম। এখন তোমরা যার যা ইচ্ছা আমাকে ভিক্ষা দেও।' এই বলিয়া আঁচল পাতিলেন। তখন গুরুভ্রাতাদের যাহার যাহা ছিল, ঠাকুরকে আনিয়া দিলেন। ভিক্ষায় প্রায় ১৬০৲।১৭০৲ টাকা হইল। ঠাকুর উহা নিজ আসনের নীচে রাখিয়া দিলেন। ৫।৬ দিনের মত আশ্রম-খরচ চলিবে

ভাবিয়া গুরুভ্রাতারাও নিশ্চিন্ত হইলেন। ঠাকুর সকলকে বলিলেন—'আমার একটি কথা স্মরণ রাখ্‌বেন; আমার আকাশ বৃত্তি। একদিনের জিনিষ অন্যদিনের জন্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় রাখ্‌বেন না। যে দিন যা আস্‌বে সমস্তই ব্যয় ক'রে ফেল্‌বেন।' গুরুভ্রাতারা সকলেই ঠাকুরের কথা শুনিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের ভিতরে আশ্রমের সমস্ত কাজ বিভাগ করিয়া লইলেন। রামযাদব বাবু বহুকাল এস্থানে আছেন, এজন্য তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর (বি. এল.) সহিত বাজার সরকার করা হইল। জগবন্ধুবাবু এবং শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ভোগরান্নার ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। মহেন্দ্র দাদা মহুরী হইলেন। জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য্যও গুরুভ্রাতারা আগ্রহের সহিত যিনি যাহা পারেন গ্রহণ করিলেন। সকলেই খুব উৎসাহের সহিত আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নিষ্কর্ম্মা গুরুভ্রাতাদের ভিতরেও একটা উৎসাহের স্রোত বহিল।

মাঘ মাসের অধিক দিন বাকী নাই। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ সাধু চড়ায় আসিয়া ছাউনী করিয়াছেন। গঙ্গার ধারে এপারেও অসংখ্য সাধু অনাবৃত স্থানে আসন করিয়া বসিয়াছেন। কাঙ্গালী, দুঃখী দরিদ্রও বিস্তর। সহরটি লোকে পরিপূর্ণ। সারাদিন ভিক্ষুকের অভাব নাই। প্রত্যহই ভিক্ষুকের চীৎকারে অস্থির থাকিতে হয়। আজ হাতে টাকা পাইয়া ঠাকুর যে যাহা চাহিলেন, দিতে লাগিলেন। ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় ৪০৲।৫০৲ টাকা উড়িয়া গেল। তিনটার পর ঠাকুর বাহির হইলেন। অবশিষ্ট টাকাগুলিও সঙ্গে করিয়া লইলেন। গঙ্গার তীরে পঁহুছিতেই ৪।৫টি সাধু ঠাকুরকে দেখিয়া বলিলেন, 'স্বামীজী! দো রোজ হাম ২৫ মূরত ভুখা হ্যায়—মেহেরবাণী কিজিয়ে।' কেহ কেহ আসিয়া বলিলেন—'মহারাজজী! ধুনীকা লকড়ী নাহি হ্যায়। ভজন তো একদম বন্ধ হো গিয়া, আব ক্যা করে।' কেহ, 'পানি পিনেকা লোটা নেহি হ্যায় বাবা'; কেহ বা 'গাঁজা নেহি হ্যায়'; আবার একদল আসিয়া বলিল—'স্বামিজী! জারামে হাম লোক তো মর্ যাতা হ্যায়—একঠো কর্‌কে কম্ব্‌লি হুকুম হোয়।' প্রার্থীরা যেমন চাহিতে লাগিলেন ঠাকুরও সেই মত ১০৲।১৫৲।২০৲।২৫৲ টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্তগুলি টাকা বিতরণ করিয়া ঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। ঠাকুরের এই প্রকার অবিচারে অর্থব্যয় সম্বন্ধে অনেকে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন। কল্য কি প্রকারে এতগুলি লোকের আহারাদি হইবে ভাবিয়া অনেকেই অশান্তিতে পড়িলেন। খাওয়াবার ভার ঠাকুর নিয়াছেন; কল্য ঠাকুর কি করিবেন এই দুশ্চিন্তায় অনেকের রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না।

আজ শেষ রাত্রে অন্যান্য দিনের মত ঠাকুর ভোরকীর্ত্তন করিয়া আসনে বসিয়া আছেন। একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক ঠাকুরের সম্মুখে দরজার বাহিরে রোয়াকে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন—'স্বামীজী! কৃপা কর্‌কে হুকুম কিজিয়ে, সেবাকা ওয়াস্তে থোড়া কুছ হাম ভেজ

দেই।' ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। কতজন লোক ঠাকুরের সঙ্গে আছি, লোকটি খবর লইয়া চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই দু'টি ভারী প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল, আটা, ঘি, তৈল, চিনি, মিশ্রি, সুজি, আলু, কপি, বেগুন, শিম, শাক, লেবু, দুধ, দই, পেয়ারা, পাঁপর, রাবড়ি, সন্দেশ ও বিবিধ প্রকার মসল্লা, তামাক, টিকে, দেশলাই, পান, সুপারী ইত্যাদি যাবতীয় সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইল। গুরুভ্রাতারা সকলেই দেখিয়া অবাক্। আজ বিবিধ প্রকার রান্না করিয়া সুখেস্বচ্ছন্দে ভোজনান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন। ঠাকুর ভাণ্ডারের কর্ত্তাদের ডাকিয়া বলিলেন—'অদ্যকার মত জিনিষ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত কাঙ্গাল দুঃখীদের বিলাইয়া দিন। আমার আকাশ-বৃত্তি। একটি জিনিষও যেন কল্যকার জন্য ভাণ্ডারে না থাকে।' ঠাকুরের আদেশ মত তাহাই করা হইল। গুরুভ্রাতারা বৈঠক করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, ঠাকুর এ কি করিলেন, ভাণ্ডারায় যাহা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল অনায়াসে কল্যও চলিত। জিনিষপত্র দেখিয়া কল্যকার জন্য আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, ঠাকুর যে সব সারিলেন।

অপরাহ্নে ঠাকুর রামযাদব বাবু প্রভৃতিকে বলিলেন—'আপনারা ২।৪ দিনের মধ্যেই চড়ায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন, আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না।' শুনিলাম চড়াতে যে স্থানটি আমাদের নেওয়া হইয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে মজবুত টাট্টি দিয়া ঘেরাও করা হইয়াছে। রান্না করিবার ঘর ও ভাণ্ডার ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। ঠাকুরের জন্য একটি পায়খানাও শীঘ্রই হইবে। এখন তাঁবুটি সংগ্রহ হইলেই চড়ায় যাওয়ার আর কোন অসুবিধা থাকে না। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যথাসাধ্য আমাদের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আর আর দিনের মত সন্ধ্যায় সময়ে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গুরুভ্রাতারা ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে দর্শকগণের সমাগমে রাস্তা লোকে পরিপূর্ণ হইল। অনেকক্ষণ কীর্ত্তনের পর ঠাকুর হরিরলুট দিয়া আসনে বসিলেন। দিনটি বড়ই আনন্দে কাটিয়া গেল। রাত্রে গুরুভ্রাতারা সকলে মাড়োয়ারী প্রদত্ত মিষ্টান্ন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। কোন কোন গুরুভ্রাতা আগামী কল্য কি প্রকারে আহারের সংস্থান হইবে, ভাবিতে লাগিলেন। আবার মর্দ্দ নিষ্কর্ম্মা গুরুভ্রাতারা বলিতে লাগিলেন, আহারাদির ভার যখন ঠাকুর নিয়াছেন তখন আর ওসব বাজে চিন্তা কেন? আমি প্রত্যহই ভাণ্ডার হইতে চাল ডাল লইয়া স্বপাক আহার করিতেছি।

ঠাকুর ভোর কীর্ত্তনান্তে আসনে বসিয়া আছেন। আজও সেই মাড়োয়ারী আসিয়া ঠাকুরকে নমস্কার পূর্ব্বক করযোড়ে বলিলেন—'স্বামীজী! মেহেরবান কর্কে হুকুম দেজিয়ে, আজ ভি হাম ভাণ্ডারা যো কুছ্ বনে ভেজ দেই।' ঠাকুর একটু সময় তাঁর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সম্মতি দিলেন। বেলা ৮টার মধ্যে কল্যকার মত সমস্ত জিনিষ আসিয়া পড়িল। ঠাকুরের আদেশ মত আজও প্রয়োজন মত জিনিষ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ভিখারীদের বিতরণ করা হইল। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গোবিন্দবাবু আমাদের তাঁবুর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। রামযাদব বাবুর নিকট শুনিলাম,

গোয়ালিয়রের মহারাজার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সার দীনকর রাও বাহাদুর আমাদিগকে একটি সুবৃহৎ তাঁবু ৪।৫ দিনের মধ্যেই আনাইয়া দিবেন। ঠাকুরও চড়ায় যাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতিদিনই সাধুদের বড় বড় জমাত আসিয়া পড়িতেছে। চড়ায় নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি প্রায় লোকে পরিপূর্ণ হইল। এ পাড়েও খালি স্থান আর দেখা যায় না। কেহ কেহ ছাতা খাটাইয়া এবং অধিকাংশ সাধু ধূনী জ্বালিয়া অনাবৃত অবস্থায় গঙ্গাতীরে জলের ধারে বাস করিতেছেন।

আজও ভোর বেলা মারোয়াড়ী ভিক্ষা দিতে আগ্রহ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন—'নেই, সো নেহি হোগা। সাধুলোক্‌ন্‌কা এইসা রীতি নেহি হ্যায়; আজ আপ্‌সে কুছ্‌ নাহি লেয়েঙ্গে।' মাড়োয়ারী বলিলেন—'ঘর্‌মে হামারা গৌয়া হ্যায়—বহুত দুধ হোতা হ্যায়, হুকুম হয় তো ৫।৬ সের ভেজ দেই।' ঠাকুর তাহাতেও আপত্তি করিলেন। বেলা প্রায় ৮টা হইল। সকলেই আহারের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঠাকুরের কোন প্রকার উদ্বেগই নাই। তিনি নিশ্চিন্তভাবে আসনে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একজন ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে একটি সাধুর আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া বলিলেন—'প্রভু! সাধু ভাণ্ডারা দিতেছেন, তিনি দয়া করিয়া সশিষ্যে সেই আশ্রমে আপনাকে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন।' ঠাকুর আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন। মধ্যাহ্নে সাধুর আশ্রমে যাইয়া সকলেই প্রসাদ পাইলেন। সাধু ৬০ বৎসর কাল ঐ আশ্রমে আসন করিয়া ভজন সাধন করিতেছেন। আশ্রম ছাড়িয়া একদিনের জন্যও তিনি অন্যত্র যায়েন নাই। এই সাধু কি প্রকারে ঠাকুরের পরিচয় ও সন্ধান পাইলেন—জানি না। আজ ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন,—'তোমাদের তাঁবু সংগ্রহ হোক্‌ আর নাই হোক্‌ পরশু আহারের পর আমি চড়ায় গিয়া বালির উপরে আসন ক'রে ব'স্‌ব।' ঠাকুরের কথা শুনিয়া কয়েকটি গুরুভ্রাতা চড়ায় কতদূর কি হইয়াছে অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন। তাঁবুর জন্যও কতকগুলি গুরুভ্রাতা গোবিন্দবাবুর নিকটে গেলেন। তাঁবু পাওয়া গেল, তাহা খাটাইবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। ছাউনীতে যাইয়া থাকার অনুষ্ঠানের আর কিছুই বাকি নাই সংবাদ আসিল। তাঁবুটি খাটান হইলেই হয়। চড়াতে যাইব মনে করিয়া গুরুভ্রাতারা খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন। মেয়েদের সাধুমণ্ডলীর ভিতরে থাকার ব্যবস্থা নাই, তাঁহারা সময় সময় যাইয়া ছাউনীতে থাকিবেন এবং সন্ধ্যার সময় আবরে বাসায় চলিয়া আসিবেন, ঠাকুর এই ব্যবস্থা করিলেন।

আজ গুরুভ্রাতারা চড়ায় যাইয়া দেখিয়া আসিলেন প্রকাণ্ড একটি তাঁবু খাটান হইয়াছে। ভাণ্ডার ঘর, রান্না ঘর পূর্ব্বে হইয়াছিল। ঠাকুরের জন্য একটি পায়খানাও তাঁবুর পশ্চাৎ দিকে প্রস্তুত হইয়াছে। এখন তাঁবুতে যাইয়া থাকার আর কোন অসুবিধা নাই। দারুণ মাঘের শীতে গঙ্গার চড়ায় বাবুদের মধ্যে অনেকেরই থাকা অসম্ভব। যাঁহারা একটু সুখাভ্যস্ত তাঁহারা সারাদিন চড়ায় থাকিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিবেন—এইরূপই ঠিক হইল। ৩০।৪০ জন

গুরুভ্রাতা ঠাকুরের সঙ্গে নিয়ত চড়ায় বাস করিবেন। এ পর্য্যন্ত গুরুভ্রাতাদের সংখ্যা ৫০ জনেরও অধিক হইয়াছে। ক্রমে আরো বৃদ্ধি পাইবে। ভগবানের কৃপায় তাঁবুটি যাহা পাওয়া গিয়াছে সচ্ছন্দরূপে ৩০।৪০ জন লোক বিছানা করিয়া থাকিতে পারিবে। গুরুভ্রাতারা উৎকণ্ঠার সহিত রাত্রি প্রভাতের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা কীর্ত্তনান্তে জলযোগ করিয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

চড়ায় যাত্রা ঃ পথে মাধোদাস বাবাজীর আশ্রম দর্শন ঃ পরমহংসজীর আবির্ভাব ও ঠাকুরের অভ্যর্থনা ঃ সংকীর্ত্তনে মহাভাবের তুফান।

আজ অতি প্রত্যুষে আমরা সকলে গঙ্গায় গেলাম। স্নানের পর অন্য কোথাও না যাইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। ঠাকুরের চা সেবার পর চড়ায় কখন আমাদের যাওয়া হইবে, খবর নিতে বহুলোক আসিতে লাগিল। আহার বেলা ১২টার মধ্যেই শেষ হইল। গুরুভ্রাতাদের উৎসাহ আনন্দ আজ আর শরীর মনে ধরে না। তাঁহারা কেহ কেহ গান, কেহ কেহ বাজনা, কেহ কেহ বা নানাপ্রকার আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তিনটার সময়ে চড়ায় যাত্রা করিবেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই গুরুভ্রাতারা দলে দলে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যাইয়া গঙ্গার পাড়ে পোলের ধারে ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করিবেন। ঠাকুরের পায়ের বেদনা এখনও সারে নাই। আড়াইটার পরই ৫।৬ খানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া পড়িল। সকলের বিছানা কম্বলাদি সকালেই চড়ায় পাঠান হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা হাঁটিয়া যান না, ৫।৭ জন এক এক গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। বিধু ঘোষ, মহেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি আমরা ৪।৫ জন ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। গাড়ি প্রশস্ত রাজপথ দিয়া পোলের দিকে চলিল। গঙ্গাতীরে পঁহুছিবার ৩।৪ মিনিট বাকী থাকিতে ঠাকুর গাড়ী থামাইতে বলিলেন। গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া, ঠাকুর দক্ষিণ পাশে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলেই গাড়ি বিদায় করিয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বাড়ীতে যাইয়া দেখি—উহা গৃহস্থ বাড়ী নয়, একটি সাধুর আশ্রম। আশ্রমটী দেওয়াল বেষ্টিত। অঙ্গনের দক্ষিণ দিকে একটি কুঠরীতে মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত আছেন। বাম দিকে বড় দালান, অনেক লোক তাহাতে থাকিতে পারে। বিস্তৃত অঙ্গনের অপর দিকে ফুল ও তুলসীর সুন্দর বাগান। একটি বৃদ্ধ সাধু মহাপ্রভুর মন্দিরে ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কম্পিত কলেবরে করযোড়ে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সাধুর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। সাধু ঠাকুরকে ধরিয়া নিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে বারান্দায় বসাইলেন এবং ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবাবেশে সাধুর শরীরে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সাধুর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল, ঠাকুরও সমাধিস্থ। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, ঠাকুরের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল; সাধুও চৈতন্যলাভ করিলেন। সাধু ঠাকুরকে বলিলেন—"আপনি যে এখানে আসিবেন, প্রভু সে খবর আমাকে সকালেই দিয়াছেন। পূজার সময়ে তিনি বলিলেন—

‘আজ বিজয় আমাকে দেখ্‌তে আসবে—তার জন্য আমার প্রসাদ রেখে দিস্‌।’ আমি আপনার জন্য ঠাকুরের প্রসাদ রেখেছি।” ঠাকুর উহা চাহিলেন। উৎকৃষ্ট লাড্ডু, মালপোয়া প্রভৃতি প্রসাদ সাধু ঠাকুরকে আনিয়া দিলেন। ঠাকুর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া গুরুভ্রাতাদের উহা দিয়া দিলেন। প্রসাদের স্বাদ ও গন্ধ বড়ই তৃপ্তিকর। উহা পাইয়া সকলেরই মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ঠাকুর তখন চড়ায় যাইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাবাজীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—‘এখন আমরা চড়ায় যেতেছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।’ তিনি কহিলেন—‘বীজ তুমি বুনিয়াছ, গাছ হউক—ফুল ফল হউক, তুমি তাহা ভোগ কর, আমার আপত্তি কি!’ অতঃপর ঠাকুর ধীরে ধীরে হাঁটিয়া পোলের নিকট উপস্থিত হইলেন।

গুরুভ্রাতারা সকলেই ঠাকুরের জন্য পোলের ধারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর যখন পোলের উপর দিয়া চড়ার দিকে চলিলেন, বহু গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে অসংখ্য সহরবাসী ভদ্রলোক ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। ঠাকুর পোল ও চড়ার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে বেষ্টন পূর্ব্বক অনিমেষে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর করযোড়ে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে চড়ার দিকে চাহিয়া চঞ্চলদৃষ্টিতে কি যেন দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আদেশে অমনি খোল করতাল কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঠাকুরের মুখমণ্ডল রক্তিমাভ ও স্ফীত হইয়া উঠিল। লম্বিত জটাভার ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময়ে আচম্বিতে শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি মুণ্ডিতমস্তক এক মহাপুরুষ বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া আসিয়া ‘আও মেরা প্রাণ’, ‘আও মেরা প্রাণ’ বলিতে বলিতে ঠাকুরকে বাহুদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক জড়াইয়া ধরিলেন। তখনই ঠাকুরকে ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদসঞ্চারে গুরুভ্রাতাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান গুরুভ্রাতারা অনেকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলেন। আমার এক হস্তে ঠাকুরের দণ্ড ও অপর হস্তে কমণ্ডলু, সুতরাং পাদস্পর্শে প্রবৃত্তি হইল না। মহাপুরুষ আমারও মস্তকে হাত বুলাইয়া ক্ষণকাল মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন। মহাপুরুষের করস্পর্শে গুরুভ্রাতারা মাতিয়া উঠিলেন; অমনি তাঁহারা গান ধরিলেন—

‘নামব্রহ্ম নামব্রহ্ম নামব্রহ্ম বল ভাই।
হরি নাম বিনা জীবের আর গতি নাই।

গানের সঙ্গে সঙ্গে গুরুভ্রাতারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুরও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে চড়ায় উপস্থিত হইলেন। শ্রবণ-মঙ্গল সংকীর্ত্তন রব বাদ্যধ্বনিতে মিলিত হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহাভাবের তুফানে পড়িয়া সকলে দিশাহারা হইলেন। বিধু ঘোষ মল্লবেশে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইলেন এবং এক একবার ফিরিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া স্পর্দ্ধার সহিত ঘন ঘন বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। শ্রীধর মধুর নৃত্য করিতে করিতে ‘জয় নিতাই’, ‘জয়

নিতাই' বলিয়া কম্বল বহির্ব্বাস উড়াইয়া চলিলেন। ভাবাবেশে বিভোর হইয়া গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের দক্ষিণে বামে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী বাবুভায়ারা ভাব-তুফানের ঝাপ্‌টায় পড়িয়া স্খলিতপদে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুর ভাবোন্মত্ত অবস্থায় দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। আসনধারী ধ্যাননিষ্ঠ ভজনানন্দী সাধুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে দৌড়িয়া সংকীর্ত্তন স্থলে আসিয়া পড়িলেন। ঠাকুরের মনোমোহন রূপ দর্শনে তাঁহারাও মুগ্ধ হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাপ্লাবনে তৃণগুচ্ছের ন্যায় প্রবল ভাবস্রোতে হাবুডুবু খাইয়া সকলে ভাসিয়া চলিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখি গৌরবর্ণ উজ্জ্বলমূর্ত্তি স্থূল কলেবর একটি মহাপুরুষ, ঠাকুরের দিকে সজলনয়নে তাকাইয়া আছেন। মহাপুরুষের পুণ্যদ্যুতিপুলকিত অঙ্গ থর থর কম্পিত হইতেছে। বাধাপ্রাপ্ত জলস্রোতের ন্যায় ঠাকুর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আনন্দ কোলাহলের হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র সাধুসন্ন্যাসীদের ভিড় ঠেলিয়া আমরা ছাউনী সমীপে উপস্থিত হইলাম। ছাউনীতে প্রবেশ করিয়াও কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তন হইল। তাঁবুর সম্মুখে ঠাকুর স্থির হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সাধুরা সকলে স্ব স্ব আসনে চলিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতারা যিনি যেখানে হয়, ভূমিতে পড়িয়া অভিভূত হইয়া রহিলেন। ছাউনীস্থল নীরব নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়া ভাণ্ডারঘর, রসুইঘর দেখিলেন। পরে কুয়া ও ছাউনীর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। তাঁবুটি খোলামেলা, দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া, খাটান হইয়াছে। তাঁবুর ভিতরে যাইয়া দেখি পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া তাহার উপরে চাটাই পাতিয়া রাখিয়াছে। ঠাকুর উত্তরদিকে ধার ঘেঁসিয়া তাঁহার আসন করিতে বলিলেন। আমাদের আসনবিছানার সহিত সংস্রব না থাকে এমনভাবে ঠাকুরের আসন পাতা হইল। সম্মুখে একটি ধুনীর কুণ্ড রহিল। ঠাকুর আসনে বসিলেন। গুরুভ্রাতারাও তাঁবুর ভিতরে যাহার যেখানে ইচ্ছা আসন কম্বল পাতিলেন। পাগলা সতীশ, কুঞ্জ, অশ্বিনী, ছোড়দাদা, অভয়বাবু ও আমি ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন করিয়া বসিলাম। ঠাকুরের সম্মুখে ধুনি প্রজ্বলিত হইল। ঠাকুর করতাল বাজাইয়া সন্ধ্যা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতারাও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে হরিরলুট হইল।

ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট, তিন দিকে গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। মহেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আসিবার সময় আপনি যে সাধুটির আশ্রমে গিয়াছিলেন, তিনি কে?'

ঠাকুর—'ইনি একজন মহাপুরুষ, নাম মাধোদাস—আমার গুরুভ্রাতা। ৩০ বৎসর ওই স্থানে থেকে নির্জ্জনে ভজন কর্‌ছেন। কোথাও যান না। সহরে কেহ উঁহাকে জানে না।

মহেন্দ্রবাবু—"চড়ায় উঠিবার সময় 'আও মেরা প্রাণ' বলিয়া কে আপনাকে আদর ক'রে জড়িয়ে ধরলেন ?"

ঠাকুর একটু ইতস্ততঃ করিয়া ছলছল চক্ষে বলিলেন—'তিনি আমার গুরুদেব—পরমহংসজী। তিনি ভিন্ন কে আর আমাকে আদর কর্‌বেন ? তাই তিনি এসেছিলেন।' এই বলিয়া চুপ করিলেন। ঠাকুরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। বহুচেষ্টায় বেগ সম্বরণ করিলেন। একটু পরে মহেন্দ্রবাবু আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পরমহংসজী তো গৌরবর্ণ, কিন্তু এঁকে শ্যামবর্ণ দেখ্‌লাম ? পরমহংসজী নিজ দেহে না অন্য দেহ পরিগ্রহ ক'রে এসেছিলেন ?'

ঠাকুর—"তিনি নূতন দেহ সৃষ্টি কর্‌তে পারেন, কিন্তু সেভাবে আসেন নাই। নিজের দেহেও আসেন নাই। একটি পরমহংসের দেহে প্রবেশ ক'রে এসেছিলেন।'

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঠাকুরের সহিত সৎপ্রসঙ্গে কাটাইয়া গুরুভ্রাতারা নিদ্রিত হইলেন। ঠাকুর সমস্ত রাত্রি একইভাবে আসনে বসিয়া রহিলেন।

কুম্ভমেলায় অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা।

শেষ রাত্রে ঠাকুর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলেই আসনে উঠিয়া বসিলেন। ভোর হওয়ামাত্র সকলে চড়ার পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম এবং শৌচান্তে স্নান করিয়া তাঁবুতে আসিলাম। বিধুবাবু প্রচুর পরিমাণে চা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁবুতে বসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সকলেই চা পান করিলাম। আজ ঠাকুর সাধুদের পরিক্রমায় বাহির হইবেন, সুতরাং নিত্যপাঠের গ্রন্থ কয়খানা প্রণাম করিয়া আসন হইতে উঠিলেন। গঙ্গার ধার ধরিয়া ঠাকুর উত্তর দিকে যাইতে লাগিলেন। আমরাও ৩০।৪০ জন ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। উভয়পার্শ্বে ও সম্মুখে পশ্চাতে স্থানের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম। সুরতরঙ্গিনী গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে মুনি ঋষি সেবিত পবিত্র প্রয়াগধাম অবস্থিত। পূর্ব্ব পাড়ে পরম রমণীয় সাধুসন্ন্যাসিগণের ভজনস্থান ঝুঁসি! এই দুইয়ের মধ্যস্থলে গঙ্গাগর্ভে প্রকাণ্ড একটি চড়া, দেখিতে ঠিক একটি দ্বীপের ন্যায়। এই দ্বীপসদৃশ চড়াই কুম্ভমেলার স্থান। চড়াবাসী সাধু-সন্ন্যাসী ও সহরবাসী সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য কেল্লার অনতিদূরে উত্তর দিকে সরকার বাহাদুর যেমন একটি নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়াছেন, মাইলাধিক ব্যবধানে দ্বারাগঞ্জ হইতে ঝুঁসিতে পঁহুছিবার জন্যও আর একটি সুদৃঢ় পোল প্রস্তুত হইয়াছে। চড়াবাসীরা এই পোল দিয়া অনায়াসে সহরে বা ঝুঁসিতে যাতায়াত করিতে পারেন। প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্গার পাড়ে জলের উপরে যে সকল স্থানে

প্রতিবৎসর কল্পবাসীরা এই সময় আসিয়া বাস করেন, এবার সে সকল স্থানে বিবিধ ধর্ম্মার্থীদের থাকিবার জন্য সহস্র সহস্র তৃণকুটীর প্রস্তুত হইয়াছে। চড়া হইতে এই স্থান হাট বাজারের মত বহু জনাকীর্ণ দেখিতে লাগিলাম, চড়ার পূর্ব্ব দিক দিয়া তাঁবুতে ফিরিবার সময়ে দেখিলাম অনতিবিস্তৃত গঙ্গার অপর পারে ঝুঁসিতে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ও তাঁবু শ্রেণীবদ্ধভাবে রহিয়াছে—ঠিক যেন একটি লোক পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ বন্দর। এই দুইটি স্থানে কত লোক রহিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সাধারণের অনুমান অন্যূন ৮৷৯ লক্ষ লোক হইবে। আর বিস্তৃত চড়াতে সাধু সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী ধর্ম্মার্থীদের বাস এ পর্য্যন্ত বার লক্ষেরও অধিক শুনিতেছি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়, এত লক্ষ লোকের নিয়ত বাসস্থলে কাহারও যত্র তত্র যাতায়াতের কোনপ্রকার অসুবিধা নাই। এত লক্ষ লোকের মধ্যে যে কোন দর্শকের যে কোন সাধু মহাত্মাকে খুঁজিয়া নিতে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না। ইহা সরকার বাহাদুরের অসাধারণ কৌশল ও শৃঙ্খলার ফল।

জমাট বালি মাটির সমতল চড়াটি দীর্ঘে অন্যূন ৫৷৬ মাইল হইবে, প্রস্থেও অর্দ্ধ মাইল অনুমান হয়। মেলা বসিবার ২৷৩ মাস পূর্ব্বেই সরকার বাহাদুর এই চড়ার উত্তর প্রান্তর হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ৪৷৫টি বড় রাস্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই রাস্তা কয়টি প্রায় ২০ ফুট চওড়া, সমব্যবধান ও সোজা। আবার পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ১৫৷২০টি পথও ঐ প্রকার প্রশস্ত ও সোজা করিয়াছেন। এই প্রকার শৃঙ্খলামত রাস্তা করায় অনেক গুলি সমচতুষ্কোণ চত্তর হইয়াছে। প্রত্যেকটি চত্তরের চতুর্দ্দিকেই ২০ ফুট রাস্তা থাকায় চত্তরগুলি বেশ খোলা মেলা। এই প্রকার চত্তর প্রায় ৪০৷৫০টিরও অধিক রহিয়াছে। সাধু সন্ন্যাসিগণ এই সকল চত্তরে শৃঙ্খলামত তাঁবু খাটাইয়া, ছাতা পুতিয়া, অথবা অনাবৃত স্থলে আকাশের নীচে ধূনি জ্বালিয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেকটি চত্তরেই দুই তিনটি কুয়া আছে। চত্তরের চতুর্দ্দিকে রাস্তার উপরে ২৷৩ মিনিট অন্তর পুলিস প্রহরী রহিয়াছে। এই মেলাতে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর নিরুদ্বেগ ভজন সাধন ও নিরুপদ্রবে বসবাসের জন্য সরকার বাহাদুর কত কি করিতেছেন কিছুই জানি না। তবে সম্প্রতি একটি বিষয়ে রাজপুরুষদের অসাধারণ কর্ম্মকৌশল ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইতেছি। লক্ষ লক্ষ সাধু এই মেলাতে অহর্নিশি অবস্থান করিতেছেন। ইহাদের পায়খানা ময়লা ও আবর্জ্জনা প্রতিদিন দুবেলা কিভাবে পরিষ্কার হইতেছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই ব্যাপারে সরকার বাহাদুরের কার্য্যতৎপরতা বড় সাধারণ নয়। দেখিলাম চড়ার পূর্ব্বাংশে দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে অসংখ্য কুঁড়েঘর রহিয়াছে। তাহাতে মেথর ধাঙ্গড়েরা বাস করে। প্রতিদিন দুবেলা তাহারা ২৷৩ মাইল বা ততোধিক স্থানে সরু লম্বা নালা কাটিয়া রাখে। পায়খানার পরই ময়লার উপরে ধারের বালি মাটি ফেলিয়া চাপা দেয় এবং তাহার ধারেই আবার নূতন নালা কাটিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখে। স্থান সর্ব্বদা এতই পরিষ্কার থাকে যে উহার খুব নিকট দিয়া চলিয়া গেলেও কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। তারপরে সাধুদের প্রত্যেকটি চত্তরে

সহস্র সহস্র সাধু রহিয়াছেন। উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাহাদের দারুণ সংস্কার। স্পর্শ হইলেই তাঁহারা স্নান করেন। অন্যূন ৪০।৫০টি চত্তরে ১০।১২ লক্ষ সাধুর এঁটো পাতা আবর্জ্জনা ও ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য উদায়স্ত বহুসংখ্যক ধাঙ্গড়, মেথর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন চত্তরে একখানা এঁটো পাতা বা কোন রাস্তায় একটি দাঁতনকাঠি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কত রাবিশের গাড়ি নিযুক্ত থাকিলে, এক একটি চত্তরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার হয়, কিন্তু চড়াতে গাড়ি নাই, টুক্‌রিতে ভরিয়া ধাঙ্গড়েরা উহা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যায়। এ পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর এই কার্য্যের জন্য ১৪ হাজার ধাঙ্গড় ও মেথর নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিয়াছি প্রয়োজন হইলে আরও আনিবেন। ময়লা পরিষ্কারের এই প্রকার সুব্যবস্থা যদি সরকার বাহাদুর না করিতেন, তাহা হইলে দুদিনও সাধু সন্ন্যাসীরা এই মেলায় থাকিতে পারিতেন না, ইহা একেবারে নিশ্চয়। তারপর আরো শুনিলাম—'পোলের অপর পারে সমীপবর্ত্তী রাজপথের দুধারে অসংখ্য দোকানঘর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। চড়াবাসীদের প্রয়োজনীয় যে কোন সামগ্রী অনায়াসে তথা হইতে লইয়া আসিতে পারেন। ইহা ছাড়া ডাকঘর, ঔষধালয়ও করিয়া রাখিয়াছেন। আরও কতদিকে সরকার বাহাদুর কত কি করিয়াছেন জানি না। ঠাকুর বলিলেন—'চড়বাসী সাধুমহাত্মা মহাপুরুষগণ সরকার বাহাদুরের এই সকল কার্য্য দেখে পরম সন্তোষলাভ করেছেন, এবং আরও কিছুকাল এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ দেশে রাজত্ব করেন—আশীর্ব্বাদ করেছেন।' বেলা প্রায় ১২টার সময়ে আমরা ছাউনীতে প্রবেশ করিলাম। ভোগ রান্না হইতে বেলা প্রায় ৩টা হইল। আহারান্তে ঠাকুর আর কোথাও গেলেন না। তাঁবু ও ভাণ্ডারঘরের মাঝামাঝি উত্তরধারে, ঠাকুর ৪।৫ ফুট একটি বেদী অবিলম্বে প্রস্তুত করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয়ই এ কার্য্যে প্রধান উদ্‌যোগকারী। মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কল্যই বোধ হয় এখানে আনা হইবে।

ব্রজবিদেহী কাঠিয়া বাবার দর্শন ঃ

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

অদ্য চা সেবার পরে ঠাকুর বৈষ্ণবমণ্ডলী পরিক্রমায় বাহির হইলেন। আমার নিত্যকর্ম্ম শেষ না হইলেও ঠাকুরের কমণ্ডলু নেওয়ার ভার আমার উপরে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। গুরুভ্রাতারাও অনেকে ঠাকুরের পশ্চাৎগামী হইলেন। ৫।৬টি চত্তরে প্রায় মাইলাধিক স্থান বৈষ্ণবগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র এবং সনক এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি চত্তর অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা ছাড়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধুনিক বৈষ্ণব পন্থী, গৌড়িয়া, বাউল, বৈরাগী প্রভৃতি আছেন তাঁহারাও একটি চত্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আড্ডা

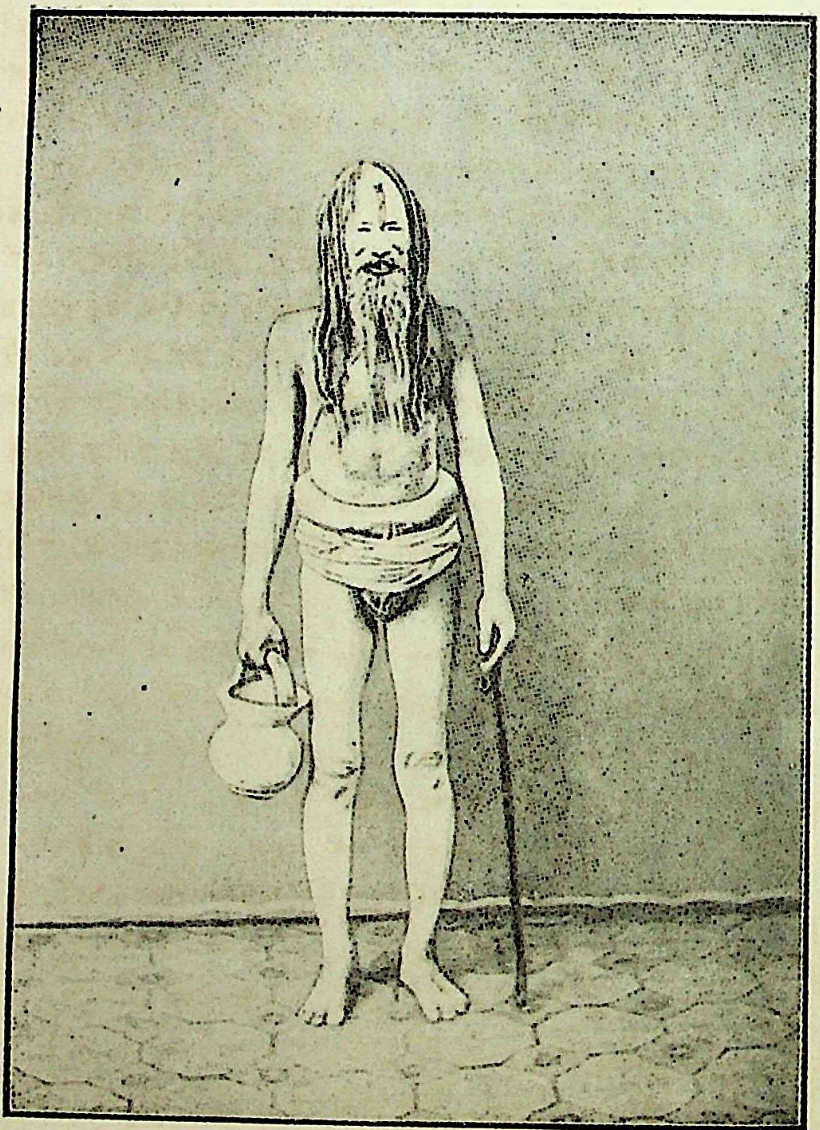

শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ পৃষ্ঠা ২৫৯

করিয়া রহিয়াছেন। বেশ ভূষা আসন বাসস্থানের আড়ম্বর বৈষ্ণবদের নাই বলিলেই হয়। মান অভিমান শূন্য দীনহীন কাঙ্গাল ভাব এই সম্প্রদায়ে যেমন এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

ঠাকুর ঘুরিতে ঘুরিতে বৈষ্ণব শিরোমণি মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাবাজী শ্রীবৃন্দাবনবাসী, ঠাকুরের পূর্ব্ব পরিচিত। ঠাকুর বাবাজীকে প্রণাম করিতেই বাবাজী শশব্যস্তে ঠাকুরকে প্রতিনমস্কার প্রদান পূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। বাবাজী একটী বৃহৎ ছত্রের নীচে আসন করিয়াছেন; সম্মুখে প্রজ্জলিত ধূনি। সামান্য একখানা কম্বলাসনে উপবিষ্ট। তীব্রতপপ্রভা প্রদীপ্ত উজ্জ্বল দেহটি ভস্মাবরণে আবৃত। মস্তকের পিঙ্গলবর্ণ সরু সরু জটারাশী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। মহাত্মার পরিধানে একটি মাত্র কাঠের কৌপীন। এ জন্য লোকে ইঁহাকে 'কাঠিয়া বাবা' বলে। বৃদ্ধ হইলেও বাবাজীর তেজঃপুঞ্জ দেহের মাধুর্য্য বড়ই মনোরম। বাবাজীর মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ সুশীতল দৃষ্টিতে আমাদের শরীর প্রাণ শীতল হইয়া গেল। অবিচ্ছেদ ধ্যাননিষ্ঠ বাবাজীর দর্শনমাত্রে মনে হইল যেন আমাদের কত আপনার। শুনিলাম এবার মহাপুরুষেরা ইঁহাকে 'ব্রজবিদেহী' উপাধি দিয়া সমস্ত ব্রজমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের ভার ইঁহারই উপর ন্যস্ত করিলেন। যতক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে ইঁহার নিকটে বসিয়া রহিলাম, আপনা আপনি 'নারদ' 'নারদ' শব্দ আমার ভিতর হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ রামদাস কাঠিয়া বাবাকে দর্শন করিয়া ঠাকুর অন্যান্য চত্তরে প্রবেশ করিলেন। ১১টার সময়ে তাঁবুতে পঁহুছিলাম।

শ্রীনবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ডাক্তার রামযাদব বাগচি মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বেই মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর পরিক্রমায় বাহির হইলেন, পরে তিনি ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আনিয়া বেদীতে স্থাপন করিলেন। পরিক্রমার পর তাঁবুতে আসিয়া ঠাকুর উহা দেখিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রাণাম করিলেন এবং খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমাকে একটি উপবীত গ্রন্থি দিয়া মহাপ্রভুর গলে পরাইয়া দিতে বলিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পৈতা গ্রন্থি দিব, মহাপ্রভুর গোত্র জানি না। ঠাকুর বলিলেন,—'শাণ্ডিল্য গোত্র'। আমি গোত্র প্রবর স্মরণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গায়ত্রী জপ করিতে করিতে উপবীতে গ্রন্থি দিলাম। তৎপরে উহা লইয়া গিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর উহা স্পর্শ করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—'মহাপ্রভুকে পরাইয়া দেও'। আমি উহা লইয়া গায়ত্রী জপ করিয়া মহাপ্রভুর গলে পরাইয়া দিলাম। চিত্তটি বড়ই প্রফুল্ল হইল। ফুল তুলসী ও সুন্দর সুন্দর মালা দ্বারা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে সাজাইয়া দেওয়ায় বড়ই চমৎকার শোভা পাইল। আমাদের ৬ ফুট প্রশস্ত দরজার উপরে সুন্দর বড় বড় অক্ষরে—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥'

লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। বেলা প্রায় ৩টার সময়ে রান্না প্রস্তুত হইল। মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া আনন্দের সহিত সকলে প্রসাদ পাইলেন। বড়ই আনন্দে দিনটি কাটিয়া গেল।

ত্রিবেণী সঙ্গমে মকর স্নান ঃ সাধুদের মিছিল —অপূর্ব্ব দৃশ্য।

আজ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। ত্রিবেণী সঙ্গমে মকরের স্নান। আজ চড়াবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহারা শেষ রাত্রিতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচান্তে আসনে আসিলেন। পরে সম্প্রদায় অনুযায়ী বেশ-ভুষা ও মালা তিলক ধারণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা আপন আপন ইষ্ট স্মরণে নিবিষ্ট থাকিয়া স্নানকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ পূর্ণ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বড়ই আনন্দ হইল। লক্ষ লক্ষ লোকের স্নানকার্য্য আজ একদিনে একই ঘাটে কি ভাবে সম্পন্ন হইবে, ভাবিতে লাগিলাম। ঠাকুর চা সেবার পর আসন হইতে উঠিলেন এবং স্নানার্থীদের দর্শনমানসে পোলের কিঞ্চিৎ দুরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব এবং বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সামরিক বেশে অশ্বারোহণে পোলের উপরে ও প্রশস্ত পথে ছুটাছুটি করিতেছেন। বড় রাস্তার দুপাশে ও পোলের উপরে তাঁহারা ঘন ঘন পুলিশ সন্নিবেশ করিয়া লোকের চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে স্থানে স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুদের স্নানযাত্রার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে সন্ন্যাসী পরমহংস মহলে ভোঁ-ভোঁ শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। বিবিধপ্রকার বাদ্যধ্বনির সহিত ঢপাং ঢপাং ঢাকের রবে নীরস হৃদয়কেও নাচাইয়া তুলিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সজ্জনগণ ভাবোদ্দীপক কণ্ঠে আপন আপন ইষ্টদেবের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। আনন্দ কোলাহলে প্রহৃষ্ট হইয়া চড়াবাসিগণ মাতিয়া উঠিল। সন্ন্যাসিগণের জনতা দেখিয়া রাজপুরুষগণ সন্ত্রস্তভাবে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা শশব্যস্তে বিশালবক্ষা খরস্রোতা গঙ্গার উপরে সংকীর্ণ নৌসেতু দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিগণ বহুমূল্য রেশম নির্ম্মিত ৮।১০টি উচ্চ উচ্চ নিশান তুলিয়া পুলের ধারে আসিয়া পড়িলেন। সমস্ত সন্ন্যাসী মণ্ডলী আজ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি মহাশয়কে সুসজ্জিত অশ্বারোহণে অগ্রণী করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উজ্জ্বল গৈরিক বসন পরিহিত উষ্ণীষধারী শান্ত সন্ন্যাসিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্মশ্রু গোঁপ বর্জ্জিত মুণ্ডিত মস্তক ত্রিপুণ্ড্রধারী দণ্ডিগণ দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে পশ্চাৎগামী হইলেন। তদনন্তর শুভ্র বস্ত্র পরিহিত উপবীতধারী জটিল ব্রহ্মচারিগণ ধ্যাননিষ্ঠভাবে নতশিরে চলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ও দণ্ডিগণ ক্রমানুসারে স্নানক্রিয়া সমাপন করিলেন। তৎপরে কেল্লার অপর পার্শ্বস্থ রাজপথ দিয়া দারাগঞ্জের পুল অতিক্রম পূর্ব্বক আপন আপন আসনে উপস্থিত হইলেন। এদিকে ব্রহ্মচারিগণও নৌসেতু পার হইয়া স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন। সন্ন্যাসিগণের যাত্রা অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নাগা উদাসীদের ভিতরে সাড়া পড়িয়া গেল। তাহাদের অসংখ্য ভেরীর ভৈরবনাদ চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া

চড়াবাসীদের চমক উৎপাদন করিল। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সুদীর্ঘ ঝাণ্ডা উড্ডীন করিয়া সদ্‌গুরুর বাণী 'গ্রন্থ সাহেবকে' লইয়া চলিলেন। সুন্দর তালবৃন্ত ও সুচারু চামর দ্বারা উদাসিগণ চলিতে চলিতে 'গ্রন্থ সাহেবকে' ব্যজন করিতে লাগিলেন। সুনীল রেশমের সুন্দর পতাকা সকল পত্ পত্ শব্দে উড়িতে লাগিল। বিভূতি ভূষিত লম্বিত জটা দিগম্বর নাগাগণ যখন সদর্পে বীরপদবিক্ষেপে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে চলিলেন, এক একবার মনে হইতে লাগিল, যেন রুদ্রানুচরগণ যোগীশ্বর মহাদেবের অনুগমন করিতেছেন। নাগা উদাসিগণের পশ্চাতে পশ্চাতে নির্ম্মলা, শিখ, আকালী প্রভৃতি নানকপন্থিগণ কাল ও নীল রঙ্গের বিবিধ প্রকার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া চলিতে লাগিলেন। অসি, খড়্গ, কৃপাণাদি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক হরি, বাসুদেব, গোবিন্দ ও রাম,—এই চারি নাম সূচক স্বগর (ওয়াগর) বলিতে বলিতে যখন তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হইল। শুধু আনন্দ কোলাহলই শ্রুত হইতে লাগিল। এই প্রকার নাগাসন্ন্যাসিগণ নিজেদের প্রভাবে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া, সেতু অতিক্রম পূর্ব্বক ঘাটে পঁহুছিলেন।

এইবার বৈষ্ণবগণের সহস্র সহস্র দুন্দুভি একেবারে বাজিয়া উঠিল। অসংখ্য কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খের মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। দিকদিগন্তব্যাপী তুমুল বাদ্যধ্বনিতে সাধুরা সকলেই মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ঋষিপ্রতিম শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়া বাবাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রা করিলেন। বিবিধ শ্রেণীর কৌপীনধারী জটিল সাধুগণ পৃথক পৃথক দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সম্প্রদায় অনুরূপ মালা তিলক ও ভস্মে বিভূষিত হইয়া পোলের দিকে অগ্রসর হইলেন; মুক্ত কণ্ঠে গদগদ ভাবে ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ভক্তের আর্ত্তনাদে ভগবানের আসন বুঝি আজ টলিল। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সহস্র সহস্র ভক্তহৃদয়ে আজ আবির্ভূত হইলেন। সকল শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই আজ ভাবাবেশে মাতিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল প্রাণে তাঁহারা গাহিতে লাগিলেন—

—"সীয়ারাম সীতারাম সী—য়া বররাম।
সীয়ারাম বল ভাইয়া জয় জয় রাম॥"

আবার কেহ কেহ 'জয় রাম' 'জয় রাম,' কেহ কেহ বা 'রাধেশ্যাম' 'রাধেশ্যাম' বলিতে বলিতে নৃত্য করিয়া চলিলেন।

ভক্তহৃদয়ে সর্ব্বত্র আজ ভাবের বন্যা বহিয়া চলিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্ভেদ্য বন্ধন, ভাব বন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল। অপূর্ব্ব ব্যাপার—সব একাকার। ভক্তপ্রাণ ভগবান আজ ভাবনদীতে তুফান তুলিলেন। পাষণ্ড দুর্জ্জন, সাধু, সজ্জন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ভাসিয়া চলিলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! ঠাকুর অবসর মত একটি দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কেল্লার কিঞ্চিৎ উত্তরে ফাঁক পাইয়া গঙ্গারধারে নামিয়া পড়িলেন। আমরা সকলে গুরুভ্রাতাভগ্নীগণ ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিলাম। পাণ্ডা সংকল্প মন্ত্র পড়াইতে জেদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কহিলেন,—

“আমাদের সংকল্প বিকল্প নাই। ভগবৎ প্রীতিই আমাদের স্নানের উদ্দেশ্য।” সন্ধ্যার পর আমরা সকলে তাঁবুতে আসিলাম। রাত্রিতে মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ প্রভুর আরতি কীর্ত্তনান্তে ভোগ দিয়া সকলে পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ পাইলেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর সকলেই আরামের সহিত বিশ্রাম করিলেন।

প্রয়াগে কুম্ভমেলার উৎপত্তি।

সকালে চা সেবার পর নিয়মিত পাঠ হইল। গুরুভ্রাতারাও সকলে ঠাকুরকে মকর স্নান ও কুম্ভমেলা সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বহুক্ষণ ওসব বিষয়ে বলিলেন। শুনিলাম—পুরাকালে এই ত্রিবেণী সঙ্গমে—প্রয়াগধামে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে ভারতবর্ষের ঋষি মুনিগণ এই আশ্রমে সমবেত হইতেন এবং ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া সমস্ত মাঘ মাস নিয়ম নিষ্ঠার সহিত কল্পবাস করিতেন। তাঁহারা প্রত্যহ অনুদয়ে গঙ্গাস্নান, অক্ষয় বট দর্শন ও ভগবানের পূজা অর্চ্চনা, ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন। সময় সময় তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তন ও ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দে কাটাইতেন। হিন্দু শাস্ত্রমতে মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস বিশেষ পুণ্যজনক। এই কল্পবাস হইতেই সাধু সজ্জন সন্ন্যাসিগণের মহাসম্মিলন। এই মহাসম্মিলনই কুম্ভমেলা। কুম্ভমেলা ৩ বৎসর অন্তর অন্তর হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থিগণই এই মেলায় কুম্ভযোগে উপস্থিত হন। প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে ক্রমানুসারে এই চারিটি স্থানে মেলার অধিবেশন হয়। সুতরাং ১২ বৎসর অন্তর অন্তর প্রত্যেকটি স্থানে পূর্ণকুম্ভ হইয়া থাকে। এই মেলায় সাধু সন্ন্যাসিগণের এমনই অদ্ভুত ও বিরাট সমাবেশ হয় যে, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে কল্পনা করা যায় না। এবার ৩।৪টি ঋষি-প্রতিম বহু প্রাচীন মহাপুরুষ মেলায় থাকিবেন—পূর্ব্বেই প্রচার হইয়াছিল। তাই তাঁদেরই কৃপায় মেলা এত বৃহৎ হইয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহের কথা ছাড়িয়া দিলে এরূপ জনসমাগম পৃথিবীতে অন্য কোন মেলায় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। সাধু দর্শন, ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ, সাধনভজন ও স্নান তপর্ণাদিতে পুণ্য অর্জ্জনই এই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। কত ধ্যানী, কত জ্ঞানী, কত কর্ম্মী এবং কত সিদ্ধ-মহাসিদ্ধ মহাত্মা-মহাপুরুষ যে এ মেলায় এবার আসিয়াছেন, বলা যায় না। তাহা ছাড়া যতপ্রকার আধুনিক ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে রহিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে সে সকল সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষগণের সাক্ষাৎকারও এই কুম্ভমেলায় লাভ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ৫।৭ হাজার লোক একটি স্থানে মিলিত হইলে তাহাদের ভিতরে কত প্রকার বাদবিসম্বাদ, অশান্তি উদ্বেগ উপস্থিত হয়। আর এই মহামেলায় বহু লক্ষ লোকের নিয়ত দীর্ঘকাল একই স্থানে থাকায়ও কোন প্রকার অভাব, অসুবিধা নাই, বাক্‌বিতণ্ডা নাই, গোলমাল কোলাহল নাই। ভগবৎ প্রসঙ্গে ও সাধন ভজনে নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহারা পরমানন্দে

দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বৃন্দাবন কি জানি না! তবে পৃথিবীতে এমন আনন্দের স্থান কল্পনা করা মনুষ্যজীবনে অসাধ্য। জয় গুরুদেব! তোমার ভক্তগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াই যেন এই জীবন শেষ হয়।

ছোট কাঠিয়াবাবা দর্শন।

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায় ঠাকুর মাসাধিককাল চড়াতে বাস করিলেন। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া সাধুদের কত অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিলাম—শুনিলাম, তাহা বিস্তৃতরূপে লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে যে সকল অসাধারণ ঘটনা আমার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহারই স্মৃতি রাখিবার জন্য দৈনিক ডায়েরী হইতে অতি সংক্ষেপে এই পুস্তকে উল্লেখ করিয়া যাইতেছি :—

চড়াবাসিগণের মধ্যে সন্ন্যাসী, উদাসী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সংখ্যাও ইহাদেরই খুব বেশী। এক একটি সম্প্রদায়ের ৫।৭টি বা ততোধিক চত্বর আছে। এই সকল চত্বরে এসকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ২০।২৫।৩০ হাজার করিয়া সাধুরা রহিয়াছেন। প্রত্যেক চত্বরবাসী সাধুদের বেশভূষা, আচার ব্যবহার, সাধন ভজন, নিয়ম নিষ্ঠা একই প্রকার দেখা যায়। সুতরাং বাহিরের অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কে সাধু কে অসাধু, কে সজ্জন কে দুর্জ্জন, কে আসল কে নকল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অন্যূন ৯।১০ লক্ষ সাধুর মধ্যে কয়টি সাধুর সঙ্গ আমরা করিতে পারি? আর সঙ্গ করিয়াও তাহাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা বুঝিবার অধিকার আমাদের কোথায়? কাজেই সাধুদের চত্বরে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর যাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়ান, যাঁহার নিকটে গিয়া বসেন, অথবা যাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করেন, তাঁহাকেই আমরা সিদ্ধ মহাত্মা বা মহাপুরুষ বলিয়া মনে করি। তাঁহারই সম্বন্ধে জানিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি এবং প্রশ্নের উপরে প্রশ্ন করিয়া ঠাকুরকে অস্থির করিয়া তুলি। মাঘের প্রথম হইতে মেলার শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুর প্রায় প্রতিদিনই দু'বেলা কখন বা এক বেলা সাধুদের মণ্ডলী পরিক্রমা করিতেন। একদিন ঠাকুরের সঙ্গে বৈষ্ণব ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া আমরা সহস্র সহস্র সাধু দর্শন করিতে লাগিলাম। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট সাধুদের মস্তকোপরি শত শত ছত্রাবরণ ও বস্ত্রাচ্ছাদন রহিয়াছে দেখিলাম। উন্মুক্ত আকাশের নীচেও সহস্র সহস্র সাধু অবস্থান করিতেছেন। সকলেই ভস্মাবৃত অঙ্গ, জটীল ও মালাতিলকধারী। পরিধানে কৌপীন বহির্ব্বাস। শীত নিবারণের জন্য কাহারও একখানা কম্বল রহিয়াছে মাত্র। কাহারও তাহাও দেখিলাম না। চড়াতে কেহই বাজে কাজে, হাসিগল্পে বৃথা কালক্ষেপ করেন না; সকলেই ভগবৎ উপাসনায় নিরত। কোথাও তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ হইতেছে,—সাধুরা নিবিষ্ট হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন; কোথাও সাধুরা আপন আপন ঠাকুরের পূজায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন; আবার কোন স্থানে সাধুরা মালাজপে—ইষ্টধ্যানে মগ্ন। এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে

পরমানন্দে গঙ্গার অনতিদূরে বালির উপরে একটি সাধুর নিকটে পঁহুছিলাম। দেখিলাম সাধুর শরীরে জটা তিলক মালা প্রভৃতি ধর্ম্মের কোন প্রকার চিহ্ন নাই। গাত্রে কম্বল বা বস্ত্র নাই, পরিধানে মাত্র একটি কাঠের কৌপীন ; অনাবৃত আকাশের নীচে একখানা ছেঁড়া চাটাইয়ের উপরে বসিয়া রহিয়াছেন। শরীর অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, গায়ের চর্ম্ম হস্তি চর্ম্মের মত খস্‌খসে, তাহাতে অসংখ্য চক্র। সাধু অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন। দরদর ধারে তাঁহার অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। সাধুর মুখশ্রী কচি ছেলের মত, দৃষ্টি এতই সরল ও স্নিগ্ধ যে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না। এমন চাহনি জীবনে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সাধু অত্যন্ত অল্পভাষী। শিশুর মত আধ আধ কথা বলিতে বলিতে মুখ দিয়া লাল পড়ে। বর্ণ শ্যাম, দেখিলে বয়স মাত্র ৩০ বৎসর বলিয়া অনুমান হয়। ঠাকুরের সঙ্গে কি কি কথা বলিলেন কিছুই বুঝিলাম না।

তাঁবুতে আসিবার সময়ে সাধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন,—'ইনি একজন সিদ্ধ মহাত্মা—রাম উপাসক। ভরতের ভাব নিয়েই আছেন। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি দেহ-কল্প ক'রেছিলেন—সেই দেহই রয়েছে,—এর ক্ষয়ও হয় নাই, বৃদ্ধিও হয় নাই, একটি চুল পাকে নাই, একটা দাঁতও পড়ে নাই। কোন আশ্রয় নাই—অবলম্বন নাই। পাহাড়েও এই অবস্থায়ই থাকেন।

এই সাধু প্রতিদিন আমাদের আড্ডায় ২।৩ বার করিয়া আসিতেন। ঠাকুরের সম্মুখে ধুনির অপরদিকে হাঁটু গাড়িয়া বসিতেন এবং ৫।৭ মিনিট করযোড়ে ঠাকুরের পানে তাকাইয়া থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। এই সাধুর একটি বিশেষত্ব এই যে ইনি গাঁজা, চরস, স্থল্‌তা, তামাকু কিছুই পান করিতেন না। প্রথম প্রথম গাঁজা খাইতেন, কিন্তু গাঁজা সংগ্রহ করিতে লোকালয়ে আসিতে হয় ও তজ্জন্য অনেক সময় নষ্ট হয় বলিয়া গাঁজা ত্যাগ করেন। প্রত্যহ আমাদের ছাউনীতে ২।৩ বার করিয়া আসেন কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—'হামারা রামজী তাঁবুতে রয়তে হ্যাঁয়। যব্‌হি হাম যাতে, রামজীকা সাক্ষাৎ দর্শন মিল্‌তে।' সাধুর নাম পরিচয় কিছুই জানা না থাকায় আমরা তাঁহাকে 'ছোট কাঠিয়াবাবা' বলিতাম।

কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী ঃ বিদ্যাভিমানী সন্ন্যাসীকে শাসন।

একদিন চা সেবার পর ঠাকুর কোথাও বাহির হইলেন না, আসনে বসিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় নয়টার সময়ে একটি তেজস্বী সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুরকে উপদেশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী মহাপণ্ডিত, সমস্ত দর্শন ও বেদ উপনিষদাদি তাঁর কণ্ঠস্থ। ঠাকুর নিয়ত সমাধিতে থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই বোধ হয় তিনি শুনিয়াছেন। ঠাকুরের সমাধি যে শ্রেষ্ঠ সমাধি নয় তাহা তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে

লাগিলেন এবং কতপ্রকার জ্ঞানের উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ১৫।১৬ বৎসরের একটি হিন্দুস্থানী গৈরিক কৌপীন বহির্ব্বাসধারী বালক ঠাকুরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া শুনিয়া সন্ন্যাসীকে ধমক দিয়া বলিলেন—'য়্যাজী! কিস্কো শাস্ত্র বাতলাতে হো? আব চুপ রহে। শাস্ত্র আপ কুছ্ নেহি জান্তো হ্যাঁয়।' সন্ন্যাসী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—'ক্যা কহ তে? হাম শাস্ত্র নেহি জান্তা হ্যায় নাই? তুম্নে শাস্ত্র কুছ্ পড়া হ্যায়? বালক—'ও বাত কাহে পুছ্তে? ক্যা, আপ দেখ তা হ্যায় নাই হাম ব্রাহ্মণ হ্যায়? সর্ব্ব শাস্ত্র তো হামারা কণ্ঠস্থ্ হ্যায়।' সন্ন্যাসী তখন নিজের কথা প্রমাণের জন্য শাস্ত্রবচন আওড়াইতে লাগিলেন। বালক, সন্ন্যাসীর মুখে প্রথম চরণ উচ্চারণ শেষ হইতে না হইতেই অবজ্ঞাভরে বলিতে লাগিলেন—'বাস্ হো গিয়া,—আব্ য্যায়সা বাত চিৎ করিয়ে, শাস্ত্র মাৎ কহিয়ে—উচ্চারণ নেহি হোতা হ্যায়—ছন্দ নেহি জান্তা হ্যায়, শাস্ত্র বাত্লাতে!' বালকের কথায় সন্ন্যাসী খুব অভিমানের সহিত বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'তোম ক্যায়া জান্তা হ্যায়? বালক তখন, 'আচ্ছা শুন্লেও' বলিয়া সন্ন্যাসী যে পদ বলিতেছিলেন তাহার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরেও ৪।৫টি পদ ছন্দেবন্দে বলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ৩।৪টি পদ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে তুলিয়া তার কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বালক প্রত্যেকটি শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ধমক দিয়া 'ঠিক নেহি হোতা হ্যায়—ভুল হোতা হ্যায়' বলিয়া সে সকল বচনের আদ্যন্ত বলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী শুনিয়া নিষ্প্রভ হইলেন। তখন বালক সমাধির যতপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে শাস্ত্রাদি হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে বলিলেন,—'ইনি যে অবস্থায় রহিয়াছেন, মনুষ্যদেহে ইহার উপরের অবস্থা লাভ হয় না। গোশৃঙ্গে সর্ষপ যতটুকু সময় থাকিতে পারে সেই সময়ের জন্যও ঐ সমাধিলাভ হ'লে দেহ ছুটিয়া যায়। সেই সমাধিও ইহার আয়ত্ত; কিন্তু দেহ থাকিবে না বলিয়া তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন না। বালকের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী অবাক্! তাঁবুস্থ সকলেই স্তম্ভিত! সন্ন্যাসী বিস্ময়ের সহিত বালকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বালকটিকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে বসিতে অনুরোধ করিলেন। বালকটি ধুনির সম্মুখে বসিলেন। ঠাকুর তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, বুঝিলাম না। বালক বলিল—'আউর দুদফে হোনেসে এহি দেহ ছুট্ যায়গা। তব্ তো আনন্দ্।' বালকের হাত পায়ের গড়ন একটু লম্বা, তেজঃপূর্ণ কলেবর, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী প্রফুল্ল ও তেজঃপূর্ণ, চক্ষু অসাধারণ উজ্জ্বল, পরিধানে গৈরিক কৌপীন বহির্ব্বাস, ললাটে ত্রিপুণ্ড, শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ, দর্শন বড়ই মধুর। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ঠাকুরের নিকটে বসিয়া কত কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। আর তাহাকে চড়ায় দেখিতে পাই নাই। বালক চলিয়া গেলে পরে ঠাকুরকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন,—'ইনি কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী। মৃত একটি ব্রাহ্মণ বালকের দেহে প্রবেশ ক'রে সামান্য একটু কর্ম্ম বাকী ছিল, তা শেষ ক'রে নিচ্ছেন। এই কর্ম্মটুকু হয়ে গেলে আর থাক্বেন না।'

জিজ্ঞাসা করা গেল—'কি কর্ম্ম বাকী ছিল', শেষ করিতেছেন ?'

ঠাকুর—'গঙ্গার উৎপত্তি হ'তে শেষ পর্য্যন্ত তিনবার গঙ্গা পরিক্রমা। একবার হয়েছে, আর দুবার হ'লেই হ'লো। তা'হলেই এই দেহ ধারণের প্রয়োজন শেষ।'

আমার কি দুর্ভাগ্য বালকটির অসাধারণত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াও, তাহার চরণে একবার মাথা নোয়াইবার আগ্রহ জন্মিল না।

নানকসাহীদের চত্বরে সাধু দর্শন।

কয়েকদিন ঠাকুর বৈষ্ণব সাধুদের বিস্তৃত চত্তরসকল পরিক্রমা করিলেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রামানুজ, মাধবাচার্য্য, শ্রী ও নিম্বাদিত্ত এই চারিটি মূল সম্প্রদায়। ইহা ছাড়া গোরখপন্থী, কবীরপন্থী, ব্রহ্মচারী, তপস্বী প্রভৃতি শাখা সম্প্রদায়গুলি ও ঐ চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ঠাকুর এই সকল সম্প্রদায়ের ভিতরে কত সাধু মহাত্মাদের দর্শন করিলেন, বলিতে পারি না। তৎপরে ঠাকুর নানকসাহীদের পরিবেষ্টনীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধু সন্ন্যাসীদের দর্শন করিতে লাগিলেন। চড়াবাসী সমস্ত সাধুদের মধ্যে নানকসাহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে হয়। নানকসাহীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উদাসী ও নির্ম্মলা। নানক সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদের প্রবর্ত্তিত পন্থাকে উদাসী বলে এবং দশমগুরু গোবিন্দসিংহের অনুসরণকারীদের নাম নির্ম্মলা। এতদ্ভিন্ন নানকসাহী মহাত্মাদের প্রবর্ত্তিত ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। দাদুপন্থী, গরীবদাসী, বেহার বৃন্দাবনী প্রভৃতিও নানকসাহী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা একদিকে যেমন শিষ্টশান্ত ভজননিষ্ঠ, তেমনই আবার অসাধারণ বীরপুরুষ। ইহারা প্রায় সকলেই জটা শ্মশ্রুধারী ভস্মাবৃত কলেবর। কৌপীন বহির্ব্বাস অনেকের আছে, আবার অনেকে একেবারে উলঙ্গ। দেখিলাম, অসংখ্য সাধু আপন আসনে ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন, আবার বহুসাধু মণ্ডলী করিয়া নিবিষ্টমনে গ্রন্থসাহেব পাঠ শুনিতেছেন। কোথাও দলে দলে সাধুরা এক এক স্থানে বসিয়া ভজনগান করিতেছেন। কোথাও বা গ্রন্থ সাহেবের সমারোহের সহিত আরতি পূজা হইতেছে। একটা স্থানে যাইয়া দেখিলাম, বিবিধপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, খড়্গ, অসি, তরবারি মুশল মুদ্গর সাজান রহিয়াছে। কোন কোন মুগুর এত ভারী যে, সাধারণ লোকে তাহা তুলিতেও পারে না। মুগুরের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য সুক্ষ্মাগ্র দেড়-ইঞ্চি পরিমিত লোহার কাঁটা। সাধুরা তরবারি খেলেন, কুস্তি করেন ও ঐ সকল মুগুর ভাজেন। সামর্থ্যবান লোকে খুব সাবধানতার সহিত ঠিক কায়দায় ঐ সকল মুগুর না ভাজিলে বিষম বিপদ ঘটিতে পারে। ঠাকুর কহিলেন—'নানকপন্থীদের ভজনের আশ্চর্য্য প্রভাব এসব সিংহতুল্য লোকগুলিকে একেবারে মেষের মত করে রেখেছে।' শাখা ভেদে এই সকল সাধুদের মধ্যে মতের ও ভাবের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও সাধারণ বেশভূষা আচার ব্যবহার প্রায় সকলেরই একরূপ। কিন্তু মহান্তদের চালচলন সাজসজ্জা স্বতন্ত্র প্রকার, উহা

দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয় রাজা মহারাজাও ইহাদের সম্মুখীন হইতে সঙ্কোচ বোধ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রয়োজন হইলে এই সকল মহান্তেরাও আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সাধারণের মত সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। নানকসাহীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেশবানন্দ মহান্তের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বহু সহস্র সাধু তাঁহার তাঁবুতে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন পায়। অন্যান্য চত্তরেও কেশবানন্দের সদাব্রত নিয়তই চলিতেছে। মহান্ত করণদাস আর দশজনের মত খুব সাধারণ ভাবেই থাকেন। মহান্ত বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার চত্তরেও প্রত্যহ বহু সহস্র সাধু প্রচুর পরিমাণে ধুনির কাঠ ও আহার পাইয়া থাকেন। নাগাসন্ন্যাসীদের চত্তরে ১০।১২টি বড় বড় তাঁবু খাটান রহিয়াছে দেখিলাম। ৫।৭ দিন আমরা নানকসাহীদের চত্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসংখ্য সাধু দর্শন করিলাম। সকল সাধু সন্ন্যাসীরাই ঠাকুরকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিলেন। ভগবৎ ভজনে ইহাদের অনুরাগ ও কঠোর বৈরাগ্য দেখিয়া নিজ জীবনে ধিক্কার আসিল। সদ্‌গুরুই ইহাদের উপাস্য; নামজপ ও গ্রন্থসাহেবের বাণীই ইহাদের সাধনভজন ও অবলম্বন। ঠাকুর বলিলেন—'ধর্ম্ম এই সম্প্রদায়ে যেমন জীবন্ত, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। বিষয়ের গন্ধ মাত্র থাকিতে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয় না। ভগবান যাহাকে দয়া করেন, তার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লন। সংসারে তার আসক্তির কিছুই রাখেন না, পথের কাঙ্গালী করেন। এ অবস্থা যার হয়, তার বড়ই সৌভাগ্য।'

সন্ন্যাসীদের চত্বরে সাধুদর্শন ঃ বাইনাচের তাৎপর্য্য।

এবার ঠাকুর বিরাট সন্ন্যাসীমণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীদের অধিকারে ৫।৬টি চত্তর রহিয়াছে। চত্তরগুলি প্রস্থে নাগা ও বৈষ্ণবদের চত্তরের মত হইলেও দীর্ঘে অনেক বেশী। কত লক্ষ সন্ন্যাসী যে এ সকল চত্তরে রহিয়াছেন অনুমান করা দুঃসাধ্য। সন্ন্যাসিগণ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শিঙ্গারী, যোশী, গোবর্দ্ধন ও সারদা—এই মঠ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত গিরি, পুরী, ভারতী, বন, পর্ব্বত, সরস্বতী প্রভৃতি দশনামা সম্প্রদায়ভুক্ত। সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসীদের মত শিক্ষিত অন্য কোন সম্প্রদায়ে দেখা যায় না। শাস্ত্র পুরাণ ও ষড়দর্শনে পারদর্শী, উপনিষদ বেদবেদাঙ্গবেত্তা মহাজ্ঞানী অগাধ পণ্ডিতগণ—সন্ন্যাসীদের ভিতরে বহু সংখ্যক রহিয়াছেন। অশিক্ষিত মূর্খ বোকাদের স্থান দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে নাই বলিলেই হয়। দণ্ডী, ব্রহ্মচারিগণও উহাদেরই অন্তর্গত। তাহা ছাড়া তান্ত্রিক অবধূত পরমহংস যোগী দরবেশ এবং সংসারত্যাগী বিরক্ত উদাসিগণও সন্ন্যাসীদের ভিন্ন ভিন্ন চত্তরে অবস্থান করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক সন্ন্যাসিনী ভৈরবীগণও চত্তরাভ্যন্তরে বালির উপরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে রহিয়াছেন। ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অস্ত্রশস্ত্রধারী নাগা সন্ন্যাসিগণ নিয়ত নিযুক্ত। সন্ন্যাসীদের এক একটি চত্তরে ৫।৭টি বৃহৎ তাঁবু রহিয়াছে। তাহাতে সম্ভবতঃ

সন্ন্যাসীদের নেতা ও মঠাধিকারিগণ বাস করেন। সন্ন্যাসীদের অগ্নি সেবা নাই, সুতরাং ধুনিরও ব্যবস্থা নাই। অনাবৃত স্থানে শীত নিবারণার্থে দেহ রক্ষার জন্য কেহ কেহ ধুনি রাখিতে বাধ্য হন মাত্র। অন্যান্য সাধুদের অপেক্ষা সন্ন্যাসীগণ সুরূপ ও সুবেশ। পরিধানে তাহাদের গৈরিক রঙ্গের কৌপীন বহির্ব্বাস, মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক বস্ত্রের শিরস্ত্রান, ললাট বিভূতিবিলেপিত তাহাতে ত্রিপুণ্ড্র-উর্দ্ধপুণ্ড্র রহিয়াছে, বক্ষে অক্ষমালা শোভিত। রক্তাম্বরধারী জটিল তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ও অবধূতগণের সংখ্যা কম নয়। একদিন সন্ন্যাসীদের একটি তাঁবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বহুমূল্য চেয়ার, কৌচ, গদি দ্বারা তাঁবুটি সুসজ্জিত। এই সাজ সজ্জার প্রয়োজন কি বুঝিলাম না। পরে শুনিলাম, রাজা মহারাজা বা খুব উচ্চপদস্থ সম্মানিত সাহেব, মেমেরা মহান্তদের দর্শন করিতে আসিলে তাহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইবার জন্যই ঐ সব আয়োজন রাখা হইয়াছে। ঐ দিন আর একটি সুবৃহৎ তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া দেখি, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। কত রঙ্গ বেরঙ্গের ঝাড়, লণ্ঠন, বেল উহাতে টাঙ্গান। মূল্যবান কার্পেটের উপরে বহুমূল্যবান সুবর্ণখচিত আস্তরণ রহিয়াছে। উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সন্ন্যাসীদের এত ঐশ্বর্য্য কেন? এযে রাজা মহারাজাদের বাইনাচের বৈঠকখানার মত। ইহার মানে কি? শুনিলাম এই স্থানেও রাত্রে বাইনাচই হইয়া থাকে।' এই বাইনাচের তাৎপর্য্য ঠাকুর অনেকক্ষণ বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু উহাতে পরিষ্কাররূপে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। মোট কথা ঠাকুর বলিলেন,—

'হরি সংকীর্ত্তন, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন কর্‌লে ভক্তের প্রাণ যেমন উথলিয়া উঠে, ভাবাবেশে মত্ত হয়ে ভক্ত যেমন অঙ্গ সঞ্চালন ক'রে বিবিধ প্রকার নৃত্য করেন, বাইনাচও সেই প্রকার। ভগবানের দরবারেও বাইনাচ হয়। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সম্মুখেও গভীর রাত্রিতে দেবদাসীরা গীতগোবিন্দ গান ও নৃত্য করেন। নৃত্য একটি উৎকৃষ্ট ভজন। ভক্ত ভগবানের দর্শনে অভিভূত হয়ে তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত পদ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সর্ব্বাবয়ব দ্বারা ভগবানের আরতি করেন—কতপ্রকার মুদ্রাদি করে ভগবানের আরাধনা করেন একেই নৃত্য বলে। শ্রীক্ষেত্রে ছোট ছোট ছেলে—আখ্‌ড়া পিলাদের নৃত্য দেখ্‌লে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়, দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। এখন আর সে সব নাই—সে ভজন নাই। এখন ভজনের কার্য্যেও বিষম বিলাসিতা ঢুকেছে। এর আর উপায় কি?'

সাধুদের সদাব্রতে চমৎকার শৃঙ্খলা।

আজ একটি বিষয় ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। চড়াতে ১০।১২ লক্ষ সাধু নিয়ত বাস করিতেছেন; প্রতিদিনই উহাদের পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন কি প্রকারে সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে ভাবিয়া

অবাক হইলাম। ১২।১৪ হাজার লোকের একবেলা আহার সংস্থান করিতে হইলে ১২।১৪ দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। তাহাতেও কত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। আর বহুলক্ষ লোকের লুচী, কচুরী, ছোকা, ডাল, রায়তা, হালুয়া, মালপোয়া লাড্ডু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। সহস্র সহস্র সাধুরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পঙ্গত করিলেন, পেট ভরিয়া আহার করিলেন এবং আপন আপন আসনে চলিয়া গেলেন। কোনপ্রকার অসুবিধা নাই, গোলমাল নাই, হৈ চৈ নাই অদ্ভুত ব্যাপার। সাধুরা একদিনের বস্তু পরদিনের জন্য সঞ্চিত রাখেন না। প্রতিদিন কাঁচা বস্তু আসিতেছে প্রত্যেক চত্তরে তাহা রান্না হইতেছে, নির্ব্বিবাদে লক্ষ লক্ষ সাধু তাহা ভোজন করিতেছেন। যাহাদের উপরে যে কার্য্যের ভার তাঁহারা নীরবে তাহা করিয়া যাইতেছেন। কল কারখানার মত কার্য্য হইতেছে। অপরে তাহা জানিতেও পারিতেছে না। এ সকল বস্তু কোথা হইতে আসিতেছে, কাহারা দিতেছেন কি ভাবে প্রস্তুত হইতেছে, জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিল। শুনিলাম মেলাস্থলে সমবেত সাধু মণ্ডলীর আহার্য্যাদি যাবতীয় বস্তু ধনকুবের মাড়োয়ারীগণ এবং ভারতের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সরবরাহ করিতেছেন। তাঁহারা এজন্য শত শত লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যহ মহান্তদের নিকটে উপস্থিত হইয়া চত্তরে কি কি বস্তু প্রয়োজন জানিয়া পরদিন সকালে তাহা পঁহুছাইয়া দিতেছেন। মহান্তেরা জমাতের ভিতরে সাধুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য শত শত লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কতগুলি লোক জল টানিতেছে, কতগুলি রান্নার যোগাড় করিয়া দিতেছে, কতগুলি রান্না করিতেছে, আবার কতগুলি লোক রান্নার পোড়া হাঁড়ি কড়া প্রভৃতি বাসন মাজিতেছে। এই প্রকার এক এক দল এক এক কার্য্যের ভার নিয়া সাধু সেবার জন্য আগ্রহের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। সুতরাং কোন দিকেই সাধুদের কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে না। দাতারা দানের শুভ সুযোগ মনে করিয়া এতদর্থে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিতেছেন, তাহাতেও তাহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। শুনিলাম দয়ার সাগর শ্রীমৎ দয়াল দাস স্বামীর নিকট সেদিন এক মাড়োয়ারী উপস্থিত হইয়া ৬০ হাজার টাকা সদাব্রত দিতে চাহিলেন—কত প্রকার কাকুতি মিনতি করিলেন। স্বামীজী কহিলেন—'আমি নিতে পারি না তুমি অন্য কোন মহান্তকে গিয়া দেও। একজন মাড়োয়ারী চড়ায় আসিবামাত্রই আমাকে বলিলেন—'এখানে যতকাল আপনি থাকিবেন আপনার ইচ্ছামত প্রতিদিনের যাবতীয় বস্তু আমি সংগ্রহ করিয়া দিব—আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। আমি যদি এই ব্যয় চালাইতে না পারি তবেই আপনি অন্যের দান গ্রহণ করিবেন।' সুতরাং আমার আর কারো কিছু নেওয়ার উপায় নাই।' মাড়োয়ারী স্বামীজীর কথা শুনিয়া দুঃখিত মনে টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। নিজের ছাউনীর লোক ছাড়া প্রত্যহ ১০।১৫ হাজার লোকের ভোজন তথায় হইতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। এই প্রকার দানের কথা জীবনে কখনও শুনি নাই।

ঠাকুরকে মেলা হইতে সরাইতে ষড়যন্ত্র ঃ
সমবেত সভায় মহাত্মা মহাপুরুষদের ঠাকুর সম্বন্ধে অভিমত।

আমরা চড়ায় আসিয়াছি পর আমাদেরও সদাব্রত প্রতিদিনই আসিতেছে। কোথা হইতে আসিতেছে, কে দিতেছে জানি না। ঠাকুরের আদেশ—"ভগবানের কৃপায় যেদিন যাহা আসিবে, সেই দিনই তাহা ব্যয় করিবে। কোন একটি বস্তু পরদিনের জন্য ভাণ্ডারে রাখিবে না।" সুতরাং নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ২।৩ শত লোকের রান্না প্রত্যহ হইতেছে এবং তাহা সাধুদের ভোজন করান যাইতেছে। কোন বস্তুর অভাবও নাই, সঞ্চয়ও নাই। আজ দুই দিন যাবৎ জানি না কেন আমাদের সদাব্রত বন্ধ হইয়াছে। খবর পাইলাম, কল্য হইতে আবার সদাব্রত আসিবে। বন্ধ হওয়ার কারণ কি অনুসন্ধানে জানিলাম, আমাদের লইয়া চড়াবাসী সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী মহান্তদের ভিতরে একটা তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। তাই উহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সদাব্রত বন্ধ ছিল। শুনিলাম ঠাকুরের একটি পুরাতন ব্রাহ্মবন্ধু ঠাকুরের প্রভাব দিন দিন বিস্তার লাভ করিতেছে, সদাব্রত প্রত্যহ আসিতেছে, গৃহস্থ শিষ্যদের লইয়া তাহা তিনি ভোগ করিতেছেন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানে তিনি আড্ডা গাড়িয়াছেন—ইত্যাদি দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ঠাকুরকে চড়া হইতে সরাইবার জন্য শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামীর একটি খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিষ্যকে সহকারী করিয়া সমস্ত সন্ন্যাসী সাধু ও বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ঘুরিতে লাগিলেন। ঠাকুরের বেশ ভূষা আচার ব্যবহার ও ভজন সাধন বৈষ্ণবধর্ম্ম বিরোধী, এইরূপ দোষারোপ করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে গোঁসাই থাকিবেন, তাহারই মর্য্যাদা লাঘব হইবে। সুতরাং চড়াতে ঠাকুরকে থাকিতে দেওয়া অত্যন্ত দোষাবহ হইবে। ইহা লইয়া সমস্ত সাধু মণ্ডলীতে একটি আলোচনা হওয়া উচিত।

দুদিন হয় চড়াবাশী প্রধান প্রধান সন্ন্যাসী উদাসী ও বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া একটি বৃহৎ সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামীর ঐ শিষ্যটী ঠাকুরের চড়াবাসে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—বহু কুম্ভ মেলায় আমরা আসিয়াছি, চড়ায় বাস করিয়াছি, কিন্তু আমাদের ভিতরে কখনও কোন বাঙ্গালীকে ছাউনী করিতে দেখি নাই। যে বাঙ্গালী সাধু আসিয়া আমাদের ভিতরে আড্ডা গাড়িয়াছেন তিনি কি সন্ন্যাসী না উদাসী জানিনা; তবে বৈষ্ণব যে তিনি নন্ তাঁর বেশভূষা আচার ব্যবহারে তাহা পরিষ্কার দেখিতেছি। তিনি জটা শ্মশ্রু দণ্ডকমণ্ডলুধারী, পরিধানে গৈরিক বসন, আবার তুলসী রুদ্রাক্ষ একসঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। ইহা কি বৈষ্ণবচিহ্ন বলিয়া কোন প্রামাণ্য শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে? দুটি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাও নূতন রকমের। রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা বা বৈষ্ণবদের কোন উপাস্য দেবতা নয়। উহারা বলেন 'গৌর নিতাই'। গৌর নিতাইয়ের পূজা কি

কোন শাস্ত্রানুমোদিত ? গৌর নিতাইকে তাঁহারা কি বিষ্ণুর অবতার বলেন ? এদিকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ স্ত্রীলোক, পুত্র, কন্যা, গৃহস্থবাবুরা সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত স্বেচ্ছাচারে চলিয়া মন্‌মুখী বেশ লইয়া কি প্রকারে তিনি বৈষ্ণবমণ্ডলীর ভিতরে থাকিবেন ?

মহাশাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী সমাজের শিরোমণি বৃদ্ধ পরমানন্দ স্বামী বলিলেন—'বৈষ্ণবদের প্রামাণ্য গ্রন্থ পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে রহিয়াছে 'তুলসী, নলিনী, অক্ষ' ধারণ বৈষ্ণবদের বিশেষ বিধি। বৈষ্ণবদের উহা ধারণ না করাই অপরাধ।' প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী অমরেশ্বরানন্দ বলিলেন—'গৈরিকবসন, ভগবান বস্ত্র। দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ ও ভগবান বস্ত্র পরিধান বৈষ্ণব অবধূতদের বিশেষ লক্ষণ পুরাণে নির্দ্দেশ আছে। ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নকালে আমি নবদ্বীপে ছিলাম। তথায় দেখিয়াছি বৈষ্ণবেরা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ বলরাম অবতার বলিয়া পূজা করেন। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূজা হয়। প্রাচীন বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূর্ণাবতার বলিয়া পুরাণাদি হইতে প্রমাণ দেখান। শ্রীবৃন্দাবনেও এই গৌরাঙ্গ উপাসকদের বিশেষ প্রভাব।' সমস্ত সন্ন্যাসীমণ্ডলে শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরির বিশেষ প্রভাব। তিনি বলিলেন—'পুত্র কন্যা ত্যাগ ও স্ত্রীলোকের সংস্রব বর্জ্জন ইহা সন্ন্যাসীদের বিধি বটে, কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিধি নিষেধের বাহিরে। উহার সঙ্গ করিয়া আমি জানি, উনি সাক্ষাৎ সদাশিব আশুতোষ।' বৈষ্ণব মহাত্মাদের অগ্রণী ব্রজবিদেহী শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়াবাবাজী বলিলেন—গোঁসাইজী তো সাক্ষাৎ মহাদেব হ্যায়, প্রেমকা অবতার! উনকো ললাট্‌মে হামেসা আগ্ ধক্ ধক্ জলতা হ্যায়। আগ্‌মে যো কুছ গিরতা হ্যায় ওতো ভসম্ হো যাতা হ্যায়। য্যায়সা প্রেমিক ত্যায়সা হি সামর্থী। বৈষ্ণব লোকনকা বিচ্‌মে ছাউনী কি হ্যায়, ইস্‌মে তো বৈষ্ণব লোকন্‌কা মান বাড় গিয়া হ্যায়—বৈষ্ণব লোকনকা বহুত ভাগ হ্যায়।' মহাত্মাদের এ সকল সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিরোধীগণ অবাক্ হইলেন ; তাহারা সলজ্জভাবে আপন আপন আসনে চলিয়া গেলেন।

অদ্ভুত ভগবানের লীলা। কোন্ সূত্র ধরিয়া তিনি কি করেন একটুকু কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। ঠাকুরের ব্রাহ্ম বন্ধুটির ষড়যন্ত্রের ফলে কল্পনাতীত একটি আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। এই চড়াবাসী লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা, মহাপুরুষদের সম্মিলন স্থলে কে কাহাকে চিনেন, কে কাহার খোঁজ নেন, অথবা কে কাহাকে দেখেন। কেবল আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা মহাপুরুষ আছেন, সম্প্রদায়ের লোকমাত্র তাঁহাদেরই জানেন, চিনেন, ও দর্শন করেন। মেলার চার আনি লোকও বোধ হয় কোন একটি মহাত্মার খবর পান না। ঠাকুরের বিরুদ্ধবাদীদের চেষ্টায় সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতা ও মহান্তদের যে বিরাট সভা হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মহাত্মারা যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, ঠাকুর সম্বন্ধে যে অভিমত তাঁহাদের মুখ দিয়া প্রকাশ হইল, তাহা দশ বার লক্ষ সাধুর ভিতরে প্রচার হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। তড়িৎপ্রবাহে মহাত্মাদের কথা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। শত শত সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণবেরা ঠাকুরকে আসিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমাদের জ্বলন্ত হুতাশন এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া যেন মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিলেন। এই

ক্লেশ আমাদের প্রাণে বড়ই লাগিতেছিল। প্রতিদিন ঠাকুর সাধু দর্শন ছলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সহস্র সহস্র সাধুদের দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন বটে, কিন্তু হেলায় দর্শন এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত দর্শনে অনেক তফাৎ। আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই। আমাদের ঠাকুরের মহিমা সর্ব্বত্র প্রচার হইল। জয় ভগবান! জয় ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ করি চিরকাল তুমি সুখে থাক, জয়যুক্ত হও। আমার বেশ দেখিয়াও সাধুরা অনেক সময় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু আমি জানি না বলিয়া কিছু উত্তর দিতে পারি না। আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধুরা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? ঠাকুর কহিলেন—"নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে নামের সঙ্গে আনন্দ যোগ করে ব'লো। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিঙ্গারী মঠ আশ্রম ব্যোমবাই বলো। গুরুর নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে ব'লো অচ্যুতানন্দ।" ঠাকুরের সন্ন্যাসের নাম যে অচ্যুতানন্দ ইতিপূর্ব্বে তাহা আমরা কেহই জানিতাম না।

দয়ালদাস স্বামীর ছাউনীতে নিমন্ত্রণ ঃ
কীর্ত্তনে মাতামাতি।

আগামী কল্য দয়ালদাস স্বামীর ছাউনীতে আমাদের নিমন্ত্রণ হইল। চড়াতে এতদিন আমরা আসিয়াছি এ পর্য্যন্ত কোন ছাউনীতে আমাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই। এই নিমন্ত্রণের হেতু কি, স্বামীজীই বা আমাদের পরিচয় কি প্রকারে পাইলেন, জানিতে কৌতূহল জন্মিল। অনুসন্ধানে জানিলাম ঠাকুরকে অপমানিত করিয়া চড়া হইতে সরাইবার জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছিল স্বামীজীর কোন বাঙ্গালী শিষ্য সেই কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী হইয়া যোগ দেওয়াতে স্বামীজী অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছেন। উহারই প্রতিকার উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে বিশেষভাবে সম্মান দিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি এই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে স্বামীজীর সেই খ্যাতনামা শিষ্যটি ঠাকুরের নিকটে আসিয়া করযোড়ে বলিলেন 'স্বামীজী করযোড়ে আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, আগামী কল্য আপনি দয়া করিয়া সশিষ্যে তাঁহার ছাউনীতে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করুন। সংকীর্ত্তন তিনি বড় ভালবাসেন। আপনাদের সংকীর্ত্তনের কথা তিনি শুনিয়াছেন। সেখানে আপনারা একটু সংকীর্ত্তন করিলে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইবে।' ঠাকুর খুব আনন্দের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

আজ বেলা প্রায় ১১টার সময়ে ঠাকুর সমস্ত গুরুভ্রাতাদের লইয়া স্বামীজীর ছাউনীতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী পরম কৌতূহল প্রকাশ পূর্ব্বক করযোড়ে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া প্রণাম করিতে করিতে আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। পরে একটি বড় তাঁবুর ভিতরে লইয়া গিয়া ঠাকুরকে বসাইলেন। স্বামীজীর দিবারাত্রি অবসর নাই, তিনি ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন এবং সেই বাঙ্গালী শিষ্যটিকে আমাদের পরিচর্য্যার জন্য তাঁবুতে নিযুক্ত রাখিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। পরে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! এক অধ্যায়

গীতা পাঠ করনা ? আমি কোন্ অধ্যায় পাঠ করিব জিজ্ঞাসা করায়, ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করিতে বলিলেন। উহা আমার কণ্ঠস্থ থাকায়, খুব্ উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পাঠ করিলাম। পরে সংকীর্ত্তনের আয়োজন হইল। ২।৩ খানা খোল ও ৫।৭টি করতাল বাজিয়া উঠিল। উহার ধ্বনি এমনই বাহির হইতে লাগিল যে সংকীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বেই গুরুভ্রাতারা মাতিয়া গেলেন। তাঁহারা নানাপ্রকার ভাবোদ্দীপক হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে করিতে লাফাইয়া উঠিলেন। নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ঠাকুর ভাবাবেশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে দর্শনার্থী সাধুরা আসিয়া তাঁবুটি ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাঁবুর ভিতরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। দর্শকমণ্ডলী গুরুভ্রাতাদের ভাবোদ্দীপক নৃত্য বিস্মিতনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। ভিতরে বাহিরে লোক বেহুঁস হইয়া পড়িতে লাগিল। সকলেই মুহুর্ম্মুহুঃ হরিধ্বনি করিয়া স্থানটিকে কাঁপাইয়া তুলিল। এই সময়ে একজন দীর্ঘাকৃতি তিলকধারী বলিষ্ঠ সাধু একটী খোল বাজাইতে বাজাইতে সংকীর্ত্তন স্থলে প্রবেশ করিলেন। পাগলা সতীশ তাঁবুর এক কোণে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল। সে সাধুকে দেখা মাত্র একেবারে লাফাইয়া উঠিল এবং লম্ফ দিতে দিতে সাধুর সম্মুখীন হইয়া পড়িল। পরে উভয় হস্ত মুখের সাম্‌নে রাখিয়া পুনঃপুনঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সাধুকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। সংকীর্ত্তনে ভাবোচ্ছ্বাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সতীশও দক্ষিণ হস্তে পাছা চাপড়াইয়া, বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সাধুর সম্মুখে বারংবার ধরিতে লাগিল এবং নানাপ্রকার ভাব ভঙ্গিতে মুখ বিকৃতি করিয়া সাধুকে দম্ভের সহিত তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিল। সাধু নিষ্প্রভভাবে পশ্চাৎ হটিয়া দরজার ধারে খোল রাখিয়া অদৃশ্য হইল। অনেকে সতীশের এই প্রকার কার্য্য দেখিয়া অবাক্। কেহ কেহ ভাবিলেন, সতীশের আঙ্গুল নাড়াও বুঝি সংকীর্ত্তনে সাত্ত্বিক ভাবোচ্ছ্বাস বিকাশেরই একটি লক্ষণ। কতক্ষণ পরে সংকীর্ত্তন থামিয়া গেলে, সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভাই! ওটী কি ভাব দেখাইলি ?

সতীশ বলিল—'ভাব আর দেখাইলাম কোথায় ? শালা যে উর্দ্ধশ্বাসে পালালো'।

আমি—কেন ! ঐ সাধুর উপরে তোর এত আক্রোশ কেন ?

সতীশ—আরে ওই যে আমাকে ভূতের বোঝা ঘাড়ে দিয়েছিল। মায়াচক্রে ঘুরায়েছিল। গোঁসাই এখন কাছে, তাই ওকে কলা দেখালাম। আর একটু থাক্‌লে ওকে কাম্‌ড়ায়ে শেষ কর্‌তাম। সময়ান্তরে হাসিগল্পচ্ছলে সতীশের আঙ্গুল দেখানর কথা ঠাকুরকে বলাতে ঠাকুর সতীশকে বলিলেন,—'সতীশ ! সেই সাধু এসেছিলেন, আমাকে দেখালে না ? একবার দেখ্‌তাম।'

দয়ালদাস স্বামীর অসাধারণ দয়ার কথা।

বেলা প্রায় ৩টার সময়ে বহুবিধ উপাদেয় বস্তুদ্বারা স্বামীজী আমাদের ভোজন করাইলেন। বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক এক পঙ্গতে সহস্র সহস্র সাধু ভোজন করিতে থাকেন। স্বামীজীর

সুদক্ষ শিষ্যগণ নিয়ত তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আর স্বামীজী নিজে শুধু কাঙ্গাল দুঃখী দরিদ্রদের নিয়া রহিয়াছেন। বুভুক্ষু কাঙ্গালীদের স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া না খাওয়াইলে স্বামীজীর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। একটি কাঙ্গালীরও তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার না হইলে ক্লেশে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়—তিনি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটান। আজ স্বামীজীর একটি অসাধারণ দয়ার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। অন্তরে পুনঃপুনঃ সেই কথা উঠিতেছে। ইতিমধ্যে একদিন বিশেষ কোন কারণে কাঙ্গালীদের ভোজনকালে স্বামীজী তথায় উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সর্ব্ব প্রধান প্রিয় শিষ্যকে ঐ কার্য্যের ভার দিয়া চলিয়া যান। স্বামীজী শিষ্যকে আদেশ করিয়া যান—'কাঙ্গালীদের ভোজন শেষ না হ'লে কখনও অন্যত্র যাবে না'। শিষ্যও গুরুর আদেশমত কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করিবেন অঙ্গীকার করিয়া ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কাঙ্গালীদের পঙ্গত কালে শিষ্য খুব যত্নের সহিত তাহাদের ভোজন করাইতে লাগিলেন। অন্যদিকে ১০।১২ হাজার সাধু সন্ন্যাসী পঙ্গত করিতেছিলেন। তাহাদের ভোজন প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে; অকস্মাৎ রামদল আসিয়া উপস্থিত হইল। রামদল সাধুগণ আপন উপাস্য দেবতার সন্তোষার্থে মহাবীর হনুমানের ভাব লইয়া উপাসনা ও ভোজনাদি সমস্ত কার্য্য করিতে ভালবাসেন। তাহারা পঙ্গতে না বসিয়া লুটপাট করিয়া খাইতে অধিক আনন্দ পান। কোন সদাব্রতে রামদল উপস্থিত হইলেই, তথায় লুটপাট হইবে, ইহা সকলেরই জানা আছে। রামদল আসিয়া পড়া মাত্রই ছাউনীর সর্ব্বত্র হৈ হৈ সোর পড়িয়া গেল। সাধু সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারের উপরে রামদলের ঝুঁকি পড়িল। সর্ব্বনাশ হইল,—অর্দ্ধভুক্ত সন্ন্যাসীদের ভোজন নষ্ট হইল? চারিদিকে এই চীৎকার উঠিল। স্বামীজীর ঐ শিষ্যটি স্থির থাকিতে না পারিয়া সন্ন্যাসীদের পঙ্গত রক্ষার্থে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাউনীর উপদ্রব শূন্য হইলে যথাযথ সকলের পঙ্গত চলিতে চাগিল। কিন্তু রামদলের ভয়ে নিরীহ কাঙ্গালীরা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়ই পাত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের আর সংগ্রহ করিয়া ভোজন করান অসম্ভব অনুমানে সে চেষ্টা আর হইল না।

স্বামী দয়ালদাস সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাউনীতে পঁহুছিয়া সমস্ত সংবাদ পাইলেন। ক্ষুধিত আশ্রয়-শূন্য কাঙ্গালীরা অর্দ্ধাহারে চলিয়া গেল আর তাদের খাওয়া হইল না মনে করিয়া স্বামীজী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি প্রধান শিষ্যটিকে ডাকিয়া বলিলেন,—'সমূহ বিপদ অনুমানে তুমি গুরুর প্রত্যক্ষ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছ। অপরাধ সাধারণ নয়। এজন্য আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম।' গুরুপ্রাণ শিষ্য অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল দেখিয়া গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'আমার এই অপরাধী দেহ আপনার সেবার যোগ্য নয়। ভালই হইল। তবে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন দেহান্তে আপনার সঙ্গ পাই।' স্বামীজী বলিলেন—'গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে সংকল্প করিয়া দেহ বিসর্জ্জন দিলে, তাহা হইতে পারে। শিষ্য সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া চরণ ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। ধীরগম্ভীর দয়ালদাস শিষ্যকে সরাইয়া দিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

‘শিষ্য কোথায় গেল’, ‘শিষ্য কোথায় গেল’ ভাবিয়া তিনি দ্রুতপদ সঞ্চারে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিষ্য কোথায় আছে, কি করিতেছে, পুনঃপুনঃ খবর লইতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্য কিঞ্চিৎ অন্তরে নির্জ্জন বালির উপরে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। গভীর নিশীথ কালে চতুর্দ্দিক ভয়ঙ্কর অন্ধকার, চড়াবাসীরা সকলে বিশ্রাম করিতেছেন, শিষ্যটি ৪।৫ হাত একগাছি লম্বা দড়ির দুদিকে দুটি প্রকাণ্ড কলসী বাঁধিলেন এবং তাহা হাতে লইয়া ‘জয় গুরু’, ‘জয় গুরু’, বলিতে বলিতে খরস্রোতা গঙ্গার পাড়ে উপস্থিত হইলেন। কতক্ষণ গুরুদেবকে আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিয়া গঙ্গায় নামিলেন। গলায় দড়ি জড়াইয়া দু’পাশে দুটি কলসী রাখিয়া যেমন তিনি গঙ্গা-যমুনার স্রোতে ভাসিতে হাত বাড়াইলেন, অমনি দয়ালদাস তাহাকে দু’হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং টানিয়া চড়ার উপরে নিয়া তুলিলেন। ‘বাস্ হো গিয়া বাচ্চা, পুরা প্রায়শ্চিত্ত হো গিয়া, আব চলো হামারা সাথ’ বলিয়া শিষ্যকে লইয়া ছাউনীতে প্রবেশ করিলেন। বুঝি আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধন্য হইল। শিষ্যের আনুগত্য, গুরুর অপার স্নেহ মমতা দেখিয়া আজ বুঝি চতুর্দ্দশ ভুবন নাচিয়া উঠিল। গুরুদেব! কবে আমাকে তোমার এরূপ অনুগত করিয়া লইবে। কবে তোমাকে আমি যথার্থ আমার বলিয়া বুঝিতে পারিব!

তাঁবুতে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইল। গৌর নিতাইয়ের আরতি সংকীর্ত্তন শেষ হইলে গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরের নিকটে বসিয়া বিবিধ প্রসঙ্গে আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। দয়ালদাস স্বামীর অনেক কথা হইল। শুনিলাম একদিন কোন এক ব্যক্তি স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন—বাবাজী! সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা অপেক্ষা সংসারের আবর্জ্জনা কতকগুলি ছোটলোক কাঙ্গাল দরিদ্রের প্রতি প্রাপনার বেশী ঝুঁকি কেন? তাহাতে দয়ালদাস বলিলেন—‘এক এক জনার এক একটা বস্তু প্রাপ্তির অধিকার বেশী। যেমন রাজার প্রাপ্য সম্মান মর্য্যাদা অভ্যর্থনার, সাধুর প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তি অভিবাদন ইত্যাদি, সেই প্রকার অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু অসাধু বিচার নাই। গৈরিকধারী সাধুসন্ন্যাসিগণকে ভোজন করাইলেই যদি সাধু ভোজনের ফল হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় কাঙ্গালদিগকে ভোজন করাইলেও মহাদেব ভোজনের ফল হইয়া থাকে।’

মহাত্মা দয়ালদাস বাবাজীর দানের ভাব কত গভীর। এসকল কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব আনন্দ করিলেন। অধিক রাত্রে সকলে বিশ্রাম করিলেন।

“এই তোমার বিলাসী সাধু”! গুরু-শিষ্যের অবস্থা ঃ অসাধারণ শক্তিশালী সা-সাহেব।

আজ ঠাকুর চা সেবার পর সন্ন্যাসীদের ছাউনীতে যাইবেন বলিয়া বাহির হইলেন। গঙ্গার ধারে ধারে সন্ন্যাসীদের এলাকায় পঁহুছিয়া কিঞ্চিৎ দূরে একটি খড়ের গাদা দেখিতে পাইলাম। ঠাকুর

ঐ স্থানে প্রবেশ করিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খড়ের ভিতরে জনমানব শূন্য স্থানে একটি পরমহংস চুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর তথায় দাঁড়াইলেন এবং পরমহংসকে নমস্কার করিয়া বসিলেন। দেখিয়া চিনিলাম—চড়ায় আসার দিন এই মহাত্মাকেই রাস্তায় দেখিয়া ঠাকুর ইহাকে পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ভাবাবেশে সর্ব্বাঙ্গ ইহার থর থর কাঁপিতেছিল। ঠাকুর এই মহাত্মার নিকটে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া রহিলেন। পরমহংস মৌন, কোন কথাবার্ত্তা হইল না। মহাত্মার দিকে একটু সময় তাকাইয়া থাকিয়া দেখিলাম তাঁহার গৌরবর্ণ, বক্ষস্থলে কাল পাথরের মত একটি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে। ছায়াটি বড় শীতল ও স্নিগ্ধ-কর। একটু সময় চাহিয়া থাকিতেই শরীরটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল—চিত্তে প্রফুল্ল ভাব আসিল, সজোরে নাম চলিতে লাগিল। মনে হইল, ইনি অসীম অনন্ত পরব্রহ্মে নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়া শান্ত সমাহিত ও মৌন হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা যে এতক্ষণ তাঁহার নিকটে রহিলাম, তাহা তিনি জানিলেন কি না তাহাও বুঝিলাম না। ইনি কে, কোথায় থাকেন কোন পরিচয়ই পাইলাম না। ইনি ‘মৌনীবাবা’ নামে খ্যাত। গোপনে থাকার অভিপ্রায়েই এইরূপ নির্জ্জন স্থানে আসিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং ঠাকুরই বা ইহার পরিচয় দিবেন কেন? ঠাকুর বলিলেন,—‘নীরবে থাকিয়া ইনি যে উপদেশ দিতেছেন ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রকার উপদেশ কেউ দিচ্ছেন না।’

মৌনী বাবার নিকট হইতে বাহির হইয়া ঠাকুর সন্ন্যাসী মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। এক একটি চত্তরে বহুসংখ্যক বড় বড় তাঁবু খাটান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। কোন কোন তাঁবুতে আসন বসন কিছুই নাই, শুধু বালি; কোনটিতে খড় বিছান; কোন কোন তাঁবুতে সতরঞ্চ গালিচা পাতা, আবার কোন কোন তাঁবুতে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া চক্ষু স্থির হইল; কোন রাজামহারাজার বৈঠকখানাতেও এত সাজ সরঞ্জাম আছে কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা সন্ন্যাসীদের সর্ব্বপ্রধান তাঁবুর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তাঁবুর একধারে একখানা ছোট তক্তপোষের উপরে সুবর্ণখচিত বহুমূল্য মখ্‌মলের গদি। তাহার উপরে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে মখ্‌মলের মোটা মোটা সুচিত্র তাকিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক রঙ্গের বসন ও আলখিল্লা ঝলমল করিতেছে। স্বামীজীর গলদেশে বড় বড় হীরা মুক্তা চুনী পান্না প্রভৃতি মণিগণের উজ্জ্বল মালা। প্রত্যেকটি মণি হইতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। কত লক্ষ টাকা যে ঐ মালার মূল্য, অনুমান করা যায় না। উৎকৃষ্ট রঙ্গিন রেশমের পাগ পরিয়া স্বামীজী ব্যাসাসনে বসিয়া আছেন। দেখিতে রাজা মহারাজার মত, চেহারা সুশ্রী, তেজস্বী ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তাঁবুর ভিতরে অনেক মহাজন মাড়োয়ারী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বসিয়া রহিয়াছেন। স্বামীজী ঈষৎ হাস্যমুখে খুব উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে শাস্ত্র পুরাণের কথা বলিয়া উপদেশ দিতেছেন; সকলে নিবিষ্ট হইয়া শুনিতেছে। স্বামীজীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি নিষ্কিঞ্চন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একখানা জীর্ণ কম্বলের উপরে বসিয়া আছেন। তিনি সময় সময় স্বামীজীকে উৎসাহ দিতেছেন।

স্বামীজীও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার পানে তাকাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, কণ্ঠস্বর গদগদ হইতেছে। আমরা তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, স্বামীজী ঠাকুরকে বসিতে হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা সকলেই তাঁবুর ভিতরে বসিলাম। সকলেই খুব ভক্তিভাবে স্বামীজীর উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। স্বামীজীর বিলাসিতার অতিরিক্ত আড়ম্বর দেখিয়া গোড়াতেই আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল সুতরাং তাঁর উপদেশ ভাল লাগিল না; তাঁর অশ্রুজল এবং গদগদ কণ্ঠ ভাবের ভাণ মনে হইতে লাগিল। একটু পরেই ঠাকুর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। আমরা ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর দিকে চলিলাম। আমার মনের উদ্বেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যিনি এত বিলাসী, তিনি আবার সন্ন্যাসীদের নেতা হইলেন কিরূপে? গদগদ স্বর, অশ্রুজল যাহা দেখিলাম, তাহাও তো ভাবের ভাণ বলিয়া মনে হয়।' ঠাকুর আমার কথা শুনিয়াও কোন উত্তরই দিলেন না। তখন মনে হইল ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন, সুতরাং কোন কথা না বলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁবুতে আসিয়া পঁহুছিলাম।

বেলা অবসানে আকাশে মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। সন্ধ্যা হইতেই ঝড়বৃষ্টি এক সঙ্গে আরম্ভ হইল। চড়ায় হাহাকার পড়িয়া গেল। সাধুদের ধুনি নির্ব্বাণ হইল। ছাউনী ছাতা পড়িয়া যাইতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ সাধু মাথা রাখিবার স্থান পাইলেন না। দু'দিন দু'রাত্রি ঝড়বৃষ্টি তুফানে লক্ষ লক্ষ সাধু অনাবৃত শরীরে বালির উপরে মাঘের দারুণ শীতে পড়িয়া রহিলেন। যাহাদের তাঁবু ছাউনী বা গৃহাদি আছে, তাহাদেরও ভাণ্ডার শূন্য। এই বিষম বিপদে কে কাকে দেখে, কে কার খবর নেয়!

তৃতীয় দিনে বেলা প্রায় দশটার সময়ে গায়ের কাপড় মুড়ি ঝুড়ি দিয়া আমরা সকলে তাঁবুর ভিতরে বসিয়া আছি, বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে,—দেখিলাম একটি গৌরবর্ণ কৌপীন মাত্র পরিহিত বলিষ্ঠ সাধু অপর ১৫.২০টি সাধু সঙ্গে লইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া পড়িলেন। সমস্ত শরীর তার আছাড়ের ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। কাদা মাখা চর্ম্মের উপর দিয়া স্থানে স্থানে রক্তের ধারা পড়িতেছে। সাধুটি আসিয়াই ঠাকুরের সম্মুখে ধুনির পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, এবং করযোড়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'স্বামীজী! ভাণ্ডারমে কোন্ চীজ্ চাহি?' ঠাকুর বিধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ভাণ্ডার শূন্য কিছুই নাই। সাধু উহা শুনিয়া দুটি সহচরকে দু' মণ চাউল ও আটা এবং তদপযুক্ত ডাল আলু লুন ঘৃত কাষ্ঠ প্রভৃতি অবিলম্বে আনিয়া দিতে বলিলেন। সাধু আর ক্ষণকালও না দাঁড়াইয়া সঙ্গীদের সঙ্গে দৌড়িয়া চলিলেন। শুনিলাম গতকল্য অপরাহ্ন হইতে তিনি মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যেও বহু সাধু সঙ্গে লইয়া চত্বরে চত্বরে মহান্তদের নিকট উপস্থিত হইতেছেন এবং কোথায় কাহাদের কি প্রয়োজন, খবর লইয়া তাহা পঁহুছিয়া দিতে সঙ্গীদের হুকুম করিতেছেন। আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া খালি গায়ে যে ভাবে তিনি দারুণ মাঘের শীতে বৃষ্টিতে চড়ার উপরে ছুটাছুটি করিতেছেন, ভাবিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। সাধু আছাড়ের পর আছাড় খাইয়া যেভাবে ক্ষত

বিক্ষত হইয়াছেন, তাহা মনে করিয়া চক্ষে জল আসিল। ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ সাধু যে চড়াতে আছে কল্পনাও করিতে পারি নাই, এই সাধুটি কে? ঠাকুর শুনিয়া ছলছল চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—'ইনিই তোমার সেই বিলাসী সাধু।' এই বলিয়া ঠাকুর চুপ করিলেন এবং ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে ঠাকুরের গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—'সেদিন যাঁকে তোমরা মহারাজার মত বেশ ভূষায় সজ্জিত হ'য়ে গদির উপরে বসা দেখেছিলে, দেখ, আজ তিনি কি অবস্থায় ছুটাছুটি কর্‌ছেন। এই সন্ন্যাসীর নাম—সঙ্করারণ্য। এঁরই ডান পাশে সাধারণ আসনে কাঙ্গালের মত যে সন্ন্যাসীটি বসেছিলেন, তিনি এঁর গুরু। বাপ মা যেমন ছেলেকে সাজ পোষাকে সাজায়ে ছেলের শোভা দেখে আনন্দ করেন, সেইরূপ অনুগত প্রিয় শিষ্যকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সাজায়ে তাকে দেখে গুরু আনন্দ কর্‌ছিলেন; শিষ্যও সেইরূপ গুরু আমাকে আদর করে মহারাজার মত গদিতে বসায়েছেন গুরুরই কৃপাতে আমার এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ হচ্ছে মনে ক'রে এক একবার গুরুর চরণের দিকে তাকাচ্ছেন, প্রণাম কর্‌ছেন, গুরুর স্নেহের কথা ভেবে অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছেন, সময় সময় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে—ভাবের ভাণ করেন নাই।'

রাত্রি প্রায় ১১টা। ঠাকুর জলন্ত ধুনি সম্মুখে রাখিয়া আপন আসনে বসিয়া আছেন; আমরা কেহ শয়ন করিয়াছি, কেহ বসিয়া রহিয়াছি। তাঁবুর দরজার দিকে চাহিয়া দেখি একটি লোক কোট পেণ্টালুনপরা, মাথায় টুপি দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখামাত্র আসন হইতে উঠিয়া গিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং নিজ আসনে নিয়া বসাইলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। কত সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর তাঁহাদের যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়া পৃথক্ আসনে বসান। এ পর্য্যন্ত এমন একটি লোকও দেখি নাই যাহাকে ঠাকুর নিজ আসনে নিয়া বসাইয়াছেন। খুব বিস্ময়ের সহিত আমরা লোকটিকে দেখিতে লাগিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে প্রায় ১৫।২০ মিনিট কথাবার্ত্তা বলিলেন। কি বলিলেন বৃষ্টির শব্দে শুনিতে পাইলাম না। যাওয়ার সময়ে আমরা ছাতা দিতে চাহিলাম, ঠাকুর নিষেধ করিলেন। লোকটি চলিয়া গেলেন পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি কে? ঠাকুর কহিলেন,—'ইনি সা সাহেব, জাতিতে মুসলমান—আমার গুরুভ্রাতা। এখন জাতিবুদ্ধি নাই—পরমহংস অবস্থা। ইনি ঐশ্বর্য্য পথে চ'লে সিদ্ধ হ'য়েছেন। ইঁহার শক্তি অসাধারণ। এই ঝড় বৃষ্টিতে এসেছেন—এক ফোঁটা জল

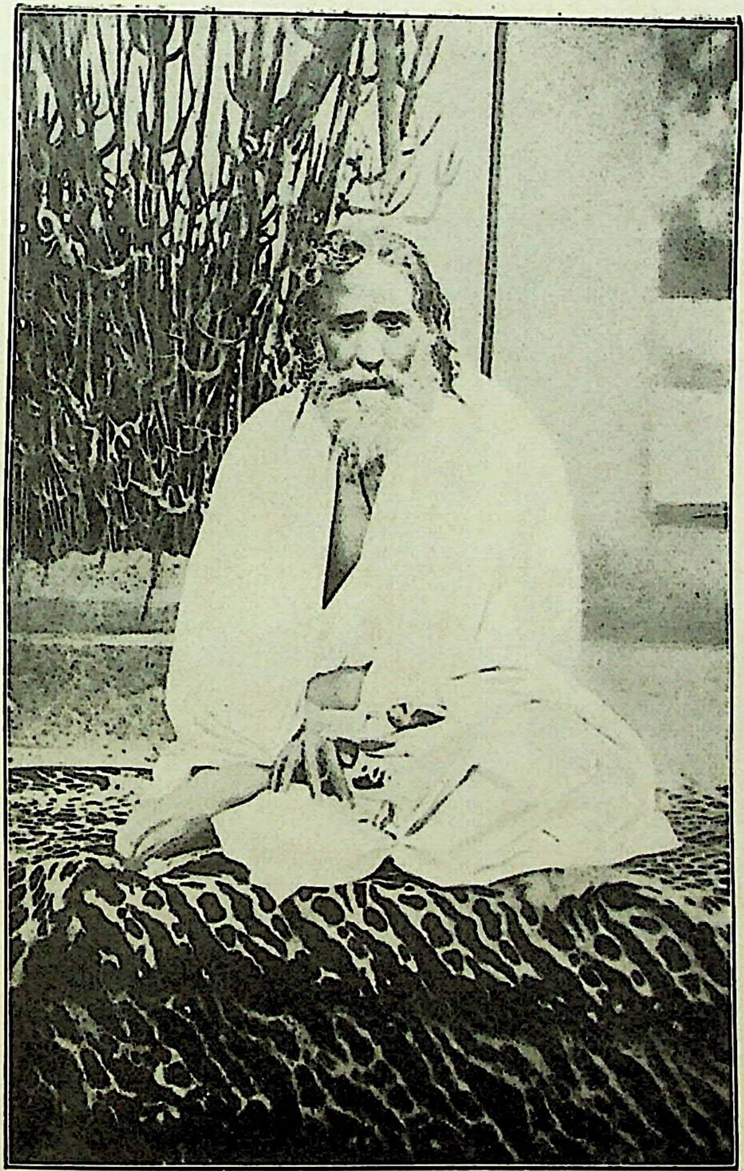

মহাত্মা গম্ভীরানাথজী পৃষ্ঠা ২৭৯

গায়ে পড়ে নাই। যাওয়ার সময়েও সেই ভাবেই গেলেন। আমরা কি ভাবে আছি খবর নিতে এসেছিলেন। এলাহাবাদে খুব গোপনে আছেন। খুব অল্প লোকই ইহাকে জানে।

সাধু ভিখনদাস ঃ ভগবানের দান প্রবাহ—স্পর্শে কৃতার্থ ঃ মহাপুরুষ গম্ভীরানাথজী দর্শন।

আজ আকাশ পরিষ্কার হইল। সাধুদের আনন্দের আর সীমা নাই। পূর্ব্ববৎ সাধুদের থাকার সুব্যবস্থা হইল। সহস্র সহস্র ধুনি জ্বলিয়া উঠিল। ভাণ্ডারার যথামত আয়োজন চলিল। প্রলয়ের পর প্রকৃতি পুনরায় শান্তভাব ধারণ করিল। সাধুরা যত্রতত্র বিচরণ করিয়া পরস্পরের খবর লইতে লাগিলেন। সকলের যেন নব জীবন লাভ হইল; এই দুই দিন ঝড়বৃষ্টিতে কোন সাধুকে দেখা যায় নাই, কিন্তু ছোট কাটিয়া বাবা প্রত্যহ যেমন ঠাকুরের নিকট আসিয়া থাকেন, এই দুই দিনই সেই প্রকার আসিয়াছিলেন। আমাদের তাঁবুর ভিতর থাকিতে বাবাজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু বাবাজী রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন,—স্ত্রীর যেমন পতি, আসন, ধুনিও সাধুদের সেইরূপ। উহা ছাড়িয়া অন্যত্র কি প্রকারে থাকিব।

আজ মহাত্মা ভিখনদাস বাবাজী ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর খুব আদর করিয়া তাঁহাকে নিজ আসনের পাশে বসাইলেন। পাটনার অনতিদূরে বাবাজীর আশ্রম। এই আশ্রমে প্রত্যহ ৫।৭ শত লোকের সেবা হয়। সময়ে সময়ে অসংখ্য সাধুদের জমাতও বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাবাজীর আকাশবৃত্তি। কখনও একদিনের বস্তু পরদিনের জন্য রাখেন না। যখন ভাণ্ডারায় অভাব অনুমান করেন, বাবাজী রঘুনাথজীর দরজায় ধন্না ধরিয়া পড়িয়া থাকেন। প্রয়োজনীয় বস্তু অমনি আসিয়া পড়ে। কোথা হইতে কি ভাবে আসে, কেহ তাহার উদ্দেশ পায় না। প্রতিদিনই এই অদ্ভুত ভাণ্ডারা বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুর বাবাজীর আকাশবৃত্তি ও অদ্ভুত ভাণ্ডারার কথা তুলিয়া খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বাবাজী উহা শুনিয়া বলিলেন—'মা গঙ্গা যেমন কারো অপেক্ষা না করিয়া নিজ মনে প্রবাহিত হইয়া সাগরে গিয়া পড়িয়াছেন, দান স্রোতও সেই প্রকার ভগবানের ইচ্ছায় প্রবাহিত হইতেছেন। আমি মাত্র সেই গঙ্গায় হাত নিমজ্জন করিয়া পবিত্র হইয়া যাইতেছি। ওতে আমার কোন কর্ত্তৃত্বই নাই। বাবাজীর বয়স ৪০।৪৫ বৎসর অনুমান হয়। বেশের কোন আড়ম্বর নাই—সাধারণ কৌপীন বহির্ব্বাস, গলায় তুলসী, ললাটে ও দ্বাদশাঙ্গে গোপী চন্দনের তিলক। দেখিতে খুব সুস্থ ও বলিষ্ঠ—বড়ই সুন্দর প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি।

আজ ঠাকুরের সঙ্গে মহাত্মা গম্ভীরানাথজীর দর্শনে চলিলাম। দূর হইতে স্বামীজীকে দর্শন মাত্রে

তাঁর অসাধারণ প্রভাব অনুভব হইতে লাগিল। প্রবল ফোয়ারার মত নামটি চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়া সতেজে ভিতর হইতে বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বাবাজী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একখানা শতছিদ্রযুক্ত মলিন বস্ত্রের খণ্ড ঠাকুরকে বসিবার জন্য পাতিয়া দিলেন। ঠাকুর উহাতে স্থির হইয়া বসিয়া বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাবাজীও কথাবার্ত্তা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বাবাজীর তপদীপ্ত কলেবরটি অসাধারণ দীর্ঘ। পরিধানে কৌপীন। কোমরে একখানা কাল কম্বলের টুকরা জড়ান রহিয়াছে। নাসিকা উন্নত, ললাট দীর্ঘ। চক্ষুদুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। অবিশ্রান্ত তাহাতে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। শরীর একেবারে নিস্পন্দ, নিষ্ক্রিয় কাঁটার মত স্থির। যে আসনে বসিয়া আছেন, তাহা আসন নয় বলিলেও চলে। ছেঁড়া একখানা চাটাই ধূলা, বালি, ধুনির ভস্মে তাহা পরিপূর্ণ। বাবাজী ঠাকুরকে চা খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া সেবকদের বলিলেন। অবিলম্বে বাবাজীর ব্যবস্থামত চা প্রস্তুত হইয়া আসিল। মাটির কুলিয়াতে করিয়া বাবাজী স্বহস্তে চা দিলেন। পেস্তা বাদাম আখরোট প্রভৃতি উপাদেয় কাবুলি মেওয়া দ্বারা প্রস্তুত করা চা, খাইতে যেমনই সুস্বাদু—গুণেও তেমনই গরম। খাওয়া মাত্র শরীর আগুন হইয়া উঠিল। ঠাকুর বলিলেন—"এমন উৎকৃষ্ট চা কখনও তিনি পান করেন নাই।"

অনেকক্ষণ ঠাকুর গম্ভীরানাথজীর নিকটে বসিয়া তাঁবুর দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইনি কে?' ঠাকুর বলিলেন—'ইনি নাথ যোগীদের মহান্ত। চারিদিকে যে সকল ভয়ঙ্কর আকৃতি সাধুদের দেখ্‌লে, তারা গোরখপন্থী—কানফাট্টা যোগী। উঁহাদের ভিতরে অঘোরীও আছেন। ইনি ঐশ্বর্য্য পথে অতি কঠোর সাধন ক'রে সিদ্ধ হ'ন, পরে মহাসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন। হিমালয়ের নীচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নাই। ইনি পলকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্‌তে পারেন। কিন্তু এখন ইনি মাধুর্য্যে একেবারে ডুবে গেছেন ইঁহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বরাবর পাহাড়ে যে চারটি মহাপুরুষ দর্শন ক'রেছিলাম, তার মধ্যে ইনি একজন—গোরখপন্থী। আলেখী, কানফাট্টা, অঘোরী এঁরা সকলেই তান্ত্রিক যোগী—এঁদের সাধন বড়ই কঠিন।

আমরা চড়াতে আসিয়া এ পর্য্যন্ত যত সাধু মহাপুরুষ দর্শন করিলাম, গম্ভীরানাথের মত কিন্তু কাহাকেও লাগিল না। গায়ে শীত লাগার মত ইঁহার প্রভাব আসিয়া দেহ মন স্পর্শ করিতে লাগিল।

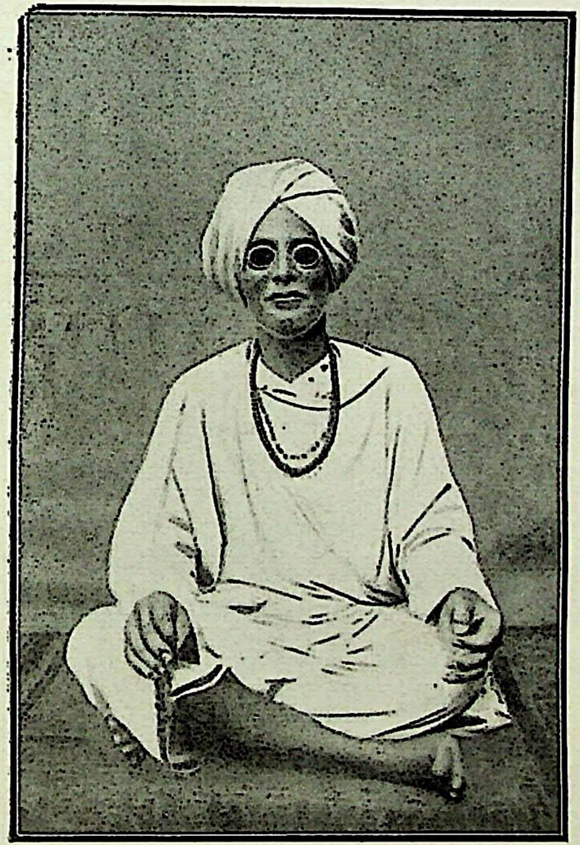

স্বামী ভোলানন্দ গিরি পৃষ্ঠা ২৮০

ভৈরবী দর্শন ঃ   সত্যদাসীর পূর্ব্বজন্মের গুরু।

আজ চা সেবার পর ঠাকুর বৈষ্ণবদের একটি চত্তরের ভিতর দিয়া তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসী ও অবধূতদের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণ অধিকাংশই রক্তাম্বর পরিহিত, ভস্মাবৃত অঙ্গ, জটিল ও ত্রিশূলধারী। ললাটে তাহাদের সিন্দুর বা লাল রুলি। চেহারা অধিকাংশেরই তেজস্বী, দেখিয়া শক্তিশালী মনে হয়। ঠাকুর ঘুরিতে ঘুরিতে একটি অবধূতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া খুব উল্লসিতভাবে 'জয় গজানন', 'জয় গজানন' বলিতে লাগিলেন। ঠাকুর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এই অবধূতের নিকটে বসিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ চলিতেই অনাবৃতস্থলে বালির উপরে ধুনি জ্বালিয়া একটি তেজস্বিনী ভৈরবী বসিয়া আছেন দেখিলাম। ঠাকুর তাঁহার নিকটে পঁহুছিতেই তিনি 'আও বাবা গণেশ', 'আও বাবা গণেশ', বলিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরকে তিনি খুব আগ্রহের সহিত ধুনির সম্মুখে একটু সময় বসিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর বসিলেন। ভৈরবী ঠাকুরকে দেখিয়া ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সাক্ষাৎ গণেশ বলিয়া, তিনি পুনঃপুনঃ ঠাকুরকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মুখ-চোখ তাঁর যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রুজলে তাঁর গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। ভৈরবীর সর্ব্বাঙ্গ ভস্মমাখা, মস্তকে রাশীকৃত জটা, তাহাতে সমস্ত পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া রহিয়াছে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষমালা, কপালে সিন্দুরমাখা, বর্ণ শ্যাম, আকৃতি বেঁটে এবং স্থূল। সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হইয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন। স্থূল উরুদ্বয়ের সংযোগ হেতু নাভির নীচে আর কিছুই দেখা যায় না। দৃষ্টি এতই স্নিগ্ধ ও সুন্দর যে, চোখে চোখ পড়িলে দৃষ্টি আর ফিরাইয়া আনা যায় না। শ্যামাঙ্গী হইলেও এমন সুশ্রী স্ত্রীলোক আমি কোথাও দেখি নাই। আমরা সকলেই ভৈরবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ঠিক যেন ভগবতী তারা আবির্ভূতা হইয়াছেন! ঠাকুর উঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। যতক্ষণ দেখা যায়—ভৈরবী ঠাকুরের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

এবার আমরা তাঁবুর দিকে রওয়ানা হইলাম। ঠাকুর সোজা পথে না চলিয়া গঙ্গাতীর দিয়া চলিলেন। সেতার হাতে একটি জটাধারী, শীর্ণকায়, দীর্ঘাকৃতি সাধু ঠাকুরকে দূর হইতে দেখিয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেলেন। তিনি গান করিতে করিতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব-স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। কত প্রকারেই ঠাকুরের নিকট কাতরতা প্রকাশ করিয়া এক একবার ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন। তাঁহার নানাপ্রকার অদ্ভুত ভাব দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে ঠাকুরকে বলিলেন—'প্রভো! আপনার দর্শন পাওয়ার জন্য অনেক ঘুরিয়াছি,—বহুকাল যাবৎ আপনাকে ধ্যান করিতেছি।' ঠাকুর খুব স্নেহভাবে তাঁর পানে দৃষ্টি করিয়া ছলছল চক্ষে কহিলেন,—'আপনাকে কয়েক দিন যাবৎ আমিও মনে মনে খোজ করিতেছি।' কিছুক্ষণ গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর তাঁবুতে চলিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময়ে আর আর দিনের মত মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ

Digitizatlon by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর আরতির পরে গুরুভ্রাতাদের সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই সংকীর্ত্তনে গুরুভ্রাতাদের মহাভাব দেখিয়া সাধুসন্ন্যাসিগণ খুব আনন্দলাভ করিলেন। সংকীর্ত্তনের পর ঠাকুর তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন।

গুরুভ্রাতারা প্রায় সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। আমি ও অশ্বিনী মাত্র বিগ্রহদ্বয়ের নিকটে রহিলাম। এই সময়ে সদর দরজার দিকে চাহিয়া দেখি, একটি সন্ন্যাসী গৌর-নিতাইয়ের দিকে তাকাইয়া, করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। একটু পরেই তিনি গৌর-নিতাইকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হইল। কারণ, সন্ন্যাসীরা কেহ গৌর-নিতাইকে জানেন না,—মানেনও না। তাঁহারা অনেকে বিগ্রহদ্বয়কে গঙ্গা যমুনা বলেন। সন্ন্যাসীর আকৃতি দেখিয়া চিনিলাম। ইনিই গতকল্য ঠাকুরের নিকট আসিয়া ঠাকুরকে প্রণামপূর্ব্বক ধুনির সম্মুখে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বসিয়াছিলেন ; ঠাকুরের সঙ্গে একটি কথাও বলেন নাই। ঠাকুরও একেবারে চুপ করিয়াছিলেন। ইনি চলিয়া যাওয়ার সময়ে নিজের কাঠের কমণ্ডলুটি ঠাকুরের পাশে রাখিয়া, ঠাকুরের কমণ্ডলুটি নিয়া গেলেন। ঠাকুর দেখিয়াও কোন আপত্তি না করায় আমরাও বাধা দিলাম না। ঠাকুরের নিকট ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন,—'ইনিই সত্যদাসীর পূর্ব্ব জন্মের গুরু। বদরিকাশ্রমেরও উপরে বহুদূর বরফাবৃত হিমালয়ের অতি উচ্চ শৃঙ্গে গোফার ভিতরে ইনি থাকেন। সেই স্থানকে সাধুরা 'বরফান্' বলেন। ওখানে কন্দমূলই আহার। ইনি একজন বহু প্রাচীন মহাপুরুষ। লোকালয়ের কিছুই জানেন না। বহুকাল পরে এবার ইনি লোকালয়ে এসেছেন।'

মহাপুরুষকে দেখিয়া আমি অশ্বিনীকে বলিলাম,—'ওরে, ওই দ্যাখ, সেই মহাপুরুষ,—সত্যদাসীর গুরু।' অশ্বিনী অমনি কুঞ্জ, সতীশ প্রভৃতিকে খবর দিতে গেল। এই অবসরে মহাত্মা সরিয়া পড়িলেন। আমি দরজার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দৃষ্টিতে রাখিতে লাগিলাম। গুরুভ্রাতারা ছুটাছুটি করিয়া তাঁহাকে ধরিতে চলিলেন,—কেহ কেহ চলিতে চলিতে আছাড় খাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, ঐ সময়ে মহাপুরুষ অকস্মাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদের দিকে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে আমাদের দরজার নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকেই তাঁহার চরণ ধুলি নিতে লাগিলেন। সকলকেই তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে পূর্ব্বদিকের রাস্তা ধরিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

মহাপুরুষের কবচ দান।

আজ সকালে উঠিয়া আর আর দিনের মত আমরা চড়ার পূর্ব্বপ্রান্তে গঙ্গাতীরে শৌচার্থে উপস্থিত হইলাম। মেথরদের ঘরের দ্বারে ঠাকুরের কমণ্ডলুর মত একটি কমণ্ডলু দেখিয়া ভাবিলাম, এখানে এই জিনিষ কেন ? একটু অনুসন্ধান করিতেই দেখি, মেথরদের ঘরের কোণে সেই মহাপুরুষ চুপ করিয়া

বসিয়া আছেন। আমরা খুব আগ্রহের সহিত অনুনয়-বিনয় করিয়া অনুরোধ করাতে তিনি আমাদের তাঁবুতে গিয়া থাকিবেন, স্বীকার করিলেন। স্নানের পর আমরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁবুতে আসিলাম। মহাপুরুষকে পাইয়া তাঁবুর সকলেরই খুব আনন্দ। আমার উপরে মহাপুরুষের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তিনি আমাকে বলিলেন,—'বাচ্চা যো চীজ্‌কে ওয়াস্তে তোম এত্‌না ভজন-সাধন কর্‌তা হ্যায়, ওহি চীজ্‌ তোম্‌কো হাম্‌ দেয়েঙ্গে। ও চীজ্‌ ধারণ কর্‌নেছে তোমারা সর্ব্ব্‌সিধ্‌ লাভ হোগা।'

আমি—'ও সিধ্‌মে হামরা ক্যা হোগা ?'

মহাত্মাজী—'মহাবীরজী কি শক্তি তোমারা ভিতর সঞ্চার হোগা!—উর্দ্ধরেতা হো যায়গে; আউর গুরুজীকা উপর অনন্য ভক্তি, একান্ত নিষ্ঠা বন্‌ যায়গি।' আমি শুনিয়া অবাক্‌ হইলাম।—ভাবিলাম, এ বস্তুর জন্যই তো একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু, ইহা কি ঠাকুর ভিন্ন অন্য কেহ দিতে পারে ? ইহা তো আমার গুরুদেবেরই এক চেটিয়া সম্পত্তি। ভাল, যদি দয়া করিয়া দেন,—আমার তো পরম সৌভাগ্য।

এগারটার সময় ঠাকুর পায়খানায় গেলেন; পরে মহাপুরুষ ঠাকুরের ধূনির সম্মুখে বসিয়া ধূপধূনা গুগ্‌গুল-চন্দনাদি মন্ত্রপূতঃ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে ভূর্জ্জপত্রে অঙ্কিত মহাবীরের মূর্ত্তি আমাকে দেখাইয়া, উহা হোম-ধূমের উপরে পুনঃপুনঃ আরতি করিলেন। তৎপরে আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'লেও ইন্‌কো দক্ষিণ বাহুমে ধারণ কর্‌না,—আউর পূজা কিও।'

আমি—মহাত্মাজী! পূজা হাম্‌ জান্‌তা হ্যায় নাই, সেরেফ্‌ ধারণ কর্‌নে সেক্‌তেঁহে।

মহাত্মা—আচ্ছা ওস্মেই হোগা। ফির্‌ মঙ্গরকা রোজ ধূনা জালায়কে একদফে আরতি কিও।

আমি মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপকা ওমর কেৎনা হ্যায় ?

মহাত্মাজী—"মই তো নাহি জানতা হ্যায়। বহুত বরষ হুয়া এক রোজ গুরুজী হামকো কহা—'আব তো তোমারা তিন শত বরষ উতার গিয়া, কভি তোমারা মন হোয় তো জনম্‌ভূম্‌ একদফে দর্শন কিও। বহুত বরষ বাদ গুরুজীকা বাত হামারা খেয়ালমে আয়া। হাম তো জনম্‌ভূম্‌ দর্শনকো ওয়াস্তে নীচু চলা আয়া। হরিদ্বারমে আয়কে শুনা, 'যবন ভারত ভূম্‌ মে প্রবেশ কিয়া হ্যায়।' তব্‌ হাম আউর নেহি উতারা, ফিন্‌ আসন পর চলা গিয়া। এহি বরষমে হাম কুম্ভমেলামে চলা আয়া।"

শুনিলাম,—'ইনি রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহরের সময়ে দেব-মুহূর্ত্তে মানস-সরোবরে স্নান করেন, পরে বদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের দর্শন ও মঙ্গল আরতি করিয়া থাকেন। তৎপরে দ্বারকাতে যাইয়া শ্রীশ্রীদ্বারকানাথজীর দর্শনান্তে হোম করেন, অতঃপর প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া নিজ আসনে চলিয়া যান। ইহাই মহাত্মার নিত্যকর্ম্ম।' তাঁহার মুখে শুনিলাম,—বলিলেন,—'এই যে ত্রিবেণী দেখিতেছ,এই প্রকারের আরও তিনটি ত্রিবেণী হিমালয়ের উপরে রহিয়াছে। মন্দাকিনী অলকনন্দা এবং ভাগীরথী; গঙ্গার এই তিন ধারাতেই সরস্বতীর সঙ্গম আছে। হিমালয় পর্ব্বতোপরে

পম্পা, মানস প্রভৃতি চারিটি সরোবর আছে। অস্ত্রে যাহাদের শরীর বিদ্ধ হয় না, আগুনেও যাহাদের শরীর পোড়েনা, যে ব্যক্তি নিজের শরীরকে এইরূপ মনে করেন, মাত্র তিনিই মানস-সরোবরে বাস করিতে পারেন এবং ঐ সকল সরোবরে স্নান করিতে পারেন। বাবা! আমি ঐ চারিটি সরোবরেই স্নান করিয়া থাকি।' ইহার পর মহাত্মাজী তাঁবু হইতে কখন কোথায় চলিয়া গেলেন—কোন খোঁজ পাইলাম না।

শৌচান্তে ঠাকুর আসনে আসিলেন; নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে সমস্ত কথা বলিলাম। মহাপুরুষ প্রদত্ত কবচ ধারণ করিব কি না ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন—'তুমি কি চেয়েছিলে? না, তিনি নিজ হ'তে দিলেন? আমি বলিলাম—'আমি কিছুই তাঁর নিকটে চাই নাই,—নিজ হ'তে তিনি দিয়েছেন।' ঠাকুর কহিলেন,—'তোমার খুব সৌভাগ্য। উনি সাধারণ নন,—বাক্‌সিদ্ধ। উনি যেমন বলেছেন সেইরূপ ধারণ কর্‌লে ঐসব অবস্থা লাভ হবে। ইচ্ছা হ'লে, আজই উহা ধারণ কর্‌তে পার।'

ঠাকুরের কথা শুনিয়াও আমার উহা ধারণ করিতে তেমন আগ্রহ জন্মিল না। আমি উহা ঝোলায় ভরিয়া রাখিয়া দিলাম।

রঙ্গিলাবাবা।

আমরা চড়ায় আসিয়াছি পর, একটী সাধু প্রায়ই ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন। বেশভূষা দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত অনুমান করা শক্ত। মস্তকে তাঁহার জটা, ললাটে ভস্মমাখা, পরিধানে বহুরঙ্গের টুকরা বস্ত্র দ্বারা আল্‌খিল্লা, চেহারা বেঁটে, বর্ণ শ্যাম। পরিচয় না পাইয়া উহাকে আমরা 'রঙ্গিলা বাবা' বলিয়া ডাকি। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া তিনি কেবল হঠ যোগের কথা বলেন। বৈষ্ণবদের উপরে বোধ হয় তেমন প্রসন্ন নন। ঠাকুরকে তিনি বলিলেন—'তোমারা যো তিলক হ্যায় ওতো হামারা শিবজীকো টাট্টি হ্যায়। শিবজী উস্‌মে ঝারা ফির্‌তা হ্যায়। ঠাকুর তাঁহার কথা শুনিয়া ছল্‌ছল্‌ চক্ষে করযোড়ে বলিলেন—'তব তো হাম ধন্য হো গিয়া।' সাধু যখন আসেন, তখনই ঠাকুরকে অনর্গল উপদেশ করিতে থাকেন। ঠাকুরের মুখের একটি কথাও আমরা শুনিতে পাই না। এজন্য সকলেই সাধুর উপরে একটু বিরক্ত। ঠাকুর কোন কথা বলিতে আরম্ভ করিলে সাধু তাহাতে কান দেন না। ঠাকুরের কথায় বাধা দিয়া নিজের কথাই বলিতে থাকেন। এসব দেখিয়া সতীশ ভিতরে ভিতরে গরম হইয়া উঠিল। কতক্ষণে সাধু তাঁবুব বাহিরে যান, সতীশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ সময়ে ঠাকুর সতীশকে পায়খানার জল দিতে বলিলেন। সতীশ ঐ কার্য্যে যাইতেই সাধু উঠিয়া গেলেন। ঠাকুর শৌচে গেলেন। সতীশ আসিয়া সাধুকে তালাস করিতে লাগিল। রাস্তায় যাইয়াও একবার খুঁজিয়া আসিল। পরে আমাদিগকে বলিল—'আজ ওকে পেলে নিশ্চয় আমি ওর কানটি কামড়াইয়া ছিঁড়িতাম। ঠাকুরের কথায় যে বাধা দেয়, ঠাকুরের কথা যে

না শুনে, তার কান থাকায় লাভ কি ?' বোধ হয় সতীশের ভাব বুঝিয়াই ঠাকুর একটা কার্য্যের হুকুম দিয়া সতীশকে সরাইয়া নিলেন,—না হলে আজ পাগলা সতীশ নিশ্চয়ই একটা বিপদ্ ঘটাইত।

ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।

আজ বেলা প্রায় ১টার সময়ে একটী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকট আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখা মাত্র করযোড়ে অভিবাদন করিয়া ধুনির সম্মুখে বসাইলেন। ভদ্রলোকটির শরীরে ধর্ম্মের কোন প্রকার চিহ্ন নাই পরিষ্কার সাদা বস্ত্র ও জামা পরিধানে। মস্তকে সুন্দর সাদা বস্ত্রের পাগড়ী, শ্মশ্রু গোঁপ পক্ক। আকৃতি সুস্থ ও সুদীর্ঘ, বর্ণ গৌর। দেখিলে খুব তেজস্বী বলিয়া বোধ হয়। লোকটিকে বড়ই আপনার বলিয়া মনে হইল। একটি কথাও না বলিয়া, ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরের পানে পুনঃপুনঃ তাকাইতে লাগিলেন। ঠাকুরও নির্ব্বাক্ থাকিয়া ভদ্রলোকটির পানে দু'তিন বার চাহিলেন। ভদ্রলোকটি যতক্ষণ ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলেন, তাঁবুর একটী লোকও বাহিরে গেলেন না,—কারো বাহিরে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা-কাল ভদ্রলোকটি থাকিয়া, পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুরকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভদ্রলোকটি কে ? দেখ্‌তে বড় ভাল লাগ্‌লো।' ঠাকুর কহিলেন,—'ইনি সাধারণ লোক নন্! মহাপুরুষ ছদ্মবেশে এসেছিলেন। ইঁহার প্রভাব অসাধারণ।

আমি—ইনি তো একটী কথাও বল্‌লেন না ?

ঠাকুর—বল্‌বেন না কেন ? ঢের ব'লেছেন। মুখে কিছু বলেন নাই বটে,—দৃষ্টিতে ব'লেছেন।

ঠাকুর—এর কি কোন পরিচয় নাই ? ইনি কে ?

ঠাকুর—পরিচর যথেষ্ট আছে, তবে দশ জনের মধ্যে প্রকাশ হ'তে চান না। ইনি কর্ণেল অল্‌কটের গুরু—কৌথুম ঋষি।' ঠাকুরের নিকটে পরিচয় পাইয়া গুরুভ্রাতারা অনেকে অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু পাইলেন না।

শুনিলাম, ঠাকুর প্রয়াগ আসার পরে শ্রীমতী এনি বেসান্ত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পত্নী মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং মনোরমার অদ্ভূত সমাধি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। মনোরমাকে নাকি তিনি কৌথুমের ফটো দেখাইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে দর্শন করিবার খুব আকাঙ্ক্ষা মনোরমাকে জানাইয়াছিলেন। শুনিলাম,—'এনি বেসান্ত' সাধুদের সঙ্গে চড়ায় বাস করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ত্রিবেণী স্নানের অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চড়াবাসী সাধু-সন্ন্যাসীরা ঐ কথায় সম্মতি দেন নাই। ত্রিবেণীতে মকর-সংক্রান্তির স্নান কালে এনি বেসাণ্ট এ দেশীয় মেয়েদের মত সাড়ী পড়িয়া স্নান করিয়াছিলেন। শুনিয়া আনন্দ হইল।

রাসায়নিক সাধু।

আজ সন্ন্যাসীদের চত্তর পরিক্রমা করিয়া নানকসাহীদের চত্তরে আসিতে, বালির উপরে অনাবৃত-স্থানে একটী সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। সন্ন্যাসীর মস্তকে দীর্ঘ জটা, গায়ে আল্‌খিল্লা। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দূর হইতে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন না। ঠাকুর চত্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে যে সাধু-সন্ন্যাসীদের একটু বিশেষত্ব দেখেন, তাঁহারই নিকটে গিয়া বসেন ; কিন্তু এই সাধুকে দেখিয়া হাসিলেন অথচ তাহার নিকটে গেলেন না,—ইহার কারণ কি বুঝিলাম না। কয়েক পা ঠাকুরের সঙ্গে চলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'সাধুর কপাল তো অসাধারণ দেখিতেছি, এত বড় উন্নত ও প্রশস্ত ললাট তো জীবনে কারো দেখি নাই। ইনি কে ?' ঠাকুর বলিলেন,—এত বড় কপাল না হ'লে কি এত বড় ভাগ্য হয় ? এঁদের গোপনে থাকাই মঙ্গল—প্রকাশ হ'লে মিষ্টতা থাকে না।' ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই ভাবিলেন—'ঠাকুর যখন ইহাকে গোপনে রাখিতে চান, তখন নিশ্চয়ই ইনি মানসসরোবরের পরমহংসজী হইবেন—এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার হাতে ঠাকুরের কমণ্ডলু,—এই হাত কাহার পায়ে স্পর্শ করাইব, ভাবিয়া আমি তফাতেই রহিলাম। গুরুভ্রাতারা সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া আমাদের তাঁবুতে নিয়া চলিলেন। ঠাকুর তাঁবুতে না গিয়া বাহিরে বসিলেন। কুঞ্জ, সতীশ, ছোড়দাদা প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা সন্ন্যাসীর সেবায় লাগিয়া গেলেন। কেহ হাত কেহ পা টিপিতে লাগিলেন। যাঁহারা অঙ্গ সেবার সুযোগ পাইলেন না তাঁহারা ঘনাইয়া সন্ন্যাসীর গা ঘেঁসিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়া খুব খুসী হইলেন এবং বলিলেন—'আজ তোম লোকন্‌কো এক আচ্ছি চীজ্ দেখায়েঙ্গে।' এই বলিয়া একটি গুলির মত কি খাইলেন। সকলেই, পরমহংসজী বিশেষ কৃপা করিবেন মনে করিয়া, খুব উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী গুলি খাওয়ার পরে 'ঠাণ্ডা চীজ্ কুছ্ লিয়াও, দহি লিয়াও, মিঠাই লিয়াও'—বলিয়া এক একজনকে হুকুম করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতারাও 'আমার উপর পরমহংসজীর বিশেষ কৃপা হইল' মনে করিয়া সে সকল জিনিষ হাজির করিতে লাগিলেন। এগারটা হইল, ঠাকুর পায়খানায় গেলেন, সাধু ৫।৭ মিনিটের জন্য ছাউনী হইতে বাহিরে যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং সকলকে বলিলেন—'আজ নেহি হোগা, চীজ্ হজম নেহি হুয়া, ও তো গির গিয়া। কাল বস্তু খায়্‌কে হাম্ পেশাব করেঙ্গে, ওস্‌মে তামা ভিজায়কে আগমে ছোড় দেও—৫ মিনিট পিছু উঠায়কে দেখোগে পাক্কা স্বর্ণ হো যায়েগা। আভি হামকো একঠো পয়সা দেও। মুখ্‌মে রাখ্‌কে ও চীজ্ হাম দে দেতে। আগ্‌মে রাখ্‌নেসে ওভি আচ্ছা স্বর্ণ হো যায়েগা। এইছা স্বর্ণ বানায়কে হাম্ নিত্ দেয়েঙ্গে, তোম লোক বাজারমে যায়কে বিক্ দেও, আউর আচ্ছা কর্‌কে ভাণ্ডারা লাগাও। সাধু এই

বলিয়া একটী পয়সা মুখে রাখিয়া দিলেন। ঠাকুর শৌচান্তে আসনে আসিলেন। সাধু তখন পয়সাটি ধুনির আগুনে ফেলিতে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং ধুনির নিকটে গিয়া বসিলেন। ঠাকুর সাধুর ওখানে বসার হেতু কি, জিজ্ঞাসা করায় তিনি মুখের পয়সা ধুনিতে ফেলিয়া সোনা প্রস্তুত করিবেন বলায়, ঠাকুর তাহাকে খুব ধমক্ দিলেন এবং সাধুকে ছাউনী হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। বিধু অমনি সাধুকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—'ইনি রাসায়নিক বিদ্যায় পারদর্শী সাধু। শঙ্খিয়া খে'য়ে তাহা পিত্তের সঙ্গে মিলাবার প্রণালী জানেন। ওরূপ কর্‌লে সেই উদরস্থ পিত্তের এমন গুণ হয় যে উহা প্রস্রাব ক'রে তাতে তামা ভিজায়ে আগুনে ফেল্‌লেই সোনা হবে। তামাতে থুথু মিলায়ে তাহা অগ্নিতে পোড়ায়ে নিলেও উৎকৃষ্ট সোনা প্রস্তুত হয়। এই সাধুর ইচ্ছা ছিল তোমাদের কারোকে নিয়া এই বিদ্যা শিক্ষা দেন। এ বড় বিষম। এর ভিতরে গেলে জীবনে ধর্ম্মলাভ হয় না।'

যে সকল গুরুভ্রাতারা সন্ন্যাসীকে মানসসরোবরের পরমহংস ঠাওরাইয়াছিলেন, ঠাকুরের শেষ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইলেন। সারাদিন তাঁহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া কাটাইলাম।

অসাধারণ ক্ষ্যাপাচাঁদ।

ঠাকুরের সঙ্গে চড়াতে প্রথম যে দিন আসিয়াছিলাম, ঠাকুর এই ছাউনিতে প্রবেশ করিয়া বালির উপরে একটী সাধুকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ইনি অসাধারণ মহাপুরুষ। মস্তক হ'তে ইহার সূর্য্য রশ্মির ন্যায় শুভ্রছটা চতুর্দ্দিকে ছড়ায়ে পড়্‌ছে।" ইহার পর চড়াতে আসিয়া দেখিতেছি, এই সাধু একটি দিনও ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়ে অন্যত্র থাকে না। যতকাল ঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছি, বাহিরের লোক রাত্রিকালে ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতে কখনও দেখি নাই; কিন্তু এই সাধু একটি রাত্রিও ঠাকুরের কাছছাড়া হয়েন নাই ইহাতে ঠাকুরও কোন আপত্তি করিতেছেন না। ঠাকুর ইঁহাকে যেরূপ আদর যত্ন করেন, তাহাতে মনে হয় ইনি ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আমরা সকলে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত ইঁহার কোন পরিচয় পাইলাম না। অতি প্রাচীন মহাত্মা মহাপুরুষগণও কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন করিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহার থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। 'অন্তরের অবস্থা অন্তর্য্যামী জানেন; কিন্তু বাহিরে ইঁহার কোন একটা ধর্ম্মের চিহ্ন বা অনুষ্ঠান দেখিতেছি না। জটা, তিলক, মালা, বিভূতি কিছুই ইঁহার নাই। ধর্ম্মের কোন প্রকার অনুষ্ঠান না থাকিলেও, কারো কারো চেহারাতেই ধর্ম্ম জাজ্বল্যমান দেখা যায়। কিন্তু ইঁহার আকৃতি এমনই কদাকার যে নিতান্ত ইতর শ্রেণীর কুলি মজুর ছাড়া আর কিছুই মনে করা

যায় না। ইঁহার আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ কাল, শরীর অতিশয় দৃঢ়—পালোয়ানের মত মনে হয়। মস্তকে কাল চুল, গোঁপ শ্মশ্রুবর্জ্জিত, মুখশ্রী দেখিলে ৪০।৫০ বৎসরের অধিক অনুমান হয় না। লোকালয়ে থাকিতে হইলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকা চলে না, তাই একখানা ছেঁড়া কম্‌ফর্‌টারের টুক্‌রা দ্বারা কৌপীন করিয়া লইয়াছেন। সম্পত্তির মধ্যে একখানা পুরান মরিচাধরা লোহার কড়া। তাহাও কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন জানি না। তাহাতেই শৌচক্রিয়া জলপান আহারাদি সমস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু কখনও উহা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে দেখি নাই। গৃহত্যাগী সাধুসন্ন্যাসীদের বা পাহাড়বাসী মহাত্মাদেরও লোক সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার বিষয়ে একটা সাধারণ সংস্কার আছে, কিন্তু ইঁহার সে সকল সংস্কার কিছুই নাই। ঠাকুর ইঁহার বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন—"জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ।" বাস্তবিক আমরা তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইঁহার কোন আচার ব্যবহারে কারো কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ হয় না—বরং ভালই লাগে।

ঠাকুর ইঁহার সম্বন্ধে বলিলেন—"ইনি ত্রিকালজ্ঞ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, দেহমুক্ত মহাপুরুষ। আপন ইচ্ছানুসারে ব্যোমমার্গে সশরীরে যত্রতত্র বিচরণ করিতে পারেন। শুধু নিজে পারেন তা' নয়, আরো দু'টি লোক দু'হাতে ধরে নিয়ে শূন্যপথে যেতে পারেন। আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন, কাশী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানে ঘুরায়ে এনেছেন। প্রেমভক্তির দিক্ দিয়েও এর অবস্থা অসাধারণ, পঞ্চভাবের যে কোন ভাব ইচ্ছানুসারে বর্ত্তমান ক'রে সম্ভোগ কর্‌তে পারেন।" ইনি নানা প্রকার বিচিত্র ভাবে থাকেন বলিয়া ঠাকুর ইঁহার নাম ক্ষ্যাপাচাঁদ রাখিয়াছেন। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী এই সাতটী তীর্থে প্রতিদিন শেষরাত্রে স্নান করেন। নেতি, ধৌতি ইঁহার নিত্যকর্ম্ম। পেটের ভিতরের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া নিয়া জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলেন।

একদিন দেখিলাম,—"পোলের বরাবর বড় রাস্তার উপরে পুলিস সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটাছুটি করিতেছেন। ক্ষ্যাপাচাঁদ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া পড়িলেন এবং ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিলেন। সাহেব খুব বেগে ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু ক্ষ্যাপাচাঁদকে কিছুতেই পশ্চাতে ফেলিতে পারিলেন না। সাহেব দু'বার রাস্তার এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন—কিন্তু ক্ষ্যাপাচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে। সেই সময়ে দেখিলাম, ক্ষ্যাপাচাঁদের দৌড়ান এক অদ্ভুত কাণ্ড। দৌড়ালেই লোকের শরীর সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে, কিন্তু ক্ষ্যাপাচাঁদের তাহা নয়,—তাঁর শরীরটি ঠিক নিক্তির কাঁটার মত সোজা,—দৌড়াইবার সময়ে পা দু'টি সোজা উঠিতেছে—নামিতেছে মাত্র। ভূমিতে কখন সংস্পর্শ হইতেছে, কখনও বা হইতেছে না,—শূন্যে যেন বায়ুর উপর দিয়া দৌড়িয়া চলিতেছে। সাহেব ক্ষ্যাপাচাঁদের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া ঘোড়া অকস্মাৎ

থামাইলেন। ক্ষ্যাপাচাঁদ অমনি সাহেবের সম্মুখীন হইয়া ঘোড়া ও সাহেবকে হস্ত দ্বারা আরতি করিতে লাগিলেন। সাহেব দু'একটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ কি করিতেছে?' তাঁহারা বলিলেন—'সাহেব! তোমার ভিতরে পরমেশ্বরের শক্তির কার্য্য দেখিয়া তাহার মর্য্যাদা দিতেছেন।' সাহেব একটু সময় ক্ষ্যাপাচাঁদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, দু'হাতে সেলাম দিতে দিতে বলিলেন—'এ বড়া আচ্ছা মহাত্মা হ্যায়,—সাঁচ্চা সাধু হ্যায়! আরো ২।৩ দিন ক্ষ্যাপাচাঁদের অদ্ভুত কার্য্য দেখিলাম।—তাহা আর এখন লিখিবার অবসর ঘটিল না।

সারাদিন ক্ষ্যাপাচাঁদ যেখানেই থাকুন না কেন, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হন্ না। গুরুভ্রাতারা যতক্ষণ নিদ্রিত না হ'ন, ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের সম্মুখে ধুনির ধারে পড়িয়া থাকেন। সকলে নিদ্রিত হইলে ক্ষ্যাপাচাঁদ উঠিয়া বসেন। তখন ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের সামনাসামনি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া করযোড়ে কত কি বলিতে থাকেন। সংস্কৃত, হিন্দি ও বিবিধ অজানা ভাষায় ঠাকুরের স্তব-স্তুতি করিতে করিতে অধীর হইয়া পড়েন। আবার তখনই লাফাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল পঞ্চপ্রদীপের ন্যায় ঠাকুরের সম্মুখে ধরিয়া, "আহা! আহা" বলিতে বলিতে আরতি করিতে থাকেন। রাত্রি ১১টা হইতে ৩।টা পর্য্যন্ত ক্ষ্যাপাচাঁদ কখন নৃত্য, কখন ক্রন্দন, কখন বা ঠাকুরের স্তব-স্তুতি করিয়া অতিবাহিত করেন। দিনের বেলায়ও কখন কখন ক্ষ্যাপাচাঁদ বাহির হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া, ঠাকুরকে কত কি বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। একটু পরেই ক্ষ্যাপাচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে মাটিতে পড়িয়া যান। বৃশ্চিক দংশনে বালক যেমন পিতামাতার নিকট পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, ক্ষ্যাপাচাঁদও সেই প্রকার হাত-পা আছড়াইয়া মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। কাঁদিতে কাঁদিতে উঁহার চোখ, মুখ এবং শরীরের শিরা সমস্ত ফুলিয়া যায়, অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ও বুক ভাসিতে থাকে। ক্ষ্যাপাচাঁদের এ অবস্থা দেখিয়া আমরাও অস্থির হইয়া পড়ি,—চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারি না। জানি না কেন ঠাকুর উঁহার ক্রন্দনে অনেক সময় ভ্রূক্ষেপই করেন না। তিনি কোন প্রকার ব্যস্ততা প্রকাশ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। কখন বা দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে নাড়িয়া ক্ষ্যাপাচাঁদকে স্থির হইতে বলেন। তখন ধীরে ধীরে ক্ষ্যাপাচাঁদ স্থির হইয়া পড়েন। ১৫।২০ মিনিট পরেই ক্ষ্যাপাচাঁদ আবার লাফাইয়া উঠেন, এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঠাকুরের আরতি করিতে করিতে নৃত্য করিয়া দোঁহা পড়িতে থাকেন—ঠাকুরকে ভগবানের লীলা শুনাইতে আরম্ভ করেন। 'তাতা ধাইয়া, তাতা ধাইয়া, তাতা ধাইয়া, ধাইয়া, বৃন্দাবনমে বংশী বাজে নাচে কিষণ কানহাইয়া।'—এই প্রকার দোঁহা পড়িয়া, শেষকালে 'কহে অর্জ্জুনা শোন ভাই সাধু'—বলিয়া প্রত্যেকটি দোঁহা সমাপন করেন। এই সকল দোঁহা পাঠকালে ক্ষ্যাপাচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেন বলিয়া অনুমান করি,—কারণ, একটি দোঁহা দু'বার বলিতে পারেন না। প্রত্যহ ১৫।২০টি দোঁহা পড়িয়া থাকেন—প্রত্যেকটি নূতন রকমের। দোঁহার শেষ ভাগে 'কহে অর্জ্জুনা শোন ভাই সাধু'—থাকে বলিয়া আমরা ক্ষ্যাপাচাঁদের নাম 'অর্জ্জুনদাস' ঠিক করিয়া

রাখিয়াছি। শাস্ত্র, পুরাণ ও উপনিষদাদিতে ক্ষ্যাপাচাঁদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ। কেহ কোন শাস্ত্রের একটি মাত্র চরণ পাঠ করিলে ক্ষ্যাপাচাঁদ উহার পূর্ব্বাপর ১০।১৫টি চরণ অনায়াসে পাঠ করিয়া যান। ক্ষ্যাপাচাঁদের বিষয়ে কোন কথা লিখিয়াই প্রাণে তৃপ্তি হয় না,—মনে হয় কিছু লেখা হইল না। ক্ষ্যাপাচাঁদ যে কে, কতকালের লোক,—কিছুই জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন কালের কোন মুনি-ঋষি বলিয়া অনুমান হয়। ক্ষ্যাপাচাঁদ বলেন—'আজকাল যো কুছ্ তাজ্জব্ আপলোক্ দেখ্‌তা হ্যায়—হামারা রামরাজ্‌মে ওসব হাম দেখা হ্যায়। রেলগাড়ী দেখা হ্যায়, হাওয়া যান দেখা হ্যায়, হাস্‌পাতাল দেখা হ্যায়, রাস্তা ইছ্‌ছেভি আচ্ছা দেখা। আউর যো সব দেখা—আংরেজ রাজমে আব্‌তক্ ওসব নেহি দেখ্ পাত্তা।'

গত কল্য রাত্রি প্রায় ২টার সময়ে ক্ষ্যাপাচাঁদ আকুল হইয়া ঠাকুরের নিকট কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে আমার বুক "দুর দুর" করিতে লাগিল। ক্ষ্যাপাচাঁদ এক সময় কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে বলিলেন—'আহা! মেরা রামজী হো! তোমার লিয়ে হাম ত্রেতা যুগ্‌সে পড়া রহা হ্যায়,—তিন যুগ হামারা গুজাড়্ গিয়া! আব্‌তো কৃপা কর্‌কে তু হামকো সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া, আব হামকো কৃপা কর্।—আব হামকো তোহার করলে!' ইত্যাদি—ক্ষ্যাপাচাঁদের এই কথা কয়টি শুনিয়া আমি একেবারে চম্‌কিয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম, ত্রেতা যুগ হইতে ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের যে কৃপালাভের জন্য পড়িয়া আছেন,—সেই কৃপা কি? যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিদেহ মহাপুরুষ,—তাঁর আর অভাব কি? কি বস্তু পাওয়ার আশায় ক্ষ্যাপাচাঁদ প্রত্যহ ঠাকুরের নিকট এত ব্যাকুলভাবে কান্নাকাটি করিতেছেন? মনে হয় জীব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকারী হইলেও ভগবৎপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি হয় না; কারণ তাঁহাদেরও আবার পুনরাবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। গীতায় আছে 'আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন। মামুপেত্যতুকৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥' তাই মনে হয়, ভগবানের নিত্য সঙ্গলাভের জন্যই ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের কৃপাভিক্ষা করিতেছেন। *

কালীকম্বলীবাবা: ছোটদাদার জন্য কাঠিয়া বাবার নিকট ঠাকুরের প্রার্থনা: ঠাকুরের অসাধারণ সহানুভূতি।

আজ ঠাকুর চা সেবার পর সাধুদের একটি চত্তরে পরিক্রমা করিয়া গঙ্গাতীরে কালীকম্বলীবাবার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি আদর করিয়া ঠাকুরকে বসিতে আসন দিলেন। কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু বলিলেন না, নীরবে থাকিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারীকে দেখিতে ২৫।২৬

---

* ইহার পরে ক্ষ্যাপাচাঁদ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।—এ পর্য্যন্ত আর তাঁর খোঁজ পাই নাই।'

বৎসর অনুমান হয়; কিন্তু বয়সে ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। ১২ শত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিলাম। কায়াকল্প করাতে দেহ একই ভাবে রহিয়াছে। হিমালয়ের অতি নিভৃত স্থলে, বদরিকাশ্রম হইতে বহুদূরে বরফান প্রদেশে ইঁহার অবস্থিতি। নীচে যখন আসেন বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি ইঁহাকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রণামী দেন। তাহা দ্বারা ইনি দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুত করান, ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন এবং বিবিধ লোকহিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন। নিজের কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। সামান্য একখানা কাল কম্বল মাত্র গাত্রাবরণ রহিয়াছে। অনেক সময় মৌনই থাকেন। বাবাজীকে দেখিয়া আমরা সকলেই খুব আনন্দলাভ করিলাম।

তাঁবুতে আসিবার সময়ে ঠাকুর রামদাস কাঠিয়াবাবার নিকট কিছুক্ষণ বসিলেন। কাঠিয়াবাবার নিকটে যাইয়াই ঠাকুর ছোড়দাদাকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইনি নকরি পেয়েছেন—শীঘ্রই জামালপুর যাবেন। আপনি এঁকে আশীর্ব্বাদ করুন!—এঁর উপার্জ্জিত অর্থ যেন সাধুসেবায় ব্যয় হয়।" কাঠিয়াবাবা খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে ছোড়দাদার দিকে চাহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বেলা প্রায় ১১টার সময়ে আমরা তাঁবুতে ফিরিলাম। গুরুভ্রাতা কেহ সাধু দর্শনে, কেহ স্নানে, কেহ কেহ বা অন্য প্রয়োজনে বাহির হইয়া গেলেন। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"কি ব্রহ্মচারী, কবচ্‌টি তুমি ধারণ কর্‌লে না? মহাপুরুষ প্রদত্ত বস্তু এম্‌নি ফেলে রাখ্‌লে? কত সাধ্য সাধনা ক'রে ওসব অবস্থা লোকের লাভ হয় না। উহা ধারণ করা মাত্র কার্য্য আরম্ভ হয়!—ধারণ ক'রছ না কেন?"—ঠাকুরের কথা শুনিয়া কোন কথাই আমার বাহির হইল না। একটু পরে ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলাম, তামার মাদুলীতে উহা ধারণ করার ব্যবস্থা। এখানে মাদুলী কোথায় পাইব?—সহরে গিয়া যা' হয় ক'রব। ঠাকুর আমার পানে একটু সময় চাহিয়া রহিলেন,—আর কিছুই বলিলেন না। কবচ ধারণ সম্বন্ধে আমার ভিতরে নানা ভাব উপস্থিত হওয়ায়, ভিতরটি তোল্‌পাড়্ করিয়া তুলিল। আমি ঠাকুরের নিকটে না বসিয়া, বাহিরে চলিয়া গেলাম। কল্য ছোড়দাদা জামালপুর কার্য্যস্থলে চলিয়া যাইবেন। পণ্ডিত মহাশয় এবং অশ্বিনীও কলিকাতা যাইবেন, শুনিলাম। অনেক গুরুভ্রাতারাই মেলাভঙ্গের পূর্ব্বে মেলাস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছেন। আজ একদল আমেরিকাবাসী ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসী-মহাপুরুষদের ফটো নিতে চড়ায় আসিয়াছেন। অনেক সাধু-মহাত্মার ফটো লইয়া তাঁহারা ঠাকুরের ফটো তুলিতে আমাদের তাঁবুতে আসিতেছেন, শুনিলাম। শুনিয়াই ঠাকুর পায়খানায় চলিয়া গেলেন।—বিধুকে বলিয়া গেলেন—"এখানে সাধুর অনুসন্ধান ক'রে ফটো নিতে চাইলে, ব্রহ্মচারীকে দাঁড় করিয়ে দিও।" আমি বড় লজ্জিত হইলাম।

আজ সকালবেলা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘনঘটার মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জনে চড়াবাসী সাধুদের আতঙ্ক

উপস্থিত হইল। শীতে আজ তাঁবু হইতে বাহির হইতে পারিলাম না। ঠাকুর ফ্লানেলের আল্‌খিল্লা গায়ে দিয়া, প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে বসিয়া আছেন। মোটা একখানা কম্বলও মুড়ি দিয়াছেন। ইহাতেও ঠাকুরের শীত নিবারণ হইতেছে না,—'ঠক্ ঠক্' করিয়া কাঁপিতেছেন। একজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি এত কাঁপিতেছেন কেন?—আপনার কি জ্বর হইল?' ঠাকুর কোন কথা না বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বালির উপরে এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং নিজের গায়ের কম্বলখানা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন—"ওকে এখানা দিয়ে এসো।" বিধু ঘোষ কোন গুরুভ্রাতার একখানা কম্বল নিয়া লোকটির গায়ে জড়াইয়া দিয়া আসিলেন। সাধু অনাবৃত শরীরে বালির উপরে শীতে অবসাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কম্বল পাইয়া তাহার শীত নিবারণ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরেরও কাঁপুনি থামিল। কোন ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেখা মাত্র তাহার সমস্ত কষ্ট আপন শরীরে অনুভব করা, এ যে কি অসাধারণ দয়া তাহা কল্পনায়ও আসে না। এরূপ পরমদয়াল ঠাকুরের সঙ্গ আমরা পাইয়াছি,—আমাদের মত ভাগ্যবান্ সংসারে আর কে আছে? ধন্য দয়াল ঠাকুর! তোমার এই দয়াই আমাদের একমাত্র ভরসা।

এই কুম্ভমেলার প্রারম্ভ হইতেই বহু ব্যবসাদার মাড়োয়াড়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ লক্ষ লক্ষ টাকার কম্বল, তুলার জামা, শীতবস্ত্র ও জলপাত্র প্রভৃতি বড় বড় সন্ন্যাসী মহান্তদের নিকট বিতরণের জন্য আনিয়া দিতেছেন। মহান্তেরা সেই সকল বস্তু আপন ছাউনিতেই সাধারণতঃ বিলাইয়া থাকেন। অতিরিক্ত থাকিলে অপরদের দেন। কিছুদিন যাবৎ ঠাকুরের নিকটও এইপ্রকার গাঁঠ্‌রি গাঁঠ্‌রি কম্বল, জামা আসিয়া পড়িতেছে। ঠাকুর সে সকল বস্তু আসা মাত্র রামদাস কাঠিয়াবাবা, গম্ভীরনাথজী প্রভৃতির নিকট এবং গরীব সাধুদের মণ্ডলীতে পাঠাইয়া দিতেছেন। নিজ হাতে দান করিবার জন্য কিছুই রাখিতেছেন না। ঠাকুরের এই প্রকার কার্য্যে চড়াবাসীদের ভিতরে সর্ব্বত্র ঠাকুরের নাম মহাদাতা বলিয়া প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমাদের ছাউনিতেও প্রার্থীদের যাতায়াতের বিরাম নাই। ভাণ্ডারাতে যতক্ষণ খাবার সামগ্রী, লাক্‌রি, জলপাত্র থাকে—ততক্ষণ প্রার্থীদের দেওয়া হয়। না থাকিলেই মুস্কিল—নাই, তাহা প্রার্থীরা বুঝে না।

বাসনাহীন সাধুর ঠাকুরের হস্তে দানপ্রাপ্তির জেদ।

আজ একটি পবিত্র মূর্ত্তি সন্ন্যাসী আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—'স্বামীজী! আমার প্রয়োজন, আমাকে কৃপা ক'রে ১২টি টাকা দিন।' ঠাকুর মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'টাকা আছে কি না।' তিনি বলিলেন—'এক পয়সাও নাই।' ঠাকুর সন্ন্যাসীকে বলিলেন—"আজ কিছুই নাই।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আপনার কি আছে না আছে তা জেনে আমি টাকা চাই নাই। আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই, এই জানি!—আপনি ইচ্ছা ক'র্‌লেই দিতে পারেন।"

ঠাকুর—"আপনার প্রারব্ধে নাই, আমি কিরূপে দিব?"

সন্ন্যাসী—'আমার প্রারব্ধ? আপনার দর্শন পেয়েছি, এখনও আমার প্রারব্ধ? বেশ, তাহলে বলুন, আপনার দর্শনেও আমার প্রারব্ধ ক্ষয় হয় নাই—আমি চলে যাই।' ঠাকুর অমনি মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—"কারো নিকট হতে ধার ক'রে ইনি যা চান দিয়ে দিন।"

সন্ন্যাসীকে ধার করিয়া টাকা দেওয়া হইল। সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন পরে সতীশ ঠাকুরকে বলিলেন—'ইনি সন্ন্যাসী, অথচ অর্থে তো খুব আসক্তি দেখ্‌লাম।'

ঠাকুর বলিলেন—"ইহার মধ্যে বাসনার লেশমাত্র নাই।—ইনি বাসনা কামনার অনেক উপরে। তবে যে টাকার জন্য আব্‌দার কর্‌লেন—সাধুর নিকট সাধু এরূপ করে থাকেন।" সতীশ ইহার বয়সের কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর তাহাতে বলিলেন—"বয়স অনেক।"

সতীশ বলিল—'৪০।৫০ হইবে।' ঠাকুর বলিলেন—"আরো বেশী।"

সতীশ বলিল—'৮০।৯০ হবে?' ঠাকুর বলিলেন—"আরো বেশী।"

সতীশ বলিল—'তবে ইহাকে এত অল্প বয়স দেখায় কেন? ২০।২৫ বৎসরের অধিক কিছুতেই তো মনে হয় না।'

ঠাকুর—"ইনি ২০।২২ বৎসর বয়সে ঊর্দ্ধরেতা হ'য়েছিলেন; সেইজন্য অল্পবয়স্ক দেখায়। সাধক যে বয়সে ঊর্দ্ধরেতা হন, শরীর বরাবর সেইরূপ থাকে—ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না।" ঠাকুরের কথায় বুঝিলাম—টাকা পয়সার প্রয়োজন ইহার কিছুই নাই। ঠাকুরের হাতে কিছু পাওয়াই যেন ইঁহার ভিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই আব্‌দার করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া নিয়া গেলেন। ঠাকুরের হাতে দান পাইয়াই যেন সন্ন্যাসী কৃতার্থ।

মহাপুরুষদের বিচরণ-কাল ঃ প্রকৃতি পূজা।

আজ অপরাহ্ণে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের চত্তর ঘুরিয়া বহু ভৈরব-ভৈরবী ঠাকুরের সঙ্গে দর্শন করিয়া আসিলাম। রাত্রে ঠাকুর নিজ হইতে অনেক উপদেশ করিতে লাগিলেন। রাত্রি ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত জাগিয়া নাম করিতে ঠাকুর প্রায় প্রতিদিন বলিতেছেন। প্রতিদিনই চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ঠিকমত একটি দিনও পারিলাম না। আজ ঠাকুর বলিলেন—"তোমরা সারা দিন রাত নাম নাই কর্‌লে, কেবলমাত্র রাত্রি ১টা হ'তে ৩টা ৪টা পর্য্যন্ত যদি নাম

কর্‌তে পার, তা হ'লেও বুঝতে পার এই সাধনের ভিতরে কি আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'রাত্রিতে ঐ সময়টি যেমন মহাপুরুষদের ও ঋষি-মুনিদের বিচরণের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, দিনের বেলায় কি সেইরূপ একটা শুভক্ষণ নাই ?'

ঠাকুর বলিলেন—"দিবাতেও আছে। ১ দণ্ড সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব সময়,—এক প্রহর বেলার পর ১ দণ্ডকাল। আড়াই প্রহরের পর ১ দণ্ড, এবং সূর্য্যাস্তের সময় এক দণ্ড। এই কয়টি সময়ও ঐরূপ ভজন-সাধনের শুভক্ষণ।"

এই সকল কথার পর তান্ত্রিক সাধক ও ভৈরব ভৈরবীদের সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। ঠাকুর কহিলেন—"যুবতী স্ত্রীলোককে উলঙ্গ ক'রে সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক স্ত্রী চিহ্নে ইষ্টদেব বা ভগবতীকে আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ক'রে মাতৃজ্ঞানে পূজা কর্‌তে হয়। এইরূপ পূজার সময় কামভাব আস্‌লে অপরাধ হয়। এজন্য এরূপ স্ত্রীলোককে সাধকেরা বিবাহ ক'রে নেন। বিবাহ ক'রে নিলে ঐ অপরাধ হয় না। ঐ স্থানে ভগবতী ভেবে মাতৃবোধে মতি স্থির ক'রে যাঁরা পূজা কর্‌তে পারেন, তাঁরা সাধারণ নন্‌। তাঁরা নিয়ম মত এই পূজা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে জিতকাম হন। স্ত্রীলোক দর্শন কর্‌লে তাঁদের কামভাব আর হয় না। ঐ যোনি হ'তেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে ভেবে, তাঁরা উহাতে ভগবতীর পূজা করেন।"

আমি—'আমাদের সাধনে এরূপ স্ত্রীলোক নিয়ে পূজা আছে কি ?'

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব আছে। তোমরা সাধন কর না! কর্‌লেই জান্‌তে পার। কত কাণ্ড আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমাদের পথে স্ত্রীলোক পূজা কখন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"নাম কর্‌তে কর্‌তে যখন এক একটি চক্র ভেদ হয়, তখন ঐ চক্রের মধ্যে পদ্ম প্রকাশিত হয়। ঐ পদ্মের ভিতরে এক একটি কুটীর আছে। ঐ কুটীরের প্রবেশের দ্বারে পরম রূপলাবণ্যময়ী এক একটি দেবী থাকেন। কুটীরের দ্বারে থেকে তাঁরা প্রবেশে বাধা দিয়ে বলেন, আমার সহিত রমণ কর। তা'হলে ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে দিব। এই ব'লে ঐ দেবীরা নানা রকম হাবভাব দ্বারা পরীক্ষা ক'রে থাকেন। যদি তাঁদের ঐ সকল ভাবভঙ্গীতে ভুলে তাঁদের সহিত রমণ করে, তবেই সে সেখানে বদ্ধ হ'য়ে পড়ে। আর যদি ঐ দেবীর হাব ভাবে না ভু'লে, নানারূপে তাঁকে স্তব-স্তুতি ক'রে বলেন, 'মা, আমাকে তুমি দয়া কর, যাতে আমার প্রকৃত কল্যাণ হয়, প্রেম-ভক্তি হয়, আশীর্ব্বাদ কর।' এইরূপ বল্‌লেই তিনি পথ

ছেড়ে দেন। এই প্রকার এক চক্র ভেদ হ'লে অন্য চক্রে আবার ঐরূপ আরো সুন্দরী দেবী এসে আরো কঠিন পরীক্ষা করেন। এই প্রকার ক্রমে পরমাসুন্দরী দেবী সকল প্রকাশ হ'য়ে নানারূপ পরীক্ষা কর্‌তে থাকেন। সকলকেই পূজা ভক্তি নমস্কার ক'রে আশীর্ব্বাদ নিয়ে, এক একটির ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে হয়। এ সব প্রলোভন অতিক্রম করা বড় সহজ নয়, একমাত্র গুরুর কৃপায়ই হয়।"

আমি—'এই প্রকার দেবীদের প্রলোভন কতদূর? চক্র কয়টি? সকল চক্রের দ্বারেই কি এই প্রকার প্রলোভন আছে?'

ঠাকুর বলিলেন—"সকল চক্রের দ্বারেই এইরূপ প্রলোভন আছে। চক্র ৭২ হাজার। ইহার মধ্যে দশটি প্রধান। এই দশটি ভেদ ক'রে যেতে পার্‌লে একরূপ জীবনের কাজ হয়ে যায়। ৭২ হাজার চক্র এক জীবনে ভেদ করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই হয়।"

আমি—'এ সকল চক্র ভেদ না ক'রে কি ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না? সকলকেই কি এসব চক্র ভেদ কর্‌তে হবে?'

ঠাকুর বলিলেন—"যাঁরা প্রণালী মত রাস্তা ধরে চলেন, তাঁদেরই পথে ঐ সকল পড়ে। যাঁরা ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করেন, তাঁকে পাইতে চান, তাঁদের এ সব প্রলোভনে পড়্‌তে হয় না। ভগবান্‌কে লাভ ক'রে এ সকল তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু কৃপায় যাঁরা পার হন, ভগবান্ তাঁদেরও নানা অবস্থায় ফেলে পাকা করে নেন।"

ঠাকুরের কমলে-কামিনী দর্শন ঃ মৌনীবাবার চিঠি ঃ ঠাকুরের উত্তর ঃ মৌনীবাবার দীক্ষা-প্রার্থনা ও লাভ।

অদ্য প্রাতে ঠাকুরের চা-সেবার পর একটি শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি জটাধারী সন্ন্যাসী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণামপূর্ব্বক ধুনির পাশে বসিলেন; এবং ঠাকুরের হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিলেন, 'এই পত্রখানা মৌনীবাবা আপনাকে দিয়াছেন।' মৌনীবাবা কেমন আছেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায়, সন্ন্যাসী বলিলেন—'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে তাঁর কুম্ভমেলায় আস্‌বার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন তিনি পীড়িত হ'য়ে পড়াতে আস্‌তে পার্‌লেন না। তিনি বড়ই মহাত্মা। ওরূপ মহাত্মা কখনও আমি দেখি নাই। তিনি আহার ত্যাগ ক'রেছেন, নিদ্রা জয় ক'রেছেন, একাসনে দিনরাত একভাবে ব'সে থাকেন, ইঙ্গিতেও কারো সঙ্গে আলাপ করেন না। সর্ব্বদা ধ্যানে মগ্ন। বোধ হয় অধিক দিন আর দেহ রাখ্‌বেন না।' সন্ন্যাসী এই প্রকার অনেক কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মৌনীবাবার

পত্রখানা নিজে পড়িলেন। তিনি চারখানা টুক্‌রা টুক্‌রা কাগজে পত্রখানা লেখা থাকায় পড়িতে অনেক সময় লাগিল। পড়ার পরে ঠাকুর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া আমার নিকট দিয়া বলিলেন—"চিঠিখানা যত্ন ক'রে রেখে দেও—পরে কাজে লাগ্‌বে।" আমি ওমনি উহা ঝোলার ভিতরে রাখিয়া দিলাম।

ঠাকুর মৌনীবাবার অনেক প্রশংসা করিলেন।—ঠাকুরের কথায় জানিলাম— মৌনীবাবা সাধারণ লোক নন্‌। প্রচারক অবস্থায় ঠাকুর যখন হিজ্‌লী কাঁথিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী সত্যনিষ্ঠ পরমোৎসাহী যুবক প্যারীলাল ঘোষ মহাশয়ও ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন। একদিন ঠাকুর ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বৃহৎ জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন অসংখ্য লাল পদ্ম জলাশয়ের সর্ব্বত্র প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর অনিমেষনয়নে পদ্মের দিকে চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে অনতিদূরে জলাশয়ের ভিতরে ঠাকুর কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন এবং ঐ পদ্মটিকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সাঁতার কাটিয়া পদ্মটিকে যেমন ধরিলেন, অমনি ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান বিলোপ হইল। বলিষ্ঠ প্যারীবাবু এই অবস্থা দেখিয়া জলে লাফাইয়া পড়িলেন এবং ঠাকুরকে ধরিয়া টানিয়া পাড়ে তুলিলেন। ঠাকুর তখন সংজ্ঞাশূন্য। প্যারীবাবুর ভিতরে তখন কি এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল,—তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে উভয়েরই চৈতন্যলাভ হইল। পদ্মটি ঠাকুরের মুঠোর ভিতরেই ছিল। তাহা লইয়া তিনি বাসায় আসিলেন। *

ইহার কিছুকাল পরেই প্যারীবাবুর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভগবানের দর্শনলাভ আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে না থাকিলে কঠোর তপস্যা হইবে না এবং ভগবানের উপাসনাও প্রাণ ভরিয়া করিতে পারিবেন না বুঝিয়া, আজ ৭.৮ বৎসর যাবৎ তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়াছেন। অনেক পাহাড় পর্ব্বতে তীব্র সাধন-ভজন করিয়া উপস্থিত নর্ম্মদা তীরে ওঁকারনাথে আছেন। গত ফাল্গুন মাসে প্যারীবাবু গেণ্ডারিয়াতে ঠাকুরকে একখানা পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—'নির্জ্জন পাহাড়-পর্ব্বতে এতকাল সাধন-ভজন, তপস্যা করিয়া কাটাইলাম। তাহাতে অনেকটা উপকার পাইয়াছি। আমি মৌন হইয়াছি; আহারের পরিমাণ—সারাদিনে আধপোয়া দুধ, নিদ্রা জয় হইয়াছে; ২৪ ঘণ্টা একাসনে বসিয়া থাকি। দয়া করিয়া শঙ্কর সময় সময় আমাকে দর্শন দেন। ব্যাসদেবও কখন কখন আসিয়া উপদেশ করেন। এসব তো হইল, কিন্তু যেজন্য আসিলাম তাহা কোথায়?—তাহার কোন সন্ধানই তো পাইলাম না। সকলেই বলেন,—সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেও, না হ'লে আর এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কি উপায়ে পিতার দর্শন পাইব, কৃপা করিয়া তাহা আমাকে আপনি উপদেশ করুন।

---

* এই পদ্মটি পুরীধামে ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্তুর সহিত তাঁহার ঝোলায় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

আমার এখন ব্রহ্মদর্শন হয় নাই।'—প্যারীবাবুর পত্র পড়িয়া ঠাকুর অমনি স্বহস্তে লিখিয়া উত্তর দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত চিঠি,—যথা—"বাহিরে ধর্ম্মলাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার জন্মে না। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু, বনে বনে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া কাঁদিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন পাইলেন না। ঈশা জন্ দি ব্যাপটিষ্টের নিকট দীক্ষিত; চৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন হয় না।

আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনী হবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে, উহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। যদি ব্রহ্ম-দর্শন করিতে চান, তবে অন্তরের সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার দূর করুন।

কি সত্য, কি অসত্য, তাহা আপনি জানেন না। এখনও পূর্ব্ব শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে। ব্রহ্ম-দর্শনে যখন প্রকৃত জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, তখন এক একটি সত্য জানিতে পারিবেন। গুরুকরণ করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই দর্শন পাওয়া যায়।

অন্তরে যে বাসনা আছে, তাহা পাইবেন; ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্ম্ম-প্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিবেন না। যতক্ষন নিজের ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম-সহবাস অনেক দূর। আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করিতে পারে, আপনি তাহা করিয়াছেন। এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ভগবান্ সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্য-জগতে কোন কার্য্য যেমন অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না, ব্রহ্ম-দর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি, এজন্য এত লিখিলাম।"

এই চিঠি লিখিবার পর ঠাকুর মৌনীবাবার আর কোন খবর পান্ নাই। সম্প্রতি মৌনীবাবার যে পত্রখানা আসিয়াছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য ছবি করাইয়াও এই স্থানে দেওয়া গেল,—

মৌনীবাবার পত্র।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

পূজনীয় দেব! আমি আপনার বাহিরের বাঁধা-বাঁধি অথবা আঁটা-আঁটি শিষ্য নহি, কিন্তু ভিতরে আপনার সহিত আমার কি প্রকার যোগ তাহা অন্তর্য্যামীপুরুষ জানেন এবং আপনিও জানেন, যেহেতু আমি স্পষ্ট তাঁহার প্রদত্ত-জ্ঞান দ্বারা জানিতেছি যে, আপনি তাঁহার সহিত এক অর্থাৎ তিনিই আপনার অন্তরাত্মা। সেই পরাৎপর পরমাত্মাই আপনার এবং আমার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি। যেহেতু দয়াময় হরি অতিশয় দয়া করিয়া কঠিন আঘাতে আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যিনিই যত বড় না হউন কেন, তিনি ভিন্ন মানুষের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি আর দ্বিতীয় নাই। আমার বিশ্বাস যে আপনি যদিও সমস্ত জানেন, তথাপি আমি অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আমার মনের সন্তোষের জন্য আপনাকে লিখিতেছি, বাহিরের শিষ্য না হইলাম তাহাতে ক্ষতি নাই, ভিতরের বন্ধন ছিন্ন করেন এরূপ শক্তি আপনারও নাই আমারও নাই। ইহলোকে না হয় পরলোকে দেখা দিতেই হবে। আমার বিষয় শুনুন :—আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া যখন অনসূয়া মায়ের আশ্রমে বাস করিতেছিলাম, সেই সময়ে একদিন—একদিন কেন অনেকদিন, হৃদয়ের শূন্যতা এবং কুৎসিত, কদাকার আত্মার আক্রমণে আমি যে বস্তু যে প্রকার, তাহাকে সে প্রকার পর্য্যন্তও দেখিতে পারিতাম না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সকলই অশ্লীলতাতে পরিপূর্ণ। যাহা কিছু দেখি, শুনি বলি সকলই অশ্লীল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনায় বসি। অশ্লীল চেহারা সকল আমার চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়ায়; সম্পূর্ণরূপে অনাথের নাথ দীনবন্ধু ভিন্ন আমার এই সঙ্কটের সময় আর কেহই ছিল না, এবং আজ পর্য্যন্তও তাঁহার দ্বারা প্রেরিত লোক ভিন্ন, এই নির্জ্জন বনে তিনি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল কাঁদিতে কাঁদিতেই দিন অতিবাহিত হইতেছে। পিতার বড় কৃপা, তাই আমি বাঁচিয়া আছি। এই সময়ে আমি পিতার চরণে পড়িয়া যে কাঁদিব, এরূপ অবস্থাও আমার ছিল না। একদিন যখন আশ্রমের সমস্ত লোক আনন্দিত, আমি নদীতীরের একখণ্ড প্রস্তরের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে 'আমি কতকগুলি অশ্লীল ভাবপূর্ণ পাঞ্চভৌতিক শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহি! তাহার পর একদিন প্রার্থনা করিতে পারিলাম। প্রার্থনার পর উঠিয়া যে দাঁড়াইয়াছিলাম, অমনি সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যহীন হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিলাম, কতক্ষণ এই অবস্থায় পিতা রাখিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। এই দিন হইতেই আমি জানিতে আরম্ভ করিলাম যে আমি কিছুই নই। তিনিই সমস্ত। এরূপ দিন গিয়াছে যে, কে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, আমি যখন পিতার নাম করিতে গিয়াছি, আমাকে অশ্লীল ভাষা বলাইয়াছে; আমি কাঁদিতে গিয়াছি, আমার হৃদয়ে বসিয়া বিকট হাসি হাসিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে পিতা যে আমাকে কতই করুণা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। চিত্রকুটে যখন পীড়িতাবস্থায় ছিলাম, তখন যে পিতাকে কতবার কতভাবে দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। পিতার করুণার কথা আর কি বলিব? আপনি সকলই জানিতেছেন। এখন বর্ত্তমানে তিনি আমাকে এই অবস্থায় আনিয়াছেন। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন, পিতারই জ্ঞান, প্রেম এবং শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নই। তিনিই আমার সম্পূর্ণ রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, বিধানকর্ত্তা, শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা; এক কথায় তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; এই জ্ঞানে সম্পূর্ণ দৃঢ়তর করিয়াছেন, এবং প্রতিদিনের ঘটনার দ্বারা জানাইতেছেন। আমার ফলাকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করিয়াছেন। তিনি নিজে অতি সুরম্য স্থান করিতেছেন, আমার জন্য তপস্যা-স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তিনি নিজে প্রত্যহ আমার জন্য আধসের দুধ এবং আধপোয়া চিনি আমার স্থূল শরীর রক্ষার্থে প্রেরণ করেন এবং এই আহারই আমার পক্ষে উপযুক্ত করিয়াছেন। আমার হৃদয়ের অপবিত্রতা দিন দিনই অপসারিত করিতেছেন। আমার নিদ্রা প্রায় পূর্ণরূপেই হরণ করিয়াছেন। চঞ্চল মনকেও ঠিক করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বদ্ধ পদ্মাসন আমার আসন করিয়া দিয়াছেন। আমার

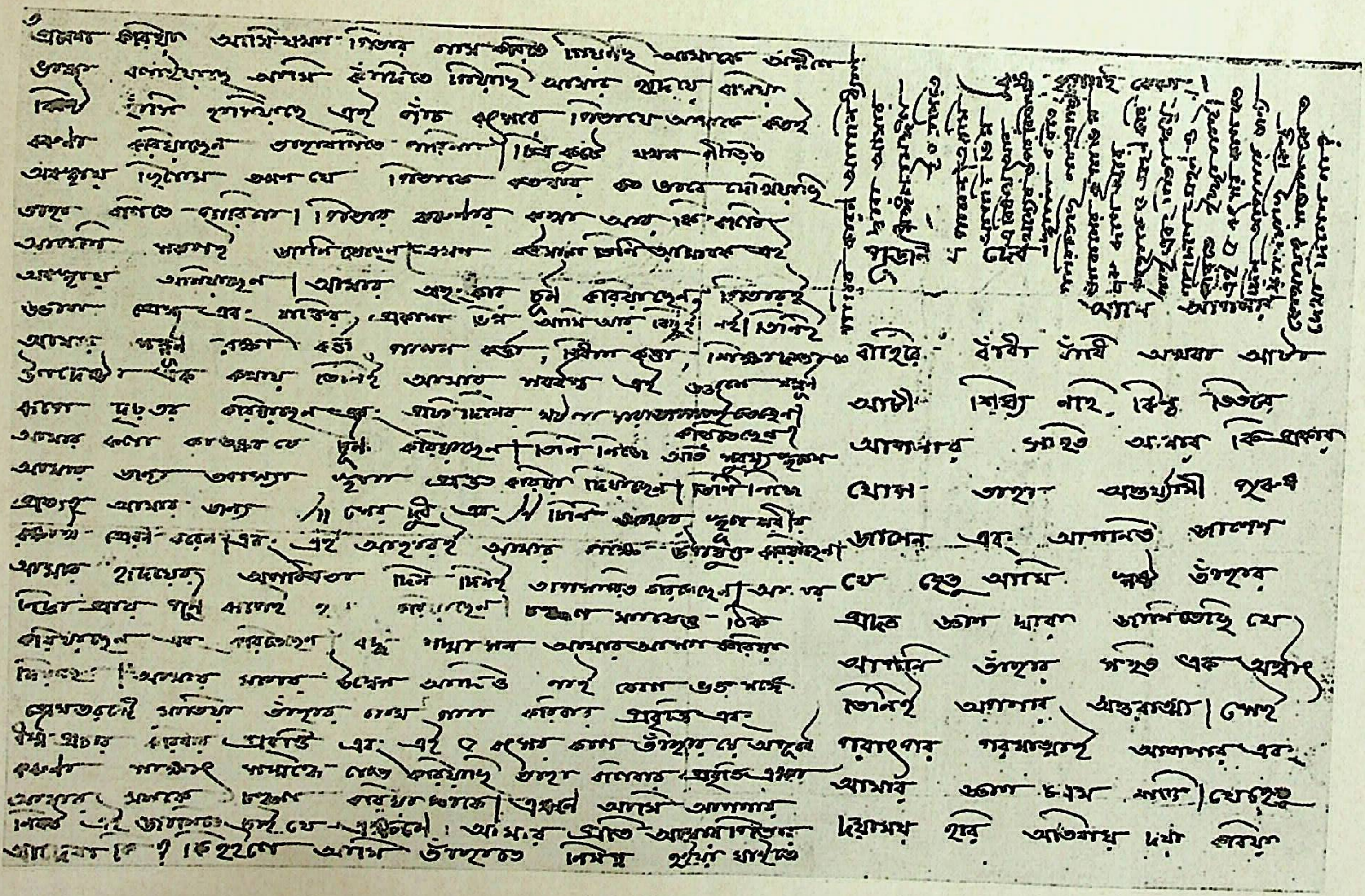

৩
প্রবেশ করিয়াছি আসিয়া যখন পিতার নাম করিতে গিয়াছি আমাকে অশ্রুতে
ভরপুর [illegible] আমি কাঁদিতে গিয়াছি আমার হৃদয় বাবা
কিন্তু হাসি দেখাইয়াছে এবং পাঁচ বৎসরে পিতা যে আমাকে কত
কৃপা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। স্বপ্নে যখন পীড়িত
অবস্থায় ছিলাম তখন যে পিতাকে কতবার ও ভাবে দেখিয়াছি
তাহা বলিতে পারিনা। পিতার করুণার কথা আর কি বলিব
আপনি সমস্তই জানিতেছেন এখন বর্তমান [illegible] অবস্থায়
অবস্থায় আনিয়াছেন। আমার অহংকার চূর্ণ করিয়াছেন, পিতাই
উত্তম [illegible] এবং [illegible], প্রকাশক ভর্তা আমি আর কিছুই নহি। তিনিই
আমার জন্ম রক্ষা কর্তা, পালন কর্তা, দীক্ষা দাতা, শিক্ষাদাতা ও
উপদেষ্টা — এক কথায় তিনিই আমার সর্বস্ব এবং তাহাতে সম্পূর্ণ
বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছেন এবং [illegible] করিতেছেন।
অন্তরে কোন কামনা যে চূর্ণ করিয়াছেন। তিনি নিজে অতি সত্য স্বরূপ
আমার জন্য অবস্থা সৃষ্টি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজে
প্রত্যহ আমার জন্য [illegible] তিনি অনেক দূর [illegible]
কষ্ট স্বীকার করেন। এবং এই অহংকার আমার নাশ [illegible]
আমার হৃদয়ে অবস্থিত তিনি নিজেই আলোকিত করিয়াছেন। [illegible]
পিতা প্রায় পূর্ণ কারণে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সমস্তই ঠিক
করিয়াছেন এবং পরিত্যাগ। বন্ধু [illegible] মন আমার আলোক করিয়া
দিয়াছেন। আমার সমস্ত চিন্তা আজিও নাই কোন ভক্তসঙ্গে
প্রেমতরঙ্গেই ভাসিয়া তাঁহার নাম গান করিবার প্রবৃত্তি এবং
নাম প্রচার করিবার প্রবৃত্তি এবং এই ৫ বৎসর কাল তাঁহার যে অপূর্ব
করুণা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছি তাহা বলিবার প্রবৃত্তি এখন
অন্তরে সর্বদা জাগরূক রহিয়াছে। এখন আমি আপনার
নিকট এই জানিতে চাই যে—প্রভো! আমার প্রতি আদেশ কি?
আনন্দ কি? হইলে আমি তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে

বাহিরে বাবা মৌনী অথবা আর্ত
আর্তী শিষ্য নাই, কিন্তু ভিতরে
আপনার সহিত সংবাদ কি প্রকার
যোগ তাহা অন্তর্যামী পুরুষ
জানেন এবং আপনিও জানেন
যে হেতু আমি স্পষ্ট উহাকে
প্রাণে জ্ঞান দ্বারা জানিতেছি যে
আপনি তাঁহার সহিত এক অর্থাৎ
তিনিই আপনার অন্তরাত্মা। সেই
পরাৎপর পরমাত্মাই আপনার এবং
আমার জ্ঞান চৈতন্য সত্য। যেহেতু
দয়াময় হরি আত্মায় দয়া করিয়া

[illegible]

মৌনীবাবার পত্র ১।৩।৪

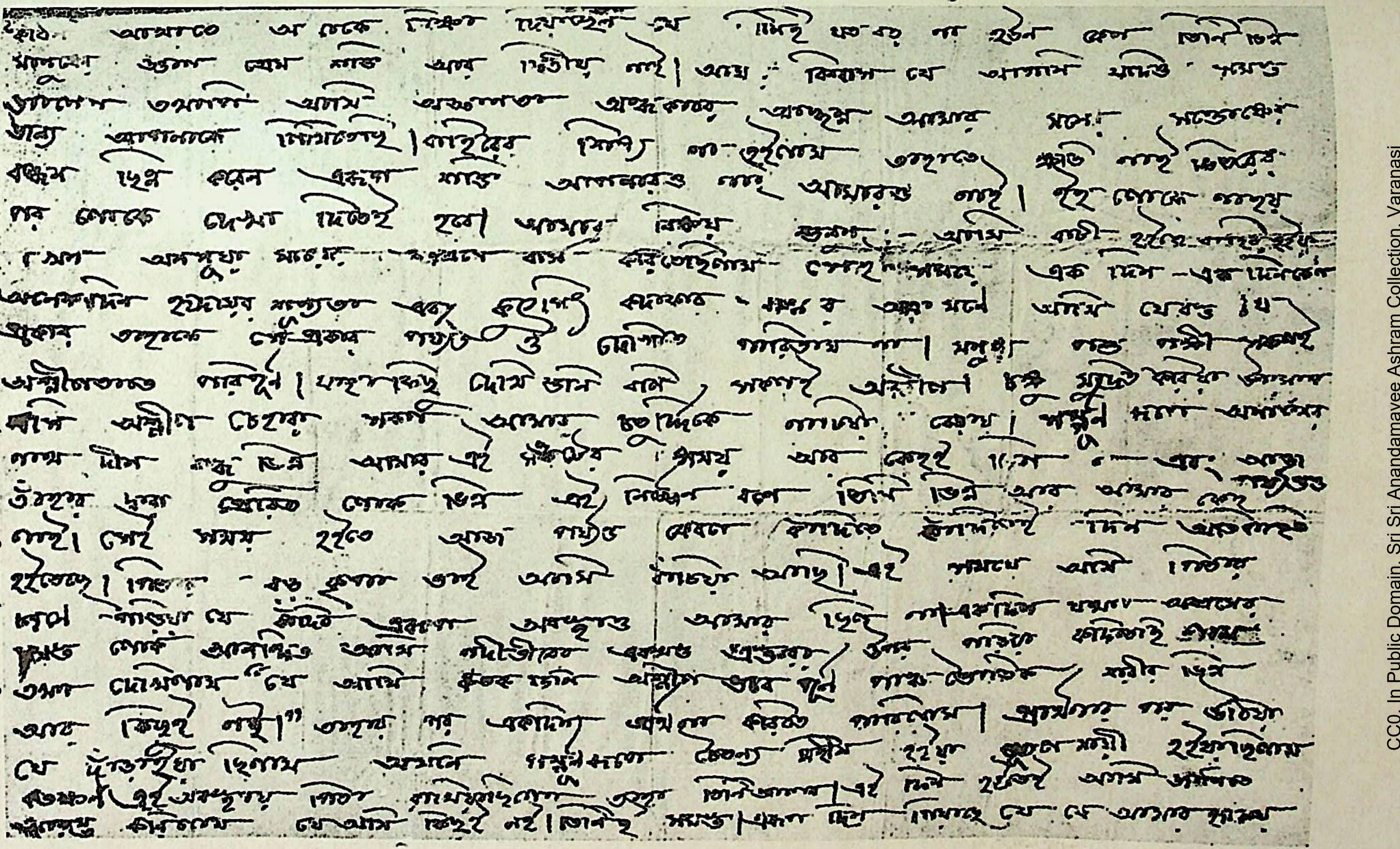

মৌনীবাবার পত্র ২

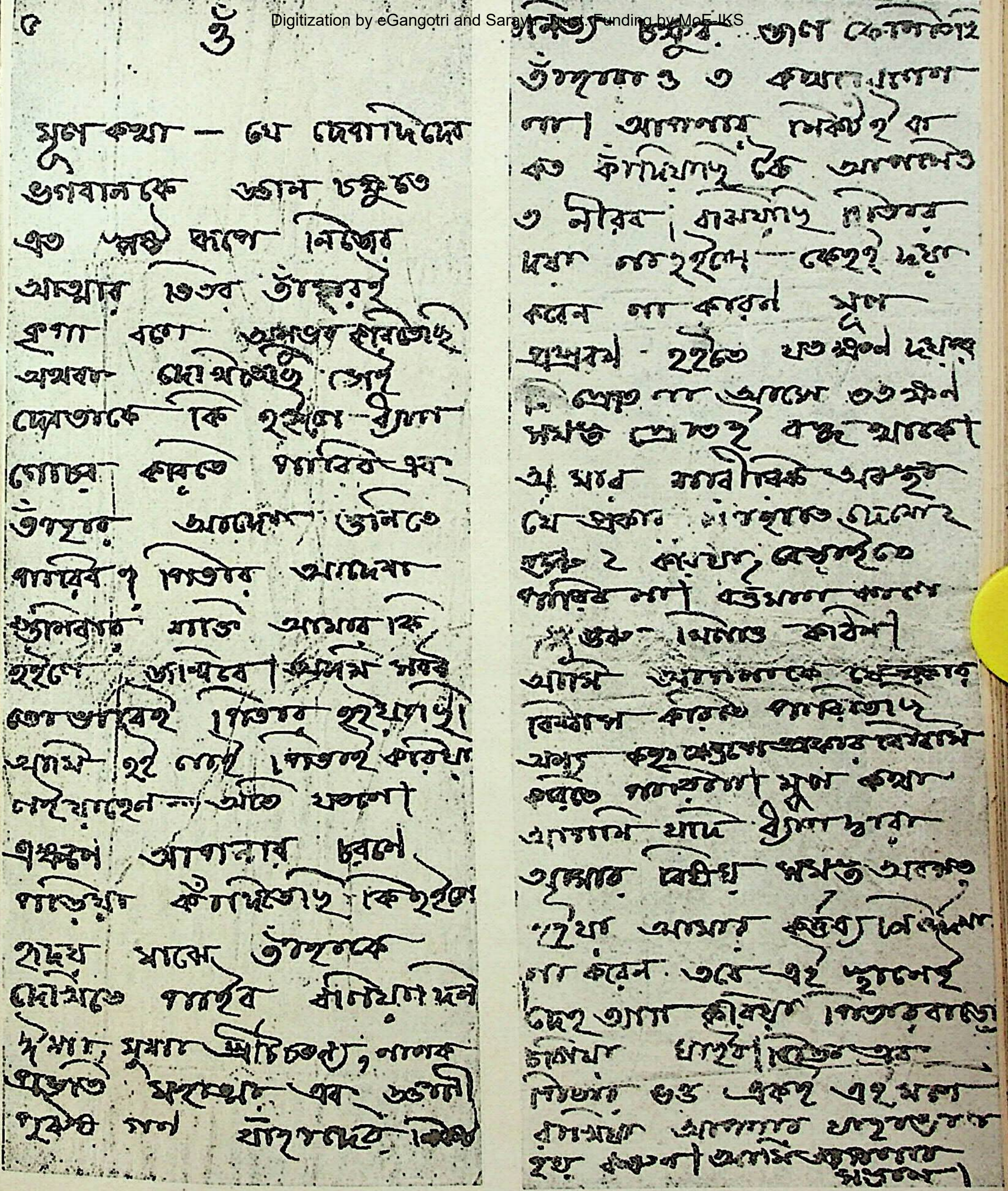

৫ ওঁ

মূল কথা — যে দেবাদিদেব
ভগবানকে জ্ঞান চক্ষুতে
এত স্পষ্ট রূপে নিজের
আত্মার ভিতর তাঁহারই
কৃপা বলে অনুভব করিতেছি
অথবা দেখিতেছি সেই
দেবতাকে কি ইন্দ্রিয়
গোচর করিতে পারিব এবং
তাঁহার আদেশ জানিতে
পারিব? পিতার আদেশ
জানিবার মত আমার কি
হইলে জানিবে। এখন সর্বই
সেভাবেই পিতার হইয়াছি
আমি হই নাই। পিতাই করিয়া
লইয়াছেন — অতি যতনে
এখন আপনার চরণে
পড়িয়া কাঁদিতেছি কি হইলে
হৃদয় মাঝে তাঁহাকে
দেখিতে পাইব যাহাদের
ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, নানক
প্রভৃতি মহাত্মা এবং ভক্ত
পুরুষ গণ যাঁহাদের [illegible]

নিত্য চক্ষুর জ্ঞান কোনটাই
উঁহাদের ও ও কথা এখন
না। আপনার নিকট ইহা
কত কাঁদিয়াছি কি আপনিও
ও নীরব। বসিয়াছি পিতার
দর্শন না হইলে — কেহই দর্শন
করেন না কারণ মূল
প্রশ্রয় হইতে যতক্ষণ দর্শন
স্রোত না আসে ততক্ষণ
সমস্ত স্রোতই বন্ধ থাকে।
এ মাত্র স্বাভাবিক তবেই
যে প্রকার সাক্ষাতে দেখে
২ কথা কহিতে
পারি না। বর্তমান কালে
গুরু মিলাও কঠিন।
আমি ভগবানকে যে প্রকার
বিশ্বাস করিতে পারিতেছি
অন্য কোন মানুষকে সেইরূপ বিশ্বাস
করিতে পারিনা। মূল কথা
এখানে যদি ঈশ্বর দ্বারা
অন্যের বিষয় সমস্ত অনেক
পূর্ব আমার কর্তব্য নির্দেশ
না করেন তবে এই স্থানেই
দেহ ত্যাগ করিব। পিতৃবাক্যে
চলিয়া যাইবো। [illegible]
পিতার ভক্ত এরূপ এই মত
রহিয়াছি আপনার [illegible]
হইতে [illegible] আমি [illegible]
[illegible]।

মৌনীবাবার পত্র ৫।৬

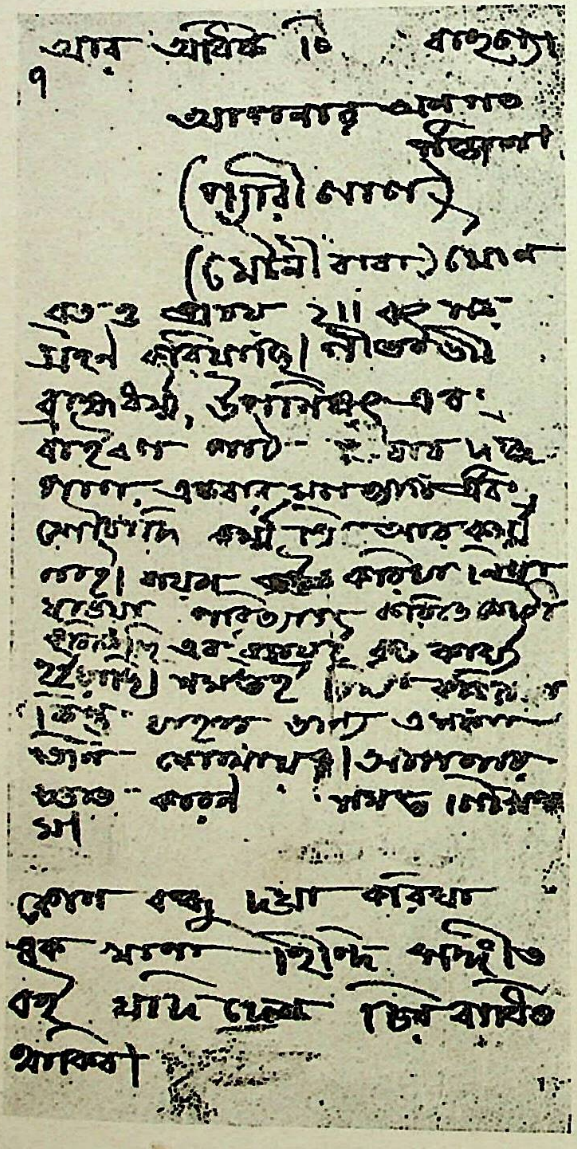

আর অধিক কি বাহুল্য।
৭
আপনার অনুগত
[illegible]
(প্যারী লাল)
(মৌনীবাবা) মৌন
ব্রত প্রায় ২।। বৎসর
গ্রহণ করিয়াছি। [illegible]
ব্রহ্মচর্য্য, উপবাস [illegible] এবং
[illegible]
[illegible] একবার মাত্র [illegible]
[illegible] কর্ম্ম [illegible] আর কোন
নাই। [illegible] কারণ [illegible]
[illegible] পারিতেছি [illegible]
[illegible] এবং [illegible] এই কার্য্য
[illegible] সমস্তই [illegible]
[illegible] তাহা এখন
[illegible] [illegible]। আশীর্ব্বাদ
[illegible] করেন যাহাতে [illegible]
মা।

কোন বন্ধু দয়া করিয়া
এক খানা হিন্দি গীতা
বই যদি দেন চির বাধিত
থাকিব।

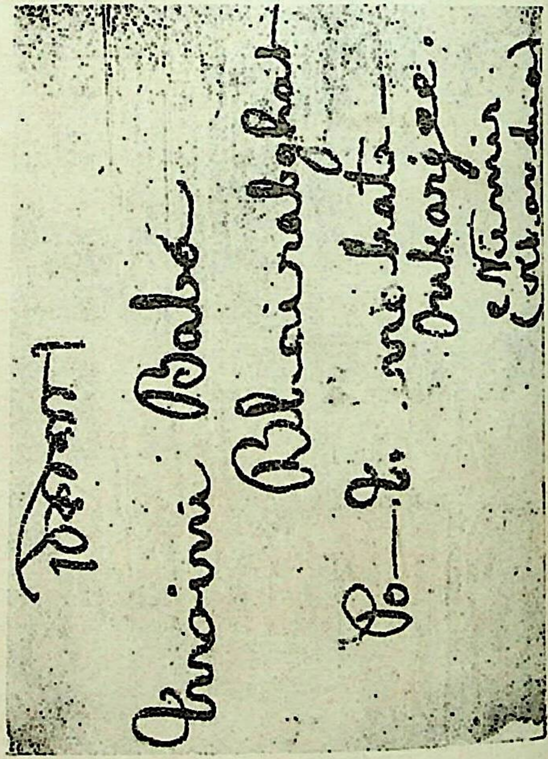

ঠিকানা।
Mouni Baba
Bhairabghat
P.O. Mandhata —
Onkarjee.
E. Nimar
(Khandwa)

মৌনীবাবার পত্র ৭ ও:ঠিকানা

মনের উদ্বেগ আদিও নাই; কেবল ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে মাতিয়া তাঁহার নাম গান করিবার প্রবৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রবৃত্তি এবং এই পাঁচ বৎসরকাল তাঁহার যে অপূর্ব্ব করুণা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছি, তাহা বলিবার প্রবৃত্তি এখন আমার মনকে চঞ্চল করিয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট এই জানিতে চাই যে, এক্ষণে আমার প্রতি আমার পিতার আদেশ কি? কি হইলে আমি তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারিব। কারণ আপনি ধ্যান দ্বারা আমার মঙ্গলামঙ্গল সকলই জানিতে পারেন। আমি, আপনি ভিন্ন এ বিষয়ে আর অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। এ পর্য্যন্ত ভগবানের কৃপা ভিন্ন গুরুরূপে আর কাহাকেও গ্রহণ করি নাই এবং পিতা স্বয়ং না দিলে গ্রহণও করিতে ইচ্ছা নাই। এই পাঁচ বৎসর কাল কতদিন আপনার জন্য কাঁদিয়াছি কিন্তু কোথায়? সন্তানকে তো দেখা দিলেন না।

(অন্য কাগজে)

“ওঁ”

মূল কথা যে দেবাদিদেব ভগবান্‌কে জ্ঞানচক্ষুতে এত স্পষ্টরূপে নিজের আত্মার ভিতর তাঁহারই কৃপাবলে অনুভব করিতেছি। অথবা দেখিতেছি, সেই দেবতাকে কি হইলে ধ্যানগোচর করিতে পারিব এবং তাঁহার আদেশ শুনিতে পারিব; পিতার আদেশ শুনিবার শক্তি আমার কি হইলে জন্মিবে। আমি সর্ব্বোতোভাবেই পিতার হইয়াছি। আমি হই নাই, পিতাই করিয়া লইয়াছেন। অতি যতনে। এক্ষণে আপনার চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছি, কি হইলে হৃদয়মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পাইব বলিয়া দিন। ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মা এবং জ্ঞানীপুরুষগণ, যাঁহাদের নিকট নিত্য চক্ষুর জল ফেলিতেছি, তাঁহারাও কথা বলেন না; আপনার নিকটই বা কত কাঁদিয়াছি, কই আপনিও তো নীরব। বুঝিয়াছি, পিতার দয়া না হইলে কেহই দয়া করেন না; কারণ মূল প্রস্রবণ হইতে যতক্ষণ দয়ার স্রোত না আসে, ততক্ষণ সমস্ত স্রোতই বন্ধ থাকে। আমার শারীরিক অবস্থা যে প্রকার, তাহাতে দেশে দেশে গুরু গুরু করিয়া বেড়াইতে পারিব না। বর্ত্তমানকালে সদ্‌গুরু মেলাও কঠিন। আমি আপনাকে যে প্রকার বিশ্বাস করিতে পারিতেছি অন্য কাহাকেও সে প্রকার বিশ্বাস করিতে পারি না। মূল কথা, আপনি যদি ধ্যান দ্বারা আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ না করেন, তবে এই স্থানেই দেহত্যাগ করিয়া পিতার রাজ্যে চলিয়া যাইব। পিতা এবং পিতার ভক্ত একই, এই মনে রাখিয়া আপনার যাহা ভাল হয় করুন। আমি অপনার সন্তান।

(অন্য কাগজে)

আর অধিক লেখা বাহুল্য। আপনার অনুগত সন্তান (প্যারীলাল) (মৌনীবাবা)।

মৌনব্রতও প্রায় ২॥ বৎসর গ্রহণ করিয়াছি। গীতাজী, ব্রাহ্মধর্ম্ম, উপনিষৎ এবং বাইবেল পাঠ, একবার দুগ্ধ পান, একবার মলত্যাগ এবং শৌচাদি কর্ম্ম ভিন্ন আর কর্ম্ম নাই। শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়া পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছি এবং প্রায়ই কৃতকার্য্য হইয়াছি। সমস্তই পিতা করিতেছেন, কিন্তু যাহার জন্য এ সকল তিনি কোথায়? আপনার জ্ঞাত কারণ সমস্ত লিখিলাম।

ঠিকানা—

Mouni Baba
Bhairabghat
P. O. Moinihata.
Onkarjee Nimir.
(Khandua)

(অন্য এক টুক্‌রা কাগজে)

কোন বন্ধু দয়া করিয়া একখানা হিন্দী সঙ্গীত বহি যদি দেন চিরবাধিত থাকিব।

ঠাকুর মৌনীবাবার পত্র পড়িয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। মৌনীবাবা এখনও ঠাকুরের নিকট দীক্ষা-প্রার্থী। কিন্তু তিনি অতিশয় পীড়িত। ঠাকুরের নিকট আসিবার ক্ষমতা নাই। এজন্য ঠাকুর বলিলেন—"আমাকেই ওঁকারনাথে যেতে হবে।"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর চোখ বুঝিলেন এবং অনেকক্ষণ একই অবস্থায় রহিলেন। দু'এক দিন পরে অবসর বুঝিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওঁকারনাথে আপনি কবে যাবেন? ঠাকুর ঈষৎ হাস্য-মুখে বলিলেন—"তিনি দীক্ষা লাভ করেছেন, আর যাওয়ার প্রয়োজন নাই।"

মহাবিষ্ণুবাবুর সংকীর্ত্তনে ভাবের তরঙ্গ ঃ নিত্যানন্দ প্রভুর অকস্মাৎ আবির্ভাব।

আমরা চড়ায় আসিয়াছি পরে বহু গুরুভ্রাতা নানা স্থান হইতে কুম্ভমেলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার অনেকে চলিয়াও গেলেন। মেলার শেষ ভাগে মহাবিষ্ণু যতি ভাগলপুর হইতে আসিলেন। ঠাকুর তাঁহার গান শুনিতে বড়ই ভালবাসেন। আজ ঠাকুর চা সেবার পর স্থির হইয়া আসনে বসিয়া আছেন। তিন দিকে গুরুভ্রাতাগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট; কেহ নাম করিতেছেন, কেহ ধ্যানে মগ্ন, আবার কেহ কেহ অনিমেষনয়নে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আছেন। মহাবিষ্ণুবাবু তাঁহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে স্বরচিত একটি গান ধরিলেন—

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

সাজ ভাই সবে মিলে আজ হরি সংকীর্ত্তনে।
মাতাও মধুর তানে জগজ্জনে মধুমাখা হরিনামে ॥
জীবন সফল কর ভাই হরিনামামৃত পানে।
তীর্থরাজ এই প্রয়াগধামে, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে;
শ্রীগুরুগোবিন্দ সনে, এমন সুযোগ আর পাবিনে ॥
আনন্দে দুবাহু তুলে, ডাক দীনবন্ধু ব'লে,
শুনেছি সে থাক্‌তে নারে, ডাক্‌লে তারে কাতর প্রাণে ॥
নামটি হরির দীনবন্ধু, দীন-দুখীজনের বন্ধু,
কে আছে ভাই পাপীতাপীর (সেই) পতিতপাবন হরি বিনে ॥
কোথায় কমল আঁখি ব'লে, ডেকেছিল দুখের ছেলে,
অম্‌নি কোলে নিলে তুলে, সেই সরল শিশুর কান্না শুনে ॥
আর এক ছেলে অসুর কুলে, মেতেছিল হরি ব'লে,
ম'লনা জলে অনলে, এই তারকব্রহ্ম নামের গুণে ॥

কোথায় দীনবন্ধু ব'লে, ভাস ভাই রে নয়ন জলে,
ডাক একবার হৃদয় খুলে (সেই) প্রাণের প্রাণ সাধনের ধনে ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, শ্রীহরিচরণে মজ,
দেখ চেয়ে চেতন হ'য়ে, দিন ফুরাল দিনে দিনে ॥
মান অপমান দূরে থুয়ে, তৃণ হ'তে সুনীচ হ'য়ে,
মনে প্রাণে নিশিদিনে ভাস হরিদাস হরিনামে ॥

মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। গুরুভ্রাতাগণ গানের দু'একটি পদ শুনিয়াই মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে গাহিতে বিবিধ প্রকার আনন্দ-ধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ছাউনির নিকটবর্ত্তী সাধু-সন্ন্যাসীরা সংকীর্ত্তনের রব শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তাঁহারা তাঁবুর চতুর্দ্দিকে থাকিয়া গুরুভ্রাতাগণের বিচিত্রভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর নিজ আসনে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক একবারে লাফাইয়া উঠিলেন। নিজ আসনে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন। সময় সময় দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইল। লম্বিত জটাভার থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের প্রকাণ্ড শরীরটির আয়তন বৃদ্ধি হইল। তাহাতে আপাদমস্তক সাত্ত্বিক ভাবের বিবিধ প্রকার খেলা দেখিতে লাগিলাম। ভক্তপ্রবর শ্রীধর মধুর নৃত্য করিতে করিতে সুমধুর কণ্ঠে উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল। বিধু ঘোষ ও মহেন্দ্র মিত্র মল্লবেশে বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনরবে ও আনন্দ কোলাহলে আজ সব একাকার। ঠাকুর সম্মুখের দিকে চঞ্চল দৃষ্টি করিয়া মুহুর্মুহু গদগদ কণ্ঠে "অবধূত অবধূত" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই সময় দেখি মুণ্ডিত-মস্তক, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, উলঙ্গ এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্মুখে ধুনির পাশে উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান। দু'তিন মিনিট পরেই তিনি ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা দিয়া বাহির হইলেন এবং দ্রুত পাদবিক্ষেপে নিত্যানন্দ বিগ্রহের গলার মালা তুলিয়া লইয়া আবার তাঁবুতে আসিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র ধুনির ধারে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া কোন্ সময় কোন্ দিক দিয়া অদৃশ্য হইলেন কেহই বুঝিতে পারিলাম না। কীর্ত্তন কালে ঠাকুর আজ আসন হইতে নামিলেন না।

সংকীর্ত্তন শেষ হইল, পরে গুরুভ্রাতারা সকলে তাঁবুতে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকার পর যোগজীবন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সংকীর্ত্তনের সময় তুমি 'অবধূত অবধূত' ব'লে ডাক্‌লে পরে হঠাৎ দেখ্‌লাম একটি সাধু ধুনির এপাশে তোমার দিকে হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছেন। তখনই তিনি তাঁবুর বাইরে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর গলার মালা এনে তোমাকে পরায়ে দিলেন এবং সংকীর্ত্তনের ভিতরে প্রবেশ ক'রে অকস্মাৎ অদৃশ্য হ'লেন। তাঁকে আর দেখ্‌তে পেলাম না; সাধুটি কে?'

ঠাকুর—তাঁকে তোরা দেখেছিস্ না কি? তোরা খুব ভাগ্যবান। স্বয়ং নিত্যানন্দ

প্রভু স্থূলদেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন ; তাঁর সচ্চিদানন্দরূপও আমাকে দেখালেন।”

যোগজীবন—‘তিনি ২।৩ মিনিটের বেশী রইলেন না তো ?’

ঠাকুর—“এই ঢের। অতক্ষণই তাঁরা থাকেন নাকি ?”

কুম্ভের শেষ স্নান।

আজ ২৪শে মাঘ, কুম্ভ স্নানের শেষ দিন। আজ চড়াবাসী সাধুসন্ন্যাসী, বৈষ্ণব উদাসী ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থিগণ ত্রিবেণী সঙ্গমে শেষ স্নান করিবেন। তাঁহারা প্রত্যুষে সম্প্রদায়ানুযায়ী তিলক মালা বিভূতি রুলি প্রভৃতি ধারণ করিয়া আপনাপন বেশভূষায় সজ্জিত হইলেন। পরে হৃষ্টান্তঃকরণে ইষ্টস্মরণে মনোনিবেশপূর্ব্বক কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে নিশান ঝাণ্ডা আশাসোটা ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া স্নানার্থীরা উঠিয়া পড়িলেন। এই সময়ে লক্ষ লক্ষ সাধুর শঙ্খ, কাঁশর, মৃদঙ্গ, করতাল, সিঙ্গা, ভেরী ও জয়ঢাকের রবে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইল। চত্তরে চত্তরে সাধুদের প্রাণ আজ আনন্দ-উৎসাহে মাতিয়া গেল। তাহারা মুহুর্মুহুঃ ভগবানের নামে জয়ধ্বনি করিয়া মহা আড়ম্বরে সেতুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নাগা উদাসী ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ ক্রম অনুসারে ধীর পদবিক্ষেপে পোল অতিক্রমপূর্ব্বক ত্রিবেণী স্নান সমাধা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতি কুম্ভস্নানেই কোন্ সম্প্রদায় অগ্রে, কাহারা পশ্চাতে স্নান করিবেন তাহা লইয়া নানা উদাসী ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইত। মারামারি কাটাকাটিতে অসংখ্য সন্ন্যাসীর রক্তে গঙ্গার জল লাল হইয়া যাইত, কিন্তু এবার তাহা কিছু হইল না। সকলেই পরমানন্দে স্নান করিয়া আপনাপন আসনে আসিলেন। সমস্ত সাধুরা মাঘ মাস গঙ্গাগর্ভে প্রয়াগ বাস আকাঙ্ক্ষায় আরও ৫।৭ দিন চড়ায় থাকিবেন স্থির করিলেন। পরমহংসজী ঠাকুরকে মাঘ মাসে চড়া ছাড়িয়া কোথাও যাইতে নিষেধ করায়—ঠাকুর ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিতে গেলেন না।

আজ ৩০শে মাঘ, মাঘী সংক্রান্তি। সূর্য্যোদয়ের পর সাধুরা সকলে ত্রিবেণী স্নান করিয়া আপনাপন চত্তরে প্রবেশ করিলেন। বেলা প্রায় দুইটার মধ্যে সাধুদের স্নানকার্য্য শেষ হইয়া গেল। আজ স্নানের পর সাধুদের আর আনন্দ স্ফূর্ত্তি নাই। তাঁহাদের সেই তেজঃপূর্ণ উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতার ভাব নাই। সকলেরই মুখশ্রী মলিন ও বিষাদপূর্ণ। পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া যে স্থানটাকে অহর্নিশি ভগবানের নাম ধ্যান ও উপাসনা আরাধনায় বৈকুণ্ঠতুল্য করিয়াছিলেন, আজ তাহা শূন্য শ্মশান হইতে চলিল। পরস্পর বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধুরাও আজ পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আজ সকাল বেলা সরকারের নোটিস পড়িল, তিন দিনের মধ্যে সকলকে চড়া ত্যাগ করিয়া

যাইতে হইবে। সাধুরা আজ চত্তরে চত্তরে আপনাপন জমাতের নিশান, ঝাণ্ডা, আশাসোটা, তাঁবু, ছাউনি গুটাইতে লাগিলেন। আলু, চিনি, আটা, ময়দা ও ভাণ্ডারার যাবতীয় বস্তু বস্তাবন্দি করিয়া উত্তর চড়ায় চলিলেন। ১লা ফাল্গুন, ১৩০০। তথায় সাধুদের ঐ সকল জিনিষপত্র বহন করিবার জন্য উট, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি মাসাধিককাল রহিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের জমাত অদ্যই চড়া ত্যাগ করিয়া পদব্রজে প্রস্থান করিলেন। আমরাও বেলা ৯টার সময়ে ঠাকুরের সঙ্গে সহরে যাইতে উঠিয়া পড়িলাম।

তাঁবু হইতে বাহির হইয়া ঠাকুর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মাটির বিগ্রহ সহজে অঙ্গহীন হয়ে যায়, আগে এই বিগ্রহ ত্রিবেণীতে বিসর্জ্জন দিয়ে এস।" ঠাকুরের আদেশ মত বিগ্রহদ্বয় গঙ্গায় দেওয়া হইল। পরে আমরা চড়া ছাড়িয়া চলিলাম। দ্বারাগঞ্জ পোলের সংযোগ স্থলে পঁহুছিয়া ঠাকুর চড়ার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। চড়ার দিকে চাহিয়া আমাদের চক্ষে জল আসিল। প্রতিবারই ত্রিবেণী স্নানের পর চড়ায় আসিতে চড়াবাসী সকলের চরণস্পর্শ এই স্থানে হইয়াছে—ঠাকুর এই স্থানে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে ধূলার উপরে গড়াইতে লাগিলেন। আমরাও সকলে ঠাকুরের সঙ্গে সাধুদের পবিত্র চরণধূলির উপরে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলাম। পরে বেলা প্রায় ১০টার সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু রামযাদব বাগচি মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। মধ্যাহ্ন আহার বাগচি মহাশয়ের বাসায়ই হইল। তৎপরে অপরাহ্ণে ঠাকুরকে লইয়া আমরা সাগঞ্জের বাসায় উপস্থিত হইলাম।

ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রস্থান ঃ পাহাড়ীবাবা।

সা-গঞ্জের বাড়ীখানা ছোট বলিয়া আমরা দ্বারাগঞ্জে একখানা ভাল বড় বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া আসিয়াছি। ঠাকুরের সঙ্গে এখনও আমরা ৩০;৩৫ জন গুরুভ্রাতা রহিয়াছি। চড়া হইতে আসিবার সময়ে ক্ষ্যাপাচাঁদ হাঁটু গাড়িয়া ঠাকুরকে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেকক্ষণ স্তব-স্তুতি করিলেন। ঠাকুর ক্ষ্যাপাচাঁদকে কহিলেন—"ক্ষ্যাপাচাঁদ! তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে যেতে পার। আমরা যাই খাই, তাই খাবে, আমরা যেমন থাকি, তেমনি থাক্‌বে।" ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন—'আহা! আপ্‌তো হামারা মনকা বাৎ বাৎলায়া।' এই বলিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে আসিলেন। পরে কখন কোন্ দিক্ দিয়া অদৃশ্য হইলেন আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না। বাসায় আসিয়া আমাদের সকলেরই ক্ষ্যাপাচাঁদের জন্য খুব কষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষ্যাপাচাঁদ আমাদের একটা দিক যেন শূন্য করিয়া গিয়াছেন।

বদরিকাশ্রম হইতে বহুশত মাইল উত্তরে বরফান প্রদেশবাসী অতি প্রাচীন মহাত্মা 'পাহাড়ী বাবা'

আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। যত বড় মহাত্মাই হউন না কেন তাঁহার সঙ্গে মিলিতে মিশিতে আমাদের কোন সঙ্কোচ বোধ হয় না। একেবারে বালকের মত প্রকৃতি। কয়েকদিন মিষ্টান্ন, দধি, পায়সাদি খাইয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন—"ইনি পাহাড়বাসী, কখনও এ সকল বস্তু খান নাই। ফল-মূল কন্দ ইহার আহার। যাঁর যা অভ্যাস নাই তাকে তা খেতে দিতে নাই; অনিষ্ট করা হয়। পাহাড়ীবাবাকে মিষ্টান্ন পায়সাদি খেতে দিও না।"

ঠাকুরের অভয় বাণী।

ঠাকুরের চা সেবার সময়ে ঘরে কেহ থাকে না। গুরুভ্রাতারা অন্য ঘরে বসিয়া চা পান করেন। আজ চা সেবার পর ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! মহাপুরুষের দেওয়া কবচটি ধারণ কর্‌লে না, ফেলে রাখ্‌লে?"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার ভিতরে বিষম লাগিল। আমি অমনি ঝোলা হইতে কবচটি বাহির করিয়া নিয়া ঠাকুরের সম্মুখেই রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিলাম এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে বলিলাম—'আপনি দয়া ক'রে আমাকে গ্রহণ ক'রেছেন। আমার এ দুর্ম্মতি কেন হলো? অন্যের দেওয়া বস্তু নিয়ে আমি গুরুতর অপরাধ করেছি; এখন আমি কি কর্‌বো? আমার কথা শুনিয়া ঠাকুরের মুখ লাল হইয়া গেল; চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। সস্নেহ-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"অন্য কারো দিকে তাকাতে হবে না, যাহা কিছু প্রয়োজন সব এখান থেকেই হবে।" ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। শরীর মন হাল্‌কা বোধ হইতে লাগিল। একটা বিষম বোঝা যেন নামিয়া গেল। রক্ষা পাইলাম।

এই সময়ে গুরুভ্রাতা সকলে আসিয়া ঠাকুরের ঘরে বসিলেন, ঠাকুর কুম্ভমেলার সাধুদের সাধন-ভজন, তপস্যা ও নিয়মনিষ্ঠার কথা বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা খুব কাতরভাবে ঠাকুরকে বলিলেন—"আপনি দয়া করে আমাদের দুর্লভ সাধন দিয়াছেন কিন্তু সাধন তো আমরা কিছুই কর্‌তে পারলাম না, পারবো যে সে ভরসাও নাই—আমাদের গতি কি হবে?"

ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের কাতরোক্তি শুনিয়া খুব স্নেহের সহিত কহিলেন,—"তোমাদের গতি যদি তোমরাই কর্‌বে তাহ'লে চব্বিশ ঘণ্টা এ ভাবে আমি ব'সে আছি কেন? তোমরা তো রাজপুত্র, পেট ভ'রে খাবে বন ভ'রে হাগ্‌বে, তোমাদের আর চিন্তা কি?"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতাদের কি যে অবস্থা হইল প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। ঠাকুরের এই বাক্যই আমাদের অনন্তকালের জন্য একমাত্র অবলম্বন হইল। জয় গুরুদেব! আজ যে চিরকালের মত আমাদের নিশ্চিন্ত করিলে। ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম।

আজ বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ উকীল গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ শীল মহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন,—'কুঞ্জদের দেশে নাকি বিনা আগুনে রান্না হ'য়েছে।' ঠাকুর কহিলেন—"এ আর আশ্চর্য্য কি! পঞ্চভূত পড়েই আছে যখন যাহা দ্বারা কাজ হয়।" ইহার পর ঠাকুর কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের ওখানে বিনা আগুনে রান্না হ'য়েছিল, সেই ঘটনাটি কি বলত?" কুঞ্জ তখন ঠাকুরকে সমস্ত বলিলেন। ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন—"ইহা অতি সত্য কথা। একেই সত্য বলে। এরূপ ঘটনা অতি বিরল। এই একটি ঘটনা দ্বারা পরবর্ত্তী কতলোক উদ্ধার হ'য়ে যাবে। যুগ যুগান্তর চ'লে যাবে কিন্তু এই ঘটনা পাহাড়ে অঙ্কিত রেখার ন্যায় চিরদিন থাক্‌বে। বর্ত্তমান সময়ে এ সকল ঘটনার কেহ আদর কর্‌তে পার্‌বে না। হয়ত ব'ল্‌বে, ইহা মিথ্যা। কেহ প্রশংসার জন্য চাতুরী ক'রে এরূপ প্রকাশ ক'রেছে। যদি তোমরা ভক্তি কর্‌তে পার এবং মর্য্যাদা দেও তবে আরও আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখ্‌তে পাবে।" শ্রীযুক্ত কুঞ্জঘোষ মহাশয় বলিলেন—'লোকে কি আর মর্য্যাদা দিতে পারে?' ঠাকুর কহিলেন—"হাঁ তা পারে না।"

কুঞ্জ কথায় কথায় ঠাকুরকে তাঁহাদের দেশের একটি গুরুভ্রাতার কথা বলিলেন—'গুরুভ্রাতাটি কোন এক জমিদারের কর্ম্মচারী ছিলেন। জমিদার তাহার উপর বিরক্ত হইয়া কতকগুলি দোষারোপ করিয়া আদালতে নালিস করিল। বিচারের দিন আদালতে সকলে উপস্থিত। গুরুভ্রাতাটিকে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দিবার জন্য সকলের সাম্‌নে জমীদারবাবু ঠাকুরের অযথা নিন্দা করিতে লাগিল। গুরুভ্রাতাটি জমীদারকে থামিতে বলিয়া কহিলেন—'মিথ্যা নিন্দা কুৎসা কর্‌ছেন, আপনি সাবধান হন।' জমীদারবাবু আরো উৎসাহের সহিত নিন্দা করিতে লাগিল। দ্বিতীয়বার গুরুভ্রাতাটি জমীদারকে বলিলেন—'আপনাকে যোড়হাতে বল্‌ছি আমার নিকটে আমার ঠাকুরের নিন্দা কর্‌বেন না—বিষম বিপদে পড়্‌বেন। জমীদার তাকে আরও উত্তেজিত করিতে পুনরায় নিন্দা আরম্ভ করিল। তখন গুরুভ্রাতাটি ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং সম্মুখে বাগানের বেড়া হইতে একটি বাঁশের ডগা তুলিয়া নিয়া দৌড়িয়া ঘরে আসিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন—'সকলে সাবধান হউন, আমার কার্য্যে যিনি বাধা দিবেন তিনি খুন হবেন। এই বলিয়া বাঁশের ডগা দ্বারা জমীদারবাবুকে হাকিমের সাক্ষাতেই ২২ ঘা বাড়ি মারিলেন। জমীদার পড়িয়া গিয়া হাত পা আছড়াইতে লাগিল। গুরুভ্রাতাটি তখন বাঁশের ডগা ফেলিয়া দিয়া হাকিমকে বলিলেন—'এখন আমাকে যাহা শাস্তি দিতে

হয় দিন।' ইহা লইয়া ঐ হাকিমেরই নিকটে মামলা উঠিল। উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়া হাকিম গুরুভ্রাতাটির ২৫৲ টাকা মাত্র জরিমানা করিলেন। জমীদারেরও অপরাধ সামান্য নয় বলিয়া তাহারও জরিমানা ২৫৲ টাকা হইল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—"এরূপ কর্‌লে তোমাদের জন্য আমাকে বিপদে পড়্‌তে হবে।"

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা সংবাদঃ নবদ্বীপে যাত্রা।

নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয় বহুকাল যাবৎ এলাহাবাদে ডাক্তারী করিতেছেন। এবার কুম্ভমেলায় তিনি সস্ত্রীক ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শুনিতেছি বাগচি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ বাণীতোষের সহিত ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখির (কুতুর) বিবাহ হইবে। আগামী ১৫ই ফাল্গুন বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। বাঙ্গালার নানা স্থানে নিমন্ত্রণ-পত্র যাইতেছে। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! এখন এখানে লোকের ভিড়, গোলমাল আরম্ভ হবে, তুমি নির্জ্জন-প্রিয়, এসব ভাল লাগ্‌বে না। তুমি এখন কয়েকদিন দাদার কাছে গিয়ে থাক। আমি কলিকাতা গেলে পরে আবার আমার সঙ্গে গিয়ে থেকো।" আমি ঠাকুরের অভিপ্রায় মত দাদার নিকট রওনা হইলাম। বস্তিতে দাদার নিকট ৮।১০ দিন থাকার পর ভাগলপুরে যাইতে ইচ্ছা হইল। অশ্বিনী বসু ও মহাবিষ্ণুবাবু ভাগলপুরে পুলিন পুরীতে আছেন। আমি অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। কয়েকদিন পরে একখানা ছাপান কাগজ পাইলাম। তাহাতে এই মর্ম্মে লেখা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে হইয়াছিল। ঐ দিন চন্দ্রগ্রহণ হইলে যে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদির ঐ সময়ে সমাবেশ হইয়াছিল। এবার ৪ শত বৎসর পরে তাহাই হইবে। মহাপ্রভুর জন্মের লগ্ন ঠিক ঠিক বর্ত্তমান হইবে বলিয়া, সাধারণের সংস্কার, এবার মহাপ্রভু ঐ দিনে আবির্ভূত হইবেন। নবদ্বীপে এবার বিরাট উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। অসংখ্য লোক এখন হইতেই নবদ্বীপে থাকিয়া সংকীর্ত্তন মহোৎসবে মহাপ্রভুকে কাতর প্রাণে আহ্বান করিতেছেন। সংবাদ পাইলাম ঠাকুর এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা পঁহুছিয়া ৫।৬ দিন বিজয়রত্ন সেন কবিরাজের বাড়ী অবস্থানের পর নবদ্বীপ চলিয়া গিয়াছেন। এই খবর পাওয়ার পর ঠাকুরের নিকট যাইতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। দোলের সময়ে খ্রীষ্টানদের পর্ব্ব পড়ায় আফিস, আদালত অধিক দিনের জন্য ছুটি হইল। অশ্বিনী বাবু, মহাবিষ্ণু যতি ও ছোড়দাদাকে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম। পূর্ণিমা দিনে সন্ধ্যার পর আমরা নবদ্বীপে উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় সশিষ্যে ঠাকুরকে পরম সমাদরে তাঁহার টোল বাড়ীতে স্থান দিয়া রাখিয়াছেন। আমরা টোল বাড়ীতে ঝোলা ঝুলি রাখিয়া মহাপ্রভুর ঘাটে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গঙ্গার ঘাটে অপূর্ব্ব কাণ্ড।

গ্রহণ সময়ে ঠাকুরের অপূর্ব্ব নৃত্য।

আজ সমস্ত গঙ্গার তীর লোকে পরিপূর্ণ। সহস্র সহস্র লোক শত শত দলে মৃদঙ্গ করতাল বাজাইয়া মহাসংকীর্ত্তন করিতেছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় উপস্থিত হইল ভাবিয়া তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল ভাবে মহাপ্রভুকে ডাকিতেছেন। লক্ষাধিক লোকের হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি ও আকুল আর্ত্তনাদে মহাভাবের বন্যা বহিয়া চলিল। শত শত দলের মহাসংকীর্ত্তনে সকলেই আজ মাতোয়ারা। ঠাকুর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহস্র লোকের ভীড়ে অপ্রতিহত গতিতে তিনি গুরুভ্রাতাদের সহ সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অসংখ্য সংকীর্ত্তনের দলে তিনি বিদ্যুতের মত ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতারা মহাভাবে দিশাহারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া চলিলেন। তাঁহাদের উচ্চ হরিধ্বনি ও হুঙ্কার গর্জ্জনে সকলেরই প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ঠাকুর গদগদ কণ্ঠে 'জয় শচীনন্দন জয় শচীনন্দন' বলিয়া মহাপ্রভুকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল মনে করিয়া বিস্মিত নয়নে সকলে ঠাকুরের পানে তাকাইয়া রহিল। সকল দলের ভিতরে ঠাকুর আজ বর্ত্তমান। অলক্ষিত ভাবে কি যেন এক মহাশক্তি সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া পড়িল। দর্শকমণ্ডলী ভাবাবিষ্ট হইয়া স্থানে স্থানে 'জয় মহাপ্রভু জয় মহাপ্রভু' বলিয়া ক্রন্দনের রোল তুলিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে শিষ্যগণ সহিত স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গাজলের ধারে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ঠাকুর রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। পরে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক চন্দ্রাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "ঐ ভাখ ঐ ভাখ" বলিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে ধরিয়া বসাইলেন। ঠাকুর ৩ ঘণ্টা কাল সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। চন্দ্র রাহুমুক্ত হইলে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন ঠাকুরের সঙ্গে আমরা গঙ্গাস্নান করিলাম। ঠাকুরের গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলাম। স্নানের পরে তীরে উঠামাত্র একটি অচেনা মেয়ে ঠাকুরকে আদর করিয়া উৎকৃষ্ট সরবৎ খাওয়াইলেন। আমরাও প্রচুর পরিমাণে সরবৎ প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। তদনন্তর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরকে লইয়া টোলবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

বালক গৌরাঙ্গের নূপুরের জন্য ক্রন্দন।

নবদ্বীপনিবাসী দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে অদ্য নব গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তথায় মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর এই উৎসবে সশিষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে ঠাকুর যখন চা-সেবা করিতেছিলেন বালক গৌরাঙ্গ

ঠাকুরের নিকট প্রকাশিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'আমাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে—সোনার নূপুর বালা দেয় নাই।'

ঠাকুর বালককে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—দিবে।" চা সেবার পর ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের লইয়া হরিসভায় উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতারা তথায় মহাপ্রভুর মন্দিরে মহা-উৎসাহের সহিত হরি সংকীর্ত্তন করিলেন। এই কীর্ত্তন শেষ হইতে একটু অধিক বেলা হইল। পরে ঠাকুর সকলকে লইয়া ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু অবস্থায় উত্তপ্ত বালির উপর দিয়া চলিয়া মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ী উৎসবস্থলে নব গৌরাঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহের পানে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন—"আহা! এত গরম বালির উপর দিয়া কি আমার সঙ্গে এমন ক'রে লাফায়ে লাফায়ে আস্‌তে হয়? হাপাস্‌নে, হাপাস্‌নে; চুপ কর চুপ কর, আমি ব'লে দিব এখন, সোনার বালা নূপুর দিবে।" এই বলিয়া ঠাকুর আবার বিগ্রহের দিকে হাত নাড়িয়া পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন—"কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না, থাম্ থাম্। দিবে দিবে—বলে দিব, দিবে।"

এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র দত্ত, স্বামীজী ও কতিপয় গুরুভ্রাতা বিগ্রহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন জীবন্ত বালকের মত বিগ্রহের অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদুটি ছল ছল করিতেছে,—বালক কাঁদিতেছে। তার বক্ষঃস্থল সহিত গলার মালাগুলিও কাঁপিতেছে। বিগ্রহের এই অবস্থা দর্শন করিয়া গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর নাটমন্দিরের শোভা ও সাজসজ্জার আড়ম্বর দেখিয়া বলিলেন—"এ সকল ঝাড়, লণ্ঠন, ফানুসের প্রয়োজন কি? যাহাকে যাহা দিয়ে সাজান উচিত তাহাকে তাহা না দিয়া ঝাড় লণ্ঠন ফানুস টাঙ্গান হয়েছে। যে ছেলেকে স্থান দেওয়া হয়েছে তাঁকে সোনার বালা নূপুর না দিলে ঘরের সমস্ত হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গেচুরে জলে ভাসায়ে দিবে।"

ঠাকুর আরো অনেক কথা বলিলেন। পরে বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে ঠাকুর গরম বালির উপর দিয়া সকলের সহিত টোল বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

সিদ্ধা-গোয়ালিনী।

১০ই চৈত্র—বৃহস্পতিবার।

অতি প্রত্যুষে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম। ঠাকুরের চা পানের পর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর সংকীর্ত্তনের সহিত পদরত্ন মহাশয়ের হরিসভায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ওখানে মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে একটু দৃষ্টি করিয়াই বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইলেন। সংকীর্ত্তন ক্রমশঃ জমাট হইয়া পড়িল। স্বামীজী হরিমোহন

ভাবাবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। গুরুভ্রাতাদের হরিসংকীর্ত্তনে সকলেই আজ পরমানন্দ লাভ করিলেন। ঠাকুরের সংজ্ঞালাভের পর বেলা প্রায় ১০টার সময়ে আমরা টোলবাড়ীতে আসিলাম।

এই সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এক ভাঁড় দুধ লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময়ের সহিত গুরুভ্রাতাদের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—'ওরে! তোরা এখানে কি ক'রে এলি, তোরা তো সব ব্রজের লোক। তোদের দেখবো ব'লে আমি কতকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ আমি তোদের দেখে ধন্য হ'লাম।' এই বলিয়া একটি পাত্রে ভাঁড় হইতে দুধ তুলিয়া নিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতে লাগিলেন। পরে তিনি এক এক গ্লাস দুধ ঢালিয়া নিয়া গুরুভ্রাতাদের খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—'পাত্র এঁটো হ'য়েছে, দুধ খাব না।' ঠাকুর অমনি বলিলেন—"ও এঁটো নয়, প্রসাদ,—খেয়ে নিন্।" একজন গুরুভ্রাতা গোয়ালিনীকে বলিলেন—'পাতামোড়া ও কি রেখেছ?' গোয়ালিনী বলিল—'ও তোমাদের দিব না—তোমরা দুধ খাও। ছেলে দুটি ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে আসে, এই ক্ষীরটুকু তাদের জন্য রেখেছি।' গ্রোয়ালিনী ঠাকুরকে বলিল—'বাবা! ছেলেদুটি তো তোমাকে দেখ্তে আসে, তাদের একটু সকালে পাঠিয়ে দিও। দেখ, আমার বড় ছেলেটি বড় ভাল, আলা-ভোলা, ক্ষুধা সইতে পারে না।' ঠাকুর বলিলেন—"আচ্ছা, ব'লে দিব।"

মধ্যাহ্নে পদরত্ন মহাশয়ের হরিসভায় আমাদের আহার হইল।

সা সাহেবের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য ঃ শক্তি আকর্ষণ ঃ রেল সংঘর্ষণে ঠাকুরের চরণে আঘাত।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুর নিজ আসনে পা দু'খানা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় পদসেবা আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরের দক্ষিণ পদের পাতায় টিপী দিতেই ঠাকুর 'উহু' করিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পায়ের পাতায় কি কোন চোট্ লেগেছে?'

ঠাকুর বলিলেন,—"এলাহাবাদ হ'তে কলিকাতা আস্তে পথে মগরা ষ্টেসনে আমাদের গাড়ির সঙ্গে অন্য গাড়ির সংঘর্ষণ হয়েছিল। তাতে পায়ের তলায় আঘাত লেগেছিল।"

অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'শুনেছি আপনি যে গাড়িতে ব'সেছিলেন তার আগে পাছে দুখানা গাড়িই ভেঙ্গে চুরমার হ'য়েছিল, অথচ আপনি যে গাড়িতে ছিলেন তার কিছুই হয় নাই—এ কথা কি সত্য ?'

ঠাকুর—"হাঁ। প্রয়াগে বাসা হ'তে আমরা ষ্টেসনে এসে একখানা গাড়িতে উঠে ব'সে আছি, হঠাৎ সা সাহেব এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি ঐ গাড়ি হ'তে আমাদের নাবায়ে নিয়ে পাশের গাড়িতে বসায়ে দিয়ে বল্‌লেন—'এই গাড়িতেই আপনারা থাক্‌বেন—অন্য গাড়িতে যাবেন না।' মগরাতে গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষণ হলে পর দেখ্‌লাম আমাদের দুপাশের দুখানা গাড়িই ভেঙ্গে একেবারে চুরমার। একটি লোক তখনই মারা গেলেন। কিন্তু আমাদের গাড়িতে কিছু হয় নাই; তেমন ধাক্কাও লাগে নাই। সা সাহেবের আশ্চর্য্য শক্তি। আমার পায়ের তলায় একটু লেগেছিল। কলিকাতা এসে জ্বর হ'লো; এখনও সামান্য বেদনা আছে। একেবারে সারে নাই।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। ঠাকুরের গাড়ির অগ্রপশ্চাতে সংলগ্ন দুইখানা গাড়িই চূর্ণবিচূর্ণ, আরও অনেক গাড়িই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ঠাকুরের গাড়িতে কোন আঘাতই লাগে নাই। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! ঠাকুর আত্মগোপন করিতে সা সাহেবের অলৌকিক শক্তির যতই প্রশংসা করুন না কেন, এই ঘটনায় মনে হয় 'কলিসনের' অদম্য শক্তির ধাক্কাতে গাড়িখানা রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর পদভরে গাড়িখানা স্থির রাখিয়া ধাক্কার সমস্ত শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন; তাহাতেই গাড়িখানা রক্ষা পাইয়াছিল। শক্তির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঠাকুর কিঞ্চিৎ আঘাত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে এখনও ভুগিতেছেন। সা সাহেব এই সাংঘাতিক বিপদে গুরুভ্রাতাদের সহিত ঠাকুরকে রক্ষা করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবুর মুখে একটি কথা শুনিয়া তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না। শুনিলাম সা-সাহেব ঠাকুরকে গাড়িতে বসাইয়া চলিয়া যাওয়ার সময়ে ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মহেন্দ্রবাবু ঠাকুরের পাশে ছিলেন। ঠাকুরকে চুপে চুপে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি কর্‌লেন ? একেবারে সেরে দিলেন নাকি ?"

ঠাকুর বলিলেন,—"কি আর কর্‌বো ? পরমহংসজী যে বল্‌লেন ওর সমস্ত শক্তি টেনে নেও, শক্তির অপব্যয় কর্‌ছে।" সা সাহেব ঠাকুরকে রক্ষা কর্‌বেন এই অভিমান যে বড় বিষম! কারণ গুরু এক,—পরমহংসজী। শিষ্যের এই অভিমান তিনি সইবেন কেন ?

রসিকদাসের পদাবলী গানে—ঠাকুর।

মহাপ্রভুর মন্দিরে আজ তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম পদাবলী গান চলিয়াছে। দেশের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণ একের পর অন্যে গান করিয়া সমানভাবে আসর জাগাইয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীরসিকলাল দাসের আজ পদাবলী গান হইবে, শুনিলাম।

১১ই, চৈত্র, শুক্রবার।

চা সেবার পর ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহকে নমস্কার করিয়া আসরে বসামাত্র রসিকদাস আসিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং করযোড়ে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া সংকীর্ত্তন করিবার অনুমতি চাহিলেন। ঠাকুর খুব হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঠাকুরের করস্পর্শে রসিকদাস পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি মৃদঙ্গ করতালে তালি দিয়া এমনভাবে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিলেন যে উহার করুণ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ মাত্র সভাস্থ সকলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ঠাকুর স্থির থাকিতে না পারিয়া 'জয় শচীনন্দন জয় শচীনন্দন' বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে তিনি একবার মহাপ্রভুর দিকে আবার পশ্চাৎ দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। পরে মহাপ্রভুর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া 'ঐ তো ঐ তো' বলিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। পদাবলী আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই মহাভাবের উচ্ছ্বাসে সকলে মত্ত হইয়া পড়িল। ভক্তপ্রবর রসিকদাস অশ্রুপূর্ণ নয়নে পরমোৎসাহে গাহিতে লাগিলেন। আসর সর্ব্বত্র নীরব নিস্তব্ধ। ঠাকুরের পাশে আমি বসিয়াছিলাম। ঠাকুর চুপে চুপে আমাকে বলিলেন—"কিছু টাকা নিয়ে এসো।" আমি তৎক্ষণাৎ টোলবাড়ীতে পঁহুছিয়া দিদিমা, যোগজীবন প্রভৃতির নিকট হইতে সতেরটি টাকা লইয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর প্রত্যেকটি পদাবলীর আরম্ভ ও শেষে রুমালে টাকা বান্ধিয়া রসিকদাসের দিকে ফেলিতে লাগিলেন। রসিকদাসের আনন্দ উৎসাহের সীমা নাই। তিনি অদ্বৈতপ্রভুর অসাধারণ মাহাত্ম্য গানের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের মহিমা আখরে বর্ণনা করিয়া হাপুস্ হুপুস্ কাঁদিতে লাগিলেন। সময় সময় তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। ঠাকুর ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নানাপ্রকার সাত্ত্বিকভাবের উদ্গমে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে শ্রোতৃমণ্ডলী ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা আকুল প্রাণে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিল। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্তবস্তুতি গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। প্রাণ যে কেমন করিতে লাগিল বলিতে পারি না। বেলা ১১টার সময়ে কীর্ত্তন শেষ হইল। অতিকষ্টে লোকের ভিড় অতিক্রম করিয়া ঠাকুরকে লইয়া আমরা টোলবাড়ীতে পঁহুছিলাম।

নবদ্বীপে রাইমাতা।

আজ চা সেবার পর ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের লইয়া রাইমাতার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। রাইমাতার নাম আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। রাইমাতা ঠাকুরকে দেখিবামাত্র 'ওগো আমার বাড়ী অদ্বৈত এসেছে গো, কে কোথায় আছিস্, আয় দেখে যা গো' বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর কারো বলার অপেক্ষা না রাখিয়া গুরুভ্রাতাদের লইয়া রাইমাতার ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় গিয়া বসিলেন। রাইমাতা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিয়া বলিলেন—'বাবা! তোমাকে দেখ্‌তে গিয়াছিলাম। দেখ্‌লাম, ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ছ; আমি আর কাছে যেতে সাহস পেলাম না, দূর হ'তে দেখে চ'লে এলাম। বড় আকাঙ্ক্ষা হ'য়েছিল—ভক্তদের নিয়ে একবার আমার বাড়ী আস, প্রাণভরে একবার দেখি। বাবা! আমার আশা এবার পূর্ণ হলো। এখন তুমি একটু বস। আমার ছেলেরা এখনও খায় নাই; তাদের খাবার দিয়ে আসি, বেলা হ'য়েছে। এই বলিয়া রাইমাতা ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটু পরে একথালা উৎকৃষ্ট খাবার লইয়া আসিয়া ঠাকুরের নিকটে ধরিলেন। ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে উহা আনন্দের সহিত ভোজন করিলেন। পরে রাইমাতা বলিলেন—'বাবা! এসেছ যখন এখানে দুটা অন্ন পেতে হবে।' ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাইমাতা ঠাকুরের অনুমতি লইয়া রান্না করিতে গেলেন। বিবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বেলা ১২টার সময়ে ভোগ দিলেন। আমরা সকলে পরিতোষ পূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। রাইমাতা ভুক্তাবশিষ্ট সমস্ত একস্থানে সংগ্রহ করিয়া নাড়ু পাকাইলেন এবং গৃহস্থিত সকলকে এক এক নাড়ু আগ্রহের সহিত বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট রাখিয়া দিলেন। রাইমাতার চক্ষু দুটি ঊর্দ্ধটানা, সর্ব্বদাই ঢুলু ঢুলু। ছুটাছুটি করিয়া কাজকর্ম্ম করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে টস্ টস্ করিয়া চক্ষের জল পড়িতেছে। যন্ত্রের মত শরীর দ্বারা কাজ হইতেছে, আর চিত্তটি যেন কোথায় নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এরূপটি কোথাও দেখি নাই।

অপূর্ব্ব তমাল বৃক্ষ ঃ ভাবাবিষ্ট বালক।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আমরা পদরত্ন মহাশয়ের হরিসভায় উপস্থিত হইলাম। পদরত্ন মহাশয় ঠাকুরকে একটি তমাল গাছ দেখাইতে তাঁহার ভিতর বাড়ী লইয়া গেলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। দেখিলাম তমাল গাছটি বাস্তবিকই একটি দেখিবার জিনিষ। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষটি মন্দিরের মত ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে এবং তাহার ঘন শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে ছত্রাকারে বিস্তার পূর্ব্বক ভূমি সংলগ্ন হইয়াছে। বৃক্ষতলা দিবালোকেও অন্ধকার; ঠিক যেন একখানা লতার ঘর প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। স্বভাব হইতে আপনা আপনি বৃক্ষের এই প্রকার নিখুঁত অবয়ব ইতিপূর্ব্বে

আর কোথাও দেখি নাই। বৃক্ষটি দেখিয়া আমরা সকলেই খুব বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। এই স্থানে একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিলাম।

পদরত্ন মহাশয়ের পৌত্র ৩ বৎসরের একটি বালক তমাল গাছের এক পাশে দাঁড়াইয়া কৌতুকাবিষ্ট নয়নে ঠাকুরের পানে চাহিয়া আছে। বালকটি বড়ই সুশ্রী ও সুন্দর। ঠাকুরের দৃষ্টি উহার দিকে পড়া মাত্র বালক সলজ্জভাবে দু'হাত দিয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। একটু পরেই আবার আড় চক্ষে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিল। বালক পুনঃপুনঃ এই প্রকার করিতে আরম্ভ করিল। তখন পদরত্ন মহাশয়ের দৌহিত্রী বালকের সমবয়স্কা একটি বালিকা ধীরে ধীরে আসিয়া বালকের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা বালকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতে লাগিল। বালক করযোড়ে অনিমেষনয়নে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিল। উহার ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। অবিরলধারে গণ্ড বহিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। প্রাণায়ামের ক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে আপনা আপনি চলিল। নানা প্রকার সাত্ত্বিক বিকারে বালকের শরীর দক্ষিণে বামে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুর এই সময়ে বালকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন— "তোমরা একে বেশ করে দেখে নেও। লোকে যার জন্য ছুটাছুটি ক'রে এদিক ওদিক ঘুর্‌ছে তিনি যে কোথায় কোন্ গলিতে কি ভাবে লীলা কর্‌ছেন, তিনি দয়া ক'রে না জানালে কেহ জান্‌তে পারে না। একে দেখে তোমরা ধন্য হ'লে।" পদরত্ন মহাশয় পণ্ডিত লোক, তাই তিনি ইহার মহালক্ষণ সমস্ত দেখ্‌তে পেয়ে আদর যত্ন কর্‌ছেন।" বালকটি এই সময় ঢুলু ঢুলু অবস্থায় ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া ঠাকুরের চরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িল। ঠাকুর উহাকে খুব আদর করিয়া তুলিয়া লইয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—"তুমি আর কাহাকেও নমস্কার ক'রো না।" বালকটিকে দেখিয়া গুরুভ্রাতাদের অনেকের মধ্যে নানা ভাবের আবেশ হইতে লাগিল। * তৎপরে বেলা অবসানে আমরা টোলবাড়ীতে আসিলাম। সন্ধ্যা কীর্ত্তনের পর ঠাকুর গোয়ালিনী ও রাইমাতার অসাধারণ অবস্থার বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

নবীনবাবুর প্রকৃতি।

আজ সুবিখ্যাত তান্ত্রিক নবীনবাবু ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহার আশ্রমে যাওয়ার পথ ভুলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন। নবীনবাবু খবর পাইয়া তাঁহার প্রকৃতির সহিত উৎকৃষ্ট খাবার লইয়া তথায় আসিলেন। সমস্ত সামগ্রী ঠাকুরকে ধরিয়া দিলেন। ঠাকুর আহার করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, প্রকৃতি ঠাকুরকে বলিলেন 'আজ

---

* এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই বালকটি ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আপনাকে হাতে ধরে খাওয়াতে ইচ্ছা হয়।' ঠাকুর সম্মতি দিলেন। খাওয়াইতে খাওয়াইতে প্রকৃতি বলিলেন—'আমাকে দয়া করুন।' ঠাকুর বলিলেন—"মা যখন বাঘ মাথায় দিয়ে শুয়েছিলেন আপনি তখন মাকে বাঘের নিকট হতে এনেছিলেন; আপনি তো আমার মাথা কিনে রেখেছেন, আপনাকে আর কি দয়া কর্‌বো?" আনন্দ প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাইয়া ঠাকুর টোলবাড়ী আসিলেন।

ওঁকার সাধন।

আজ ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের লইয়া ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারবাবু ঠাকুরের পুরাণ বন্ধু। তিনি মধ্যাহ্ন সময়ে অতগুলি লোক সহিত হঠাৎ ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। গুরুভ্রাতাদের সহিত ঠাকুরকে আদর করিয়া বসাইয়া তিনি সকলের জলযোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজকুমারবাবুর বৃদ্ধ মাতা আসিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে কহিলেন—"রাজকুমারবাবুকে আমি ভাই বলিয়া মনে করি। আপনি আমার মা। মা কি ছেলেকে নমস্কার করে?" রাজকুমারবাবুর মা বলিলেন—'বাবা! তোমাকে যে আমি মহাদেবের মত দেখ্‌ছি।' ঠাকুর কহিলেন—"তবে আপনি মহাদেবকে নমস্কার করুন; আমি মাকে নমস্কার করি।"

সকলের জলযোগের পর রাজকুমারবাবু স্থির হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। রাজকুমারবাবু ঠাকুরকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন—'আমার প্রতি যে আপনার অসাধারণ ভালবাসা তার পরিচয় আমি ঢের পেয়েছি। কিন্তু আমার জীবনের দুর্দ্দশা দেখেও তো আপনি বেশ চুপ ক'রে আছেন, কিছু কর্‌ছেন না। আপনি আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন, যাতে ২।১ মিনিটের জন্যও আমি ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাক্‌তে পারি। কিন্তু খুব সহজ উপদেশ দিবেন—যাহা আমি প্রতিপালন কর্‌তে পারি। পরে আমি উপযুক্ত হ'লে দীক্ষা দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর্‌বেন।' ঠাকুর রাজকুমারবাবুর কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"আপনি যেমন বল্‌লেন তেমনই একটি উপদেশ দিচ্ছি। ইহা সহজও বটে শক্তও বটে। সহজ বল্‌ছি এই জন্য যে লোকে একটু মনোযোগ রাখ্‌লেই অনায়াসে ইহা কর্‌তে পারে। শক্ত এই জন্য যে সকলে জানে অথচ ইহা কর্‌তে কারো প্রবৃত্তি হয় না। আপনি ওঁকারের সাধন করুন। ওঁকারের অর্থ অ, উ, ম। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। পূর্ব্বে যাহা ছিল না, এখন আছে, পরে আবার থাক্‌বে না। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা,

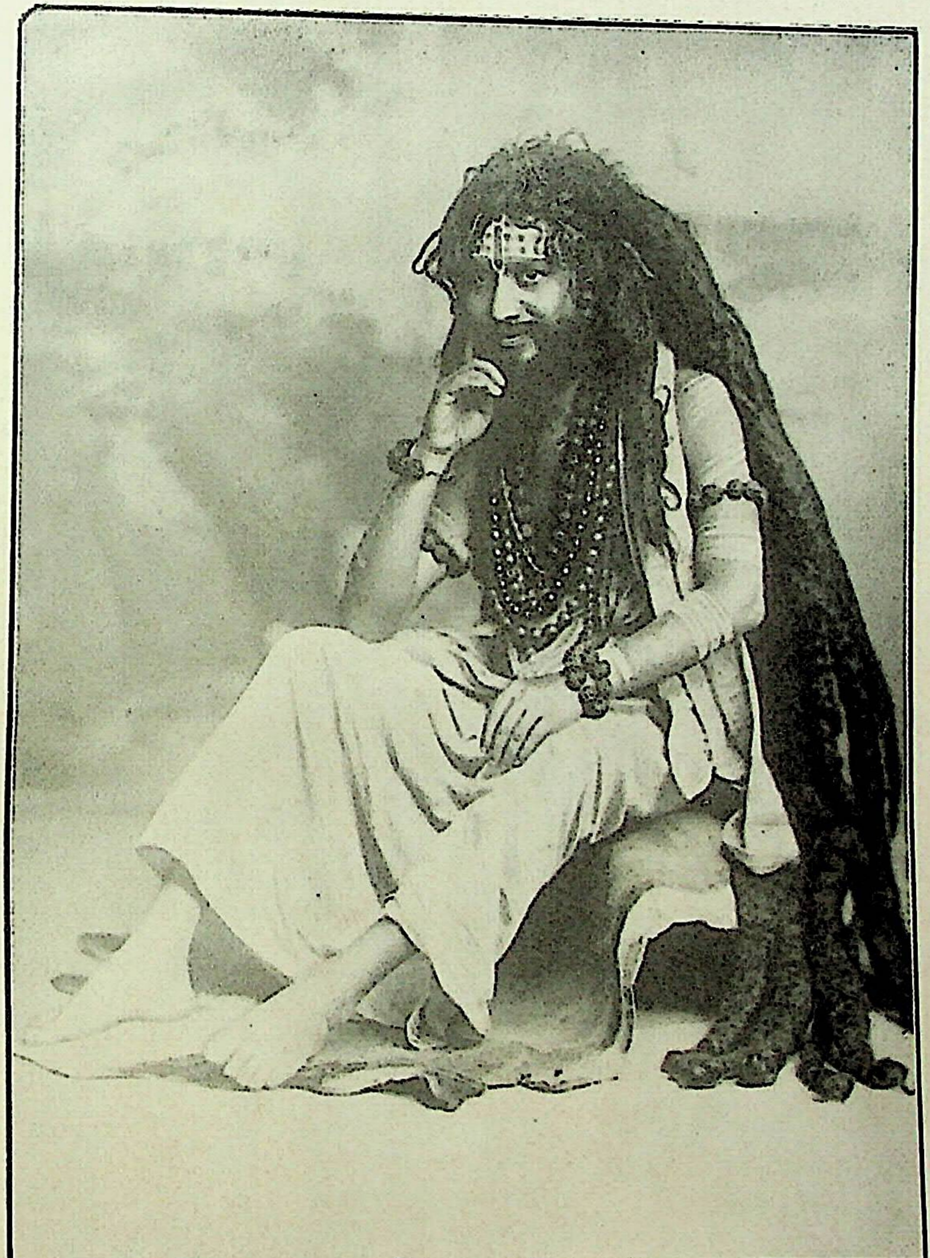

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী পৃষ্ঠা ৩১৫

স্থাবর, জঙ্গম—পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এখন আছে এবং পরে থাক্‌বে না। যাহা কিছু দেখ্‌বেন সকলেতেই এই ভাব আরোপ কর্‌বেন। ইহা ছিল না, এখন আছে, পরে আর থাক্‌বে না। ক্রমে এই ধারণা যত দৃঢ় হবে ততই সমস্ত অসার, অনিত্য, মিথ্যা মনে হবে,—কিছুতেই আর মমতা থাক্‌বে না। তখন হৃদয় শূন্য বোধ হবে। এই সময় যাহা চিরকাল থাকে, চিরস্থায়ী এমন একটি বস্তু পাইতে তীব্র ব্যাকুলতা জন্মাবে—সেই সময়ে দীক্ষা। তখন দীক্ষালাভ ক'রে কৃতার্থ হবেন।”

ইহার পর আমরা কয়দিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া চৈত্রের শেষে ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইলাম।

সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের

দেহাশ্রিত অবস্থার ৮ বৎসরের (১২৯৩-১৩০০ সাল পর্য্যন্ত) অলৌকিক ঘটনাবলী
শ্রীচরণাশ্রিত নিত্যসেবক—**শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর** মহাশয়ের
ডায়েরীতে যথাযথভাবে লিখিত।

মহাপুরুষগণের ও নানা তীর্থস্থানের এবং বহু দেবদেবীর চিত্রে সুশোভিত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ।
একত্রে পাঁচখণ্ড — ২১৲

প্রথম খণ্ড (৫ম সংস্করণ ১২৯৩-৯৬) ৪৲। **চতুর্থ খণ্ড** (৩য় সংস্করণ ১২৯৯) ৪৲ ৮০

দ্বিতীয় খণ্ড (৩য় সংস্করণ ১২৯৭) ৪৲। **পঞ্চম খণ্ড** (৩য় সংস্করণ ১৩০০) ৫৲।

তৃতীয় খণ্ড (৫ম সংস্করণ ১২৯৮) ৪৲ ৫০ **হিন্দী অনুবাদ প্রথম খণ্ড**—২৲। **দ্বিতীয় খণ্ড** যন্ত্রস্থ ৩৲
৩য় খণ্ড ৪৲

সাধন সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা। এই সকল পুস্তকে সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বীর্য্যধারণ করিতে হইলে, নানা প্রলোভনের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া তপস্যা করিতে হয়, এই পুস্তকে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একাধারে উপনিষদ ও উপন্যাস। আর্য্য ঋষিগণের সারগর্ভ বাক্যাবলী ব্রহ্মচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। উচ্চ আদর্শকে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে এত সহজ ও সুখপাঠ্য করা হইয়াছে যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়।

কৃষ্ণ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ যুগাবতার সংস্রবে আসিয়া গোস্বামী প্রভু ধর্মক্ষেত্রে মহামিলন ঘটাইয়াছেন। সকল পথের সকল মতের সামঞ্জস্য করিয়া, মনুষ্যত্ব লাভের নূতন পথ দেখাইয়াছেন। গুরুর দয়া, শিষ্যের ঔদ্ধত্য, গুরুর আদেশ, শিষ্যের আনুগত্য দেখাইয়া গুরুর মাহাত্ম্য প্রকট করা হইয়াছে।

আচার্য্য প্রসঙ্গ—৪৷৷০ (শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবন-কথা। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ডায়েরী হইতে শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত)।

উপাসনা তত্ত্ব—৷৷০ (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)।

Brahmachari Kuladananda (Vol-I) Rs. 5/- (Early Life and Training under Bijoykrishna By Dr. Benimadhab, Barua, M. A., D. Lit. (Lond.)

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর ও শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবীর ছবি একরংয়ের প্রত্যেকটি ১৮"×১৪" [illegible]। শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ছবি একরংয়ের চারি প্রকার ১৮"×১৪" [illegible]। শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ছবি রঙিন ১৬"×১২" [illegible]। শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর বাণী [illegible]। ছোট ছবি একরংয়ের (নানাপ্রকার) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীকালিদাস বিশ্বাস ঃ সদ্‌গুরুসঙ্গ পাব্‌লিকেশন্, ১৪-বি ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪। বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানী, ২১৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,** কলিকাতা-৬। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ঠাকুরবাড়ী, পুরীধাম ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।